ভাষা আন্দোলন

সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন

মোস্তফা কামাল

ভাষা আন্দোলন ঃ
সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন

মোস্‌তফা কামাল

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম—ঢাকা

ভাষা আন্দোলন ঃ
সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন

মোস্তফা কামাল

●

প্রথম প্রকাশ ঃ
ফাল্গুন, ১৩৯৩
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

●

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
ফাল্গুন ১৪০৩
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

●

প্রকাশনায় ঃ
অধ্যাপক এন এম হাবিবউল্লাহ
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোনঃ ২২৭৫২৩

●

ঢাকা অফিসঃ
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

●

প্রচ্ছদ ঃ
ওয়াহেদ চৌধুরী

●

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
এ্যাডর্ন
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬১৬০১০

●

মুদ্রণে ঃ
নিশান প্রিন্টার্স
৫০, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১৪৮৬৬

●

মূল্য ঃ একশত সত্তর টাকা

BHASHA ANDOLAN : SHATCHALLISH THEKE BAANNA
MOSTOFA KAMAL, Second Edition, Falgun 1403 BS/February 1997
Published by Prof. N.M. Habibullah Director-In-Charge
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd.
Price : 170.00 US $ 6.00

ISBN-984-493-18-9

উৎসর্গ

যাঁদের জন্য আমার জীবনের 'সব কিছু'–
আব্বা আবদুল হাকিম
ও
আম্মা ফজিলতুন্‌নেছাকে
পরম শ্রদ্ধাভরে
মোস্‌তফা কামাল

আমাদের কথা

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ আন্দোলনে সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা রয়েছে। কিন্তু এ মহান আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের সামনে নেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীতে এ আন্দোলন চরম পরিণতি লাভ করে। আর এই পরিণতি আত্মত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

এ আন্দোলনে বস্তুনিষ্ঠ ধারাবাহিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য জনাব মোস্তফা কামাল দীর্ঘদিন এ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 'ভাষা আন্দোলনের সৈনিকদের' সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং এসব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ঢাকা ডাইজেস্টে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় সাক্ষাৎকারগুলো পাঠক ও বুদ্ধিজীবী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইতিহাসের অনুরাগী অনেক অনুসন্ধিৎসু পাঠক 'ভাষা আন্দোলনের সৈনিকদের' এ সাক্ষাৎকার সংগ্রহের কাজকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের অন্বেষায় 'গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক' হিসেবে উৎসাহিত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী 'ভাষা আন্দোলনের সৈনিকদের' কাছ থেকেই আমরা এ মহান আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করতে পারি। গ্রহণ ও বর্জনের সম্ভাবনা স্মরণ রেখেই বলা যেতে পারে, এ সব সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমরা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের অনেক বিভ্রান্তি ও কাল্পনিক তথ্য দূর করতে পারবো। ভাষা আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য এ দিক থেকে বিচার করলে দীর্ঘদিনের সংগৃহীত এ সাক্ষাৎকারগুলোকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলা যেতে পারে।

এ গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা সাক্ষাৎকারগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। আশা করি লেখকের ইতিহাস অন্বেষার এ শ্রম এবং আমাদের প্রয়াস পাঠক ও বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদৃত হবে।

এ, জেড, এম, শামসুল আলম
সভাপতি
সরকারনিযুক্ত পরিচালনা কমিটি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

৮/২/৮৭ইং

প্রকাশকের কথা

মরহুম মোস্‌তফা কামাল সংকলিত "ভাষা আন্দোলন ঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন" একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ১৯৮৭ সনে এর প্রথম সংস্করণ বের হয়। দুটি কারণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমটি অবশ্যই বইটির বর্তমান দুষ্প্রাপ্যতা। দ্বিতীয়টি বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের স্বরূপকে বিকৃত করার যে প্রচেষ্টা চলছে তাকে প্রতিরোধ করার এবং সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার।

মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঙ্গালী জাতি যে আত্মাহুতি দিয়েছে তার তুলনা পৃথিবীতে বিরল। এই বইটি তারই দলিল হিসাবে সংকলিত। ভাষা সৈনিকদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই সংকলন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন পরকালে। পরম করুণাময়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তাঁদের আত্মার মাগফেরাতের জন্যে।

বিদগ্ধ পাঠক সমাজের কাছে আবার নূতন কলেবরে বইটি পেশ করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত।

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ
বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম–ঢাকা।

৮ই জানুয়ারী '৯৭

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি স্মরণীয় অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছে অনেক পূর্বে। ইংরেজশাসিত ভারতে একটা প্রশ্ন উঠেছিল ভারতের সাধারণ ভাষা কি হবে? কংগ্রেস মহল একবাক্যে হিন্দীর স্বপক্ষে রায়দান করে। সাধারণভাবে মুসলমানেরা উর্দুর পক্ষে মত প্রদান করে। তবে এই দুই মতবাদের বিপক্ষে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে বাংলাকে ভারতের সাধারণ ভাষা করার জন্য একটি শোর উঠে। তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে শান্তি নিকেতনের মনীষীগণই ছিলেন প্রধান। বাংলাকে ভারতের সাধারণ ভাষা করার স্বপক্ষে ১৯২০ সালে শান্তি নিকেতনে যে সভা হয় তার সভাপতি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে সভায় ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার স্বপক্ষে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধটি মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে তখনকার দিনের ভারতের সকল অঞ্চলে এ মতবাদ গৃহীত হয়নি।

ইতিপূর্বে মধ্যপ্রদেশ থেকে উর্দুকে উচ্ছেদ করার জন্য এক ভীষণ আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। ১৯০০ খ্রীঃ যুক্তপ্রদেশের গভর্নর স্যার এন্টনী যুক্তপ্রদেশের সরকারী দফতর থেকে উর্দু ভাষা ও উর্দু বর্ণমালার পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষর প্রবর্তন করেন। এর ফলে মুসলিম সমাজ খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। কাজেই উপমহাদেশে সাধারণ ভাষা বা লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা নিয়ে তখনও বিতর্ক চলছিল। একে ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক বীজ বলা হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হওয়ার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। তবে এতে কোন কোন প্রদেশ সম্মত ছিল না। মাদ্রাজে হিন্দীর বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা দেখা দেয়। মাদ্রাজ প্রদেশের সুবিখ্যাত জননেতা চক্রবর্তী রাজা গোপালা চারী হিন্দীর পক্ষে ছিলেন বলে তিনি তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেন। ১৯৫৬ সনে স্বচক্ষে দেখেছি মাদ্রাজ শহরে হিন্দীতে প্রকাশিত পুস্তকাদির বহ্ন্যুৎসব হয়েছে। হিন্দীকে সাধারণ ভাষা করার যারা পক্ষপাতি ছিলেন তাদের যুক্তি ছিল, পূর্বেই যখন হিন্দীকে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে, তখন তাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে কি আপত্তি থাকতে পারে? তার উত্তরে হিন্দীর বিরোধী মাদ্রাজীরা বলতো, হিন্দী হচ্ছে বিজয়ীদের ভাষা। যে আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা কোনকালে দাক্ষিণাত্য জয় করেছিল তাদের ভাষা হচ্ছে হিন্দী। কাজেই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা যায় না। এ ক্ষেত্রে বিজেতা বলতে তারা শ্রী রামচন্দ্রকে মনে করতো।

তেমনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিন্ধু প্রদেশের ডক্টর দাউদ পোতা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নির্বিবাদে গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না। তিনিও পশতু ভাষার কবি খোশাল খান খটকের মত মোগলদের বিরোধী ছিলেন। মোগল আমলেই উর্দু বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে বলে তার বিরোধিতা করতেন।

তবে এ ক্ষেত্রেও উর্দুর স্বপক্ষে যারা যুক্তি পেশ করতেন তাদের যুক্তি ছিল এই যে, যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারা উর্দু সাধারণ ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে তখন দেশ বিভাগের পরে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। তবে এখানে একটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণ ভাষা হিসেবেই সকল প্রদেশের মুসলমান উর্দুকে গ্রহণ করলেও বাংলাদেশের মুসলমানদের পক্ষে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার মস্তবড় অসুবিধা ছিল এই যে, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানেই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বাস এবং তাদের ভাষা ছিল বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই কথ্য ভাষা উর্দু ছিল না। শুধুমাত্র পশ্চিম পাঞ্জাবের লেখার ভাষা ছিল উর্দু। অথচ সেই পশ্চিম পাঞ্জাবের লেখার ভাষাকেই পাকিস্তানের সর্বত্র রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করার কোন যুক্তিই নেই। কাজেই এই প্রচেষ্টার মূলে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল।

ভাষা আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা এ আন্দোলনের সার্থকতা খুব সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ ডক্টর শহীদুল্লাহ, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ও মনীষীগণ।

দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস গঠন করেন। এই তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত প্রথম পুস্তক 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' ?-প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেমের তিনটি প্রবন্ধ ছিল এবং এ দেশের ছাত্রসমাজ ও জনগণ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর স্বপক্ষে এ সব প্রবন্ধাবলীর যুক্তিতে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে।

গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলার স্বপক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ দেবের প্রস্তাব ও লিয়াকত আলী খান কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে রেসকোর্সের ময়দানে ও কার্জন হলে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উর্দুর স্বপক্ষে ভাষণের পর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর স্বপক্ষে জনমত আরো প্রবল হয়ে উঠে এবং অবশেষে পল্টন ময়দানে নাজিমুদ্দীনের উর্দুর পক্ষে পুনরায় ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের জনমত বাংলার দাবীর পক্ষে আরো দুর্বার হয়ে উঠে।

এ আন্দোলনের মূলতঃ দু'টি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় ১৯৪৭-'৪৮ সালের আন্দোলন। এতে অংশগ্রহণকারী ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন হল '৫২ সালের গণ আন্দোলন। এ দু'টি পর্যায় নিয়েই সামগ্রিকভাবে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস।

আশ্চর্যের বিষয় এ আন্দোলনের দু'পর্যায়ের কোনটিতেই অংশগ্রহণ করেননি এমন লোকও সগর্বে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী সৈনিক বলে নিজেকে প্রচার করছে এবং যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলনকালে ভীষণ নির্যাতন ভোগ করে আন্দোলনকে গড়ে তুলেছেন তাঁরা অনেকেই আজো অখ্যাত, অজ্ঞাত রয়ে গেছেন।

এ গ্রন্থে যে সব ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার রয়েছে তাতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাতে অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে এই যে, এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। এতে যাঁদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাঁরা নির্লিপ্ত প্রত্যক্ষদর্শী নন। তাঁরা হচ্ছেন এ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী ও ভুক্তভোগী। তাঁরা আন্দোলনকে জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন বলে তাঁদের সাক্ষাৎকারের মধ্যে আন্দোলনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের অভিজ্ঞতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সত্যতা দ্বারা উপস্থাপিত বলে এ সাক্ষাৎকারগুলোর মূল্য অপরিসীম।

ভাষা আন্দোলনের উপর এরূপ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিরল। এ জন্য এ পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত কাম্য। লেখকের চেষ্টা ও শ্রম সফল হোক এই কামনা করি।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

সূচীপত্র

সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় ও পদমর্যাদার কথা উল্লেখিত হয়েছে তা সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়কালীন। দু'একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে।

ভূমিকা

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অনন্য চেতনাদীপ্ত অধ্যায়। এ আন্দোলন জাতির সত্তা অন্বেষার এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। জাতির এগিয়ে চলার জন্য এ আন্দোলন প্রতিবাদী চেতনার এমন এক সুবিস্তৃত পথ রচনা করেছে, যা জাতিকে যে কোন সংকটকালে পথের দিশা দেবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার, অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা দেবে এ আন্দোলন। এ আন্দোলনের উত্তাপ আজো জাতিকে উজ্জীবিত করে। তাই ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদী চেতনার পথ দিয়ে আজো চলছে জাতির দৃপ্ত পদচারণা।

ভাষা আন্দোলনে একুশে ফেব্রুয়ারীর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলে ভাষা আন্দোলনকে বায়ান্নর একুশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সাতচল্লিশ সাল থেকে। এমনকি দেশ বিভাগের পূর্বেও সচেতন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদগণ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের আবেগ অনুভূতি প্রবলভাবে জড়িয়ে আছে। এই আবেগের উত্তাপে এবং উচ্ছ্বাসে যেন এ ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রকৃত ঘটনা এবং তথ্য হারিয়ে না যায়, সে জন্য আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। ইতিহাসের আলোকে ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজন।

বিভাগ-পূর্ব কালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন

দেশ বিভাগের পূর্বে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে 'উত্তর-পশ্চিম' ও 'পূর্বাঞ্চলে' দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করে সচেতন বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটি আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটির তাৎপর্য কমে যায় নি। পাকিস্তান পূর্বকালে মুজিবুর রহমান খাঁ রচিত 'পাকিস্তান', হাবিবুল্লা বাহারের 'পাকিস্তান', তালেবুর রহমানের 'পাকিস্তানবাদের ক্রমবিকাশ' ও 'সর্বহারাদের পাকিস্তান' শীর্ষক গ্রন্থসমূহে এবং ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, কবি ফররুখ আহমদ, আবদুল হক, মাহবুব জামাল জায়েদী প্রমুখের লেখায় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গটি স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

[দ্রষ্টব্যঃ 'বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা প্রীতি', মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, 'ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব', আবদুল হক]

রেনেসাঁ সোসাইটি ও সাহিত্য সংসদ

বিভাগ-পূর্ব কালে কলিকাতা ও ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' ও 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' নামে যে দুটি সাংস্কৃতিক সংস্থা ছিল তাদের আলোচনা সভাতেও বহুবার বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা আলোচিত হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তখনও লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ার কথা।

আজাদের একটি সম্পাদকীয়ঃ
বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের পক্ষ হতে "হিন্দী"-কে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জোর প্রচেষ্টা ও তৎপরতা চলে। সমগ্র ভারতকে এক রাষ্ট্রে পরিণত এবং এক জাতীয়তায় আবদ্ধ করার জন্য এই প্রচেষ্টা ও কৌশলে গান্ধীজী থেকে শুরু করে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বলে পরিচিত সকল নেতৃবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা দাবী হিসেবে ভারতের উর্দু সমর্থক মুসলমানদের পক্ষ হতে "উর্দু"-কে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা ও দাবী উত্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ সোলেমান-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুবাদ সংঘের কার্যক্রমের আলোচনা প্রসঙ্গে এক আলোচনা সভায় তিনি এ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "ভারতের বিভিন্ন ভাষাবিদ অধিবাসীদের মধ্যে এমন একটি ঐক্যসূত্রের যোগ রহিয়াছে যাহা ইউরোপের কোন দেশের মধ্যে নাই।.....

ভারতবর্ষে এক ভাষা ও এক জাতীয় বর্ণমালা প্রচলনের আদর্শ হয়তো অনাগত বহু বর্ষ যাবত আদর্শের রাজ্যেই থাকিয়া যাইবে; তথাপি ভারতবর্ষে অন্ততঃ একটি ভাষা আছে যাহা ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান শহরে প্রচলিত, সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক যে ভাষায় অভিজ্ঞ এবং পৃথিবীর অধিক স্থানের লোক যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন।.... ভারতবর্ষের ভাষা জগতে ইহা (উর্দু) এক নূতন অভ্যুদয়, বিগত বহু শতাব্দী যাবত হিন্দু ও মোছলেম সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ও মিলন-মিশ্রণের ভিতর দিয়া এই ভাষার উদ্ভব হইয়াছে।" [আজাদ, ১ম বর্ষ ১৫১ সংখ্যা]

হিন্দী এবং উর্দুর পাল্টা দাবী হিসেবে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার দাবী পেশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৩৭ সনের আজাদের একটি ঐতিহাসিক সম্পাদকীয় উল্লেখযোগ্য। ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আজাদের সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ

"ভারতের রাষ্ট্রভাষা"

"ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ এবং উহার বর্তমান প্রদেশগুলি বস্তুতঃ অন্যান্য অঞ্চলের এক একটা দেশের সমান, বরং কোন কোনটা অপেক্ষা বড়। প্রকৃতির অনুশাসনে এই সব দেশের আবহাওয়া ও জল মাটির ন্যায় এই সব দেশ বা প্রদেশের অধিবাসীদের ভাবে ও ভাষায়, আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত পার্থক্যকে বিস্মৃত হইয়া সমগ্র ভারতকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া তাহার জন্য একটি রাষ্ট্রভাষা করিতে যাওয়া, আবশ্যক হইলেও স্বাভাবিক হইতেছে না।

নেহেরু রিপোর্টের যুগে মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রভাষা উপলক্ষে হিন্দী ও উর্দুর পরস্পরবিরোধী দাবীর মীমাংসা করিয়া দিয়া বলিলেন–'আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইবে হিন্দুস্থানী', আরবী বর্ণমালায় লিখিত হইলে যাহার নাম হইবে উর্দু এবং দেবনাগরী বর্ণমালায় লিখিত হইলে যাহাকে বলা হইবে হিন্দী। কিন্তু নেহেরু রিপোর্টের ফলাফল সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়াতে মহাত্মাজী অচিরে তাঁহার মত ও পথ বদলাইয়া ফেলার জন্য বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতার মত নূতন ফর্মুলার সন্ধানে থাকিলেন। তখন প্রকাশ্যভাবে হিন্দীর অনুকূলে ও উর্দুর প্রতিকূলে ক্রুসেড না হইলেও বস্তুতঃ হিন্দুস্থানীয় নামে হিন্দীকে চালাইয়া দিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। এই অবসরে মহাত্মাজী হিন্দী অভিযানের প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজন শেষ করার পর অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিলেন ভাবী রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে –"হিন্দী–হিন্দুস্থানী।"

এই হিন্দী-হিন্দুস্থানীয় অমিশ্র সংযোগের রহস্যভেদ বাহ্যতঃ একটু কঠিন। কিন্তু ইহার ইতিহাসটা জানা থাকিলে উহার তত্ত্বকথাটা সহজে বোঝা যাইতে পারিবে। মহাত্মাজী মহাত্মা মানুষ। কিছুদিন পূর্বে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে–হিন্দীও নয় উর্দুও নয়–হিন্দুস্থানী। এখন সেই হিন্দুস্থানীকে হিন্দীতে পরিণত করার দরকার, অথচ মহাত্মা মানুষের কথার খেলাফ কোন অবস্থাতেই হওয়া উচিত নহে। কাজেই হিন্দুস্থানীকে পূর্বের মত অবিকল রাখিয়া তাহার পূর্বে হিন্দীকে বিশেষণরূপে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে প্রতিশ্রুতিও বাঁচিল, হিন্দীও রক্ষা পাইল। সেই হইতে এই হিন্দী-হিন্দুস্থানী অর্থাৎ হিন্দীকেই মহাত্মাজী ও তাহার অনুচরেরা রাষ্ট্রভাষার সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মন এত মহান ও দৃষ্টি এত উদার যে, এই হিন্দীকেই তাঁহারা ভারতীয় জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির একমাত্র মহান বাহন বলিয়া ঘোষণা করিতেও বর্তমানে আর কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। কিন্তু ভারতের মুসলমান সমাজ তাঁহাদের এই সব চেষ্টা ও যুক্তিবাদে একেবারে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের মতে, হিন্দী ভাষা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাহন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে সেগুলি বিজাতীয়– মুসলমানের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কোন স্থানই তাহার মধ্যে নাই, এবং সব চাইতে বড় কথা এই যে, তাঁহাদের মতে কোন প্রকার সামঞ্জস্যই বিদ্যমান নাই।

বিপদের কথা দাঁড়াইয়াছে যে, এই রাষ্ট্রনৈতিক হুজুগের স্রোতে একদিকে বাংলার হিন্দুরা আত্মবিস্মৃত অবস্থায় ভাসিয়া চলিয়াছেন, বাংলার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে পরদেশীয়দের পদানত করিয়া দিতে, বাংলার মুসলমানও এই হিন্দীর প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অগত্যা উর্দুকে অবলম্বন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন, আমাদের মাতৃভাষার যে বিরাট সর্বনাশ এই সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তরালে লুকাইয়া আছে, বাংলার হিন্দু বা মুসলমান কেহই সে সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাশ পাইতেছে না।

....

মধ্যবিত্ততার একটু স্বাধীন চিন্তার আভাস পাইয়া আজ একটু আনন্দ অনুভব করিতেছি। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার সরকার এই সমিতির এক সভায় ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাভাষার দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সরকার মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেন– "একদিকে মানভূম, সি-ভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, অন্যদিকে শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কাছাড় পর্যন্ত বাঙ্গলার আসল সীমানা। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রায় ৭ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলে। হিন্দী ভাষার সংখ্যা এর চেয়ে বেশী নয়। তাহা ছাড়া, আসামী, উড়িয়া ও মৈথিলিও বাঙ্গালারই শাখা ভাষা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব বঙ্গে ও বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় উচ্চারণের কিছু প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু লেখ্য বাঙ্গলার রূপ সর্বত্রই একই। সাহিত্যের দিক দিয়া বাঙ্গলা ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গলা ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দের সংখ্যাও বেশী। অতএব বাঙ্গলা সব দিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষার চেয়ে হিন্দীর যোগ্যতা কোন দিক দিয়াই বেশী নহে। একদিকে বিহার হইতে রাজপুতনা, অন্যদিকে গাড়োয়ান হইতে মধ্য প্রদেশ পর্যন্ত হিন্দী ভাষা বিস্তৃত বটে, কিন্তু এই ভূ-ভাগের মধ্যে ৪-৫ রকমের হিন্দী প্রচলিত। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। ইহা ছাড়া হিন্দীর পাশাপাশি উর্দুও ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতেছে।"

এই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষায় কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য নাই, ইহার শব্দসম্পদও বেশী নয়। বাঙ্গলার চেয়ে এই 'বাজার চলতি' 'হিন্দুস্থানী'র রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা নিশ্চয়ই বেশী নয়। উত্তর ভারতের সর্বত্র হিন্দুস্থানীর ন্যায় বাঙ্গলাও সকলের বোধগম্য। দক্ষিণ ভারতের হিন্দী, হিন্দুস্থানী বা বাঙ্গলা সকলেরই সমান অবস্থা। প্রফুল্ল বাবু আরো বলেন যে, হিন্দী ও হিন্দুস্থানীর প্রচারকল্পে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ব্যক্তিরা বহু চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বাংলার সে সৌভাগ্য নাই। বাঙ্গালীরা তীর্থ ভারতীয় ব্যাপারে আজকাল উদাসীন, সুতরাং নিজেদের দাবী পেশ করিতে তাহারা অক্ষম। বাঙ্গালীর

হীনতাবোধই (Inferiority complex) ইহায় বাধে।

শ্রীযুক্ত সরকারের এই যুক্তিগুলি এবং তাহার মূলীভূত উদ্দেশ্যটা বাংলার হিন্দু মুসলমান চিন্তানায়কদের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ভারতের হিন্দুস্থানীয় ধনকুবেররা যে কোন কারণে যে কোন উপায়ে হউক, বাংলায় সকল প্রকার শিল্প বাণিজ্যের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের দেশের কোন কর্মক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর জীবনে হিন্দু হউক, আর মুসলমান হউক কোন প্রকার অধিকার নাই।

রাষ্ট্রভাষার আসনের উপর বাংলা ভাষার দাবী সম্বন্ধে আর একটা কথাও বিশেষভাবে জোর দিয়া বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রভাষার নির্বাচন লইয়া হিন্দী উর্দুর সমর্থকদের আজ যে তুমুল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে হয়ত উর্দু ও হিন্দীর মধ্যে কোনটারই রাষ্ট্রভাষার আসন অধিকার করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হইলে এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত সংঘর্ষের আশংকা বহু পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে। কারণ মোছলেম ভারতের অন্তর্গত অংশ খাঁটি বাংলাভাষী। হিন্দী ও বাংলার মধ্যে প্রতিযোগিতা হইলে বাংলাকে সমর্থন করা তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।" (আজাদ, ২৩শে এপ্রিল ১৯৩৭/শুক্রবার ১০ই বৈশাখ ১৩৪৪)

উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বে অখণ্ড ভারতে কংগ্রেস নেতাদের হিন্দীকে একক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে উর্দু সমর্থক মুসলমানদের মধ্যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। হিন্দীর পাল্টা দাবী হিসেবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার এ মানসিকতা দেশ বিভাগের প্রাক্কালে আরো প্রবল হতে থাকে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় সংহতির নামে পাকিস্তানে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা এ মানসিকতারই ফসল।

আমরা আজ গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি, লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বেও হিন্দী ও উর্দুর রাষ্ট্রভাষার আসন দখল করার এ তুমুল লড়াইয়ের প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের সচেতন বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদগণ সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবীকে সোচ্চার করে তুলে ধরেছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত আজাদের ১৯৩৭ সালের আলোচ্য সম্পাদকীয় তারই পরিচয় বহন করছে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ অভিমত ব্যক্ত করেন, হিন্দীকে ভারতের

রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যুক্তিসঙ্গত কারণে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত।

ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদের বক্তব্য খণ্ডন করে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সাতচল্লিশের উনত্রিশে জুলাইয়ের দৈনিক আজাদে প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য জোরালো বক্তব্য ও যুক্তি পেশ করেন। তিনি বলেনঃ

"কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ... যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।" (কারণ উর্দু পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোন অঞ্চলের ভাষা নয়। এই অর্থে উর্দুও বিদেশী ভাষা) "যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য।"

"পূর্ব পাকিস্তানের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দীকে গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতার নামান্তর হইবে।" (দৈনিক আজাদ ঃ ২৮শে জুলাই, ১৯৪৭)

আবুল মনসুর আহমদ

উনিশশ' তেতাল্লিশ সালে মোহাম্মদীতে প্রকাশিত "পূর্ব পাকিস্তানের জবান" শীর্ষক এক প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে জনাব আবুল মনসুর বলেন, "উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাংলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়নে হাত দিতে পারবো।

জাতির যে অর্থ, শক্তি, সময় ও উদ্যম উর্দু প্রবর্তনে অপব্যয় হবে তা যদি আমরা শিক্ষা, সাহিত্যে নিয়োজিত করি তবে পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতের এমন কি গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবো।" (মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৫০)

কবি ফররুখ আহমদ

বিভাগ-পূর্ব কালে উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তির রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিপক্ষে বক্তব্য রাখার কঠোর সমালোচনা করে "পাকিস্তান ঃ রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে কবি ফররুখ আহমদ বলেন–

"পাকিস্তানের অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে এ কথা সর্ববাদিসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলাভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করেছেন যা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাদের অভিমত। কী কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পেছনে কাজ করছে এ কথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি।" (মাসিক সওগাত, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫৪)

ইতিপূর্বে কবি ফররুখ বাংলা উর্দু রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে যে ব্যাঙ-সনেট লিখেন তা থেকে তৎকালীন সচেতন মুসলিম সাহিত্যিকদের রাষ্ট্রভাষা চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

"দুইশ পঁচিশ মুদ্রা সে অবধি হয়েছে বেতন/বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকে করিয়াছি নিকা/বাপাও শ্রমের ফলে উড়িছে আশার চামচিকা/উর্দু নীল অভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)!" উর্দু বনাম বাংলা ঃ মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৫২)।

রাষ্ট্রভাষা ও তমদ্দুন মজলিস

দেশ বিভাগের পর বাংলাকে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপন করে তমদ্দুন মজলিস। ১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম ও অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রের উদ্যোগে 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' নামে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। তবে অধ্যাপক আবুল কাসেমই উদ্যোক্তা ছিলেন। তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা দাবী প্রসঙ্গে মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছেনঃ

"বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা যায় কিনা এ নিয়ে ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী মহলে প্রথম চিন্তার সূত্রপাত করে তমদ্দুন মজলিস। এই তমদ্দুন মজলিস ছিল ইসলামিক আদর্শে প্রভাবিত আধা-রাজনৈতিক এবং আধা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র এবং কতিপয় শিক্ষকের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। রশিদ বিল্ডিং-এর পাশে সুরুজ্জামান মেসের একটি পুরাতন দালানের উপরের তলায় তমদ্দুন মজলিসের অফিস স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানই প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ওঠায় এবং ভাষা আন্দোলনের পথ উন্মোচন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্ররা একে সামগ্রিক রূপ প্রদান করে।" (দ্রষ্টব্য ঃ ঢাকা ডাইজেস্ট, মার্চ, ১৯৭৮)।

অন্যত্র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মোঃ তোয়াহা বলেছেনঃ "১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের সাথে সাথেই ভাষার প্রশ্নটি উচ্চারিত হয়।....... ভাষা সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ তেমন চিন্তা করতেন না। 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি আধা-রাজনৈতিক আধা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন অধ্যাপক

আবুল কাসেম। তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আর আমি ছিলাম ফজলুল হক হলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সে সময় আবুল কাসেম সাহেব আমাদের সকলকে ধরে নিয়ে তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি সে দিন সে-প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু মাঝে-মধ্যে তমদ্দুন মজলিসে যেতাম।

তাঁরা মাঝে-মাঝে আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। সে সভায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হত। বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যেও কিছু আলোচনা হত। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে, এটা কোনদিন কারও মাথায় ঢোকেনি। বুদ্ধিজীবী মহলে খানিকটা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা হত। ....(স্মৃতিচারণ, একুশের সংকলন ১৯৮১, বাংলা একাডেমী সম্পাদিত)

তমদ্দুন মজলিসের "এসব সেমিনারে মজলিস নেতৃবৃন্দ, প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতেন।"

(দ্রষ্টব্যঃ বিশেষ সাক্ষাৎকার, ঢাকা ডাইজেস্ট, মার্চ ১৯৭৮)

প্রথমদিকে তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক এ, কে, এম, আহসান, (পরবর্তীকালে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য), সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম, আজিজ আহমদ (মরহুম), অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, সানা উল্লাহ নূরী প্রমুখ।

ক্যাম্পাসের প্রতিকূল পরিবেশ

তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হওয়ার পর প্রথম দিকে এর কর্মতৎপরতার পরিসর ছিল খুবই সীমিত। মজলিসের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবনা নিয়ে যে সব সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলত না। এ প্রসঙ্গে ডঃ নূরুল হক ভূঁইয়া বলেছেনঃ

"একেবারে প্রথম দিকে তো রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হতে পারে এ ব্যাপারটি যেন অনেকে বুঝতেই চাননি। এর গুরুত্বও অনুভব করেন নি। ইউনিভার্সিটির কয়েকজন সায়েন্সের অধ্যাপক ছাড়া এ ব্যাপারে কেউ এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। বাংলা ডিপার্টমেন্ট তো রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে চরম নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে। .... প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটি নিয়ে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আমাদের রীতিমত নাজেহাল হতে হয়েছে।

ক্যাম্পাসে যাঁদের সাথে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করে তখন সাড়া পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে ফজলুল হক হলের প্রভোষ্ট ডঃ মাহমুদ হোসেন (পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন), অধ্যাপক রেআয়েৎ খাঁ, সরদার ফজলুল করিম, আজিজ আহমদ

প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রেআয়ৎ খাঁ অবাঙ্গালী ছিলেন। তিনি প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিরও (পরিষদ) সদস্য ছিলেন। ডঃ মাহমুদ হোসেন ও রেআয়ৎ খাঁ রাষ্ট্রভাষা বাংলার মুখর সমর্থক ছিলেন। রেআয়ৎ খাঁ বলতেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ন্যায্য এবং স্বাভাবিক। (ঢাকা ডাইজেস্ট, নভেম্বর ৭৮)

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা

১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' –এ নামে তমদ্দুন মজলিস একটি বই প্রকাশ করে। অধ্যাপক আবুল কাসেমের চেষ্টায় ও সম্পাদনায় মজলিস কর্তৃক বলিয়াদি প্রেস হতে এই বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, 'ইত্তেহাদ' সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম লিখিত প্রবন্ধ ছাপা হয়। প্রবন্ধগুলোতে নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা হয়– বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত। (ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, অধ্যক্ষ আবুল কাসেম)

"…. এ সব লেখায় (প্রবন্ধে) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে যুক্তি ও জোরালো বক্তব্য পেশ করা হয়। এরপর রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি ছাত্রমহলে জনপ্রিয় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। … তখনও এ দাবীর পেছনে ছাত্ররাই ছিল নিয়ামক শক্তি।" (মোহাম্মদ তোয়াহাঃ ঢাকা ডাইজেস্ট, মার্চ ৭৮)

বস্তুতঃ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিশ প্রকাশিত 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' –এই পুস্তিকা জনমত গঠনে সুদূর-প্রসারী অবদান রাখে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত এটাই ছিল প্রথম পুস্তিকা।

বইটির মুখবন্ধে যে প্রস্তাবগুলো সন্নিবেশিত হয় তা ছিল নিম্নরূপঃ

"স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়েছে। 'আজাদ' ও 'ইত্তেহাদের' আলোচনা, বহু নামজাদা সাহিত্যিক ও রাজনীতিকের মতামত ইত্যাদি যাচাই করে আমরা নিম্নরূপ প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানের সুধী সমাজের নিকট পেশ করছি।

১। বাংলা ভাষা-ই হবে
(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন
(খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা
(গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি– উর্দু ও বাংলা।

৩। (ক) বাংলা-ই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব

পাকিস্তানের শতকরা একশ জনই শিক্ষা করবেন।

(খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। যাঁরা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরি ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তাঁরাই শুধু ও-ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেয়া যাবে।

(গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যাঁরা চাকরি করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাঁদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে হাজারে ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না।

ঠিক একই নীতি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে স্থানীয় ভাষা উর্দু প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা, আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকাজ চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলাভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।

প্রথম মেমোরেণ্ডাম

রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে এক স্বাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত মেমোরেণ্ডামে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা ও নামকরা ব্যক্তিদের স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য মজলিসের নেতা ও কর্মীরা চেষ্টা চালায়। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ স্বাক্ষরতা অভিযানে বেশ সাড়া পাওয়া যায়। এমনকি অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীও মেমোরেণ্ডামে স্বাক্ষর করেন। এঁদের মধ্যে তৎকালীন ডি-আই-জি মরহুম আবুল হাসনাতের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময় কয়েকজন মন্ত্রীও গোপনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে সমর্থন করতেন। এঁদের মধ্যে জনাব হাবিবুল্লা বাহার ও সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [অধ্যক্ষ আবুল কাসেম]

'মেমোরেণ্ডামটি সরকারের কাছে পেশ করা হয়– আর তার কপি কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। তখনকার স্থানীয় পত্রিকাগুলি একে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল কলিকাতার "ইত্তেহাদ" (জনাব আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত) ও মরহুম আবদুল ওয়াহেদ নামক একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সম্পাদিত সাপ্তাহিক "ইনসাফ"। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তখনো 'সৈনিক' বের হয়নি'। [দ্রষ্টব্যঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ঃ অধ্যক্ষ আবুল কাসেম]

ফজলুল হক হলে সাহিত্য সভা

ছাত্রদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে জনপ্রিয় করার জন্য তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লা বাহার চৌধুরী। মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থক। উক্ত সাহিত্যসভায় আলোচনায় অংশ নেন কবি জসীম উদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম ও কয়েকজন মন্ত্রী।

[দ্রষ্টব্যঃ মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, ঢাকা ডাইজেস্ট, মার্চ ৭৮]

প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে আরো সোচ্চার করার জন্য ফজলুল হক হলের সাহিত্যসভার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর নূরুল হক ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের অফিসে সুরত জামাল মেসের পুরোনো ঘরটিতেই সংগ্রাম পরিষদের কাজ শুরু হয়। প্রথম দিকে খুবই গোপনীয়ভাবে সংগ্রাম পরিষদের সভাগুলো অনুষ্ঠিত হতো। কারণ তখনও ভাষা প্রশ্নে জনমত গড়ে উঠেনি। ইতিপূর্বে ভাষা প্রশ্নে তমদ্দুন মজলিসের কর্মতৎপরতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পুরোনো ঢাকার একদল লোক এসে একদিন মজলিস অফিসে হামলা চালায় এবং সবকিছু তছনছ করে দেয়। পুরোনো ঢাকার স্থানীয় জনসাধারণ তখন মনে করতো রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী তুলে ছাত্ররা পাকিস্তান ও ইসলামী আদর্শের খেলাপ কাজ করছে। (অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, ডঃ নূরুল হক ভূঁইয়া)

ভাষা আন্দোলন এবং পুরোনো ঢাকা

"এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে ইশ্‌তেহার বিলি করতে গিয়ে ছাত্ররা চকবাজারে স্থানীয় জনতা কর্তৃক ঘেরাও হয়।" এই ছাত্রদের মধ্যে মোহাম্মদ তোয়াহা ও গোলাম আযম (অধ্যাপক গোলাম আযম)-সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কয়েকজন ছাত্র ছিলেন। ছাত্ররা উত্তেজিত জনতার সামনে অসহায় অবস্থার সম্মুখীন। "এ সময় গোলাম আযম সাহস করে এগিয়ে যান। তিনি চীৎকার করে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন 'আরে ভাই, আমরা কি বলতে চাই তা একবার শুনবেন তো।' এ বলেই তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কি উপকার হবে তার ওপর ছোট-খাট বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি শান্ত হয়। সে দিন আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।" (দ্রষ্টব্যঃ মোহাম্মদ তোয়াহা ঃ ঢাকা ডাইজেস্ট, মার্চ ১৯৭৮)

এভাবে পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিকে নেতা ও কর্মীদের অপ্রীতিকর ও বিপদজনক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের দাবী

সাতচল্লিশ সালের ৫ই নভেম্বর শিল্পী জয়নুল আবেদিনকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ফজলুল হক মুসলিম হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোতাহার হোসেন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উক্ত সভায় আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ জনাব শরফুদ্দিন, অধ্যাপক আবুল কাসেম, কবি কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম ও অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন এবং সাহিত্যিক আবুল হাসনাৎ, সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দিন প্রমুখ বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন বলেন............ "উর্দু ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ভাষারই স্বরূপ। উর্দু কখনই বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া যুক্তিযুক্ত।" (এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মহল উর্দুকে মুসলমানের ভাষা হিসেবে প্রচার চালিয়ে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।) জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে উর্দুর স্বপক্ষে ক্ষমতাসীন মহলের ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করেন। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। (দ্রষ্টব্য ঃ দৈনিক আজাদ, ৮ই নভেম্বর ১৯৪৭)

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্ম-তৎপরতায় এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটি ছাত্র মহলে সামগ্রিকভাবে জনপ্রিয় দাবীতে পরিণত হতে শুরু করে। উর্দুর স্বপক্ষে ক্ষমতাসীন মহলের গৃহীত এ সময়ের কিছু পদক্ষেপ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন শিক্ষিত সমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এগুলোর মধ্যে পোস্টকার্ড, খাম, মনিঅর্ডার ফরম, রেলের টিকিট ও টাকায় বাংলা ব্যবহার না করে শুধু ইংরেজী ও উর্দুর ব্যবহার, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় হতে বাংলাকে বাদ দেওয়া ও করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের সংবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিভিল সার্ভিসের সিলেবাস

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ সচিব মিঃ গুড ইন '৪৭ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে উচ্চতর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বিষয়াদি সম্পর্কে একটি সার্কুলার পাঠান। এই সার্কুলারে ঐ পরীক্ষার জন্য

সর্বমোট ৩১টি বিষয় দেওয়া হয়, যার মধ্যে নয়টি ছিল ভাষা। এই সকল ভাষার মধ্যে হিন্দী, উর্দু, ইংরেজী, জার্মান, ফ্রান্স এমন কি মৃত ভাষা ল্যাটিন ও সংস্কৃতও স্থান পায়। কিন্তু স্থান পায় না পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা। এই সার্কুলারের উল্লেখ করে অধ্যাপক আবুল কাসেম কলিকাতার দৈনিক ইত্তেহাদে একটি বিবৃতি দেন। ত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে ঐ বিবৃতি এবং এ সম্পর্কে পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদের লেখা এক কড়া সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ ভাষা আন্দোলনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি, অধ্যাপক আবদুল গফুর, [দৈনিক আজাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩]

প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকপত্র পেশ

উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে এ আশংকায় ছাত্র, শিক্ষক ও সমাজের সচেতন শ্রেণী এ সময় খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। '৪৭-এর ১৭ই নভেম্বর বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ জানিয়ে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকপত্র দাখিল করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের শত শত নাগরিক এই স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, আইনজীবী, শিক্ষক, ওলামা, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, সাংবাদিক এবং সরকারী কর্মকর্তাসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন। স্মারকপত্রে উল্লিখিত রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটি পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী মন্ত্রীরাও সমর্থন করেন বলে জানা যায়।

(দ্রষ্টব্য ঃ দৈনিক আজাদ, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪৭)

রাষ্ট্রভাষার দাবীতে প্রথম সভা ও মিছিল

'৪৭ এর পাঁচই ডিসেম্বর করাচীতে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই ডিসেম্বর ঢাকার ইংরেজী দৈনিক, 'মর্নিং নিউজ' -এ প্রকাশিত হয় যে, শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে সম্মেলনে উপস্থিত পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিরাও উর্দুর পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে।

এ সংবাদটি ঢাকার ছাত্রদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সে দিনই ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা দলে দলে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় (বর্তমানের আমতলার অদূরে) এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এটাই ছিল প্রথম ছাত্রসভা।

সভা শুরু হয় বেলা দু'টায়। সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক

ও তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাসেম (অধ্যক্ষ, বাংলা কলেজ, অবসর প্রাপ্ত)। বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট (মৌলবী) ফরিদ আহমদ, মুনির চৌধুরী, এ, কে, এম, আহসান, আবদুর রহমান চৌধুরী, কল্যাণী দাস গুপ্ত। ফরিদ আহমদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব দেন। আরেকটি প্রস্তাবে রাষ্ট্রভাষা এবং লিংগুয়া ফ্রাংকা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে চাপা দেয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মন্তব্য করা হয়।

সভার পর প্রতিবাদ মিছিল করে ছাত্ররা যান সেক্রেটারিয়েটে। সেখানে কৃষিমন্ত্রী তাদের দাবী মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন। তারপর ছাত্ররা নূরুল আমীন ও হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান। নূরুল আমীন ছাত্রদের কাছে ওয়াদা করেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে ব্যর্থ হলে তিনি আর মন্ত্রী থাকবেন না। অবশেষে মিছিলটি খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে যায় এবং ফরিদ আহমদ সহ তিন জনের একটি প্রতিনিধিদল নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। কিছু বিতর্কের পর নাজিমুদ্দীন লিখিতভাবে আশ্বাস দেন যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।

ছাত্রদের এই প্রতিবাদ সভা ও মিছিল পুরোনো ঢাকায় এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যে, দীর্ঘ দিন ছাত্রদের প্রচলিত পোষাক লম্বা সাদা জামা ও পাজামা পরিহিত কেউ তৎকালীন শহরের প্রধান বিপনী কেন্দ্র সদরঘাটে যেতে পারতো না।

[বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, অধ্যক্ষ আবুল কাসেম। 'প্রথম সভা ও মিছিল', দৈনিক বাংলা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী '৮৩।

মুসলিম হলে মাওলানা আকরাম খাঁ

সাতচল্লিশ সালের ৭ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ঢাকার শিক্ষাবিদ ও ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।

সভাপতির ভাষণে জনাব আকরাম খাঁ ঘোষণা করেন "উর্দু কিছুতেই বাংলার (পূর্ব পাকিস্তানের) রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না।" তিনি বলেন, "শতকরা নিরানব্বই জন যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষা চাপাইয়া দিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। আম বৃক্ষের নিকট হইতে আখরোট ফল আশা করা যেমন সম্ভব নয়, বাংলাদেশেও বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা শিক্ষা বা সরকারী অফিস আদালতের মাধ্যম হিসাবে

আশা করা সেরূপ অসম্ভব ব্যাপার।"

উর্দুর স্বপক্ষে "মর্নিং নিউজের" সম্পাদকীয় লেখার তীব্র সমালোচনা করে, জোর করে উর্দু শিখানোর চেষ্টা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এরূপ জবরদস্তি বাংলার মুসলমান সহ্য করিবে না– এরূপ কখনও আমরা হইতে দিব না।" সভায় আরো বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ জহুরুল ইসলাম, জনাব আবু সুফিয়ান, জনাব হাবিবুল্লা বাহার প্রমুখ।

[দৈনিক আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ঃ কয়েকটি দলিল, বাংলা একাডেমী]

বাংলা ও উর্দু ভাষা সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী

এ সময় ঢাকায় বাংলা ও অবাঙ্গালী উর্দু সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। "১২ই ডিসেম্বর পলাশী ব্যারাকে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী কেরানীদের মধ্যে গোলযোগ ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে পলাশী-ব্যারাক ও আহসান উল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গুণ্ডাদের হামলা হয় এবং পুলিশের গুলি বর্ষিত হয় বলে খবর রটে। সংঘর্ষের ফলে ২০ জন আহত হয় এবং ২ জন মারা যায়। প্রতিবাদে ১৩ই ডিসেম্বর ছাত্র ও সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা ধর্মঘট করে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য ঢাকা শহরে ১৫ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি হয়।" [ডঃ নূরুল হক ভুঁইয়া ঃ ঢাকা ডাইজেস্ট, নভেম্বর '৭৮]

এ ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হয়। আজাদের রিপোর্টে বলা হয়, "বাংলা উর্দু লইয়া যে বিরোধ চলিতেছিল তাহা লইয়া দুইদল মুসলমানের মধ্যে আজ একটি সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষে কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

অদ্য রাতে বাসে করিয়া কতিপয় মুসলমান যুবক প্রচার করিতে থাকে যে, "উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হউক" "এই প্রচার বাহিনী" পলাশী ব্যারাকের নিকট পৌঁছিলে এক সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং লাঠি ও ইটপাটকেল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও বাঙ্গালী ও উর্দু ভাষার সমর্থকদের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়।

বৈকাল ৩টা পর্যন্ত ২০ জনেরও অধিক লোক আহত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৭ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ইহার পর বাঙ্গালী মুসলমানদের বিরাট একদল জনতা রমনা ও সেক্রেটারিয়েট অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা গ্রহণের দাবী জানায়।"

সরকারী এশতেহারে বলা হয়ঃ
অদ্যকার ঘটনায় প্রায় ২০ ব্যক্তি আহত হয়। ইহাদের মধ্যে ২ জনকে হাসপাতালে রাখিয়া বাকি সকলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।.......

প্রকাশ যে, কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বাসে করিয়া প্রচার করিতে থাকে যে, উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। পলাশী ব্যারাকের অধিবাসীগণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা উক্ত ঘোষণাতে আপত্তি করিলে সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং ইহার ফলে উক্ত ব্যক্তিগণ আহত হন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছে এবং সাবধানতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত এলাকায় পিকেট বসানো হয়। এই ঘটনার পরই শহরে ভীষণ গুজব ছড়াইতে থাকে এবং বলা হয় যে, দুই তিন ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। অপর একটি গুজবে বলা হয় যে, পুলিশ লাঠি অথবা গুলি চালাইয়া উক্ত ব্যক্তিদের হতাহত করে।

.... অপরাহ্নের দিকে একটি শোভাযাত্রা সরকারী দফতরের কাছে গিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস প্রদান করে কৃষিমন্ত্রী জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল ও শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ খান বলেন যে, "ভাষার প্রশ্ন লইয়া এত বাক-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ইহা নির্ভর করিতেছে।.... [দৈনিক আজাদ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭।]

শিক্ষা দফতরের প্রেসনোট

"উর্দুকে সাধারণ ভাষা করার সোপারেশ করা হয়েছে মাত্র ঃ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।" করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে যে বিতর্ক ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল ১৫ ডিসেম্বর সে সম্পর্কে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের এক প্রেস নোট প্রকাশিত হয়।

উক্ত প্রেস নোটে বলা হয়, "পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিয়নের রাষ্ট্রভাষা কিংবা সরকারী ভাষা কি হইবে, সে সম্পর্কে সম্মেলনে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।"

ভাষাপ্রশ্নে সংঘটিত শিক্ষা সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ ঃ
"উর্দুকে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য এই সম্মেলন পাকিস্তান গণপরিষদের নিকট সোপারেশ করিতেছে।"

"এই সম্মেলন মনে করে যে, বিভিন্ন স্কুল সমূহে উর্দু ভাষাকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দিতেই হইবে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে উর্দু শিক্ষাদানের পর্যায় নির্ধারণ সম্পর্কে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তই বিবেচ্য হইবে। স্কুলে শিক্ষাদানের বাহন

কিংবা মাধ্যম সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কিংবা দেশীয় রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন থাকিবে।"
দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক আজাদ, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭।]

পণ্ডিতমূর্খদের চেষ্টা

স্কুল কলেজের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উর্দু প্রচলনের প্রস্তাবকে এ সময় ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে এক প্রবন্ধ লেখেন। "পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা" শীর্ষক এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, ... "যাহারা বাংলাদেশে বাংলাভাষাকে ছাড়িয়া কিংবা বাংলার স্কুল কলেজে শিক্ষার মাধ্যম (মিডিয়াম) রূপে অথবা বাংলাদেশের আইন আদালতের ব্যবহার্য্য ভাষারূপে উর্দুর পক্ষে ওকালতি করিতেছেন আমি তাহাদিগকে কাণ্ডজ্ঞানবিহীন পণ্ডিতমূর্খ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। ...." [দৈনিক আজাদ, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৪৭]

গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা প্রশ্নে সরকারী প্রস্তাবের ওপর একটি সংশোধনী পেশ করেন। পরিষদে সংশোধনী আনতে গিয়ে তিনি বলেনঃ

"-----রাষ্ট্রভাষা সেই ভাষাই হওয়া উচিত, রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে এবং ---- আমি মনে করি যে, বাংলাভাষাই আমাদের রাষ্ট্রের লিংগুয়া ফ্রাংকা.... যদি ২৯ নং বিধিতে ইংরেজী ভাষা সম্মানজনক স্থান পেতে পারে– যদি পরিষদের কার্যাবলী উর্দু অথবা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে চলতে পারে তাহলে বাংলা, যা চার কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের ভাষা কেন সম্মানজনক স্থান পাবে না? কাজেই এ ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এ ভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষারূপে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং,----আমি প্রস্তাব করি যে, ২৯ নং বিধিতে ইংরেজী শব্দটির পরে 'অথবা বাংলা' কথাটি যোগ করা হোক। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবটি সরকারী সদস্যদের বিরোধিতার মুখে অগ্রাহ্য হয়।

১৮৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির ঊনত্রিশ নং উপধারা সংশোধনের জন্য 'ইংরেজী ভাষার সঙ্গে উর্দু ভাষার' নামযুক্ত করার সরকারী প্রস্তাবের ওপর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উপরোক্ত সংশোধনী আনেন। (দৈনিক আজাদ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৮)

ঢাকায় তীব্র বিক্ষোভ

গণপরিষদে বাংলা ভাষার দাবী এভাবে অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে ঢাকায় তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। রাজধানীতে ছাত্র ধর্মঘট ও রমনা এলাকায় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার

দাবীতে ফেব্রুয়ারীতে প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।' (দৈনিক আজাদ, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪৮/অধ্যক্ষ আবুল কাসেম)

দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন

রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ সময় তমদ্দুন মজলিস ও সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে এক যৌথ বিবৃতি দেন। ১৯৪৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিবৃতিটি দেয়া হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ১৯৫৩ সালের ২০শে মার্চ 'সৈনিকে' বিবৃতিটি পুনর্মুদ্রিত হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেনঃ

অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া (প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির কনভেনার ও তমদ্দুন মজলিস কর্মী), অধ্যাপক এম, এ, কাসেম (ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা), অধ্যাপক রেআয়ৎ খাঁ (ঢাকা ইউনিভার্সিটি), অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম (ঢাকা ইউনিভার্সিটি), আজিজ আহমদ, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (সাপ্তাহিক ইনসাফের সম্পাদক), এম, আবুল খায়ের (ছাত্র), নঈমুদ্দীন আহমদ (ছাত্র), অলি আহাদ (ছাত্র) এবং আরো কয়েকজন। বিবৃতিতে বলা হয় ঃ

" আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি, তারা যেন বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য আগাইয়া আসেন। আমাদের মাতৃভাষাকে কোনঠাসা করার জন্য যে একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলিতেছে– তার বিরুদ্ধে আমাদের এখন হইতে তৎপর হওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখানে সংবাদপত্র ও শিক্ষিত সমাজ এখনো এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত বলিয়া মনে হয় না। আমরা এ দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের মনে রাখা উচিত দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বাংলা ভাষা যথাযোগ্য স্থান পাইবে না।

আরও একটি বিষয়ে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের হিতাকাঙ্খীদের সহানুভূতি কামনা করিতেছি। সমস্ত প্রদেশব্যাপী আন্দোলন করিতে হইলে আমাদের অনেক অর্থের দরকার। --- ইহা বিবেচনা করিয়া তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় পরিষদ একটি বাংলা ভাষা প্রচার তহবিল খুলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই ফান্ডে মুক্ত হস্তে দান করিবার জন্য আমরা সকলের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বিভিন্ন পত্রিকায় চাঁদা প্রাপ্তির হিসাব ও চাঁদা দাতার নাম প্রকাশ করা হইবে।

অধ্যাপক এম, এ, কাসেম

ট্রেজারার, 'বাংলাভাষা প্রচার তহবিল"

১৯, আজিমপুর, ঢাকা।"

[বিশেষ সাক্ষাৎকার ঃ ডক্টর নূরুল হক ভুঁইয়া, ঢাকা ডাইজেস্ট নভেম্বর, '৮৮/সৈনিক, ১১ই মার্চ, ১৯৫৩]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারণ

আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রয়োজনে 'প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে জনাব কামরুদ্দিন আহমদ বলেন, "মার্চ মাসের ২রা তারিখে অধ্যাপক আবুল কাসেম আমাকে খবর দিলেন যে, সে দিন ফজলুল হক হলে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও কোর্ট কাচারীর ভাষা কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হবে। আমি যেন সে সভায় যোগদান করি।"

জনাব কামরুদ্দিন আহমদই সভায় সভাপতিত্ব করেন। একটি নতুন সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা এবং শিক্ষার 'মাধ্যম' বা কোর্ট কাচারীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবী না করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবী করাই যুক্তিসঙ্গত বলে স্থির করা হয়।

নতুন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে গণআজাদী লীগ, তমদ্দুন মজলিস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি, এ ছাড়া 'ইনসাফ', 'জিন্দেগী' ও 'দেশের দাবী' পত্রিকার পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এর সম্প্রসারিত রূপ দেওয়া হয়।

প্রথম সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ছুটি নেওয়ার প্রেক্ষিতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তমদ্দুন মজলিস কর্মী জনাব শামসুল আলমকে পুনর্গঠিত সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়।

ফজলুল হক হলের এ সভায় ৭ই মার্চ ঢাকায় ধর্মঘট ও ১১ই মার্চ দেশের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহবান জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ সভায়ই সংগ্রাম পরিষদের অনেকগুলি সাব কমিটি করে দেয়া হয়। পুনরায় ১০ই মার্চ সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থির হয় সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার জন্য অফিস আদালতেও পিকেটিং চালাতে হবে।

[দ্রষ্টব্যঃ 'বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ,' দ্বিতীয় খণ্ড, কামরুদ্দিন আহমদ, ঢাকা ডাইজেস্ট---কামরুদ্দিন আহমদ 'জুন' ৭৯, ডক্টর নূরুল হক ভূঁইয়া, নভেম্বর '৭৮]

ঐতিহাসিক এগারই মার্চ

"ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ৪৮ সালের ১১ই মার্চের আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। সত্যি বলতে কি, ১১ই মার্চের আন্দোলন না হলে ৫২-এর আন্দোলন হতো না, ৪৮এর ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়ে যে সংগ্রাম শুরু হয়, ৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে তা পূর্ণতা পায়।"[১]

"বস্তুতঃ ৪৮-এর ১১ই মার্চই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত গণবিক্ষোভ।"[২]

" এ আন্দোলন তৎকালীন সরকারকে রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। অথচ রক্ত দিয়েও ৫২ সালে সরকারকে টলানো যায়নি। ভাষার দাবী উঠাবার নৈতিক বল যতটুকু এসেছিল তা ১১ই মার্চের চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ চুক্তি লংঘিত হয়েছিল বলেই ৫২ সালের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। ১১ই মার্চ চুক্তি সম্পাদিত না হলে চুক্তি লংঘনের প্রশ্ন আসতো না। ৫২ সালের আন্দোলন মূলতঃ ২১, ২২, ২৩ এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। এরপর পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার এটাকে তছনছ করে দেয়। আজো ভাববার বিষয়– ভাষার দাবী কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"৩

[বিশেষ সাক্ষাৎকার ঃ ১. বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ২. মোহাম্মদ তোয়াহা, মার্চ, ৭৮। ৩. কামরুদ্দীন আহমদ, জুন ৭৯, ঢাকা ডাইজেস্ট।]

এগারই মার্চের কর্মসূচী ঃ

এগারোই মার্চের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রদেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে সভা ও সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীদের অফিসে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য পিকেটিং।

সকাল দশটা থেকে সংগ্রাম পরিষদের কর্মী ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থকরা গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে পিকেটিং শুরু করে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সলিমুল্লাহ হলের ভিপি আবদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল সেক্রেটারিয়েটের উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে আসে। কিন্তু ইতিমধ্যে মন্ত্রীত্বলোভীদের সমর্থকেরা অন্যান্য সেবোটিয়ারদের সঙ্গে মিলে কতগুলি অশোভন কাজ করে বসে। বহুঘন্টা ধরে সেক্রেটারিয়েট ঘিরে রাখা হয়। জনৈক মন্ত্রীকে সেক্রেটারিয়েট থেকে বের করে আনা হয়। তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে না পারলে 'পদত্যাগ করবেন বলে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন এবং অগ্রিম পদত্যাগ পত্র লিখে দেন।'

অপরদিকে সেক্রেটারিয়েটের সেগুন বাগিচার গেইটে পিকেটিং এর সময় পুলিশ ছাত্রদের বেদম প্রহার করে এবং বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করে। পিকেটিং-এ যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মধ্যে কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, গোলাম আযম, খালেক নেওয়াজ, মোঃ বায়তুল্লাহ উল্লেখযোগ্য। পিকেটিং এর প্রথম পর্যায়ে শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হয়ে যান। সেগুন বাগিচার গেইটে পুলিশের আই, জি, জাকির হোসেনের গাড়ীকে রাস্তায় শুয়ে পড়ে থামাবার চেষ্টা করলে কাজী গোলাম মাহবুবকে পুলিশ বেদম প্রহার করে এবং ঘটনাস্থল থেকে ডি, আই, জি, চ্যাথাম-এর নির্দেশে সিটি এস, পি, গফুর গ্রেপ্তার করেন। পরে কোতওয়ালী থানায় তাঁর নামে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়।

টি এণ্ড টি অফিসের সামনে (বর্তমান টেলিফোন একচেঞ্জ ভবনের সামনে) পিকেটিং করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসুর) জি, এস, গোলাম আযম সহ দশ বারো জন ছাত্র গ্রেপ্তার হন। তাঁদের গ্রেপ্তার করে তেজগাঁ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, ছাত্রদের পিকেটিং এবং পুলিশের লাঠি চার্জের ফলে ঢাকা শহর বিক্ষোভের নগরীতে পরিণত হয়। এবং বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সহ প্রায় ৫০ ব্যক্তি আহত হন। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে দৈনিক আজাদে আকর্ষণীয় শিরোনাম সহ রিপোর্ট বের হয় ঃ

'বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দাবী করিয়া ছাত্র বিক্ষোভ/ঢাকায় ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জঃ হক সাহেব সহ ৫০ জন আহত/সরকারী অফিস সমূহে পিকেটিং ও কর্মচারীদের অফিস ত্যাগ'

রিপোর্ট থেকে জানা যায়, শহরের বিভিন্ন স্থান হতে আহত ব্যক্তিগণকে মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং জনাব এ, কে, ফজলুল হক ও অন্যান্য কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

গ্রেপ্তার ও 'পুলিশী জুলুম' এর প্রতিবাদে ১২, ১৩ ও ১৪ই মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ফজলুল হক হলের এক কর্মী সভায় ১৫ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালনের তারিখ স্থির করা হয়।

[অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, কাজী গোলাম মাহবুব, ঢাকা ডাইজেস্ট, মে '৭৮/দৈনিক আজাদ, ১৩ই মার্চ '৪৮]

প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাব

এগারোই মার্চের ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা ও পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আযম-এর আসন্ন ঢাকা সফরের কারণে প্রাদেশিক সরকার আপোষমুখী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন আলোচনার প্রস্তাব রাখেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা অধ্যাপক আবুল কাসেমের নিকট পত্রের মাধ্যমে এবং জনাব কামরুদ্দীন আহমদের নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের নিকট রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আলোচনার প্রস্তাব রাখেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ আলোচনায় বসতে সম্মত হন।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ আলোচনার টেবিলে সাত দফা সম্বলিত চুক্তিপত্রের খসড়া পেশ করেন।

দাবীগুলি ছিল ঃ

১. পূর্ববঙ্গ পরিষদে চলতি অধিবেশনে বাংলাকে পূর্ব বঙ্গের ভাষা এবং সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাব পাশ করতে হবে।

২. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত প্রাদেশিক পরিষদের গৃহীত একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হবে।

৩. আন্দোলন চলাকালে গ্রেপ্তারকৃত সকল রাজবন্দীর বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে।

৪. আন্দোলনে সমর্থনদানকারী পূর্ববঙ্গ এবং কোলকাতা হতে প্রকাশিত সকল পত্রিকার ওপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৫. পুলিশ এবং দায়িত্বে নিয়োজিত কমাণ্ডিং অফিসারগণের সকল নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত দল গঠন করতে হবে।

৬. আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলের ওপর হতে গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৭. সরকারীভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, এ আন্দোলন গভীর দেশপ্রেমে উজ্জীবিত। প্রেস নোটের মাধ্যমে এবং প্রধানমন্ত্রীকে তা ঢাকা বেতার থেকে তাঁর ভাষণে বলতে হবে।

এছাড়া জনাব মোহাম্মদ তোয়াহার আপোষহীন দাবীর মুখে খাজা নাজিমুদ্দীনকে আরেকটি দফা নিজ হাতে চুক্তিপত্রে লিখে দিতে হয়। তোয়াহা বলেন, "আপনি গতকাল বলেছিলেন যে, বিক্ষোভ ও আন্দোলনকারীরা বর্ডার অতিক্রম করে এসেছে, তারা রাষ্ট্রবিরোধী কমিউনিষ্ট। আপনাকে বলতে হবে, এগুলো আপনি ভুল বলেছেন। তোয়াহার জোর পীড়াপীড়ির ফলে খাজা নাজিমুদ্দীনকে আরো নমনীয় হতে হয়। কারণ সে মুহূর্তে প্রদেশে শান্তি ও সুস্থিতি স্থাপন করা তাঁর বড় প্রয়োজন। তিনি লিখে দেন–

৮. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পর আমি (খাজা নাজিমুদ্দীন) এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, এ আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি।

[বিশেষ সাক্ষাৎকারঃ কামরুদ্দীন আহমদ, ঢাকা ডাইজেস্ট, জুন, '৭৯/মিল্লাত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩]

জনাব তোয়াহার আপোষহীন মনোভাবকে সে পরিস্থিতিতে জনাব কামরুদ্দীন আহমদ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। জনাব কামরুদ্দীন আহমদ বলেছেন, 'তোয়াহা সাহেব আন্দোলন বন্ধ করে আলোচনায় যেতে রাজী ছিলেন না। তাই তিনি আলোচনা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য শেষ বাণ নিক্ষেপ করলেন।' যা হোক দুইটি বৈঠকে অনেক আলোচনা

ও বিতর্কের পর অবশেষে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সরকার পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন, সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কামরুদ্দীন আহমদ। চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ এক 'বিজয় মিছিল' বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে এসে জমায়েত হয়। সেখানে অধ্যাপক আবুল কাসেম চুক্তির শর্তাবলী পাঠ করে শুনান এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "আমরা আন্দোলনের স্বার্থে আন্দোলন করি না। আমরা যা দাবী করেছিলাম, তা মানা হয়েছে।"

[বিশেষ সাক্ষাৎকার ঃ কামরুদ্দীন আহমদ, ঢাকা ডাইজেস্ট, জুন, '৭৯ 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', অধ্যক্ষ আবুল কাসেম]

সংবাদপত্রের অভিনন্দন

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে নাজিমুদ্দীন সরকারের এ চুক্তি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অসামান্য সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। চুক্তির শর্তাবলী বিভিন্ন পত্রিকায় বড় বড় হেড লাইনে প্রকাশিত হয়। প্রায় পত্রিকাই এই সাফল্যের জন্য সংগ্রাম পরিষদকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় লেখেন। আন্দোলনের অন্যতম সমর্থনকারী "ইত্তেহাদ" সম্পাদকীয়তে বলেনঃ "বিরাট শক্তি ও দুর্জয় বিরোধিতার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া বাংলাভাষা আন্দোলনকারীগণ যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে সোনার হরফে লিখিত থাকিবে।"

কায়েদে আযমের ঢাকা আগমনঃ রেসকোর্স ও কার্জন হলের ভাষণ

১৯শে মার্চ বিকেলে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আগমন করেন। ২১শে মার্চ বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে তিনি এক বিশাল নাগরিক সম্বর্ধনায় ভাষণ দেন। পাকিস্তানের জাতির জনক হিসেবে তখন তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা। কিন্তু ঢাকা আগমনের পূর্বেই তাঁকে ভাষা আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে প্রদেশের ক্ষমতাসীন মহল হতে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া হয়। রেসকোর্সের ভাষণে তিনি 'একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণা জনমনে নিদারুণ হতাশা সৃষ্টি করে। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'এটা আমার বিশ্বাস যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়া উচিত।' সঙ্গে সঙ্গে 'নো নো' ধ্বনি উত্থাপিত হয়।

২৬শে মার্চের আজাদ পত্রিকায় সমাবর্তনের যে রিপোর্ট প্রকাশ হয়, তার শিরোনাম ছিলঃ

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমার্বতন উৎসব সভায় কায়েদে আযমের বক্তৃতা/প্রাদেশিক

রাষ্ট্রভাষা প্রদেশবাসীই স্থির করিবে।

নতুন গ্রাজুয়েটগণকে সুশৃঙ্খল জাতি হিসেবে গঠনমূলক কাজ করার অনুরোধ

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পশ্চাতে মোছলেম পঞ্চম-বাহিনীর অস্তিত্ব"

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পশ্চাতে 'পঞ্চম-বাহিনীর অস্তিত্ব' আবিষ্কারের বক্তব্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, প্রদেশের ক্ষমতাসীন মহল হতে ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে বলার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করা হয়েছিল।

জীবন সায়াহ্নের সংলাপ

পরবর্তীকালে জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এলাহী বখ্‌শ্‌-এর সঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সব আলাপ আলোচনা করতেন তা থেকে কায়েদে আযম জিন্নাহর মনোভাবের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের তাঁর 'ইতিহাস কথা কয়' গ্রন্থে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

জিয়ারত-এ থাকাকালে মিস্টার জিন্নাহ মাঝে মাঝে ডাক্তার এলাহী বখ্‌শ্‌-এর সঙ্গে আলাপ করতেন। তাও নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নয়। পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে। ডাক্তার এলাহী বখ্‌শ্‌-এর মুখে শুনেছি মিস্টার জিন্নাহ তাঁর সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

'দেখ ডাক্তার, আমি জীবনে দুটি ভুল করেছি তাও পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে। প্রথম ভুল করেছি লাহোর প্রস্তাবকে 'সংশোধন' করে, যা এক জন দেশের নেতা হিসেবে আমার পক্ষে আদৌ উচিত হয়নি। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব মানবে না। তারা নিশ্চয়ই স্বাধীন হয়ে যাবে। আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, ওদের ওপর বিমাতাসুলভ আচরণ। পাকিস্তান ওদের ত্যাগের জন্যই এসেছে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ওদের প্রতি অবিচার করছে।

আমার দ্বিতীয় ভুল আমি ঢাকায় গিয়ে করেছি। গভর্ণর জেনারেল হিসাবে ভাষা সমস্যা নিয়ে কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আসলে ভাষা প্রশ্নের মিমাংসা পার্লামেন্ট করতে পারত। কিন্তু আমি কয়েকজন পূর্ব পাকিস্তানী নেতার দ্বারা বিভ্রান্ত হ'য়ে ভাষার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্র ও জনগণের যে দৃঢ় মনোভাব লক্ষ্য করেছি, তাতে আমি বিশ্বাস করি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী অযৌক্তিক নয়।'

মিস্টার জিন্নাহ আরও বলেছিলেন, 'উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের ভাষা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে যার জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশী সেখানে শতকরা ১০০ জনই বাংলাভাষী। সুতরাং বুঝতেই পারছ, বাংলা ভাষার দাবী কত জোরালো। আর এই জন্যই আমি ভাষা

সম্পর্কে আর কোন কথা কোন দিন উচ্চারণ করিনি।

(ইতিহাস কথা কয় ঃ মোহাম্মদ মোদাব্বের, পৃষ্ঠা ঃ২৪৪-২৪৫)

ভাষা আন্দোলন ও ডাকসু

'৪৯ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। সে সফরকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনাসিয়াম মাঠে এক ছাত্র সভায় ভাষণ দান করেন। ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু)র সাধারণ সম্পাদক জনাব গোলাম আযম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মেমোরেণ্ডাম লিয়াকত আলী খানকে প্রদান করেন। এ মেমোরেণ্ডামের খসড়া তৈরী করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন তুখোড় ইংরেজী জানা ছাত্রনেতা জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী।

এ মেমোরেণ্ডাম সম্পর্কে (বিচারপতি) আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন, "বস্তুতঃ সে মেমোরেণ্ডাম ছিল রাষ্ট্রভাষার দাবীসহ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী সম্বলিত এক ঐতিহাসিক দলিল। -----উক্ত মেমোরেণ্ডামে প্রতিরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানের সম অধিকার, চাকুরির ক্ষেত্রে নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রামে নৌ-সদর স্থাপন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দাবীসমূহ সন্নিবেশিত ছিল।"

ছাত্রসভায় মেমোরেণ্ডাম পাঠ সম্পর্কে (অধ্যাপক) গোলাম আযম বলেন, -----ডাকসুর জি, এস, হিসেবে আমি ঐ মেমোরেণ্ডাম পাঠ করি। রাষ্ট্রভাষার কথাটি ছিল মাঝামাঝি। এর পূর্বে আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার নিন্দা ছিল। মনে পড়ে, রাষ্ট্রভাষার দাবীর প্যারাটি দু'বার পড়েছিলাম। একবার পড়ার পর ছাত্র সমাবেশে তুমুল করতালি পড়ে। করতালি শেষ হলে আমার কানে এলো বেগম রানা লিয়াকত আলী রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত প্যারাটি শুনে লিয়াকত আলী খানকে বলছেন, "ল্যাঙ্গুয়েজকে বারে মে সাফ সাফ বাতা দেনা।" আমি যেখানে দাঁড়িয়ে স্মারকলিপি পাঠ করছিলাম, তার পাশে রানা লিয়াকত আলী বসেছিলেন। তাঁর কথা শুনে, আমি 'Let me repeat this' বলে আবার ভাষার দাবীর প্যারাটি পড়লাম। আবারও এ দাবীর সমর্থনে সমাবেশে তুমুল করতালি পড়ে।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে লিয়াকত আলী খান বলেন, "If it is not provincialism, then what is provincialism?" তাঁর এ কথাগুলো শুনে আমরা ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু না, তিনি কিছু বলেন নি। গোটা প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে যান।

(বিশেষ সাক্ষাৎকার ঃ বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, ঢাকা ডাইজেস্ট, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ৭৯/অধ্যাপক গোলাম আযম, ঢাকা ডাইজেস্ট জানুয়ারী, '৭৯)

বায়ান্নর আন্দোলন

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন শুরু হয় পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দীনের উর্দুর স্বপক্ষে ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। ২৬শে জানুয়ারী পল্টনের এক জনসভায় পুনরায় তিনি ঘোষণা করেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।' এ ঘোষণা ছিল ৪৮ সালের ১৫ই মার্চে গৃহীত রাষ্ট্রভাষা চুক্তির প্রত্যক্ষ খেলাপ। নাজিমুদ্দীনের ঘোষণার প্রতিবাদে ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আবদুল মতিনের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। তিনিই ছিলেন এই সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক। এই কমিটির উদ্যোগেই প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক ১১ই মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হতো।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন

খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টনের ঘোষণার প্রেক্ষিতে ৩০শে জানুয়ারী বিকেলে বার লাইব্রেরী হলে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা ও সংস্কৃতিবিদদের এক বৈঠকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৪০ জনের উপর সদস্য নিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুবকে এই পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ সভা

সর্বদলীয় পরিষদের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়।

বিকালে কর্মপরিষদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জননেতা মাওলানা ভাসানী, আবুল হাসেম ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতাগণ লীগ সরকারের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নিন্দা করেন এবং বাংলা ভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আরও ঘোষণা করা হয়, ২১শে ফেব্রুয়ারী অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট

পালিত হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটের প্রস্তুতি

৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের অব্যাহত প্রস্তুতি চলে। গণবিক্ষোভের আয়োজন যখন সমাপ্ত প্রায়, তখন আসন্ন প্রাদেশিক বাজেট অধিবেশনকে উপলক্ষ করে সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি থেকে ক্রমাগত এক মাসের জন্য ঢাকা শহরের সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করেন।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের জরুরী বৈঠক

একদিকে একুশে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি অপরদিকে ১৪৪ ধারা জারী, এই পরিস্থিতির আলোকে জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে কর্মপরিষদের বৈঠক বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণ করতে গিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

অবশেষে ১১-৪ ভোটের ব্যবধানে গণতান্ত্রিক উপায়ে ১৪৪ ধারা না ভেঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠতে অলি আহাদ, আবদুল মতিন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সহ-সভাপতি শামসুল আলম (তমদ্দুন মজলিস কর্মী ও প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের দ্বিতীয় আহ্বায়ক) এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদের ভি, পি, (মরহুম) গোলাম মাওলা যে কোন মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দেন এবং প্রতিবাদী ভূমিকা রাখেন। মোহাম্মদ তোয়াহা নেপথ্য থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশের অভাবে ভোট দানে বিরত থাকেন।

বৈঠকে আরো প্রস্তাব গৃহীত হয়, যদি সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, তবে স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ বাতিল হয়ে গেছে।

ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ফজলুল হক মুসলিম হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল নিজ নিজ হলে দুটি পৃথক ছাত্র সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

আমতলার ঐতিহাসিক সভা

বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের প্রায় সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে প্রায় সাড়ে বারোটায়

সভা শুরু হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হক ১৪৪ ধারা না ভঙ্গ করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক জনাব আবদুল মতিন আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত সাধারণ ছাত্রদের ওপর ছেড়ে দেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদী চেতনার পরিবেশে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে অব্যাহতভাবে চলে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার চেষ্টা ও প্রতিবাদী মিছিল। সে প্রতিবাদী মিছিল ঠেকাতে চলে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস, লাঠি চার্জ ও গুলি। গুলি চালনার ফলে শহীদ হন সালাউদ্দিন, বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার ও আরো অনেকে। বুকের তাজা রক্তের আখরে সৃষ্টি হয় ভাষা আন্দোলনের আরেক অধ্যায়। এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের সন্ধানে

ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আজ একটি অব্যাহত জাতীয় আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু আজো ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি। এমন একটি জাতীয় আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে সুদীর্ঘ ৪০ ('৪৭-'৮৭) বছর পরও বিতর্ক চলছে। বিভিন্নভাবে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে।

হাতের কাছে এ আন্দোলনের সঠিক তথ্য ও উপকরণ ছড়িয়ে থাকলেও এতোকাল এ সব ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ সংরক্ষণের তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যার ফলে এগুলি হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে। যাঁরা এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরাও পরপারের ডাকে একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছেন। অনেকের স্মৃতি বয়সের ভারে ক্রমে ক্রমে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তবু তাঁরাই এখনো এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের জীবিত সৈনিক। তাঁদের কাছ থেকে আমরা ভাষা আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ পেতে পারি। এই সচেতন চিন্তার ফলশ্রুতিই হলো ঢাকা ডাইজেস্টের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিশেষ সাক্ষাতকারগুলো।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের অন্বেষায় ঢাকা ডাইজেস্টের পক্ষ থেকে আমি ১৯৭৮ সালের মার্চ থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করি। এ পর্যন্ত যাঁদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাঁরা হলেন–

(১) জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা/মার্চ '৭৮ (২) প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম (৩) ডক্টর শাফিয়া/এপ্রিল '৭৮ (৪) ডক্টর সুফিয়া আহমদ/এপ্রিল '৭৮ (৫) অধ্যাপিকা শামসুন্নাহার

আহসান/এপ্রিল '৭৮ (৬) জনাব কাজী গোলাম মাহবুব/মে '৭৮ (৭) জনাব আবু নছর মোহাম্মদ গাজীউল হক/জুন '৭৮ (৮) জনাব আতাউর রহমান খান/জুলাই '৭৮ (৯) জনাব এ, আই, এম, তাহা/আগষ্ট '৭৮ (১০) জনাব এম, এ, আউয়াল/সেপ্টেম্বর '৭৮ (১১) অধ্যাপক গফুর/সেপ্টেম্বর '৭৮ (১২) জনাব সানাউল্লাহ নূরী/সেপ্টেম্বর '৭৮ (১৩) অধ্যাপক শাহেদ আলী/অক্টোবর '৭৮ (১৪) ডক্টর নূরুল হক ভূঁইয়া/নভেম্বর '৭৮ (১৫) ডাঃ সাঈদ হায়দার/ডিসেম্বর '৭৮ (১৬) অধ্যাপক গোলাম আযম/জানুয়ারী '৭৯ (১৭) সৈয়দ মুজিবুল্লাহ (জনাব আবুল হাশিম সম্পর্কে)/ফেব্রুয়ারী '৭৯ (১৮) ডাঃ ওবায়দুর রহমান/মার্চ-এপ্রিল '৭৯ (১৯) ডাঃ আহমদ রফিক/মে '৭৯ (২০) জনাব মোহাম্মদ সুলতান/জুন '৭৯ (২১) জনাব কামরুদ্দীন আহমদ/জুন '৭৯ (২২) বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী/আগষ্ট-সেপ্টেম্বর '৭৯ (২৩) জনাব ফরমান উল্লাহ/ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর '৭৯ (২৪) জনাব এস, এ, বারী এ, টি,/অক্টোবর-নভেম্বর '৭৯ (২৫) জনাব আবদুল মতিন/ডিসেম্বর '৭৯ (২৬) জনাব আবদুল মালেক (শহীদ বরকতের মামা)/জানুয়ারী '৮০ (২৭) জনাব আবুল হোসেন মিয়া/জানুয়ারী '৮৩ (২৮) জনাব হাসিনা খাতুন (শহীদ বরকতের মা)/ ফেব্রুয়ারী '৮০ (২৯) আবু নাসির মোহাম্মদ ওয়াহিদ (শহীদ বরকতের বন্ধু)/ফেব্রুয়ারী '৮০।

সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আমরা সবাইকে আবেদন করে বলেছি- 'মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের উপকরণ সংরক্ষণের জন্য আমরা এ বিশেষ সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। সুতরাং অতীতের বা সমকালীন দলমতের উর্ধে সবাইকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিতে হবে।' সকলেই এই অভিমত সমর্থন করে সাড়া দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের বিশেষ সাক্ষাৎকারগুলোতে বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছে। সকলেই ইতিহাসের দাবীর প্রেক্ষিতে স্মৃতিচারণ করেছেন।

সাক্ষাৎকারগুলো ঢাকা ডাইজেস্টে প্রকাশিত হওয়া শুরু হলে পাঠক এবং সচেতন মহল হতে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও উৎসাহমূলক চিঠিপত্র আসতে থাকে। পর্যায়ক্রমিকভাবে এ ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের সিরিজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা অনুরোধ করেন। সাক্ষাৎকারগুলোর তথ্যের ব্যাপারে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিবাদ বা সংশোধনমূলক চিঠি আসেনি। এ ধরনের যে দু'একটি চিঠি এসেছে সে সবের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে আমরা সাক্ষাৎকারে পরিবেশিত তথ্য সংশোধন করেছি।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আরো অনেকের কাছে গিয়েছি। কেউ কেউ ফিরিয়ে দিয়েছেন। সময় এবং সুযোগের অভাবে অনেকের কাছে যথাসময়ে যাওয়া হয়নি। এসব কারণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার এখানে দেয়া সম্ভব হয়নি।

ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদগণ এই ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের মূল প্রেরণার উৎস ছিল। এ গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ জানা অজানা সব শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

পরিশেষে এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির চেয়ারম্যান জনাব এ, জেড, এম, শামসুল আলম যে আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ইত্তেফাক-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আখ্তার-উল-আলম ভাই এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ নিয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন, আমার জীবনে তা প্রেরণা ও গভীর আত্মবিশ্বাসের উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধের কথা কোন দিন ভোলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে জনাব এস, মুজিবুল্লাহ-র গভীর আগ্রহের কথাও স্মরণ করতে হয়। ঢাকা ডাইজেস্ট-এর সম্পাদক অধ্যাপক ফজলে আজিম-এর কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ও অনুরাগের জন্যই দীর্ঘ দিন ধরে সাক্ষাৎকার সংগ্রহ এবং তা ডাইজেস্ট-এ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। বন্ধু এ, কে, এম, হাস্নাইন্ও বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ ও প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার কথাও স্মরণ করছি। তাঁদের সবার সহযোগিতার জন্যই এই ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ বইটি যথাসময়ে প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারী '৮৭

মোস্তফা কামাল

★ দৈনিক আজাদের ১৯৪৭-এর ১৩ই নভেম্বর-এর এক রিপোর্টে দেখা যায়, তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ফজলুল হক হলের সাহিত্য সভাটি ১২ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম

[প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তাঁর উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাতকারী সংগঠন 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি প্রকাশ করেন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'। '৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় '৪৭ সালে যে আন্দোলনের সূচনা হয় '৪৮ এবং '৫২ সালে তা গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। তিনি ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক সৈনিক-এরও প্রতিষ্ঠাতা। ভাষা আন্দোলনে তাঁর ব্যতিক্রমী ভূমিকা তাঁকে বিরল ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

জনাব আবুল কাসেম ১৯২০ সালের জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার ছেবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিয়র রহমান। তিনি চট্টগ্রামের বরমা হাই স্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে প্রথম বিভাগে তিনটি লেটার সহ ম্যাট্রিক পাশ করেন ও বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৪১ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এস-সি, ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এস-সি (অনার্স) এবং ১৯৪৫ সালে এম.এস-সি পাশ করেন।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে কার্যরত ছিলেন। পরবর্তীকালে কিছুকাল চট্টগ্রাম নৈশ কলেজে অধ্যাপনা করেন।

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে তিনি ঢাকায় বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। '৮২ সাল হতে তিনি অবসর জীবন যাপন করেন। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম ১৯৫৪-৫৬ সাল পর্যন্ত খেলাফতে রব্বানী পার্টি ও যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন।

জনাব কাসেম বাংলা একাডেমী, পূর্ব-পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড্ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি উচ্চতর শ্রেণীর জন্য প্রয়োজনীয় ৩৬টি বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং ইসলামী সাহিত্যে সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো– 'একুশ দফার রূপায়ন', 'আধুনিক চিন্তাধারা', 'সাহিত্য ও দর্শন', 'সংগঠন', 'মুক্তি কোন পথে', 'ইসলাম কি দিয়েছে ও কি দিতে পারে', 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু', 'একমাত্র পথ', 'বিবর্তনবাদ', 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি', 'ইসলামী রাষ্ট্রনীতি', 'বিজ্ঞান বস্তুবাদ ও আল্লাহর অস্তিত্ব', 'কোরানিক অর্থনীতি', 'আমাদের ভাষার রূপ' প্রভৃতি। ব্যক্তি জীবনে তিনি সহজ, সরল, সদালাপী এবং বিনয়ী। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে তথ্য ও উপকরণ যোগাবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ কিভাবে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে? দেশ বিভাগের পর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা ও পরিবেশ কেমন ছিল?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে 'তমদ্দুন মজলিসের' মাধ্যমে। ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসের পর পরই ১লা সেপ্টেম্বর-এ আমারই উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় ১৯ নম্বর আজিমপুর-এ 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' নামে এ বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ১৯ নম্বর আজিমপুরে থাকি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার কথা আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকি, এ বিষয়ে আমি প্রথমে আলাপ করি বন্ধুবর অধ্যাপক এ, কে, এম, আহসানের সঙ্গে (পরবর্তীকালে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য)। তিনিও আমার সঙ্গে ১৯ নম্বর আজিমপুর-এর বাসায় থাকতেন। এরপর এ বিষয়ে আলোচনা করি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তখনকার ছাত্র সৈয়দ নজরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট) ও শামসুল আলমের (পরবর্তীকালে বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী) সঙ্গে। ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। পরে আজিজ আহমদ (মরহুম), অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, নঈমুদ্দীন, সানাউল্লাহ নূরী প্রমুখ তমদ্দুন মজলিসে যোগ দেন।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হতে পারে কিনা এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা

করার মত খুব কম লোকই ছিল। শুধু তাই নয়, অনেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে উর্দুর সমর্থক ছিলেন। তার ঐতিহাসিক কারণও ছিল। অখণ্ড ভারতে বর্ণহিন্দুরা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মাধ্যমে হিন্দীকে যেমন ভবিষ্যত রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার সব রকমের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন– তেমনি মুসলমানরাও হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের যুক্তি ও দাবী পেশ করে সোচ্চার হয়ে উঠেন। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের হিন্দীর প্রতি সমর্থন মুসলমানদেরকে উর্দুর প্রতি ঠেলে দেওয়া ত্বরান্বিত করে। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের শাসক মহল হতে একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অবহেলা করা হয় অপর দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে প্রথমে পূর্ব-পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) শিক্ষিত সমাজ চরম উদাসীন থাকে।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবীর প্রতি সচেতনা সৃষ্টি ও জনমত গড়ে তোলার জন্য তমদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক কর্মসূচীগুলি কি ছিল?

উত্তর ঃ তমদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক কর্মসূচীগুলির মধ্যে ছিল ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে সাহিত্য সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠান। এসব সাহিত্য সভা ও সেমিনারে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও ছাত্ররা অংশগ্রহণ করতেন। তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ–পশ্চিমে অবস্থিত লনে ও ফজলুল হক মুসলিম হলের মিলনায়তনে সাধারণ সভা ও সাহিত্য সভার আয়োজন হয়েছিল বহু বার। এ ছাড়া জনমত সৃষ্টির জন্য বিবৃতি ও হ্যাণ্ডবিল প্রকাশ করা হতো। এরপর ১৫ই সেপ্টেম্বর আমার চেষ্টায় ও সম্পাদনায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত প্রথম বই– 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক বংশালের বলিয়াদি প্রিন্টিং প্রেস হতে মুদ্রিত ও ১৯, আজিমপুর হতে প্রকাশিত হয়।

এই বই-এর লেখক ছিলাম আমরা তিনজন– অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, 'ইত্তেহাদ' সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ ও আমি নিজে। প্রবন্ধগুলিতে যথার্থ যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা হয়– বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত।

বইটির মুখবন্ধে আমার যে প্রস্তাবটি সন্নিবেশিত হয়,তাতে বলা হয়– প্রস্তাব ঃ

"১। বাংলা ভাষা-ই হবে– (বর্তমান পূর্ব বাংলা)

(ক) পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।

(খ) পূর্ব-পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।

(গ) পূর্ব-পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি– বাংলা ও উর্দু।

৩। (ক) বাংলা-ই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা একশ জনই এ-ভাষা শিক্ষা করবেন।

(খ) পূর্ব-পাকিস্তানের উর্দু হবে– দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। যাঁরা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হবেন শুধু তাঁরাই ও-ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

(গ) ইংরেজী হবে পাকিস্তানে তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাঁদের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানে হাজারে একজনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক এ নীতি হিসেবে পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে (স্থানীয় ভাষার দাবী না উঠলে) উর্দু প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বছরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই পূর্ব-পাকিস্তানের শাসন কাজ চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার করতে হবে।

দেশের শক্তির যাতে অপচয় না হয় এবং যে ভাষায় দেশের জনগণ সহজে ও অল্প সময়ে লিখতে, শিখতে ও বলতে পারে সে ভাষা-ই হবে রাষ্ট্রভাষা। এই অকাট্য যুক্তিই উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রধান ভিত্তি।

আর না হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যেমন জনগণের মত না নিয়ে বা তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য না রেখে ইংরেজীকে আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল শুধু উর্দু কিংবা বাংলাকে সমস্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে ঠিক সেই সাম্রাজ্যবাদী অযৌক্তিক নীতিরই অনুসরণ করা হবে। অথচ এই অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক প্রচেষ্টাই আজ কোন কোন মহলে দেখা দিয়েছে। ইহা সত্যিই বড় লজ্জাকর ও দুর্বল মনের অভিব্যক্তি। একে সর্ব প্রকারে বাধা দিতে হবে। এর বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এর সূচনা হিসাবে আমরা কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের প্রবন্ধ প্রকাশ করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রত্যেককে এই আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রত্যেক স্কুলে, কলেজে এবং প্রত্যেক শহরে সভা করে অপর ভাষাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে কায়েদে আজম ও অন্যান্য নেতার নিকট

পাঠাতে হবে। গণ-পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের নিকট ডেপুটেশন গিয়ে তাঁরা যেন বাংলাভাষার বিরুদ্ধে মত দিয়ে বাঙালীর আত্মহত্যার পথ সুগম না করেন তা স্পষ্ট করে বুঝাতে হবে।

কায়েদে আজম জিন্নাহ প্রত্যেক প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের নিজ নিজ প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।"

('পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?'– পৃষ্ঠা ৩-৫)

রাষ্ট্রভাষা বাংলার সুস্পষ্ট দাবী সম্বলিত এসব প্রস্তাবাবলী নিয়ে আন্দোলন সংগঠনের জন্য আমরা সকল তৎপরতা ও শক্তি নিয়োজিত করি। তমদ্দুন মজলিসের নেতা, কর্মী ও অনুরাগীদের নিয়ে দেশের সর্বত্র মজলিসের শাখা গঠন ও ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই। পর্যায়ক্রমে প্রথমে ঢাকায় এবং পরে বিভিন্ন জেলায় ধীরে ধীরে ভাষা আন্দোলনের মানসিক পরিবেশ গড়ে উঠতে থাকে।

বইটিতে জনাব আবুল মনসুর আহমদ 'বাংলাই হবে রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কারণ ও যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। প্রবন্ধটিতে বলা হয় ঃ

"ঢাকা তমদ্দুন মজলিসের তরফ হইতে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, সে চেষ্টায় আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

আমি অন্যান্য কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণসমূহে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে চাই ঃ

(ক) জনগণের ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা এক না হইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে না।

(২) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি "অশিক্ষিত" ও সরকারী চাকুরীর "অযোগ্য" বনিয়া যাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি সরকারী কাজের "অযোগ্য" করিয়াছিল।

(৩) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলেও বাংলাকেই শিক্ষার মেডিয়াম রাখা হইবে বলিয়া যে প্রচার করা হইতেছে, উহা কার্যত ভাওতা ও রাজনৈতিক প্রবঞ্চনায় পরিণত হইবে, কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে 'যোগ্যতার' মাপকাঠি হইবে রাষ্ট্রভাষায় জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা।

(৪) উর্দু বাংলার চেয়ে সহজ বলিয়া যে কথা বলা হইতেছে উহা প্রচারণা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উর্দু বাংলার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন।

(৫) উর্দুর সুপ্রচলিত ও সুদৃশ্য লখ্‌নৌভী হরফের ছাপা, মুদ্রণ, টাইপ রাইটিং প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কাজের অনুপযোগী। কলিকাতা ও মিসরী হরফ ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ ও কষ্টে শিক্ষণীয়। উভয় ছাপারই হরফের রূপান্তর বড় বেশী জটিল।

(৬) বাংলা-ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা ও হিন্দু প্রভাবপূর্ণ, এ অভিযোগ ভ্রান্ত। বাংলা ভাষা মুসলিম কৃষ্টির উপযোগী নয়, এ অভিযোগও ঠিক নয়। আমরা যে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে চাই, সেটা "ব্যাকরণ মঞ্জুষার" বঙ্গভাষা নয়, জনগণের মুখের বাংলা জবান।

(৭) হরফ সম্বন্ধে আমাদের কোন গোঁড়ামী নাই। বিজ্ঞানের নিক্তিতে ওজন করিলে যদি বাংলা হরফ অযোগ্য প্রমাণিত হয় এবং সম্ভাব্য রদ বদলেও যদি উহা যথেষ্ট যোগ্যতা লাভ না করে, তবে আমরা রোমান হরফ নিতে রাজী আছি। উর্দুওয়ালারাও যদি আরবীর বদলে রোমান হরফ নিতে রাজী হন,তবে উর্দুর পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তিই খসিয়া পড়ে। কারণ আরবী হরফে লেখা হয়, এটাই উর্দুর পক্ষে মুসলিমগণের মনে সবচেয়ে বড় আবেদন।

উপরে আমি যে সাতটি যুক্তি দিলাম, তাছাড়াও অনেক যুক্তি আছে, বাস্তব জীবনে যার মূল্য কম নয়।

গণপরিষদে যদি উর্দু-বাংলার যোগ্যতার ও দাবীর বিচার উঠে, তবে সেখানে বাংলার পক্ষে ওকালতি যাতে যোগ্য ও যথেষ্ট হয়, তার চেষ্টা প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদেরই করিতে হইবে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের ইন্‌টেলিজেন্‌শিয়া হিসাবে তাদের দায়িত্ব অপরিসীম।"

প্রশ্ন ঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?'– বইটি ক্যাম্পাসে কেমন সাড়া জাগিয়েছিল?

উত্তর ঃ সত্যিকারে বলতে কি, এ বইটি কেনার মত ৫ জন লোকও প্রথমে ক্যাম্পাসে পাওয়া যায় নি। মজলিসের কর্মীদেরকে সঙ্গে করে বইটি নিয়ে অনেক জায়গায় ছুটে গিয়েছি কিন্তু দু'এক জায়গায় ছাড়া প্রায় সব জায়গা হতেই নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। পাকিস্তান লাভের সফলতা তখন সারা জাতিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ সময় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে একাধিক ভাষার প্রশ্ন তোলা যে কত 'মারাত্মক ক্ষতিকর', আর বিশেষ করে পাকিস্তানের জন্য ২টি রাষ্ট্রভাষা যে কত বড় "অবাস্তব' প্রস্তাব তাই যেন সেদিন সকলে বুঝাবার চেষ্টা করতেন। কেউ বলতে চাইতেন এটা 'পাগলামী' ছাড়া আর কিছু

নয়।

ক্যাম্পাসে তখনকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র "মুসলিম হল" ও "ফজলুল হক হলেও" আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার ব্যাপারে বৈঠক করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। শুধু তাই নয়, আমরা রুমে রুমে গিয়েও ব্যক্তিগত আলোচনা চালিয়েছি– কিন্তু দু'একজন ছাড়া প্রায় ছাত্রই এ বিষয়ে বিরূপ ভাব দেখিয়েছেন। 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলেই বা কি, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।' এই ছিল তখনকার সাধারণ মনোভাব।

প্রশ্ন ঃ ক্যাম্পাসের বাহিরে তখন আপনাদের কোন তৎপরতা ছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এ সময় ক্যাম্পাসের বাহিরেও আমরা তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে রাষ্ট্রভাষার দাবীর প্রশ্নে গণসংযোগের চেষ্টা করি। আমরা কিছু সরকারী কর্মচারী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে কিছুটা সাফল্য অর্জন করি। এ সময় দেশের নামকরা ব্যক্তিদের দস্তখত নিয়ে একটি মেমোরেণ্ডাম তৈরী হয়, আমরা সারা শহরের অলিতে-গলিতে ঘুরে অনেক চেষ্টার পর বেশ কিছু দস্তখত সংগ্রহ করি। মেমোরেণ্ডামটি সরকারের নিকট পেশ করা হয় এবং তার কপি কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখনকার স্থানীয় পত্রিকাগুলি এ বিষয়কে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছিল জনাব আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত কোলকাতার "ইত্তেহাদ" ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী সম্পাদিত ঢাকার সাপ্তাহিক "ইনসাফ"। তখনো 'সৈনিক' বের হয় নি।

এ কথা মনে রাখার মত যে, এ সময় মেমোরেণ্ডামে অনেক সরকারী কর্মচারী দস্তখত করেছিলেন। এমনকি ডি.আই.জি জনাব আবুল হাসনাতও এতে দস্তখত করে সমর্থন জানিয়েছিলেন। জনাব হাবিবুল্লা বাহার, আফজাল সাহেব সহ কয়েকজন মন্ত্রী এ সময় গোপনে ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করতেন।

প্রশ্ন ঃ 'সৈনিক' কখন বের হয়? কোন সময় থেকে 'সৈনিক' তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে শুরু করে?

উত্তর ঃ সাপ্তাহিক 'সৈনিক' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১৪ই নভেম্বর, বাংলা ১৩৫৫ সালের ২৮শে কার্তিক। রেল কর্মচারী লীগের কয়েকজন নিষ্ঠাবান বিশিষ্ট কর্মীর সহায়তায় আমি এই বিপ্লবী পত্রিকাটি তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রকাশ করি। 'সৈনিক' প্রকাশের জন্য রেল কর্মচারী লীগের যে কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীর সহায়তা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে মাহবুবুল হক, এম.এস. হক ও আবুদল হাই প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্ররূপেই 'সৈনিক' আত্মপ্রকাশ করে। ভাষা আন্দোলনে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য 'সৈনিক' জনগণের প্রিয় হয়ে উঠে। 'ভাষা আন্দোলন',

'তমদ্দুন মজলিস' আর 'সৈনিক' এই তিনটি নামকে তখন পৃথক করে ভাবা যেতো না।

'৪৮ সালে 'সৈনিক' আত্মপ্রকাশের সময় সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন শাহেদ আলী ও এনামুল হক। পরে শাহেদ আলী সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন। পরবর্তীকালে আবদুল গফুর 'সৈনিকের' ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। ৫০-৫১ সালের দিকে তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। এক সময় হাসান ইকবালও 'সৈনিকে'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। '৪৮ সালে ১৯ নং আজিমপুর-এর তমদ্দুন মজলিসের অফিসই ছিল 'সৈনিক'-এর অফিস। '৪৯ সালে 'সৈনিক' প্রকাশিত হতে থাকে ৪৮ নং কাপ্তান বাজার থেকে।

আত্মপ্রকাশের সময় থেকে 'সৈনিক' পূর্ব-পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) সকল প্রকার অধিকার ও বাংলাভাষার বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সজাগ ছিল। 'সৈনিক' সংবাদ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কবিতা, গান, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবীকে তুলে ধরতে গিয়ে আপোষহীন অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর পক্ষে উল্লেখযোগ্য সেমিনার, আলোচনা ও সাহিত্য সভা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমরা এর উদ্যোগে ক্যাম্পাসে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে মতামত গড়ে তুলতে চেষ্টা করে আসছিলাম। পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হলে আমরা তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন হলগুলিতে নিয়মিত আলোচনা ও সাহিত্য সভা অনুষ্ঠান করতে থাকি। এসব সভা রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে বেশ সহায়ক হয়। ১৯৪৭ সনের অক্টোবর মাসে ফজলুল হক হলে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে একটু ব্যাপক আয়োজনে আমরা এ ধরনের একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করি। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন তখনকার মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ্ বাহার আর বক্তৃতা করেন কবি জসীম উদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন এবং আরো কয়েকজন মন্ত্রী। এ সভা ক্যাম্পাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে বেশ প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছিল। মন্ত্রীদের মধ্যে তখন রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়– একটি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেব ও হামিদুল হক সাহেবকে কেন্দ্র করে, এঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধী ছিলেন। অপর দলটি ছিল–হাবিবুল্লা বাহার ও আফজাল সাহেব সহ আরো দু'একজন মন্ত্রীকে নিয়ে। পূর্বেই বলেছি এঁরা গোপনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সমর্থন করতেন। ফজলুল হক হলের সভাতেই প্রথম আমার বিশেষ অনুরোধে হাবিবুল্লাহ বাহার সাহেব কয়েকজন মন্ত্রীসহ অংশ গ্রহণ করেন এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'যথাযোগ্য মর্যাদা' দেওয়ার

ইচ্ছা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। তাঁদের বক্তব্য তখনকার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে রাজনৈতিক কারণে তাঁরা নিশ্চুপ হয়ে যান। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁরা সকলেই বাংলা ভাষাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ফজলুল হক হলের এই সাহিত্য সভাটি কি অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, না ১২ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল? কারণ এ সাহিত্য সভার একটি রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছিল কোলকাতার দৈনিক আজাদের ১৯৪৭-এর ১৩ই নভেম্বর-এর সংখ্যায়। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় সাহিত্য সভাটি ১২ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ ছাড়া '৪৭-এর ১৫ই নভেম্বর-এর আজাদে প্রকাশিত ফজলুল হক হলের সাহিত্য সভাটি সম্পর্কে অপর এক রিপোর্টে বলা হয়, সভাটি জনাব নুরুল আমিন উদ্বোধন করেছিলেন। এবং তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। এ সম্পর্কে আপনার কি স্মরণে আসছে?

উত্তর ঃ [গভীরভাবে স্মৃতিচারণের চেষ্টা করে প্রিন্সিপাল কাসেম বলেন] ফজলুল হক হলের আলোচ্য সভাটি অক্টোবরে আয়োজন করেছিলাম বলেই আমার স্মরণে আসছিল। মাস ও তারিখের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আমার ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও কাগজপত্রগুলি ভাষা আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী শওকত আলীর কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ার পরবর্তীকালে এ সাহিত্য সভার মাস ও তারিখটি আমি যাচাই করতে পারিনি। তাই আমার 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস'-পুস্তিকাতে এবং অন্যান্য সাক্ষাৎকারগুলিতেও তাৎক্ষণিক স্মৃতি থেকে অক্টোবর মাসের কথাই উল্লেখ করেছি। তবে সাহিত্য সভার বিবরণ 'ইত্তেহাদ', 'আজাদ' ও 'ইনসাফ'-সহ তখনকার কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের তারিখই সঠিক হবে।

সাহিত্য সভাটি জনাব নুরুল আমিন উদ্বোধন করেছিলেন বলে আমার স্মরণে আসেনি, তাই তাঁর নাম উল্লেখ করিনি। বয়সের ভারে এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য ক্রমে স্মৃতি শক্তি খাটো হয়ে আসছে। এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্যের জন্য তখনকার 'ইত্তেহাদ', 'আজাদ' এবং 'ইনসাফ'-পত্রিকার রিপোর্টগুলির ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। নুরুল আমিন সাহেবের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর প্রশ্নে সেক্রেটারিয়েটে এবং তাঁর বাসভবনে বহুবার আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে। তিনি কখনো রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর বিরোধিতা করেন নি। তবে তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চালুর পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বই পত্রের অভাব ও সমস্যার কথা প্রকটভাবে তুলে ধরতেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও কাগজপত্র জনাব শওকত আলীর

নিকট কিভাবে যায়?

উত্তর ঃ বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল 'সৈনিক' ও 'তমদ্দুন মজলিস'-এর দফতর, আমার ঊনিশ নম্বর আজিমপুরের বাসাটিতে পুলিশী হামলা বা অভিযান চলবে আশংকায় আমি ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও কাগজপত্র তমদ্দুন মজলিস ও ভাষা আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী মতিয়ুর রহমানের কাছে (পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারী, পরবর্তীকালে ডক্টর মতিয়ুর রহমান বাংলা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হন) নিরাপদে রাখার জন্য দেই। ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত তিনটার দিকে পুলিশ আমার ঊনিশ নম্বর আজিমপুরের বাসাটি প্রায় ঘিরে ফেলে। আমি এবং অধ্যাপক আবদুল গফুর পুলিশের দৃষ্টির আড়ালে বাসা থেকে সরে যেতে সক্ষম হই এবং প্রায় দুই মাস বিভিন্নস্থানে আত্মগোপন করে থাকি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, ঢাকায় ফিরে আসার পর মতিয়ুর রহমানের নিকট ভাষা আন্দোলনের ফাইল ও কাগজপত্রের খোঁজ নিলে সে জানায়, 'ফাইল ও কাগজপত্র সে শওকত আলীর কাছে রেখেছিল। কিন্তু শওকত আলীর কাছ থেকে সেগুলি আর ফিরে পাওয়া যায়নি।' শওকত আলীর বক্তব্য অনুযায়ী ফাইল এবং কাগজপত্রগুলো তার কাছ থেকে খোয়া গেছে। পরে পত্রিকায় বিশেষ হারানো বিজ্ঞপ্তি দিয়েও সেই ঐতিহাসিক ফাইল এবং কাগজপত্র আর পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিস গঠনের চিন্তা কিভাবে আপনার মানসিকতায় স্থান লাভ করে?

উত্তর ঃ ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অনুভব করলাম দেশে আদর্শিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য চরিত্রবান, আদর্শিক এবং অধিকার সচেতন যুব সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজন। হৃদয়ের এই একান্ত বিশ্বাস এবং আবেগ থেকেই তমদ্দুন মজলিস গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করি। '৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস গঠন করি।

প্রথম থেকেই আমরা অনুভব করি ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র আদর্শিক সংগঠন ব্যতীত উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। সমাজে সুবিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও এ ধরনের আদর্শিক সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার এ ধরনের সংগঠন যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত না হয় তা হলে দেখা যায় যে সংগঠনই আদর্শের আবরণে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবিচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বাহন হয়ে উঠে। তাই তৎকালীন স্বাধীন পাকিস্তানে তমদ্দুন মজলিসের আত্মপ্রকাশ ছিল প্রগতিবাদী আদর্শ-কর্মী সৃষ্টির সুদূর প্রসারী প্রচেষ্টা।

বস্তুতঃ 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' ছিল আদর্শবাদী কর্মীদের বৈজ্ঞানিক সংগঠন। চিন্তা-বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবন মারফত সর্বমানবীয় কল্যাণধর্মী আদর্শ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমই মজলিসের লক্ষ্য ছিল।

প্রথমে একেবারে শূন্য থেকেই শুধুমাত্র গভীর বিশ্বাস ও হৃদয়ের আবেগকে নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। মনে পড়ে, প্রথমে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র শামসুল আলম, (পরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের দ্বিতীয় আহ্বায়ক) ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট) তমদ্দুন মজলিসের সদস্যভুক্ত করতে সমর্থ হই। পরবর্তীকালে যাঁরা যোগ দেন তাঁরা হলেন, মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা আজিজ আহমদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া (পরে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম আহ্বায়ক), জগন্নাথ কলেজের ছাত্রনেতা সানাউল্লাহ নূরী এবং আরো অনেকে।

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিসের অফিস কোথায় ছিল?

উত্তর ঃ প্রথম দিকে তমদ্দুন মজলিসের সাংগঠনিক কাজ ও ভাষা আন্দোলনের যাবতীয় কাজের জন্য আমার বাসা ১৯ নম্বর আজিমপুর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ–পশ্চিমে অবস্থিত রশিদ বিল্ডিং-এর নীচতলার একটি ছোট কামরা এই উভয় স্থানই প্রধান অফিসরূপে ব্যবহার করতাম। পরে রশিদ বিল্ডিং-এর দোতালায় একটি কামরা ভাড়া করে তমদ্দুন মজলিসের অফিস স্থাপন করি। মজলিসের এই অফিস থেকেই তখন ভাষা আন্দোলনের সব কাজ পরিকল্পিত ও পরিচালিত হত। ভাষা আন্দোলনের অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এ অফিসেই গৃহীত হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কখন গঠিত হয়? কোন পরিস্থিতিতে এ সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়?

উত্তর ঃ ফজলুল হক হলে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভার পর 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পোস্টকার্ড, মানি অর্ডার ফরম, রেলের টিকেট ও টাকায় বাংলা ব্যবহার না করে ইংরেজী ও উর্দুর ব্যবহার, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সিলেবাস হতে বাংলাকে বাদ দেয়া, শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের উর্দুর পক্ষে ওকালতি আমাদের শংকিত করে তোলে। অথচ ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের কেউ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী নিয়ে তৎপর নন। এই উদাসীনতার সুযোগে শুধু উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে এই আশংকায় আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। সুতরাং এই এক তরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন সৃষ্টির জন্য

তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তমদ্দুন মজলিসের বিশিষ্ট কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর নূরুল হক ভূঁইয়াকে এ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়।

প্রশ্নঃ প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কাজের সূচনা হয় কিভাবে?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর পরই প্রথমে আমরা রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের সঙ্গে নাজিরা বাজার মাওলা সাহেবের (ফজলুল হক সাহেব) বাসায় সাক্ষাৎ করি। শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান সাহেব করাচী থেকে ঢাকা এলে নাজিরা বাজার মাওলা সাহেবের বাসায় অবস্থান করতেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক হয়।

ফজলুর রহমান সাহেব আমাদের সঙ্গে অনেকটা রুক্ষ ও অপমানজনক ব্যবহার করেন। এই ঘটনা আমাদের খুবই বিক্ষুব্ধ করে তোলে। আমরা সংগ্রাম পরিষদের নামে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর স্বপক্ষে মেমোরেণ্ডাম পেশ করার জন্য কাজে নেমে যাই। কয়েক সপ্তাহের চেষ্টায় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর পক্ষে কয়েক হাজার দস্তখত সংগ্রহ হয়। এই মেমোরেণ্ডাম আমরা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট পেশ করি। বিভিন্ন পত্রিকাতেও মেমোরেণ্ডাম পেশের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এই মেমোরেণ্ডাম বা স্মারকপত্রতে 'বাংলা ভাষাকে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম সম্পদশালী ভাষা এবং বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে উল্লেখ করে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান উভয় সরকারকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে অতি সত্ত্বর বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বাংলাভাষী মন্ত্রীরাও এ স্মারকলিপির প্রস্তাব সমর্থন করেন। কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, রাজনীতিক, আইনজীবী, আলেম-ওলামা, ডাক্তার, ছাত্রনেতা সহ সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর লোক এই স্মারক লিপিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উচ্চতর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সিলেবাস হতে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে তখনকার সংবাদপত্রে আপনার কোন বিবৃতি দানের কথা মনে পড়ে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিব মিঃ গুড ইন্ বিভিন্ন

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ৪৭ এর নভেম্বরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বিষয়ের সিলেবাস সম্পর্কে একটি সার্কুলার পাঠান। আমি এই সার্কুলারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে পড়ার সুযোগ পাই। এই সার্কুলারে পরীক্ষার জন্য ৩১টি বিষয়ের মধ্যে ৯টি ছিল ভাষা। এই সকল ভাষার মধ্যে উর্দু, হিন্দী, ইংরেজী, জার্মান, ফ্রেঞ্চ সহ মৃত ভাষা ল্যাটিন ও সংস্কৃতও স্থান পায়। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলাকে বাদ দেয়া হয়। এটা ছিল বাংলা ভাষার প্রতি চরম অবহেলা ও অবমাননা স্বরূপ। সার্কুলার-এর বিষয় উল্লেখ করে বাংলা ভাষার প্রতি চরম অবহেলার প্রতিবাদ করে কোলকাতার দৈনিক ইত্তেহাদে আমি কঠোর ভাষায় এক বিবৃতি প্রদান করি। সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের শেষ দিকে ঐ বিবৃতি এবং ইত্তেহাদ সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের লেখা তীব্র সমালোচনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য সরকার-এর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয় ভুলক্রমে বাংলা বাদ পড়েছে। আমাদের ক্ষোভ দ্বিগুণ হয় এই ভেবে যে ভুলক্রমে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা কি করে বাদ পড়তে পারে।

প্রশ্ন ঃ করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদে ইউনিভার্সিটির বেলতলায় '৪৭ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কোন সভার কথা আপনার মনে পড়ে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, করাচীর শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত উর্দুর স্বপক্ষে গৃহীত প্রস্তাব পত্রিকায় দেখার পর ক্যাম্পাসে এবং সচেতন বুদ্ধিজীবী মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঢাকার উর্দুর সমর্থক পত্রিকা মর্নিং নিউজ এ খবর ফলাও করে প্রচার করে। শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের প্রতিবাদে ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণের বেলতলায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমিই ঐ সভার সভাপতিত্ব করি। সম্ভবতঃ ইউনিভার্সিটির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে এটাই প্রথম প্রতিবাদ সভা।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কখন কি ভাবে সম্প্রসারিত হয়?

উত্তর ঃ বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম এবং কোর্ট কাচারী ও অফিসসহ সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য '৪৮ সালের ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আহ্বান করি। এ সভাতেই তমদ্দুন মজলিস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, গণ আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, 'ইনসাফ', 'জিন্দেগী' ও 'দেশের দাবী' পত্রিকার প্রতিনিধি নিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন করা হয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বিশিষ্ট তমদ্দুন মজলিস কর্মী শামসুল আলমকে এই সম্প্রসারিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়।

প্রশ্ন ঃ এ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগেই কি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে '৮৮ সালের ১১ই মার্চের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ৭ই মার্চ ফজলুল হক হলে এ সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১১ই মার্চ ঢাকায় পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট ও প্রদেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের কর্মসূচী নেয়া হয়। ১১ই মার্চের কর্মসূচী সার্বিকভাবে সফল হয়। ঢাকার রাজপথ ছাত্র জনতার রাষ্ট্রভাষার দাবীর শ্লোগানে মুখরিত হয়। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে অনেক ছাত্র আহত হয় এবং বহু ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। ১১ই মার্চের আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রভাষার দাবী নতুন গতি লাভ করে।

এ পর্যন্ত মজলিসের পক্ষে আমরাই এককভাবে আন্দোলনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এ আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে যাই। কিন্তু তখন লীগ, কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন (তখনকার বাম পন্থী ছাত্র প্রতিষ্ঠান) এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমাদের নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়। মুসলিম লীগ একে মোটেই আমল দেয়নি, কংগ্রেস কর্মীরা এর নাম শুনে আঁতকে উঠেন। ঢাকা জজ কোর্টের পেছনে কম্যুনিষ্ট পার্টির যে বিরাট অফিস ছিল, তাতে একদিন কম্যুনিষ্ট পার্টির এক মিটিং ছিল। কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ এ বৈঠকে নেতৃত্ব করছিলেন। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে আমি কয়েকজন কর্মীসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি পার্টির তরফ হতে আমাকে জানিয়ে দেন যে এ আন্দোলনকে সমর্থন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, তিনি মেমোরেণ্ডামে দস্তখত করতেও অস্বীকার করেন। ছাত্র ফেডারেশনও এতে যোগদান করতে অস্বীকার করে।

প্রশ্ন ঃ এ সময় ভাষা আন্দোলন বিরোধী তৎপরতা কেমন ছিল? এ তৎপরতা কারা চালাতেন? প্রতিবন্ধকতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে আন্দোলন কিভাবে বিস্তার লাভ করে?

উত্তর ঃ আন্দোলন এভাবে দানা বেঁধে উঠার সাথে সাথে একে গোড়াতেই পণ্ড করে দিয়ে এর মাধ্যমে স্বার্থোদ্ধারের জন্য জোর চেষ্টা চলতে থাকে। সরকারী এজেন্ট বলে সন্দেহ করা হয়েছিল এমন কয়েকজন ব্যক্তি বড় বড় সংগ্রামী কথা বলে সংগ্রাম পরিষদে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে থাকে– তারা নানা রকম অবান্তর কথা তুলে ছাত্র ও কর্মীদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

অন্যদিকে কয়েকজন এম.এল.এ. এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য মেতে উঠেন। এঁদের অনুসারী বহু ছাত্রও এ কাজে নিযুক্ত হয়। ভাষা-আন্দোলনকে তলিয়ে একে 'মন্ত্রিত্ব-সংকট আন্দোলনে' পরিণত করার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লেগে যান। বলা বাহুল্য, কিছু দিন আগেও এঁরা ভাষা আন্দোলনকে অবাঞ্ছিত বলে মনে

করতেন। এ সময়ে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে মোহাম্মদ আলী সাহেব, তোফাজ্জল আলী সাহেব ও নছরুল্লা সাহেব প্রমুখ এম.এল.এ. বাংলা-ভক্ত হয়ে ছাত্রদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হতে চেষ্টা করেন ও অন্যদিকে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে এই জনপ্রিয়তা দেখিয়ে আন্দোলনকে থামাবার শক্তি রাখেন বুঝিয়ে মন্ত্রিত্ব পাবার তদবির করতে থাকেন।

তৃতীয় আর একদল এ আন্দোলনকে স্যাবোটাজ করার চেষ্টা করে। বলাবাহুল্য এরা কমবেশী ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য ছিল। এতোদিন এরা কোন কাজেই এগিয়ে আসেনি। অথচ আন্দোলন যখন বেশ গতি লাভ করেছে তখন এরা গোপনে পাকিস্তান-বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কয়েকটি হ্যাণ্ডবিল ও পোস্টার দিয়ে জনগণকে আন্দোলন-বিরোধী করে তোলে। জনসাধারণ তখন সন্দেহ করতে শুরু করে যে, এ আন্দোলন নিশ্চয়ই ভারতের প্ররোচিত। এমনও হয়েছে যে কয়েকজন ছাত্র ফেডারেশন কর্মীকে উত্তর বঙ্গে প্রচারের জন্য যাতায়াত খরচ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ঐ কর্মীরা ভাষা আন্দোলনের জন্য তো কোন কাজই করেনি বরং সে টাকার কোন হিসাবও দিতে পারে নি।

অপূর্ব মিলন

এভাবে সরকারী গুপ্তচর, মন্ত্রীত্বলোভীরা আর তথাকথিত প্রগতিশীলরা এক জোট বেঁধে ভাষা-আন্দোলনকে স্যাবোটেজ করার বা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার কাজে লেগে যান– আর নানারূপ অবান্তর প্রচার করে জনমত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। অনেক এম.এল.এ. বড় বড় কথা বলে নেতা বনে যান– আর তাঁরা আন্দোলনের সুযোগে রাষ্ট্রদূতের পদ বা মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। এঁরাই মন্ত্রীত্ব পেয়ে প্রকাশ্যভাবে বাংলার বিরুদ্ধাচরণ করতেও লজ্জাবোধ করেন নি।

সংগ্রাম পরিষদ আরো সম্প্রসারণ

ইতিমধ্যে সংগ্রাম পরিষদে বিভিন্ন গ্রুপ এবং বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের প্রতিনিধি নিয়ে একে আরও সম্প্রসারিত করা হয়।

মজলিস অফিস ও কর্মীদের উপর হামলা

সত্য কথা বলতে কি সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্র ও কর্মীদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণ এ আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। তার সংগে যোগ হয় সরকারী প্রচার। অতিপ্রগতিশীলদের কয়েকটি গোপন পোস্টারকে ভিত্তি করে নির্লজ্জভাবে

সরকার প্রচার করতে থাকে যে এটা রাষ্ট্রের শত্রুদের কাজ। ফলে জনসাধারণ আরো ক্ষেপে উঠে। এ সময়ে ইউনিভার্সিটির নিকটস্থ তমদ্দুন মজলিসের অফিসটি স্থানীয় লোকেরা লুট করে– প্রকাশ্যভাবে ভীতি প্রদর্শন করে অফিসটি উঠিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য যে, এ মজলিস অফিসই ছিল সংগ্রাম পরিষদের তথা ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় অফিস।

ঢাকার জনসাধারণ ভাষা আন্দোলনের ফলে খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা ভাষা আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। মজলিস কর্মীদের ও ছাত্রদের তখন শহরে প্রবেশ একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মজলিস কর্মী মোঃ সিদ্দিকুল্লা (সলিমুল্লা হলের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারী) ছদ্মবেশে বলিয়াদি প্রেসে হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে গিয়ে কসাইটুলীতে বন্দী হন। এবং তাঁকে কেটে ফেলার মুহূর্তে জনৈক দয়াশীল লোকের দ্বারা মুক্ত হয়ে পলায়ন করতে সমর্থ হন। আমার নিজের উপর কয়েকবার হামলা হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এ, কে, এম, আহসান সাহেবকেও মারপিট করা হয়।* এই ভাবে ছাত্র ও কর্মীরা রমনাতে 'অবরুদ্ধ' হয়ে পড়ে।

বাঙলা বিরোধী আন্দোলন

এদিকে উর্দু সমর্থক আন্দোলন গড়ে উঠে। স্বনামখ্যাত মৌলানা দীন মোহাম্মদ সাহেব প্রমুখকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল্লায় ও মফস্বলের বহুস্থানে উর্দুকে সমর্থন করে বহু সভা করা হয়। এঁরা কয়েক লাখ দস্তখত যোগাড় করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক মেমোরেণ্ডাম্ পেশ করেন। পথে ঘাটে ইস্টিমার এ স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ চলে– স্বাক্ষর সংগ্রহের পর কয়েকজন নাম করা ব্যক্তি করাচীতে গিয়ে সরকারের কাছে পেশ করে আসেন।

হাস্যকর অপপ্রচার

তখনকার ঢাকার "মর্নিং নিউজ" ও সিলেটের "যুগভেরী" জঘন্যতমভাবে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে লিখতে থাকে। 'মর্নিং নিউজ' সম্পাদকীয়তে ও চিঠিপত্র বিভাগে মজলিসকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয়। 'যুগভেরী' একদিন এমনও লিখে যে, তমদ্দুন মজলিস একটি ভয়ঙ্কর বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। ভাষা আন্দোলনে এ সংগঠন ঢাকাতে সমান্তরাল সরকার (Parallel Government) প্রতিষ্ঠা করে টেক্স আদায় করছে। অপর দিকে কলিকাতার ইত্তেহাদ, ঢাকার সাপ্তাহিক সৈনিক ও ইনসাফ

★ ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিকে তিনি আমার সাথে এক বাসায় থাকতেন।

ভাষা আন্দোলনকে জোর সমর্থন জানিয়ে বিরাটভাবে সাহায্য করতে থাকে।

বাঙলা-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের একাংশ

ছাত্র সমাজের একটা অংশও তখন উর্দু সমর্থক আন্দোলনে যোগ দেয়। রায় সাহেব বাজার হতে এরূপ এক ছাত্র মিছিল বের হয়ে ঢাকা কলেজে আসে। আন্দোলনের সময় ফজলুল হক হল হতেও ছাত্রনেতা শামছুল হুদা সাহেবের নেতৃত্বে বাংলা বিরোধী এক ছাত্র মিছিল বের করা হয়। এক সময় ঢাকার নবাব সাহেব ফুলতলায় (ঢাকা স্টেশন) আমাদের এক মিছিলে লোক লেলিয়ে দিয়ে লাঠিপেটা করান। এ হামলায় বিখ্যাত সমাজকর্মী নাজির আহমদ সহ আমরা বহুজন আহত হই।

আন্দোলন চলতে থাকে

১৯৪৮ সনের প্রথম দিক। এত বিপত্তি সত্বেও আন্দোলন চলতে থাকে। ধর্মঘটে যোগ দেয়ার জন্য রেল শ্রমিকের সংগে ও কেন্দ্রীয় কর্মচারী সমিতির সাথে আমি যোগাযোগ করি। নির্দিষ্ট দিনে ২২শে মার্চ ইউনিভার্সিটি প্রাংগনে মিটিং হয়। মিটিং-এর পর মিছিল বের হয়। মিছিলকে হাইকোর্ট পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নেয়া হয় কিন্তু ইতিমধ্যে মন্ত্রীত্বলোভীদের সমর্থকেরা অন্যান্য স্যাবোটিয়ারদের সঙ্গে মিলে কতকগুলো অশোভন কাজ করে বসে।* বহু ঘন্টা ধরে সেক্রেটারিয়েট ঘিরে রাখা হয়। জনৈক মন্ত্রীকে সেক্রেটারিয়েট হতে বের করা হয় এবং তিনি বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে না পারলে পদত্যাগ করবেন বলে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন ও আগাম পদত্যাগ পত্র লিখে দেন। সে পদত্যাগ পত্র আমার কাছে দেয়া হয়। আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে সেক্রেটারিয়েটের সামনের প্রাঙ্গন হতে তাঁকে রক্ষা করি।

ইতিমধ্যে এই খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ে। খবর আসে যে কিছু লুংগি পরা শহরের গুণ্ডা সেক্রেটারিয়েটে ঢুকে পড়েছে। তখন তাদের আক্রমণের ভয়ে ছাত্ররা সেক্রেটারিয়েট ছেড়ে চলে যায়। এ সময়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

★ মন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ সাহেবের বাগান নষ্ট করা হয়। আর একজন মন্ত্রীর দাড়ি ধরে অপমান করা হয়। সেক্রেটারিয়েটের জনৈক নিরীহ পুলিশকে আধমরা করে রাখা হয়। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা ছাত্রদের মারার জন্য সলিমুল্লা হল ও ফজলুল হক হল আক্রমণ করবে বলে খবর আসতে থাকে। ছাত্রদের নিয়ে আমরা সারা রাত গেট বন্ধ করে ছাদে উঠে পাহারা দিতে থাকি। এক বিভীষিকাময় অবস্থার মধ্যে কয়েক দিন সকলকে সময় কাটাতে হয়।

পরদিন আবার মিছিল হয়। সেক্রেটারিয়েটের নিকট পুলিশ বাধা দেয়। জনতা-পুলিশে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে ও লাঠিচার্জ করে শত শত কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। অনেককে বাসে করে তেজগাঁও ও নারায়ণগঞ্জ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।

ঢাকায় আন্দোলন-বিরাট ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। এ দিকে খবর আসে পুরনো ঢাকার লোকেরা শায়েস্তা করার জন্য আমাদের বাসস্থান ও হলগুলো আক্রমণ করবে।

অন্যান্য স্থানে আন্দোলন

এ সময় সেক্রেটারিয়েটে ধর্মঘট করানোর চেষ্টা করা হয়। তা আংশিক সফল হয়।

দ্বিতীয় দিন ভোর বেলা ঢাকাগামী ২/৩টি ট্রেন ধর্মঘটের ফলে বন্ধ থাকে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্মচারী সমিতি ও রেল কর্মচারী লীগের সাথে বহুদনি ধরে আমাকে গোপনে কাজ করতে হয়।

মফস্বলে

মফস্বলে নোয়াখালী ও যশোহরে সফলভাবে হরতাল ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহীতে ছাত্ররা দুই দলে বিভক্ত হয়। দলাদলিকে ভিত্তি করে কলেজ কর্তৃপক্ষ বাঙলা ভাষা সমর্থকদের উপর দারুণ নির্যাতন চালায়। অনেকে গ্রেপ্তার হয়। দুইদল ছাত্রের মধ্যে মারামারি হয়। এতে অনেকে আহতও হয়।

চট্টগ্রামে আমরা যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলাম তারা কোন কাজ করতেই সুযোগ পায়নি। অধিকন্তু কয়েকজন মজলিস কর্মী লালদিঘীর পাড়ে ও মেডিকেল স্কুলে সভা ও মিছিল করতে গিয়ে বাংলা ভাষা বিরোধীদের হাতে দারুণভাবে মার খায়।

সিলেট গোবিন্দ পার্কে তখনকার তমদ্দুন মজলিস এক মিটিং-এর আয়োজন করে। মিটিং এর সময় স্থানীয় লোকেরা হামলা করে মিটিং-এর উদ্যোক্তাদের দারুণভাবে প্রহার করে এবং মাইকটি ভেঙে ফেলে।

অন্যান্য স্থানেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোথাও সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের তেমন সক্রিয় সমর্থন পায়নি। কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যেই বিশেষ করে এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা এ আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করি এবং আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রাখি।

প্রশ্ন ঃ নাজিমুদ্দীন সরকারের সঙ্গে কি ভাবে আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং অবশেষে

কি ভাবে সরকারের সঙ্গে ভাষা চুক্তি সম্পাদিত হয়?

উত্তর ঃ ইতোমধ্যে খবর আসে কায়েদে আজম ঢাকা সফরে আসবেন। আরো শোনা যায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেবকে গণ্ডগোল মিটমাট করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সরকার ভাষা আন্দোলনের দাবী মেনে নিতে রাজী– এ মর্মে আলোচনা করার জন্য নাজিমুদ্দীন সাহেব আলোচনার প্রস্তাব রেখে আমার কাছে কয়েকটি চিঠি লিখেন। এ চিঠি আমি সংগ্রাম পরিষদের কাছে পেশ করি। সংগ্রাম পরিষদ প্রথমে আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে দাবী মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আমরা আলোচনা করতে সম্মত হই।

নাজিমুদ্দীন সাহেবের সংগে আমাদের (সংগ্রাম পরিষদের) দু'টি বৈঠক হয়। আমরা নীচের শর্তগুলি নাজিমুদ্দীন সাহেবের কাছে পেশ করি–

(১) অবিলম্বে বাংলাকে পূর্ববঙ্গের (তখন পূর্ববংগ বলা হত) সরকারী ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম বলে ঘোষণা করতে হবে।

(২) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট যাতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে নেন– সেজন্য পূর্ব বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ করে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিকট তা পাঠাতে হবে।

(৩) ভাষা আন্দোলনের সময়ে যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁদেরকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে।

(৪) ভাষা আন্দোলনের সময়ে 'ইত্তেহাদ', 'অমৃতবাজার', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকার উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা উঠিয়ে নিতে হবে।

(৫) ভাষা আন্দোলনে জড়িত ছিল বলে কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন রকমের শাস্তি দেয়া চলবে না।

(৬) প্রেসনোট বার করে সরকার ঘোষণা করবেন যে ভাষা আন্দোলন কোনমতেই রাষ্ট্রের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হয় নি।

(৭) ভাষা আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য সরকার যে কার্যক্রম নিয়েছেন তার জন্য প্রকাশ্যভাবে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে ক্ষমা চাইতে হবে।

বহু বাদ-প্রতিবাদের পর নাজিমুদ্দীন সাহেব ২, ৪, ৫ ও ৭ ছাড়া অন্য চারটি দাবী মেনে নেন। ২নং দাবী সম্বন্ধে তিনি বলেন এটা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতেয়ারের বিষয়– এটা নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের কিছু করা সম্ভবপর নয়। ৪নং শর্ত সম্বন্ধে তিনি বলেন–

কয়েকটি পত্রিকা বন্ধ করা হয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লিখেছে বলে, ভাষা আন্দোলনের জন্য নয়। ৫নং শর্ত সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল– সরকারী কাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়, নইলে রাষ্ট্র চালনা সম্ভবপর নয়। ৭নং সম্বন্ধে তিনি বলেন– প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে অবমাননাকর। তিনি সংগ্রাম পরিষদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে রাজী আছেন।

আমরা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে ঘোষণা করি– সমস্ত শর্ত মেনে না নিলে কিছুতেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না। এতে প্রথম বৈঠকের আলোচনা ব্যর্থ হয়। আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে আন্দোলন চালিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি।

পুনরায় নাজিমুদ্দীন সাহেব সংগ্রাম পরিষদের সংগে আলোচনার জন্য আমাকে চিঠি লিখেন। দ্বিতীয় বৈঠকেও অনেকক্ষণ ধরে তর্ক বিতর্ক চলে। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের শর্তে অনমনীয় থাকি। ফলে নাজিমুদ্দীন সাহেবকেই সংগ্রাম পরিষদের সমস্ত দাবী মেনে নিতে হয়। সংগে সংগে এসব দফা ও শর্তকে কেন্দ্র করে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একদিকে সরকারের পক্ষে নাজিমুদ্দীন সাহেব অন্যদিকে আমরা চুক্তি পত্রে দস্তখত করি। এই চুক্তির কথা ঘোষণা করার ভার আমার উপর পড়ে। মেডিকেল কলেজের পাশে বর্তমান শহীদ মিনারের পেছনে তখন বিরাট মাঠ ছিল। সেখানে বিরাট জনতার সামনে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আমি এই চুক্তির কথা ঘোষণা করি। এতে প্রায় সকলেই খুশী হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক মন্ত্রীত্ব শিকারী ও তাদের অনুসারী এতে মন্ত্রীত্ব লাভে অসুবিধা হবে ভেবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ভাষা আন্দোলনের বিরাট সাফল্য

বলাবাহুল্য, সংগ্রাম পরিষদের শর্তগুলি এত তাড়াতাড়ি নাজিমুদ্দীন সাহেব মেনে নেবেন তা কেউ ভাবতে পারেনি।

যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল– চুক্তির পর তাদের মুক্তির আদেশ দেয়া হয়। ভারতের যে সমস্ত পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তাও উঠিয়ে নেয়া হয়। সরকারের পক্ষ হতে ভাষা আন্দোলনকারীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে নাজিমুদ্দীন সাহেব তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দেন। আন্দোলনটি যে রাষ্ট্রদ্রোহীদের দ্বারা পরিচালিত হয় নি তাও তিনি বিবৃতিতে স্বীকার করেন। সরকারী কর্মচারীদের শাস্তির জন্য যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা তিনি বাতিল করে দেন। এ ছাড়া তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী (বাজেট) অধিবেশনেই বাংলাকে পূর্ববঙ্গের সরকারী ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব এবং একে কেন্দ্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ গৃহীত হবে।

বিভিন্ন পত্রিকায় অভিনন্দন

চুক্তির শর্তাবলী বিভিন্ন পত্রিকায় বড় বড় হেডলাইনে প্রকাশিত হয়। প্রায় সব পত্রিকাই এ সাফল্যের জন্য সংগ্রাম পরিষদকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় লিখেন। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সমর্থনকারী "ইত্তেহাদ" তার প্রধান সম্পাদকীয়তে বলেন– বিরাট শক্তি ও দুর্জয় বিরোধিতার মধ্যে সংগ্রাম করে বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীগণ যে সাফল্য লাভ করেছেন তা ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে। ইত্তেহাদ বিভিন্ন লেখায় আন্দোলনে মজলিসের নেতৃবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের আগমন ও উর্দুর স্বপক্ষে ঘোষণার পর পরিস্থিতি কি রূপ লাভ করে?

উত্তর ঃ ১৯শে মার্চ কায়েদে আযম ঢাকায় আগমন করেন। ২১শে মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে কয়েক লাখ লোকের সমাবেশে বক্তৃতায় পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা এখানের জনসাধারণই ঠিক করবে বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা যে উর্দু হবে তা জোরের সাথে বলে যান। রেস্‌কোর্সের এ জনসমাবেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আহ্বান জানিয়ে মজলিসের পক্ষে আমরা একটি ইশতেহার বিলি করি।

এ সময়ে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কায়েদে আযমের সংগে আমরা সাক্ষাত করি। তাঁকে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকেও গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি দিতে থাকলে কায়েদে আযমের সংগে আমাদের বহুক্ষণ বিতর্কমূলক আলোচনা হয় ও শেষে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই সময় কার্জন হলের কনভোকেশনেও কায়েদে আযম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুর সমর্থনে মন্তব্য করলে সভাস্থলেই অনেকে প্রতিবাদ করেন।

এরপর এসেম্বলির অধিবেশনে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব সরকারের পক্ষ হতে চুক্তির অন্যতম দাবী অনুযায়ী এক প্রস্তাব পেশ করেন। এতে বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস সদস্যগণসহ সকলে এ প্রস্তাব সমর্থন করার পর সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে প্রস্তাব পাশ করার কথা ছিল তা নাজিমুদ্দীন সাহেব উত্থাপনই করেন নি। সংগ্রাম পরিষদ তাঁর কাছে এর কৈফিয়ত দাবী করলে নাজিমুদ্দীন সাহেব আমাদের বলেন– কায়েদে আযম, যিনি আমাদের জাতির পিতা– তিনি বলে গেছেন যে উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। অতএব তিনি যদিও এ প্রস্তাব পাশ করেন তা হলে কায়েদে আযমের প্রতি অসম্মান দেখানো হবে। সুতরাং চুক্তির এ ধারা পালনে তিনি অক্ষম। সংগ্রাম পরিষদ চুক্তি ভঙ্গের জন্য নাজিমুদ্দীন সাহেবকে দায়ী করেন।

এরপর '৪৮ সাল হতে '৫২ সালের মধ্যে ভাষা নিয়ে আর ব্যাপক কোন আন্দোলন সৃষ্টি করা যায়নি। '৪৮ সনে এসেম্বলিতে বাংলাকে এখানে সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার স্বীকৃতি দেয়ায় কর্মীরা অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। বছরের শেষে ১১ই মার্চে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ থাকে। এ সময়ে গণসংযোগ করার এক ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়। ঢাকার উর্দু সমর্থক জনসাধারণের মধ্যে সদিচ্ছা সৃষ্টি ও প্রচারের জন্য আমি 'ঢাকা মজলিশ' গঠন করি। জনাব আবদুল মান্নান এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন মহল্লায় কাজ চালাতে থাকি।

প্রশ্ন ঃ এবার ভাষা আন্দোলনের বায়ান্নর রক্তাক্ত অধ্যায় সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই।

উত্তর ঃ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত অধ্যায় শুরু হয় খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টনের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। ভাষা চুক্তি লংঘন করে তিনি পুনরায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

এবার সংগ্রাম পরিষদ গঠনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এগিয়ে আসে। তারা বার লাইব্রেরী হলে সব দলের এক বৈঠক আহ্বান করে। বৈঠকে পূর্ব-পাক মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা কাজী গোলাম মাহবুব আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। তমদ্দুন মজলিস, পূর্বপাক ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, ইয়থ লীগ, ইসলামিক ব্রাদারহুড প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধি সমবায়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী "প্রতিবাদ দিবস" পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। মফস্বল হতেও বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।

১৪৪ ধারার প্রতিক্রিয়া

সরকার আকস্মিকভাবে ২০ তারিখ শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে অসন্তোষ আরো ধূমায়িত হতে থাকে। ১৪৪ ধারা জারির ফলে আন্দোলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নবাবপুরে জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের জরুরী সভায় ১৪৪ ধারা না ভেঙ্গে আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে

এরপর ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়ে ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার উপর কয়েকবার লাঠি চার্জ করা হয়। পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ঢিল ছোঁড়াছোঁড়ির মাধ্যমে শুরু হয় সংঘর্ষ। অবশেষে ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে।

সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি ছোঁড়ে। এ গুলিতে আহত হয় অনেকে, আর শহীদ হয় বরকত, জব্বার সহ আরো কিছু তরুণ প্রাণ।

গুলির প্রতিক্রিয়া

যে আন্দোলন হয়তো আইনসঙ্গতভাবে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতো, নির্বিচারে গুলী করে সরকার তাকে আগুনের মত চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। মায়ের ভাষার দাবীর জন্য ছাত্রদের এভাবে গুলি করে হত্যা করার সংবাদে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠে। যে ঢাকার জনসাধারণ ১৯৪৮ সনে উর্দুর পক্ষে থেকে সরকারকে সব রকমের সাহায্য করেছে– তারাও সরকারের উপর ক্ষেপে যায়। স্বাধীন দেশে এভাবে গুলি করে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। ঢাকাসহ সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল, মিটিং ও মিছিলে গর্জে উঠে।

২১শে ফেব্রুয়ারীর গুলির প্রতিবাদে ২২ তারিখ সবখানে হরতাল পালিত হয়। ঐদিন এক মিছিলের উপর হাইকোর্টের নিকট আবার গুলি করলে বহুলোক হতাহত হয়। ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়।

সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কসহ আমাদের সকলের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হল। শহরের বিভিন্ন স্থানে মিলিটারী মোতায়েন করা হল। এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে রাজধানীর বাসিন্দারা কাল অতিবাহিত করতে লাগল।

মফস্বলেও এর প্রতিক্রিয়া প্রবল আকার ধারণ করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক জায়গায় দোকান-পাট, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, বরিশাল বলতে গেলে প্রত্যেক জিলায় এ সময় যেভাবে বিক্ষোভ ও আন্দোলন হয়েছে বৃটিশ আমলেও তা কোন স্থানে হয়নি। চারিদিকে তীব্র প্রতিবাদের ঢেউ উঠতে থাকে। সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলোও তীব্র ভাষায় সরকারের কাজের সমালোচনা করে। কালো বর্ডারে সম্পাদকীয় লিখে শহীদদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা হয়। এ সময় সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকার বিশেষ 'শহীদ সংখ্যা' বের হয়। শুধু ঢাকাতেই এর হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়ে যায়। আন্দোলনের ব্যাপারে 'সৈনিকে'র স্বাধীন মতামত জানবার জন্য জনসাধারণ এত আগ্রহশীল হয়ে পড়ে যে বিশেষ সংখ্যা বের হওয়ার দিন ভোর ৬টা হতে রাত ৯টার কারফিউ জারীর পূর্ব পর্যন্ত 'সৈনিক' অফিস ছাত্র ও জনতায় ভর্তি হতে থাকে।

ইতিমধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিশের আগমন শুরু হয়। রাত্রে পুলিশ আমাদের বাসা ও সৈনিক অফিস (১৯নং আজিমপুর রোড) ঘিরে ফেলে। আমি

ও সৈনিক সম্পাদক আবদুল গফুর সাহেব এ সময় শেখ সাহেব বাজারের জঙ্গল, কূয়া ও গোরস্তানের মধ্যে দিয়ে বাসা থেকে সরে পড়ি এবং মাসাধিককাল ময়মনসিংহ ও ঢাকায় আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হই।

'৪৮ ও '৫২ সালের আন্দোলন ঃ

১৯৪৮ সনের আন্দোলন ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু তার সাফল্য ছিল অসাধারণ। সেবার সর্ব প্রকার শর্ত মানতে গভর্নমেন্ট বাধ্য হয়েছিল। ৫২ সনে সরকার কোন রকম চুক্তিতেই আসে নি। '৪৮ সনে সমস্ত বন্দীকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। '৫২ সনে সরকার খেয়ালখুশী মত অনেককে বন্দী করে রাখেন। '৪৮ সনে স্ট্রাইক ও হরতাল উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল সরকারের নতি স্বীকার করার পর। আর '৫২ সনে আন্দোলন বন্ধ করা হয় সরকারের দমননীতির ভয়ে। গভর্নমেন্ট '৪৮ সনে গুলী না চালিয়েও দুঃখ প্রকাশ করে। '৫২ সনে গুলী করে ছাত্র হত্যার পরও সরকার অনমনীয় থাকে। এতদসত্ত্বেও '৫২ সনের আন্দোলনে ব্যাপকতা রাজনীতিতে এক বিরাট প্রভাব রেখে যায়। আর এর ফলেই এক সময়ের জনপ্রিয় মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের কাছে দারুণভাবে পরাজয় বরণ করে। এ রাজনৈতিক মনোভাব সৃষ্টির ব্যাপারে '৫২ সালের আন্দোলন ছিল অতিশয় সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
এপ্রিল, ১৯৮৪
নভেম্বর, ১৯৮৬

মোহাম্মদ তোয়াহা

[মোহাম্মদ তোয়াহা ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

তিনি ১৯২২ সালে লক্ষ্মীপুর জেলার (সাবেক নোয়াখালী জেলা) কুশাখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী মোহাম্মদ ইয়াসিন। আম্মার নাম হাসনা বানু। গ্রামের ফরাশগঞ্জ হাই স্কুল থেকে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এ হাই স্কুল থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর ঢাকা থেকে আই, এ, পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি, এ, এবং এম, এ, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) পাশ করেন।

খুব অল্প বয়স থেকে তিনি বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি খাদি আন্দোলন আর লবণ, আইন, অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। বিলেতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি বড় হয়েছেন।

শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি নেপথ্যে কমিউনিষ্ট পার্টিতে থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

ভাষা আন্দোলনের জন্য তিনি কারাবরণ করেন। কথিত 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রাজনীতির' কারণে তিনি সুদীর্ঘ ১৫ বছর ফেরারী জীবন যাপন করেন। জেল এবং ফেরারী অবস্থা মিলিয়ে প্রায় ২২/২৩ বছর তিনি নির্বাসিত জীবন কাটান।

মোহাম্মদ তোয়াহা সাম্যবাদী (মাঃ-লেঃ) দলের চেয়ারম্যান। রাজনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে

তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গণশক্তি পত্রিকারও সম্পাদক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই নিরহংকারী ও সদালাপী।]

প্রশ্ন ঃ কিভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ওঠে? কারা এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নেয়?

উত্তর ঃ বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা যায় কিনা এ নিয়ে ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী মহলে প্রথম চিন্তার সূত্রপাত করে 'তমদ্দুন মজলিস।' এই 'তমদ্দুন মজলিস' ছিল ইসলামিক আদর্শে প্রভাবিত আধা-রাজনৈতিক এবং আধা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র এবং কতিপয় শিক্ষকের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। "সুরুজ্-জামাল" মেসের একটি পুরাতন দালানের (পরবর্তী কালের রশিদ বিল্ডিং-এর) ওপরের তলায় তমদ্দুন মজলিসের অফিস স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানই প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ওঠায় এবং ভাষা আন্দোলনের পথ উন্মোচন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্ররা একে সামগ্রিক রূপ প্রদান করে।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে এ প্রতিষ্ঠান ভাষার দাবী ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী মহলে উপস্থাপন করে? ছাত্র মহলে এ দাবী কেমন সাড়া জাগিয়েছিল?

উত্তর ঃ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রসঙ্গ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে তমদ্দুন মজলিস প্রায়ই সেমিনারের আয়োজন করতো। এসব সেমিনারে মজলিস নেতৃবৃন্দ, প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতেন। এ ছাড়া মজলিস '৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'এই নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, জনাব আবুল মনসুর আহমদ এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম-এর নিবন্ধ ছাপা হয়। এসব লেখায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে যুক্তি ও জোরালো বক্তব্য পেশ করা হয়। এরপর রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি ছাত্র মহলে জনপ্রিয় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয় এবং জাতীয় দাবীতে সরব হয়ে ওঠে। তখনও ছাত্ররাই ছিল এ দাবীর পেছনে নিয়ামক শক্তি।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে তখন প্রায়ই সেমিনারের আয়োজন হতো। এ ধরনের উল্লেখযোগ্য সেমিনার বা আলোচনা সভা সম্পর্কে কিছু বলুন না।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তখনকার দিনে ইউনিভার্সিটিতে একটা সুন্দর একাডেমিক পরিবেশ ছিল। সম্ভবতঃ ১৯৪৭ সালের অক্টোবরের দিকে মজলিসের উদ্যোগে ফজলুল হক হলে ভাষার প্রশ্নে আলোচনার জন্য এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী। মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন বাংলাভাষা প্রশ্নে খুবই সহানুভূতিশীল। ঐ সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেন

তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি জসীমউদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং আরো কয়েকজন মন্ত্রী।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষার দাবী ঢাকার তৎকালীন স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

উত্তর ঃ জনসাধারণকে এমন একটা ধারণা দেয়া হচ্ছিল যে, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী তুলে ছাত্ররা পাকিস্তান ও ইসলামিক আদর্শের খেলাপ কাজ করছে। বিশেষ করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মহল হতে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানাভাবে ঢাকার স্থানীয় জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হচ্ছিল। ফলে সিদ্দিক বাজার, নাজিরা বাজার প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় জনগণ একদিন মারমুখো হয়ে এসে তমদ্দুন মজলিস অফিসে হামলা চালায় এবং সব কিছু তছনছ করে দেয়। এ ঘটনার পর পরই আমি অন্যান্য তমদ্দুন মজলিস কর্মীদের সাথে অফিসের কাগজ-পত্র সরিয়ে আনি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি তমদ্দুন মজলিসের সদস্য ছিলেন?

উত্তর ঃ না, আমি সদস্য ছিলাম না। অধ্যাপক আবুল কাসেম সাহেব আমার এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ কয়েকজনের নাম নিজেই তালিকাভুক্ত করেছিলেন। পরে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমি নীতিগত কারণে সদস্য হইনি। তবে মজলিস কর্মী এবং এর বাইরে থেকে, আমরা সবাই একযোগে ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে কাজ করতে গিয়ে কাসেম সাহেবের সাথেও আমার সহৃদয়তা গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিস অফিস আক্রান্ত হওয়া ছাড়া এসময় আর কোথাও এমনি ধরনের ঘটনা ঘটেছিল কি?

উত্তর ঃ এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে ইশতেহার বিলি করতে গিয়ে ছাত্ররা একদিন চকবাজারে জনতা কর্তৃক ঘেরাও হয়। তখন পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল ছিল। ছাত্ররা উত্তেজিত জনতার সামনে অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ সময় গোলাম আযম সাহস করে এগিয়ে যান। তিনি চিৎকার করে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'আরে ভাই আমরা কি বলতে চাই তা একবার শুনবেন তো।' এই বলেই তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের কি উপকার হবে তার ওপর ছোট-খাট বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। পরিস্থিতি শান্ত হলো। সেদিন আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন্ গোলাম আযমের কথা বলছেন?

উত্তর ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম। এখন যিনি জামায়াতে ইসলামী করেন।

প্রশ্ন ঃ তাহলে ভাষা আন্দোলনে আপনারা এক সাথে কাজ করেছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ভাষা আন্দোলনে আমরা অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক সাথে কাজ করেছি।

প্রশ্ন ঃ তিনি কি তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ না, তিনি তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন না। দলগতভাবে নয়, বরং সামগ্রিকভাবে ছাত্ররা তখন ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল।

গোলাম আযম সাহেব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের G.S. (জেনারেল সেক্রেটারী) ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন মেধাবী। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন অমায়িক এবং ভদ্র। ভালো সার্কেলের ছাত্ররা যেমন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তেমনি আমরা সহজাতভাবে একত্রিত হয়ে ভাষা আন্দোলনে কাজ করেছি। আমাদের এ সার্কেলে আরো অনেক সহযোগী ছিলেন। এর পেছনে আর অন্য কোন কারণ ছিল না।

প্রশ্ন ঃ অরবিন্দ বোস যে প্যানেলে V.P. ছিলেন সেই প্যানেলেই কি গোলাম আযম সাহেব G.S. ছিলেন?

উত্তর ঃ সেই সংসদেই তিনি G.S. ছিলেন। তখন দলীয় কোন প্যানেল ছিল না। কেন্দ্রীয় সংসদের পদগুলো চারটি হলে বন্টন হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন তখন ছিল আমোদজনক খেলার প্রতিযোগিতার মতো, যা আজ আর নেই।

প্রশ্ন ঃ তখনকার ছাত্র সংগঠনগুলো ভাষা আন্দোলনে যে ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কে কিছু তথ্যভিত্তিক বর্ণনা দেবেন কি?

উত্তর ঃ সে সম্পর্কে বলার পূর্বে ছাত্র সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। মূলতঃ তখনও কোন ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে একটা সংগঠন ছিল। তার নাম ছিল All Bengal Muslim Students League. বিভাগ পূর্ব ২৮টি জেলার প্রতিনিধি নিয়ে এ ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর এ সংগঠনকেই পুনরুজ্জীবিত করে নাম রাখা হয় All East Pakistan Muslim Students League বা নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। এর সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী * (বর্তমানে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য) এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান** (বর্তমানে বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক)।

---

* জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী বর্তমানে জাতীয় সংসদের স্পীকার।

** জনাব শাহ আজিজুর রহমান বর্তমানে বি.এন.পি'র (তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অংশের) চেয়ারম্যান।

প্রশ্ন ঃ এ সময় কোন নূতন ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছিল কি?

উত্তরঃ সে সম্পর্কেই বলছি। আমি তখন ফজলুল হক মুসলিম হলের ভি, পি, (ভাইস প্রেসিডেন্ট)। এ সময় একটা প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। একদিন অলি আহাদ, নঈমুদ্দীন আমার হলে এসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে। পরে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে ফজলুল হক হলের এ্যাসেম্বলি হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি ঐ সভায় সভাপতিত্ব করি। অলি আহাদ এবং নঈমুদ্দীনকে যুক্ত কনভেনার করে গঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেদিন আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন (জাষ্টিস) জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, জনাব কফিল উদ্দীন মাহমুদ, মোল্লা জালালুদ্দীন, আবদুল হামিদ (ফরিদপুর) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন প্রশ্নে পরে বিবাদ বাধে। গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হয় যে, এ ছাত্র সংগঠন শুধু মাত্র মুসলিম লীগের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবে, অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে নয়। এর প্রতিবাদে আমি এবং অলি আহাদ পদত্যাগ করি। পরবর্তীকালে অবশ্য পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনতন্ত্রের সে অনুচ্ছেদ মোতাবেক মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত ছিল না। কারণ পরবর্তী সময়ে এতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রভাবই কার্যকরী হয় বেশী।

প্রশ্ন ঃ গঠনতন্ত্রের যে আপত্তিকর ধারার জন্য আপনি আর অলি আহাদ সাহেব সে দিন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ হতে পদত্যাগ করেন, সে ধারা তো পরবর্তীকালে কার্যকর হলো না, সুতরাং সেদিন সামান্য ধারা সংযোজন নিয়ে আপনাদের পদত্যাগ করা ঠিক হয় নি। আপনারা এ সংগঠনের সাথে জড়িত থাকলে নিশ্চয়ই এর চরিত্র ভিন্ন ধরনের হতো না কি?

উত্তর ঃ হয়তো তাই,আমরা থাকলে সে সংগঠনের রূপ অবশ্যই ভিন্ন ধরনের হতো।

প্রশ্ন ঃ পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে শেখ মুজিবের কোন ভূমিকা ছিল কি?

উত্তর ঃ শেখ মুজিবের কোন ভূমিকা থাকার প্রশ্নই উঠে না। কারণ ছাত্র মহলে তখন তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য পরিচিতি ছিল না।

প্রশ্ন ঃ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সম্পর্কে কিছু বলুন না। এ দিনটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১১ই মার্চ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ১৯৪৮ এর ১১ই মার্চ ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত গণবিক্ষোভ দিবস। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এদিন বিক্ষোভ মিছিল বেরুবে। বস্তুতঃ ১১ই মার্চের বিক্ষোভ এবং আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে

নাজিমুদ্দীন সরকারের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা চুক্তি হয়। ১৯৪৮ সাল হতে ৫১ সাল পর্যন্ত ১১ই মার্চ মর্যাদার সাথে পালন করা হতো। তবে নাজিমুদ্দীন সরকারের সাথে ৭ দফা চুক্তি সম্পাদনের পর আন্দোলনের গতিধারা অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। ১১ই মার্চও অনেকটা 'অফিসিয়াল' দিবসের মতো পালিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে পল্টনে নাজিমুদ্দীনের উর্দুর স্বপক্ষে মন্তব্যের পর এ দিবসের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের অবদান কতটুকু ছিল?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের তেমন কোন অবদান ছিল না। এ সম্পর্কে অনেক ডাহা মিথ্যাচার প্রচলিত আছে, যা ভাষা আন্দোলনের মহান ইতিহাসকে বিকৃত করছে। আর তখন শেখ মুজিবের অবদান থাকার কথাও নয়। কারণ ঢাকার ছাত্র সমাজে তাঁর পরিচিতি ছিল তখন নিতান্তই নগণ্য। কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে যেসব ছাত্ররা stray ঘোরাফেরা করতো শেখ মুজিব ছিলেন সে ছাত্র গ্রুপেরই একজন।

আপনাকে দুটো ঘটনা বলছি। বুঝতে পারবেন ক্ষুদ্র পরিসরে যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তাকেও শেখ মুজিব কিভাবে উপদলীয় কোটারী রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন।

একদিন আমি এবং তাজউদ্দীন আইন পরিষদের সদস্য মোঃ তোফাজ্জল আলীর বাসায় যাই। তিনি আমাদের দেখেই দূর থেকে চীৎকার করে বলে উঠলেন– 'আরে এসো, এসো, তোমাদের খবর আছে।' আমরা বুঝতে পারলাম না। এ 'খবর আছে' কথার অর্থ কি? আমরা গিয়েছিলাম প্রাদেশিক পরিষদ থেকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে সুপারিশ পাঠানোর কথা ছিল, সে বিষয়ে জানার জন্য। সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি যেন হেলা করেই বললেন, 'আরে, ওসব হয়ে যাবে। এখন কথা শুনো, Perhaps you are getting two Ministers and one Ambassador. মুজিব তোমাদের কিছু বলেনি।' আমরা অবাক হয়ে গেলাম। তোফাজ্জল আলী সাহেবের সাথে আরো কিছুক্ষণ আলাপ হলো। আলাপের পর আমাদের বুঝতে আর বাকী রইলো না যে, শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে MLA-দের পদ এবং ক্ষমতা লাভের সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করছেন।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে উপদলীয় রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন?

উত্তর ঃ তখন আইন পরিষদের ভিতরে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের সমর্থক MLA-দের একটা গ্রুপ ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন মোঃ তোফাজ্জল আলী (কুমিল্লা), মফিজ উদ্দীন (কুমিল্লা), আনোয়ারা বেগম, খান সাহেব ওসমান আলী (নারায়ণগঞ্জ), মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) প্রমুখ।

শেখ মুজিব এঁদের কাছে আনাগোনা করতেন এবং প্রচার করে বেড়াতেন যে, ইউনিভার্সিটিতে যেসব আন্দোলন হচ্ছে তা তিনি এবং তাঁর সমর্থকেরাই পরিচালনা করছেন। সুতরাং তাঁদের মধ্য থেকে (সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপ থেকে) যদি মন্ত্রীত্বে না নেয়া হয় তবে যে কোন মূল্যে আন্দোলন দ্বারা নাজিমুদ্দীন সরকারকে উৎখাত করা হবে। এইভাবে শেখ মুজিব-সোহ্‌রাওয়ার্দী বনাম নাজিমুদ্দীন-নুরুল আমিনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে মহান ভাষা আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। ভাষা আন্দোলনকে উপদলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে রাজনৈতিকভাবে চিত্রিত করার মাঝেই শেখ মুজিবের প্রকৃত ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ এসব জানতে পেরে আপনারা তখন কি করলেন?

উত্তর ঃ আমি এবং তাজউদ্দীন ইউনিভার্সিটিতে ফিরে গিয়ে যখন সকলকে জানাই যে, MLA-দের পদ লাভের জন্য ভাষা আন্দোলনকে উপদলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার ষড়যন্ত্র চলছে, তখন সাধারণ ছাত্ররা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এরপর বেলতলায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ঐ সভায় আমিই সভাপতিত্ব করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ ইউনিভার্সিটিতে 'বেলতলা' এবং 'আমতলা' নামে দু'টো সভা অনুষ্ঠানের স্থান ছিল নাকি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, দু'টো স্থান ছিল। আমতলার অদূরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল বেলতলা। ছাত্র সভাগুলো গ্রীষ্মকালে আমতলায় এবং শীতকালে বেলতলায় অনুষ্ঠিত হতো।

প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ ছাত্রসভাগুলোতেই দেখা যাচ্ছে আপনি সভাপতিত্ব করেছেন। কিন্তু এর কারণ কি?

উত্তর ঃ অধিকাংশ সময় আমিই সভাপতিত্ব করতাম, মাঝে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভি, পি, অরবিন্দ বোসও সভাপতি থাকতেন। আমার সভাপতিত্ব করার কারণ হলো– প্রথমতঃ আমি ফজলুল হক হলের ভি,পি, ছিলাম। আর তখন ছাত্র রাজনীতির কর্মমুখরতা এই হলকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতো। দ্বিতীয়তঃ চারটি হলের নির্বাচিত ভি, পি, দের মধ্যে আমিই একটু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম। এ ছাড়া সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আমার সুপরিচিতিও এ ব্যাপারে কার্যকর ছিল বলে আমার মনে হয়।

প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে আরো কি একটা ঘটনা বাদ পড়ে গেছে যা আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে বলতে শুরু করেছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বলছি। ১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ। পূর্বেই নির্ধারিত ছিল এইদিন সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হবে। বিরতির সময় আমরা বেশ কয়েকজন সভাস্থলের দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি শেখ মুজিবুর রহমান কালো শেরওয়ানী এবং জিন্নাহ টুপী

পরিহিত অবস্থায় চেয়ারে সভাপতির আসনে বসে আছেন। আমি অবাক হয়ে যাই, কারণ ঐ সভাতে আমার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। শেখ মুজিবের সভাপতির আসন অধিকার করে থাকার কোন যুক্তিসংগত কারণই থাকতে পারে না। আর তৎকালীন পরিস্থিতিতে সে মর্যাদাও তাঁর ছিল না। কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে আমি এবং আমার সহসাথীরা কিছু বললাম না। এ সময়ের মধ্যে কাউকে কোন সুযোগ না দিয়ে শেখ মুজিব উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। যা নিরর্থক শ্লোগানসর্বস্ব বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারপর হঠাৎ করে বক্তৃতা থামিয়ে দিয়ে 'চলো চলো এ্যাসেম্বলী চলো' –বলে শ্লোগান দিয়ে ছাত্র সভার সকলকে মিছিল সহকারে পরিষদ ভবনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানান। যদিও সেদিন মিছিল বা বিক্ষোভের কোন কর্মসূচী ছিল না, তবুও আকস্মিকভাবে পরিস্থিতি এমন হলো যে, মিছিল বন্ধ করারও তখন কোন উপায় ছিল না। পরিশেষে মিছিল হলো এবং পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে সেদিনের অসংগঠিত মিছিল স্বাভাবিক পরিণতিতে ছত্রভঙ্গ হলো। সেদিন এই ঘটনার মাধ্যমে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে মুজিব ভাষা আন্দোলনের দুর্বার গতিকে হীন স্বার্থে কাজে লাগাতে তৎপর রয়েছেন। তোফাজ্জল আলী সাহেবের বাসার ঘটনার সাথে সেদিনের অনির্ধারিত মিছিলের একটা যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া গেল।

প্রশ্ন ঃ ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকার ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর যেসব সাক্ষাৎকার হয়েছিল সে সম্পর্কে বলুন না। কিভাবে এই সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়?

উত্তর ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট কায়েদে আযম ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। আমরা চার হলের ভি, পি, এবং জি, এস, সহ ১০ জন ছাত্র প্রতিনিধি এ সাক্ষাৎকারে মিলিত হই।

বেইলী রোডে চীফ সেক্রেটারীর বাসভবনে এ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। কায়েদে আযম আমাদের লক্ষ্য করে বলেন, "What can I do for you, gentlemen?"

আমরা জবাবে বলি, ' You please address a meeting of the students' তিনি আশ্বাসসূচক জবাব দেন। সামান্য আলোচনার পর বিদায় নিয়ে আমরা কক্ষ হতে বের হচ্ছি, এমন সময় গভর্ণর জেনারেলের মিলিটারী সেক্রেটারী অথবা তাঁর সংশ্লিষ্ট কেউ ইঙ্গিতে আমাদের থামালেন যে, কায়েদে আযম মুসলিম ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলতে চান। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে কয়েকজন বের হয়ে গেছে। আমরা আবার বসলাম। কায়েদে আযম বললেন, I wanted to meet with the representatives of the Muslim students.

আলোচনা হলো পূর্ব-পাকিস্তানে যে কয়টি মুসলিম ছাত্র প্রতিষ্ঠান আছে তাদের নিয়ে।

কায়েদে আযম জানালেন মুসলিম ছাত্রদের সবাইকে এক ছাত্র প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করা উচিত। তিনি বললেন, 'তোমরা সব এক হয়ে যাও।' এ নিয়ে সম্ভবতঃ পরের দিন বৈঠকের জন্য তারিখ স্থির হলো।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের কথায় আপনারা কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেন নি?

উত্তর ঃ ছাত্র সংগঠনের ঐক্যের প্রশ্নে আমি বিরোধী ছিলাম না। তাছাড়া কায়েদে আযমের কথায় দ্বিমত প্রকাশের অবকাশও ছিল না। কারণ তাঁর যে 'Imposing personality' ছিল তাতে তিনি সবাইকে শ্রোতা হিসেবেই রেখে দিতেন। তিনি বলেই যেতেন। আর আমরা প্রভাবিত শ্রোতার মতো শুনেই যেতাম। মাঝে মধ্যে আমাদের ছাত্রদের ভেতর বিতর্ক হতো। তখন তিনি শুধু শুনতেন এবং প্রয়োজনবোধে মন্তব্য করতেন।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের ছাত্রদের মাঝে কি নিয়ে বিতর্ক হতো?

উত্তর ঃ নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সম্পর্কে আপনাকে পূর্বেই বলেছি। শাহ আজিজুর রহমান চাইতেন, নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ---অর্থাৎ যে ছাত্র প্রতিষ্ঠানের তিনি জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন তা টিকে থাকুক।

এ নিয়ে কায়েদে আযমের সামনে কয়েকটা বৈঠকে আমাদের মাঝে বিতর্ক হয়। শাহ আজিজুর রহমান ও তাঁর সহসাথীরা আমাকে এবং আমার সহকর্মীদেরকে কায়েদে আযমের নিকট কমিউনিষ্ট হিসাবে প্রমাণ করতে চাইতেন এবং বলতেন আমরা নাকি কায়েদে আযম সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে থাকি।

এক বৈঠকে শাহ আজিজুর রহমান জাতির পিতা সম্পর্কে আমরা আপত্তিকর মন্তব্য করেছি বলে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে আমি কিছু বলতে উদ্যত হই। তখন কায়েদে আযম আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন– 'Your Quaid-e-Azam doesn't mind it' আসলে তিনি তো খুব উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাই যে কোন পরিস্থিতিকে শান্তভাবে 'ট্যাকল্' করতে পারতেন।

প্রশ্ন ঃ পরিশেষে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এক প্রতিষ্ঠান করার প্রশ্নে ঐকমত্য হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ কায়েদে আযমের সঙ্গে পরে আমাদের এক যুক্ত বৈঠকে আমরা যুক্তি দেখাই যে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যা বিভাগ পূর্বে All Bengal Muslim Students League –এরই রূপান্তর, তার কার্যকরী পরিষদের ৩১ জন সদস্যের মধ্যে ২৭ জনই তখন ছিল সরকারী কর্মচারী, সুতরাং সে সংগঠন টিকে থাকতে পারে না।

কায়েদে আযম একক সংগঠনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নামটিই বেছে নিলেন। তবে তার অর্থ এটা ছিল না যে আমাদের সংগঠনকেই তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই নামটি তাঁর পছন্দ হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ পরে কি এ নামেই সংগঠন দু'টো এক হয়েছিল?

উত্তর ঃ না, পরিশেষে তা আর হয়নি। যুক্ত বৈঠকের আলোচনায় সে সম্ভাবনা দেখা দিলেও পরবর্তী পর্যায়ে কায়েদে আযমের সাথে দুই গ্রুপের পৃথক বৈঠকগুলোতে সে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। শাহ্ আজিজুর রহমানের গ্রুপ তখন আমাদের সাথে ঐক্যের বিপক্ষে তৎপর ছিলেন। আমাদেরকে 'কমিউনিষ্ট' হিসাবে চিত্রিত করা সম্পর্কে আজিজুর রহমান গ্রুপের কথাবার্তা প্রথম দিকে কায়েদে আযম তেমন গায়ে মাখতেন না। কিন্তু পরে শাহ আজিজুর রহমান এবং তাঁর সহসাথীরা যখন এ সম্পর্কিত দৈনিক আজাদের কিছু কাটিং প্রমাণস্বরূপ কায়েদে আযমের সামনে পেশ করেন, তখন তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, আমরা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত। অবশ্য এ ব্যাপারে তখনকার দৈনিক আজাদের রিপোর্টও ভ্রান্ত ছিল না। কারণ ঠিক সে সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল তার পেছনে মূলতঃ কমিউনিষ্টরাই শক্তি হিসাবে কাজ করছিল। আমিও ঐ সম্মেলনে ডেলিগেট ছিলাম কিন্তু কি কারণে যেন আমি যেতে পারিনি। সে যাক, কায়েদে আযমের নিকট আজাদের কাটিং পেশ করার পর পরবর্তী পর্যায়ে একক সংগঠনের কাজে আর ফলপ্রসূ কিছু হয় নি।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের সাথে আপনাদের সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন দাবী বা প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, একদিন আমরা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত একটি মেমোরেণ্ডাম প্রদান করি। মেমোরেণ্ডামের কাগজটা হাতে নিয়ে কায়েদে আযম জিজ্ঞেস করেন, 'What is it? আমি জবাব দেই, " It's a Memorandum on State Language.We demand Bengali as one of the State Languages of Pakistan." কায়েদে আযম উত্তর দেন- ' There could not be more than one State Language.'আমি তখন একাধিক রাষ্ট্রভাষার উদাহরণ স্বরূপ কানাডা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করি। তিনি জবাব দেন- 'Your Quaid-e-Azam konws it well. You leave the matter with me'.

আলাপের এই পর্যায়ে মৃদু বিতর্ক হয়। এ সম্পর্কে কোথাও কোথাও অতিরঞ্জিতভাবে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এসব তথ্য ঠিক নয়। খুব রূক্ষভাবে কোন বিতর্ক হয়নি। ব্যাপার হচ্ছে কি, কায়েদে আযমের দৃষ্টির এমন একটা গভীরতা বা শক্তি ছিল যার মাধ্যমে অন্য কেউ কিছু বলার পূর্বেই ভাব দেখে তিনি বুঝে নিতেন এবং নিজের

'imposing personality' দিয়ে স্বীয় মতের দিকে বিপক্ষকে টেনে আনতেন।

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বাক্য বিনিময়ের পর আমার ধারণা হলো, তিনি যেন ভাবছেন– 'তোমরা ছেলে-পেলে মানুষ, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। তা আমার উপর ছেড়ে দাও।'

প্রশ্ন ঃ কার্জন হলে কায়েদে আযমের ভাষণ দানের সময় রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিপক্ষে কারা প্রতিবাদ করেছিলেন?

উত্তর ঃ সত্যিকারের ঘটনা হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেখানে কেউ প্রতিবাদ করেনি এবং তাতে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। এ প্রতিবাদ ছিল সম্মিলিত আওয়াজ বিশেষ। সেই সম্মিলিত প্রতিবাদে কে কোন দিক থেকে কণ্ঠ মিলিয়েছিল তা পৃথকভাবে চিহ্নিত করারও কোন প্রয়োজন নেই। কায়েদে আযম যে টাইপ করা বক্তৃতা পাঠ করছিলেন সম্ভবতঃ তার মাঝে উর্দুকে এক মাত্র রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কিত কোন কথা ছিল না। টাইপ করা বক্তৃতা পাঠকালে হঠাৎ কাগজখানা সরিয়ে উপস্থিত সমাবেশকে সম্বোধন করে তাঁর স্বভাবজাত দৃঢ়তায় বলে উঠেন 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ঠিক তখনই সম্মিলিত প্রতিবাদ ওঠে। তবে এই প্রতিবাদের ধ্বনির বিপক্ষেও সামনের শ্রোতাদের মধ্য হতে পাল্টা ধ্বনি ওঠে। যেহেতু কায়েদে আযমের বক্তৃতা রেকর্ড করা হচ্ছিল হয়তো সে জন্যই প্রতিবাদের ধ্বনিকে মুছে ফেলার জন্য পাল্টা ধ্বনি ওঠে।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের রেসকোর্সের জনসভায় প্রতিবাদ ওঠেছিল কি?

উত্তর ঃ না, সেখানে কোন প্রতিবাদ হয়নি। সে মিটিংয়ে লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছিল। কে কোথায় প্রতিবাদ করবে? আর প্রতিবাদ করার জন্য সংগঠিত পরিকল্পনা এবং পরিবেশও ছিল না।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলন পুনরায় কখন থেকে দুর্বার গতি লাভ করে?

উত্তর ঃ পুনরায় ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে, তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন যখন পল্টন ময়দানে ঘোষণা করেন, 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' তখন থেকে ভাষা আন্দোলন আবার দুর্বার গতি লাভ করে। নাজিমুদ্দীনের উক্তির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভা ও মিছিল হয়।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারী 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়। ইউনিভার্সিটির প্রত্যেক হল থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ছাত্রলীগের কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে এই কর্মপরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের অন্যতম সদস্যদের মধ্যে ছিলেনঃ জনাব আবুল হাশিম, জনাব আতাউর রহমান খান, মাওলানা ভাসানী, জনাব অলি আহাদ, জনাব

শামসুল হক, জনাব আবদুল মতিন, আমি এবং ছাত্রলীগের খালেক নেওয়াজ প্রমুখ।

এই কমিটিই সিদ্ধান্ত নেয় সভা শোভাযাত্রা এবং হরতালের মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসাবে পালন করা হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সফল করার জন্য তখন থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই মিছিল এবং ছোট ছোট সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

প্রশ্ন ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত ঘটনাগুলোর কথা বলুন না।

উত্তর ঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা হতেই ঢাকায় অব্যাহতভাবে ১৪৪ ধারা জারী হয়ে যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল আবার আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বাজেট অধিবেশনের দিন। এই সময় ১৪৪ ধারা সম্পর্কে আলোচনার জন্য জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ সদস্যই পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দেন। তাদের যুক্তি ছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হবে। কিন্তু ছাত্রদের মত ছিল, যে কোন পরিস্থিতিতে তারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জানায়। এ নিয়ে তখন সভায় মতভেদের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ১১-৪ ভোটে (মতান্তরে ১১-৫) ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমি যদিও ব্যক্তিগতভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছিলাম, কিন্তু তবুও তখন পার্টির (কম্যুনিষ্ট পার্টি) নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পার্টির নির্দেশ আসতে দেরী হচ্ছিল। আর এরই মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমি ভোটদানে বিরত থাকি। প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি তখন এমন হয়েছিল যে ভোটা-ভোটির কোন পরিবেশই ছিল না।

পরের দিন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারী বেলা এগারোটার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সকল স্কুল-কলেজের ছাত্রে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সাড়ে বারোটার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা আরম্ভ হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিষয় সমবেত ছাত্র-জনতার ওপর ছেড়ে দেন। এ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শুরু হয় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পালা। বিভিন্ন দিক থেকে শুরু হয় ছাত্র-পুলিশের লড়াই। সে লড়াইয়ের দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করার নয়, শুধু অনুভব করার।

প্রশ্ন ঃ গুলিবর্ষণের ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল কোথায়?

উত্তর ঃ বর্তমান মেডিকেল কলেজের প্রধান গেইটের নিকটবর্তী স্থানে। শহীদ মিনারের জন্য স্থানও প্রথমে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে পরিবর্তন করে বর্তমান স্থান নির্ধারণ করা হয়। গুলিবর্ষণের ঘটনা বর্তমান শহীদ মিনারের স্থানে ঘটেনি।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের অনেক ঐতিহাসিক সত্যই বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব প্রতিরোধ করা দরকার সত্যিকার উপকরণ আহরণ করে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ সত্যকে বিকৃত করা কোনক্রমেই উচিত নয়। ইতিহাস হবে নিরেট সত্যি। তার মাঝে আবেগ বা মিথ্যার কোন স্থান থাকতে পারবে না। একমাত্র সত্যিকার উপকরণ সংযোজন করেই এটা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আপনার সম্পর্ক হয় কিভাবে? তোফাজ্জল আলী সাহেবের বাসায় যাওয়া আসার সময় থেকেই কি?

উত্তর ঃ না, না, সেতো '৪৮ সালের কথা। সে এক সুদীর্ঘ কাহিনী। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম সাহেব যখন পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন, তখন আমি, তাজউদ্দীন, শামসুল হক (আওয়ামী লীগের এক কালের সেক্রেটারী) ও তাঁর ভাই নূরুল হক এবং সামসুদ্দীন আহমদ সহ [তিনি ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। এখন পাকিস্তান ফরিন এফেয়ার্সের ডাইরেক্টর জেনারেল] আমরা সবাই তখন মুসলিম লীগের হোল-টাইম কর্মী। তখন ১৫০, মোগলটুলীতে পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম লীগের একটা শাখা অফিস খোলা হয়। সে সময় থেকেই তাজউদ্দীনের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে।

এছাড়া তাজউদ্দীন পূর্বাপর কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যদিও তাজউদ্দীন বাহ্যতঃ আওয়ামী লীগ করতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সাথেই জড়িত ছিলেন। পার্টির সিদ্ধান্তেই তাঁকে আওয়ামী লীগে রাখা হয়।

একবার সম্ভবতঃ '৬২ সালের দিকে তিনি জেল থেকে বের হয়ে আমাদের বললেন 'আর ছদ্মনামে (অর্থাৎ আওয়ামী লীগে) কাজ করতে আমার ভাল লাগছে না। আমি নিজ পার্টিতেই (অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টিতে) কাজ করবো'। তখন কেউ কেউ মনে করলো, 'থাক না আমাদের একজন আওয়ামী লীগে আছে, সেখানেই কাজ করুক না'।

পরে অবশ্য পার্টিতে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল, কিন্তু তাজউদ্দীনকে প্রত্যক্ষভাবে পার্টিতে নেয়া হয়নি। আমার মতে সেটা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। তবে তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগে থেকেও আমাদের জন্য কাজ করেছেন। আওয়ামী লীগের সব তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছেন। ইণ্ডিয়াতে গিয়ে অসম-চুক্তি করার পরই তাঁর মাঝে একটা বিক্ষিপ্ত ভাব এসে যায়। এরপর তিনি কিছুটা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তবে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যখন আমরা তাঁকে তাঁবেদার সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনে করতাম, তখনও তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। [বারান্দার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে] প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একবার এ বারান্দায় বসে আমার সাথে আলাপ করে গেছেন। ভুল-শুদ্ধ যখন যা করেছেন সবই এসে আমাদের কাছে অকপটে বলেছেন।

প্রশ্ন ঃ বরকত সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সাহেব যে মন্তব্য করেছেন, সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ বরকতকে আমরা পূর্বাপর ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ হিসেবেই জানি। তবে অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেব পুলিশ অফিসারের নিকট হতে যে কথা শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, সে ধরনের কথা পূর্বে আমরাও শুনেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি বরকত সম্পর্কে কথাটা কার কাছে শুনেছেন?

উত্তর ঃ আমি মোজাফফর আহমদের কাছ থেকে (ন্যাপনেতা অধ্যাপক মোজাফফর) কথাটা শুনি। মোজাফফর তখন ওপরের কর্তৃপক্ষ মহলে আনাগোনা করতেন। সেখান থেকে শুনে এসে তিনিই প্রথম আমাকে কথাটা বলেন। কিন্তু আমরা তখন এতো টেনশানে ছিলাম যে, এ নিয়ে ভাববার ফুরসত ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, ভাষা আন্দোলনের যাঁরা সূত্রপাত করেছিলেন বা আপনারা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এর সাথে জড়িত ছিলেন তাঁদের কি কোন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনা ছিল?

উত্তর ঃ না, ভাষা আন্দোলনের পেছনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না। তবে আমরা যারা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, তারা প্রথম থেকেই পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন ভৌগলিক পরিবেশের কথা চিন্তা করে এই অঞ্চলে Sovereign State গড়ার কথা চিন্তা করতাম। এ নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে কমিউনিষ্ট সম্মেলনে যুক্তিভিত্তিক আলোচনাও হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
মার্চ, '৭৮

ডক্টর এ,এস,এম, নূরুল হক ভূঁইয়া

[ডক্টর এ, এস, এম, নূরুল হক ভূঁইয়া ভাষা-আন্দোলনের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৪৭ সালের ১লা অক্টোবরে গঠিত 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' তিনিই ছিলেন প্রথম আহ্বায়ক। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সাংস্কৃতিক সম্পাদক। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী নিয়ে যখন জনসমক্ষে মুখ খোলার উপায় ছিল না, তখন তিনি প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। যে ক'জন অগ্রসেনানী ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিকে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের সঙ্গে অনমনীয় মনোবল নিয়ে তৎপর ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন।

ডক্টর নূরুল হক ভূঁইয়া ১৯২৩ সালের ১লা মে, ঢাকা জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী শাহাবুদ্দিন ভূঁইয়া।

স্বীয় গ্রামেই জনাব নূরুল হক ভূঁইয়ার প্রাথমিক পড়াশুনা আরম্ভ হয়। পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মহাজনপুর হাইস্কুল হতে ডিস্টিংশন সহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪১ সালে জগন্নাথ কলেজ হতে তিনি আই, এস-সি, পাশ করেন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়নশাস্ত্রে বি, এস-সি (অনার্স) এবং ১৯৪৫ সালে এম, এস-সি পাশ করেন।

ডক্টর নূরুল হক ভূঁইয়া ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে এই বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান-এর পদ হতে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সাল হতে তিনি পুনরায় একই বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে কার্যরত আছেন।

তিনি ১৯৪৮ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশীপ ও ১৯৬০ সালে পাকিস্তান এটমিক এনার্জি কমিশনের ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিত হয়েও দেশাত্মবোধের প্রতি অনমনীয় মনোভাবের কারণে বিদেশী ডিগ্রীর প্রতি (অবশ্য শিক্ষা নয়) অনীহা প্রকাশ করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে তিনি ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনায়ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পাটের অগ্নিরোধক মিশ্রণ এবং দ্রুতবেগসম্পন্ন বিমান ও অন্যান্য ইঞ্জিনের প্রয়োগযোগ্য 'সলিড লো ব্রিকেন্ট' জাতীয় বিষয়াদি আবিষ্কার করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

জনাব নূরুল হক ভূঁইয়া ছাত্র জীবন হতেই রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে মহানভাষা আন্দোলন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটেরও একজন মেম্বার। এ ছাড়া তিনি অনেক স্কুল, কলেজ ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথেও বিভিন্নভাবে জড়িত রয়েছেন।

'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' প্রথম আহ্বায়ক ডক্টর নূরুল হক ভূঁইয়ার এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস রচনার জন্য অনেক মূল্যবান উপকরণ ও তথ্য জোগাবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কোন ঘটনার সূত্র ধরে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবী উত্থাপিত হয়? ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের পর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস গঠনের কি কারণ ছিল?

উত্তর ঃ কোন নির্দিষ্ট ঘটনার সূত্র ধরে নয়, বরং বলা যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় চাহিদার প্রয়োজনেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবী উত্থাপিত হয়েছিল। ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস গঠিত হলো আর ১৫ই সেপ্টেম্বর আবুল কাসেম সাহেবের সম্পাদনায় তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত প্রথম পুস্তিকা– 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। সুতরাং এতেই বোঝা যায়, পূর্ব থেকেই এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। নইলে ১৫ই সেপ্টেম্বর ভাষার দাবী শীর্ষক এই পুস্তিকা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তমদ্দুন মজলিস গঠনের কারণ জিজ্ঞেস করেছেন, সে সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার।

১৯৪৭ সালের ২৬ কি ২৭শে আগষ্ট সিদ্দিক বাজারের "লিলি কটেজে" (রাজী উদ্দীন ভূঁইয়ার বাসা) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘরোয়া আলোচনা সভার বিষয় ছিল– 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র-কাঠামো ও যুব সমাজের ভূমিকা।' এই আলোচনায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। ১. একদল পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো ও আদর্শ পুরোপুরিভাবে ইসলামিক হতে হবে বলে চরম বক্তব্য রাখেন। ২. আরেক দল পাকিস্তানের রাষ্ট্র-

কাঠামো ও আদর্শ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক করার দাবী তুলে ধরেন ৩. আমরা একদল মধ্যমপন্থী ছিলাম, এই দুই চরম মনোভাবের বিরোধী। আমাদের বক্তব্য ছিল খুবই উদারনৈতিক। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইসলামের মৌল আদর্শে উজ্জীবিত হবে, এই ছিল আমাদের বক্তব্য। ঘরোয়া আলোচনায় চরম মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অতি সত্বর একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্রভাবে অনুভব করি। অবশ্য এ সম্পর্কে পূর্বেই কিছু চিন্তা-ভাবনা হয়েছে।

বস্তুতঃ নিজেদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যই তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়।

প্রশ্ন ঃ লিলি কটেজের আলোচনা কি তবে তমদ্দুন মজলিস গঠন ত্বরান্বিত করে? তমদ্দুন মজলিসের প্রথম কর্মসূচী হিসেবে কি অন্তর্ভুক্ত হয়?

উত্তর ঃ একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা পূর্বেই চলছিল। তবে লিলি কটেজের আদর্শিক মতভেদ এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণে আমাদের আরো তৎপর করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীই প্রথমে তমদ্দুন মজলিসের প্রধান কর্মসূচী হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম সাহেবের কর্মতৎপরতা জাতির কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ '৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মজলিস গঠিত হওয়ার পর এর কর্মতৎপরতা নিশ্চয়ই খুব সীমিত ছিল? প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আপনারা যাঁদের সাথে আলোচনা করে সাড়া পেয়েছেন তাঁদের নাম বলুন না।

উত্তর ঃ একেবারে প্রথম দিকে তো রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হতে পারে এ ব্যাপারটি অনেকে বুঝতেই চান নি। এর গুরুত্বও অনুভব করেন নি। ইউনিভার্সিটির কয়েকজন সায়েন্সের অধ্যাপক ছাড়া এ ব্যাপারে কেউ এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। বাংলা ডিপার্টমেন্ট তো রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে চরম নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে। কোন বাংলার শিক্ষক এ ব্যাপারে তখন আগ্রহ পোষণ করে এগিয়ে আসেন নি। প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটি নিয়ে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আমাদের রীতিমত নাজেহাল হতে হয়েছে।

ক্যাম্পাসে যাঁদের সাথে ভাষা প্রশ্নে আলোচনা করে তখন সাড়া পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে ফজলুল হক হলের প্রভোষ্ট ডঃ মাহমুদ হোসেন (পরে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভি, সি, হন) অধ্যাপক রেআয়ৎ খাঁ অবাঙ্গালী ছিলেন। তিনি প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিরও (পরিষদ) সদস্য ছিলেন। রেআয়ৎ খাঁ ও ডঃ মাহমুদ হোসেন উভয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার মুখর সমর্থক ছিলেন। রেআয়ৎ খাঁ বলতেন, 'পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ সারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ন্যায্য এবং স্বাভাবিক।'

প্রশ্ন ঃ এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিপক্ষে সরকার এমন কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কি, যা আপনাদের বিক্ষুব্ধ করে?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ '৪৭-এর অক্টোবরে যখন মনি-অর্ডার ফরম, ডাক টিকেট এবং মুদ্রায় বাংলাকে বাদ দিয়ে একের পর এক উর্দু ইংরেজী ব্যবহার শুরু হলো, তখন আমরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। ফজলুর রহমানের আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব আমাদের আরো বিক্ষুব্ধ ও শংকিত করে তুললো।

সমর্থক কিছু ছাত্র ও মজলিস কর্মীরা ছাড়া কেউ তখন প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে তৎপর ছিলেন না। আমাদের ধারণা হলো, সহসা এ নিয়ে আন্দোলন সৃষ্টি না হলে বাংলাকে বাদ দিয়ে শুধু উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

প্রশ্ন ঃ এ সময় মজলিসের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে কোন সেমিনার বা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো কি? প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় কখন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হতো। সম্ভবতঃ অক্টোবরে মজলিসের উদ্যোগে ফজলুল হক হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে কাজী মোতাহার হোসেন, কবি জসিমউদ্দীন, মন্ত্রী হাবিবুল্লা বাহার, আবুল কাসেম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এই সভার পরপরই ভাষা আন্দোলনের জন্য আমাকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

প্রশ্ন ঃ করাচীতে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কখন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোন শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে তাতে যোগ দিয়েছিলেন কি? ভাষা প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা কি ছিল? শিক্ষা সম্মেলনে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ '৪৭-এর ৫ই ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনের শেষ দিন ছিল। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডক্টর মাহমুদ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কোন মন্ত্রী বা সম্মেলনের আর কোন প্রতিনিধি তাঁকে সমর্থন জোগায়নি। যেহেতু তিনি ছিলেন ইউ, পি-র লোক তাই তাঁকে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের আর কোন প্রতিনিধি এ ব্যাপারে কিছু বলছেন না, আপনি বাংলা ভাষা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? ডক্টর মাহমুদ হোসেন সম্মেলন শেষে ঢাকায় ফিরে এলে আমরা তাঁর কাছে এসব তথ্য জানতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ভাষা প্রশ্নে করাচীর শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এখানে কোন প্রতিবাদ হয় নি ?

উত্তর ঃ ভাষা প্রশ্নে শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম।

প্রতিবাদ সভা শেষে এক বিরাট মিছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে শ্লোগান তুলে কয়েকজন মন্ত্রী এবং (পূর্ব পাকিস্তানের) প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গমন করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী পেশ করে।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপনায় থেকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে কর্মতৎপর ছিলেন। এ জন্য সরকারের নিকট হতে কখনো কোন কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ আমার বাসা তখন মালিটোলায়। পুলিশের এক অফিসার নরসিংদি এক মিটিং-এ আমার বক্তব্য সম্পর্কে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসেন। প্রথমে পুলিশ অফিসার আমার কার্যকলাপকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে আখ্যায়িত করলেও পরে আমার বক্তব্য ও যুক্তি শুনে আমার কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। একদিন আমি কার্জন হলের ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হচ্ছি, এমন সময় আই, বি-র একজন অফিসার এসে বললেন রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা রয়েছে। আমি বললাম, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করিনি। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে সে ধরনের গ্রেফতারী পরওয়ানা থাকতে পারে না। ভাষা আন্দোলনের তৎপরতার প্রশ্ন এলে তাঁকে বললাম, সে হচ্ছে সরকারের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। এই সরকার আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়। আলোচনার পর আই, বি, অফিসার ভাষা আন্দোলনের যথার্থতা অনুধাবন করে ফিরে যান। তখনকার মত আর কোন সরকারী জিজ্ঞাসাবাদ বা কৈফিয়ৎ প্রদর্শনের সম্মুখীন হতে হয়নি।

প্রশ্ন ঃ '৪৭-এর ডিসেম্বরে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল কি?

উত্তর ঃ ১২ই ডিসেম্বর পলাশী ব্যারাকে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী কেরানীদের মধ্যে গোলযোগ ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে পলাশী ব্যারাক ও আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গুণ্ডাদের হামলা ও গুলিবর্ষণ হয়। ফলে ২০ জন আহত এবং ২ জন হাসপাতালে মারা যায়। প্রতিবাদে ১৩ই ডিসেম্বর সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীদের ধর্মঘট পালিত হয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য ঢাকা শহরে ১৫ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম দিকে আপনাদের উল্লেখযোগ্য তৎপরতা কি ছিল?

উত্তর ঃ ইউনিভার্সিটির হলে হলে রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে 'ক্যাম্পেইন', কর্মীদের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজনের সাথে মিশে রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী করা,

পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে জনগণের কি লাভ হবে সে সম্পর্কে বুঝানো, লিফলেট ও পুস্তিকা বিতরণ এ সবই ছিল রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রাথমিক তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে প্রচারণা চালাতে গিয়ে পুরোনো ঢাকায় কি ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

উত্তর ঃ পুরোনো ঢাকায় প্রচারণা চালাতে গিয়ে অনেক কর্মী নাজেহাল হয়েছেন। অনেকে বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। একবার প্রচারণা চালাতে গিয়ে সিদ্দিক বাজারে মজলিস কর্মী সিদ্দিক উল্লাহ গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হন। অধ্যাপক এ, কে, এম, আহসান, নাজির আহমদ সহ ভাষা আন্দোলনের আরো অনেক নেতা ও কর্মী বিভিন্ন সময়ে গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন।

পুরোনো ঢাকা ছাড়াও ঢাকার অন্যান্য স্থানে শিক্ষিত লোকদের নিকট হতে দুঃখজনকভাবে বিরূপ ব্যবহার পাওয়া গেছে। কিন্তু সব জায়গায় এমনটি ঘটে নি।

প্রশ্ন ঃ ভাষা সম্পর্কিত মজলিসের কাগজপত্র, পোষ্টার, বুকলেট ইত্যাদি কোথায় ছাপানো হতো?

উত্তর ঃ পুরোনো ঢাকার বলিয়াদি প্রেসে মজলিসের কাগজপত্র, লিফলেট প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদি ছাপানো হতো।

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিসের অফিস আক্রান্ত হয় কবে?

উত্তর ঃ '৪৮-এর জানুয়ারীতে পুরোনো ঢাকার ভাষা আন্দোলনের বিরোধীরা রশীদ বিল্ডিংস্থ তমদ্দুন মজলিস অফিস আক্রমণ করে তছনছ করে দেয়। তখন সাময়িকভাবে মজলিস অফিস ফজলুল হক হলে স্থানান্তরিত হয়।

প্রশ্ন ঃ তা হলে '৪৮ সালের প্রথম দিকেও রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে জনমন প্রতিকূল ছিল? তখন রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে জনমনে অনুকূল সাড়া সৃষ্টির জন্য পত্রিকার মাধ্যমে কোন উদ্যোগ নেয়া হতো কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জনমন তখনও প্রতিকূল ছিল। তবে ছাত্রদের মধ্যে অনুকূল সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে জনগণের ব্যাপক সাড়া পাওয়ার জন্য সংবাদপত্রে আবেদন জানিয়ে বিবৃতি দেয়া হতো। এই ধরনের একটি বিবৃতি ১৯৪৮ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেয়া হয়েছিল।

আলাপের এই পর্যায়ে জনাব নূরুল হক ভূঁইয়া ১৯৪৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিবৃতিটি ১৯৫৩ সালের ২০শে মার্চ সৈনিকে পুনর্মুদ্রিত অবস্থায় দেখান। সৈনিকে ভাষা আন্দোলনের দলিল হিসেবে উক্ত বিবৃতিটি হুবহু পুনর্মুদ্রিত হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীদের নাম উক্ত দলিল অনুসারে দেয়া

হলো ঃ

অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া (প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির কনভেনার ও তমদ্দুন মজলিস কর্মী), অধ্যাপক এম, এ, কাসেম (ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা), অধ্যাপক রেআয়ৎ খাঁ (ঢাকা ইউনিভার্সিটি), অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম (ঢাকা ইউনিভার্সিটি), আজিজ আহমদ, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (তখনকার সাপ্তাহিক ইনসাফের সম্পাদক), এম, আবুল খায়ের (ছাত্র) নঈমুদ্দীন আহমদ (ছাত্র, এখন এডভোকেট) অলি আহাদ (ছাত্র) এবং আরো কয়েকজন।

বিবৃতির অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ "আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি, তাহারা যেন বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য আগাইয়া আসেন। আমাদের মাতৃভাষাকে কোণঠাসা করার জন্য যে একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলিতেছে তার বিরুদ্ধে আমাদের এখন হইতে তৎপর হওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এখানের সংবাদপত্র ও শিক্ষিত সমাজ এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত বলিয়া মনে হয় না। আমরা এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের মনে রাখা উচিত, দেশব্যাপী এ আন্দোলন গড়িয়া তোলা ছাড়া বাংলা ভাষা যথাযোগ্য স্থান পাইবে না। আরও একটি বিষয়ে আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের হিতাকাঙ্ক্ষীদের সহানুভূতি কামনা করিতেছি। সমস্ত প্রদেশব্যাপী আন্দোলন করিতে হইলে আমাদের অনেক অর্থের দরকার। বাংলা ভাষার প্রচার করিতে গিয়া ইতিপূর্বেই তমদ্দুন মজলিসের অনেক আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় পরিষদ একটি বাংলা ভাষা প্রচার তহবিল খুলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই ফাণ্ডে দান করিবার জন্য আমরা সকলের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বিভিন্ন পত্রিকায় চাঁদা প্রাপ্তির হিসাব ও চাঁদা দাতার নাম প্রকাশ করা হইবে।

অধ্যাপক এম, এ, কাসেম
ট্রেজারার, "বাংলাভাষা প্রচার তহবিল"
১৯, আজিমপুর, ঢাকা।

প্রশ্ন ঃ '৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আর কি ঘটনা ঘটে?

উত্তর ঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে গণপরিষদের বৈঠক বসে। গণপরিষদে ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ধীরেন দত্ত গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের দাবী জানান। তিনি সুস্পষ্টভাবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করারও প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু সে দাবী ও প্রস্তাব গণপরিষদে অগ্রাহ্য হয়।

প্রশ্ন ঃ গণপরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

উত্তর ঃ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে গণপরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানাই। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের এই প্রথম ধর্মঘট সফল হয়। ঐ দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক কাসেম সাহেবের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয। সভায় নঈমুদ্দীন প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়ার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে অনুরোধ জানান।

প্রশ্ন ঃ পরবর্তী পর্যায়ে কি কর্মসূচী নেয়া হয়? সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগেই কি সে কর্মসূচী নেয়া হয়?

উত্তর ঃ পরবর্তী কর্মসূচী নেয়ার পূর্বেই ২৮শে ফেব্রুয়ারী আমি ছুটি গ্রহণ করি। আমার ছুটি গ্রহণের পর এস, এম, হলের তমদ্দুন মজলিস কর্মী শাসসুল আলম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন।

২রা মার্চ ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিভিন্ন হল প্রতিনিধি এবং ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও রাজনৈতিক কর্মী সমন্বয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত ও সম্প্রাসারিত করা হয়। শামসুল আলমকেই এই পুনর্গঠিত সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়। এই পরিষদই ১১ই মার্চের কর্মসূচী প্রণয়ন করে।

প্রশ্ন ঃ '৪৮-এর এই ১১ই মার্চের প্রধান কর্মসূচী কি ছিল?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ ৫ই কি ৬ই মার্চ সংগ্রাম পরিষদের বিশেষ এক বৈঠকে গণপরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১১ই মার্চ প্রদেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে সভা, শোভাযাত্রাও ১১ই মার্চের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কর্মসূচী পুরোপুরিভাবে সফল হয়। প্রদেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল এবং ছাত্রদের পিকেটিং-এ ঢাকা শহর বিক্ষোভের নগরীতে পরিণত হয়। ৬০/৬৫ জনের মত গ্রেফতার হয়। পিকেটিং করার সময় অনেকে আহত হয়। গ্রেফতার ও সরকারের পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ১২, ১৩ ও ১৪ই মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৪ই মার্চ ফজলুল হক হলে এক কর্মী সভায় ১৫ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালনের তারিখ স্থির হয়।

প্রশ্ন ঃ ১৫ই মার্চ কি সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়?

উত্তর ঃ না, এর পূর্বে অর্থাৎ ১৪ই মার্চ সন্ধ্যার দিকে খাজা নাজিমুদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ১৫ই মার্চ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার পূর্বে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ (ভূট্টোর কেবিনেটে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন) উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে শর্ত আরোপ

করেন। সে অনুযায়ী তিনি উপস্থিত ছিলেন না। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী খাজা নসরুল্লাহ আলোচনায় অংশ নেন। দুই দফা আলোচনার পর নাজিমুদ্দীনের সাথে সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। খসড়া চুক্তিটি ১১ই মার্চে গ্রেফতারকৃত শামসুল হক, শওকত আলী, অলি আহাদ, শেখ মুজিব, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ ছাত্রনেতাদের জেলের অভ্যন্তরে দেখানো হয়। আবুল কাসেম সাহেব পরে চুক্তিটি বর্তমান শহীদ মিনারের সামনে সমবেত ছাত্রদের পড়ে শুনান। ছাত্রদের মধ্যে তখন চরম বিশৃংখলা ও অসংগঠিত ভাব বিরাজ করছিল।

প্রশ্ন ঃ চুক্তির পর গ্রেফতারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দ মুক্তি পান নি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ঐ দিন সন্ধ্যায় দু'একজন ছাড়া অধিকাংশ ছাত্র ও সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ মুক্তি লাভ করেন।

প্রশ্ন ঃ চুক্তির পর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রতিবাদ সভা বা বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ ১৬ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ছাত্রসভার পর অনির্দ্ধারিতভাবেই পরিষদের সামনে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের ফলে বিক্ষোভ মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১৭ তারিখেও এর জের চলে।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযম কত তারিখে ঢাকা আসেন? তাঁর আগমনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ছাত্রদের কোন বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী ছিল কি?

উত্তর ঃ ১৯শে মার্চ কায়েদে আযম ঢাকা আগমন করেন। না, বিক্ষোভ প্রদর্শনের কোন কর্মসূচী ছিল না। ১৯ নম্বর, আজিমপুরে মজলিস অফিসে মজলিস কর্মী ও ছাত্রদের এক ঘরোয়া আলোচনা বৈঠকে কায়েদে আযম রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বিরূপ মন্তব্য করলে প্রতিবাদ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ঃ কত তারিখে রেসকোর্সে কায়েদে আযমের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়? আপনি জনসভায় উপস্থিত ছিলেন? সেখানে কোন প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ ২১শে মার্চ রেসকোর্সে কায়েদে আযমের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। হ্যাঁ, আমি জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানে ৮/১০ জনকে আমি 'নো, নো' বলে প্রতিবাদ করতে দেখেছি। তাঁরা মজলিস কর্মীদের একাংশ। ওরা নো, নো, করে উঠলে জনসভার শ্রোতারা তাদের বসিয়ে দেয়। কয়েকজনকে পুলিশ তাড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন ঃ জনসভায় প্রতিবাদ উঠার প্রশ্নে কেউ বলেছেন, কোন প্রতিবাদ হয়নি। কেউ বলেছেন, প্রতিবাদ উঠেছে। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ বিশাল জনসভা। সংগঠিতভাবে প্রতিবাদের কর্মসূচীও ছিল না, সে অবস্থাও ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে যে কয়েকজন প্রতিবাদ করেছে অনেকে তাদের ধ্বনি শুনেন নি। আর বিশাল জনসভায় তা শোনারও কথা নয়। এইজন্য একেক জন একেক রকম বলেছেন।

প্রশ্ন ঃ কার্জন হলের কনভোকেশন সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? সেখানে প্রতিবাদ হয়েছিল কি? কারা প্রতিবাদ করেছিল, তাঁদে নাম বলুন না?

উত্তর ঃ এটা ছিল বিশেষ কনভোকেশন সভা। সভাকক্ষের অর্ধেকেরও বেশী ছিল নিমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। আমাদের শিক্ষকদের সারিও ছিল বেশ পেছনে। আমি কনভোকেশন সভার কক্ষে প্রবেশের পূর্বেই লক্ষ্য করেছি হলের ওপরে দোতলায় বেশ কয়েকজন ছাত্র পায়চারী করছে। আমাকে দেখেই তারা বললো– 'স্যার, আল্লাহ যাই করে, এখানেও যদি কায়েদে আযম শুধু উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলে, তাহলে আমরা প্রতিবাদ করবো'। আসলে ওরাই ওপর থেকে 'নো, নো' করে প্রতিবাদ ধ্বনি উঠিয়েছিল। নীচে কাউকে আমি 'নো, নো' বলতে দেখিনি। দু'বার 'নো, নো' ধ্বনি উঠেছিল। প্রথমবার হয়তো নীচ থেকে কেউ কণ্ঠ মিলিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার শুধু ওপর থেকেই 'নো, নো,' ধ্বনি এসেছে। নীচ থেকে কেউ এই ধ্বনি উচ্চারণ করেনি। প্রতিবাদ ধ্বনি ওঠার পর শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন ওঠে এদিক-ওদিক খুঁজতে থাকে, কারা ধ্বনি উঠিয়েছে, তা বের করার জন্য। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি।

প্রশ্ন ঃ গুলিবর্ষণের সময় আপনি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছিলেন কি?

উত্তর ঃ কার্জন হলের পূর্ব দিকের গেইটে আমরা ক'জন শিক্ষক এবং ছাত্র দাঁড়ানো ছিলাম। তখন জিমনেসিয়াম মাঠের এখনকার দেয়াল বা প্রতিবন্ধকতা কিছুই ছিল না। সবকিছু এদিক থেকে দৃশ্যমান হতো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো কাঁদানে গ্যাসের যন্ত্রণায় ছেলেরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো। পুলিশের সাথে সংঘর্ষের পর ছেলেরা দিব্যি এদিকেও ছুটে আসছিল। এক রিকশাওয়ালা এসে প্রথম আমাদের গুলিবর্ষণে নিহত হওয়ার খবর দেয়।

প্রশ্ন ঃ '৪৭–'৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ এবং '৫২ সালের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কি পার্থক্য আপনার চোখে পড়ে?

উত্তর ঃ ১৯৪৭-৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সূচনা ও ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে অসামান্য এবং সুদূর প্রসারী সাফল্য অর্জিত হয়। যা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এতদিন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। '৪৭-৪৮ আন্দোলনের অধ্যায় এবং বায়ান্নর অধ্যায় এর একটা তুলনামূলক বিবরণ সামনে রেখে আমরা ভাষা আন্দোলনের দুটি অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি।

১৯৪৭-৪৮ সালের ঘটনা প্রবাহ

১. '৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেম-এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাতকারী সাংস্কৃতিক সংগঠন 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়।

২. '৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত– "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?"– নামে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ।

৩. রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য প্রথম মেমোরেণ্ডাম তৈরী করে স্বাক্ষরতা অভিযান চালানো হয় এবং তা সরকারের কাছে পেশ করা হয়। কলিকাতার 'ইত্তেহাদ' ও ঢাকার সাপ্তাহিক "ইনসাফ" পত্রিকায় সে মেমোরেণ্ডামের দাবীর সমর্থনে সংবাদ প্রকাশ।

৪. '৪৭-এর ১লা অক্টোবর অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত এবং সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর স্বপক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।

৫. ৫ই নভেম্বর পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ।

৬. পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সিলেবাস হতে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে "ইত্তেহাদ" পত্রিকায় অধ্যাপক আবুল কাসেমের কড়া বিবৃতি ও জনাব আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদকীয় প্রকাশ।

৭. '৪৭-এর ১৭ই নভেম্বর তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট পূর্ব-পাকিস্তানের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনীতিক, শিক্ষক, ছাত্র এবং সরকারী কর্মকর্তা সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের স্বাক্ষরযুক্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ।

৮. ১২ই নভেম্বরে (আজাদের রিপোর্ট অনুযায়ী) তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে সাহিত্য-সভা।

৯. শুধুমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশ এবং প্রস্তাব গ্রহণের প্রতিবাদে '৪৭-এর ৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সভা।

১০. ৭ই ডিসেম্বর পূর্ব-পাকিস্তান সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সলিমুল্লাহ হলে অনুষ্ঠিত শিক্ষাবিদ ও ছাত্রদের বিরাট সভায় মাওলানা আকরাম খাঁ ঘোষণা করেন 'উর্দুকে বাংলার (পূর্ব-পাকিস্তানের) রাষ্ট্রভাষা করার জবরদস্তি বাংলার

মুসলমান সহ্য করবে না।

১১. ১২ই ডিসেম্বর পলাশী ব্যারাকে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী কেরানীদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে গোলযোগ। বাংলা ভাষা বিরোধীদের পলাশী ব্যারাক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আক্রমণ। প্রতিবাদে এক বিরাট মিছিল সেক্রেটারিয়েটে মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে মন্ত্রী আবদুল হামিদ ও সৈয়দ আফজালের সমর্থন আদায় করে।

১২. ১৩ই ডিসেম্বর সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা পূর্ণ হরতাল পালন করেন। সেদিন থেকেই ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৩. '৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

১৪. গণপরিষদের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ছাত্রসভা। তমদ্দুন মজলিসের ডাকে 'প্রতিবাদ-দিবস' ও ধর্মঘট পালন। সে দিনই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপে বহু ছাত্র আহত এবং কিছু ছাত্র গ্রেফতার। বিক্ষোভ ও গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীগণ তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে আসেন।

১৫. ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালনের কর্মসূচী গ্রহণ।

১৬. ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিলে ঢাকা শহর প্রকম্পিত। পুলিশের লাঠি চার্জের ফলে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সহ শতাধিক আহত। ৬৯ জন গ্রেফতার।

১৭. ১২ থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ঢাকা ও অন্যত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়।

১৮. ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেবের ৮ দফা ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯. ঐ দিন ছাত্র-জনতার এক বিরাট মিছিল জগন্নাথ হলে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের সভার দিকে পুলিশের ব্যারিকেড ভেদ করে অগ্রসর হয় ও পরে চুক্তির কথা জানতে পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

২০. ২৪শে মার্চ কার্জন হলে কনভোকেশন সভায় জিন্নাহ সাহেবের রাষ্ট্রভাষা 'উর্দু হবে' বক্তব্যের প্রতিবাদে 'নো, নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

এরপর ১৯৪৯ হতে ৫১ সাল পর্যন্ত ১১ই মার্চ দিনটি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। বস্তুতঃ নাজিমউদ্দীন সাহেব চুক্তির ৩নং দফায় পরবর্তী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় "বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপনের" অঙ্গীকার করায় ভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

এই চুক্তিতে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে গ্রেফতারকৃত সকলকে মুক্তিদান এবং আমাদের সকল দাবী মেনে নেওয়ায় ছাত্র-জনসাধারণ অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বস্তুতঃ এ ছিল এক অনন্য বিজয়। এ ব্যাপারে তৎকালীন কলকাতার আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে আন্দোলনের সফলতার প্রমাণ মিলে। তিনি লিখেছিলেনঃ "যে বিরাট শক্তি ও দুর্জয় বিরোধিতার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীগণ যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"

এবার ১৯৪৭-৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে ১৯৫২ সনের আন্দোলনের তুলনা করা যাক–

'৫২-তে ২৬শে জানুয়ারী নাজিমুদ্দীন সাহেব পল্টন ময়দানে আবার ঘোষণা করলেন যে, উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, এরপর–

১. বার লাইব্রেরীতে ৩০শে জানুয়ারী সর্বদলীয় সম্মেলনে পুনরায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং কাজী গোলাম মাহবুব এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। এই সভায় '২১শে ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ দিবস' পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. ৪ঠা ফেব্রুয়ারী '৫২ স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা হয়। ৩. ১২ই ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস পালন করা হয়। ৪. ১৯শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী হয়। সেই দিন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পরদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয় ও পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। এ গুলি বর্ষণে সেদিন ও পরের দিন রফিক, বরকত, জব্বার ও সালামসহ কয়েকটি অমূল্য প্রাণ শাহাদাৎ বরণ করে। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে দেখা যায় সরকার নির্মম পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪/৫ দিনের মধ্যে আন্দোলনের গতি রুদ্ধ করে দেয়।

উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ১৯৪৭-৪৮ সনের ৬-৭ মাসের আন্দোলনের ইতিহাস কত ঘটনাবহুল এবং কি বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। অন্যদিকে, ১৯৫২ সনের আন্দোলনে শুধু '২১শে ফেব্রুয়ারী ছাড়া বিরাট আন্দোলনমুখর

বা ঘটনাবহুল দিন নেই। ঐদিন ছাত্র-জনতার বিক্ষুব্ধ মনোভাব যা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে ও পরে শহীদের রক্তে বিস্ফোরণ ঘটে। কাজেই আসল আন্দোলন ছিল ১৯৪৭-৪৮ সনে এবং তাই-ই পরিণতি পায় ১৯৫২ সনের কয়েকদিনের আন্দোলন ও ২১শে ফেব্রুয়ারীর বিস্ফোরণের মাধ্যমে। বায়ান্নর আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে এ নিরেট সত্যি কথাগুলো বলা যায়। বড়ই দুঃখজনক যে, ইতিহাসে ১৯৪৭-৪৮ সালের আন্দোলনের গুরুত্বকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। বাংলা একাডেমীর সংকলনে আন্দোলনের সময় যাঁরা তখন 'স্কুলের ছাত্র' ছিলেন তাঁদের জবানীতে এবং আন্দোলনের সঙ্গে নামমাত্র জড়িত লোকদের দিয়ে স্মৃতিচারণ করিয়ে মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে সে দিনের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য নিয়ে সঠিক ইতিহাস রচনা আজো সম্ভব বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ঃ এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ আপনাদের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। এর মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ
নভেম্বর, ১৯৭৮
নভেম্বর, ১৯৮৬

কামরুদ্দীন আহমদ

[জনাব কামরুদ্দীন আহমদ '৪৮ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। '৪৮ সালের ১১ই মার্চের আন্দোলনের পর ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে নাজিমুদ্দীন সরকারের সাত দফা দাবী সম্বলিত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তিনিই ছিলেন তার নেপথ্য রূপকার।

বস্তুতঃ সে চুক্তিই প্রথম শাসনতান্ত্রিক পন্থায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বীকৃতি এনে দেয়। '৫২ সালের আন্দোলনও সরকার কর্তৃক সে চুক্তিভঙ্গের ফলশ্রুতি।

জনাব কামরুদ্দীন ১৯১৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার ষোলঘর-এ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জছির উদ্দিন ছিলেন বরখা তালুকের জমিদার।

জনাব কামরুদ্দীনের পড়াশুনা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আরমানীটোলা স্কুলে সম্পন্ন হয়। এরপর বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিক এবং বি, এম, কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে আই, এ, পাশ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৩৪ সালে অনার্স এবং '৩৫ সালে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে ল' পাশ করেন। কিছুকাল তিনি আরমানীটোলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনাব কামরুদ্দীন তখনকার ঢাকা বিভাগের জেলাসমূহের মুসলিম লীগের নির্বাচন অফিসের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৫৪ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৫৭ সালেই তিনি কূটনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। এ বছর কোলকাতায় ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বার্মায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। পরে একই সাথে ক্যাম্বোডিয়ারও রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে অবসর নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সুপ্রাচীন ORR. Dignam and Co-র সিনিয়র পার্টনার ছিলেন। এছাড়া তিনি আরো বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ছিলেন।

জনাব কামরুদ্দীন বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। আত্মপ্রচার বিমুখ, বিনয়ী, সদালাপী কামরুদ্দীন ভাষা আন্দোলনেরও অনেক ঘটনা অতি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অনেক দুর্লভ তথ্য ও উপকরণ জোগাবে বলে আমরা আশা করি। জনাব কামরুদ্দীন আহমদ ১৯৮১ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন।]

প্রশ্ন ঃ আপনি 'রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে' তমদ্দুন মজলিসের '৪৮ সালের তৎপরতাগুলির সাথে জড়িত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ আমি প্রত্যক্ষভাবে মজলিসের কর্মী বা নেতা কিছুই ছিলাম না। তবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মজলিসের উদ্যোগে যে সব সেমিনার এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো তাতে প্রায়ই যোগ দিতাম। আবুল কাসেম সাহেব প্রায় প্রতিটি আলোচনা সভার পূর্বেই দাওয়াত করতেন। তাঁরই অনুরোধে কোন কোন সভায় সভাপতিত্বও করতে হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা ডাইজেস্টে প্রকাশিত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিশেষ সাক্ষাৎকারগুলি পড়েছেন কি? এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এ পর্যন্ত প্রকাশিত সব সাক্ষাৎকারই পড়েছি। যাঁদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাঁরা সবাই ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ঘটনার সঠিক তথ্যই এসেছে। তবে সবগুলি সাক্ষাৎকার পড়ে আমার যা ধারণা হয়েছে তাই আমি বলছি। অনেক নাম ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক বাদ পড়েছে। তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কিছু নাম গুরুত্বের সাথে এসেছে, এর বিপরীতটিও ঘটেছে। কারো কারো সম্পর্কে কোন মন্তব্য যথাযথ হয়নি। এটা ঠিক ঢাকা ডাইজেস্টের ব্যাপার নয়, যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের দায়িত্ব।

যেমন মোহাম্মদ তোয়াহা সাক্ষাৎকারের এক স্থানে বলেছেন, কোলকাতা থেকে এসে যে সব ছাত্ররা Stray ঘোরাফেরা করতো শেখ মুজিব ছিলেন সে সব ছাত্রদের নেতা। ঢাকায় তাদের কোন পরিচিতি ছিল না। কথাটা সত্যি নয়। এভাবে বলা ঠিক হয়নি।

১৯৪৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ১৫০, মোগলটুলী মুসলিম লীগের অফিস ও ওয়ার্কার্স ক্যাম্প উদ্বোধনের পর এর পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। কোলকাতা থেকে

আগত মুসলিম লীগের সব ছাত্রকর্মী ও নেতার প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল ১৫০, মোগলটুলী। সুতরাং কোলকাতা হ'তে আগত ছাত্রদের ঢাকায় পূর্ব পরিচিতি ছিল না, এ কথা ঠিক নয়। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের দায়িত্বের কারণে স্বাভাবিকভাবে শেখ মুজিব সহ এখানে আগত সব ছাত্রকর্মী ও নেতার লোকাল গার্জিয়ান ছিলাম আমি। শামসুল হক, সামসুদ্দীন (পরবর্তীকালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের ডাইরেক্টর জেনারেল), মোঃ শওকত আলী, তাজউদ্দীন ছিলেন মোগলটুলী ক্যাম্পের 'হোল টাইমার'।

প্রশ্ন ঃ '৪৮ এর ১১ই মার্চের আন্দোলন সম্পর্কে কবে এবং কোথায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়?

উত্তর ঃ '৪৮ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী আদায়ের জন্য একটি নতুন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পিপলস ফ্রিডম লীগের দু'জন, তমদ্দুন মজলিসের দু'জন, মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে দুজন এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক হল হতে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে এই সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। শামসুল আলম এ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। কিন্তু ৭ই মার্চ সে বাড়ী যাওয়াতে আমাকে আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করতে হয়।*

৭ই মার্চ ফজলুল হক হলে সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১১ই মার্চের আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী গৃহীত হয়। ১১ই মার্চ প্রদেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্ররা ঢাকার রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে এবং শতাধিক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ১২, ১৩ ও ১৪ই মার্চও আন্দোলনের জের চলে। রাষ্ট্রভাষার দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ঃ নাজিমুদ্দীন সরকারের সাথে সংগ্রাম পরিষদের রাষ্ট্রভাষার ৭ দফা দাবী সম্বলিত

---

* রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর 'বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে বিবরণ দিয়েছেন – '৪৮ সালের "মার্চ মাসের ২রা তারিখে প্রফেসর আবুল কাসেম সাহেব আমাকে খবর দিলেন যে, সেদিন ফজলুল হক হলে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও কোর্ট-কাচারীর ভাষা কিভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা হবে আমি যেন সে সভায় যোগদান করি। আমি বিকেলে সেখানে গিয়ে দেখলাম বেশ কিছু সংখ্যক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী উপস্থিত হয়েছেন। সভায় আমাকে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তারপরে সভার কাজ আরম্ভ হয়। একটি নতুন সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা এবং শিক্ষার বাহন বা কোর্ট-কাচারীতে বাংলা ভাষা ব্যবহার-এর দাবী না করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের জন্যে দাবী করাই যুক্তিসঙ্গত বলে স্থির করা হ'ল। নতুন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ দু'জন গণ-আজাদী লীগ থেকে, দু'জন গণতান্ত্রিক যুবলীগ থেকে, দু'জন তমদ্দুন মজলিস থেকে আর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম হল হ'তে চারজন এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে দু'জন প্রতিনিধি ছাড়াও "ইনসাফ", "জিন্দেগী" ও "দেশের দাবীর" পক্ষ থেকে তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে ঐ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সে দাবীগুলি কি ছিল এবং তা কিভাবে স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর ঃ ১৫ই মার্চ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে চীফ মিনিষ্টার খাজা নাজিমুদ্দীনের দু'জন প্রতিনিধি হিসেবে মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) এবং পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী খাজা নসরুল্লাহ আমার জিন্দাবাহার লেনের বাসায় গমন করেন এবং সংগ্রাম পরিষদের সাথে একটা মীমাংসায় আসতে সরকারের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। আমাকে তাঁরা মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানান। আমি ফজলুল হক হলে এসে সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করে নাজিমুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। যাওয়ার সময় এ কথাও বলে যাই যে, মীমাংসার সম্ভাবনা থাকলে আমি ফজলুল হক হলে ১২টার মধ্যে ফিরে আসবো, নতুবা আসবো না। আমি ১২ টার মধ্যেই ফিরে আসলাম। সম্ভাব্য যে সব দাবীর ভিত্তিতে চুক্তি হতে পারে সেগুলির খসড়া দেখলাম। আলাপ-আলোচনার পর পরিশেষে ৭ দফা দাবী সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র তৈরী হলো।

দাবীগুলি ছিল ঃ

(১) পূর্ব বঙ্গ পরিষদের চলতি অধিবেশনে বাংলাকে পূর্ব বঙ্গের সরকারী ভাষা এবং সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাব পাশ করতে হবে।

(২) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত প্রাদেশিক পরিষদের গৃহীত একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হবে।

(৩) আন্দোলন চলাকালে গ্রেপ্তারকৃত সকল রাজবন্দীর মুক্তি দিতে হবে। আন্দোলনকে সমর্থনদানকারী পূর্ব বঙ্গ এবং কোলকাতা হতে প্রকাশিত সকল পত্রিকার ওপর হতে 'ব্যান' প্রত্যাহার করতে হবে।

(৪) পুলিশ এবং দায়িত্বে নিয়োজিত কমাণ্ডিং অফিসারের সকল নির্যাতনমূলক

অন্য একটি প্রস্তাবে ৭ই মার্চ ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট ও ১১ই মার্চ বাংলার প্রতিটি স্থানে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। অনেক আলোচনার পর দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরিষদ সদস্য ও হিন্দুদের কোন প্রতিনিধি সংগ্রাম পরিষদে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটাতে অনেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫২ সনে যেটা সম্ভব ছিল সেটা ১৯৪৮ সনে সম্ভব ছিল না। যে কোন আন্দোলনে ট্যাক্টিক্সের প্রশ্নটা সর্বপ্রথম বিবেচ্য। আন্দোলন ধাপে ধাপে এগোয় এবং যে কোন আন্দোলন করার পূর্বে জনগণের মানসিকতার কথা ভুলে গেলে আন্দোলনে সফলতা লাভ হয় না– বরঞ্চ আন্দোলনের উপর যে আঘাত আসে তাতে অন্তত সাময়িকভাবে প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সংগ্রাম পরিষদ অনেকগুলো সাব-কমিটি করে দেন এবং সেখানে সকলের সাহায্যই নিতে বলা হয়েছিল। সংগ্রাম পরিষদের সকল প্রতিনিধিদের সভা আবার ১০ই মার্চ বসে এবং সেখানে মোটামুটিভাবে কি করা হয়েছে– এবং পরের দিন কি করা হবে তা স্থির করা হয়। এটা স্থির হয় যে, অফিস-আদালতেও পিকেটিং চালাতে হবে। ...."

কার্যকলাপের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

(৫) সরকারীভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, এ আন্দোলন গভীর দেশপ্রেমে উজ্জীবিত। এ সম্পর্কে চীফ মিনিষ্টারকে ঢাকা বেতার থেকে তাঁর ভাষণে বলতে হবে।

(৬) আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলের ওপর হতে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

(৭) চীফ মিনিষ্টারকে, 'আন্দোলনকারীরা কমিউনিষ্ট, শত্রু, দেশের এজেন্ট' এসব পূর্বে কথিত মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

এ ছাড়া মোঃ তোয়াহার দাবীতে চীফ মিনিষ্টার খাজা নাজিমুদ্দীনকে আরেকটি দফা নিজ হাতে লিখে দিতে হয়। তোয়াহা বলেন, আপনি গতকাল বলেছিলেন যে, বিক্ষোভ ও আন্দোলনকারীরা বর্ডার অতিক্রম করে এসেছে। তারা রাষ্ট্রবিরোধী কমিউনিষ্ট। আপনার বলতে হবে এগুলি আপনি ভুল বলেছেন। তোয়াহার জোর পীড়াপীড়ির ফলে নাজিমুদ্দীনকে সে ধরনের বক্তব্যের একটা অনুচ্ছেদও নিজ হাতে লিখে দিতে হয়।

আলোচনার সময় খাজা নাজিমুদ্দীন চীফ সেক্রেটারীকে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিরা তাতে রাজী হয়নি। পরিশেষে সব দাবীই মেনে নেওয়া হয়। চীফ মিনিষ্টার খাজা নাজিমুদ্দীন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।[১] সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে আমি চুক্তিতে স্বাক্ষর করি। যতদূর মনে পড়ে সাড়ে বারোটায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।★★

প্রশ্ন ঃ আলোচনায় কারা ছিলেন?

★★ কামরুদ্দীন আহমদ এ প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন– '৪৮ সালের "১৪ (মার্চ) তারিখে অনেক রাতে (আমি বাসায়) ফিরে আসি। সুতরাং সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠেই শুনি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ও খাজা নসরুল্লাহ্ আমার স্যাঁতস্যাঁতে চেম্বারে বসে আছেন ভোর থেকেই। আমি নীচে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তাঁরা খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের দূত হিসেবে এসেছেন একটা মিটমাট করার জন্যে। কারণ জিন্নাহ্ সাহেব আসবেন ১৯ তারিখে। তার পূর্বেই তিনি মোটামুটিভাবে একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান। আমি বললাম যে, আমি ফজলুল হক হলে যাচ্ছি নেতারা যাঁরা বাইরে আছেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করি– যদি মিটমাট সম্ভব হয় তবে বারোটার পূর্বেই আমরা খাজা সাহেবের বাড়ী যাব আর যদি না যাই তবে যেন বুঝে নেন যে, নেতারা মিটমাটের বিরুদ্ধে। আমি তাঁদের বিদায় করে আমার ছোট টাইপ-রাইটার নিয়ে বসে দাবীগুলি লিখে ফেললাম। তারপর গোসল করে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ফজলুল হক হলে তোহা সাহেবের ঘরে তাজুদ্দীন সাহেবকে পেলাম– একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়া হ'ল কাসেম সাহেবকে ডাকতে ও সংগ্রাম পরিষদের যাঁদের পাওয়া যায় তাঁদের খবর দিতে। যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই এলেন। তখন আমি নাজিমুদ্দীন সাহেবের মিটমাটের ইচ্ছের কথা বললাম– এবং মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে কি কি কথাবার্তা হয়েছে তাও বললাম। কাসেম সাহেব বললেন যে,

উত্তর ঃ আমি, তোয়াহা, তাজউদ্দিন, আবুল কাসেম, আরো দু'একজন থাকতে পারে। আমার মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন ঃ চুক্তি স্বাক্ষরের পর আপনারা কখন জেলে ছাত্র নেতাদের কাছে গেলেন?

উত্তর ঃ চুক্তি স্বাক্ষরের পরই আমরা জেলে যাই। প্রথম আমাদের ভেতরে যেতে দেয়া হয়নি। তখন আমি জেলারের অফিস থেকে চীফ মিনিষ্টারের পি,এ, বাকের সাহেবের সাথে আলাপ করি। তিনি জেলারের সাথে আলাপ করেন। এরপর আমাদের ভেতরে যেতে দেয়া হয়। আমি ও আবুল কাসেম সাহেব ভেতরে যাই। আমাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে শওকত আলী মনে করে আমরা গ্রেফতার হয়েছি। তাই "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগান দিয়ে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে। শওকত আমাদেরকে ওদের কারাকক্ষে নিয়ে যায়। আমি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা চেপে গিয়ে বলি এসব দাবীর ভিত্তিতে যদি তোমরা রাজী হও তবে চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে। মৃদু আলোচনা-সমালোচনার পর শেখ মুজিব সহ সবাই চুক্তি সম্পাদন করতে রাজী হলো যার যার লক্ষ্য অনুযায়ী। সবার তখন আশু লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি। আমি আরো বললাম চুক্তি স্বাক্ষর হবে, তবে এটাও লিখে দিয়ে আসবো না যে আমরা আর আন্দোলন করবো না। একথা শুনে তখন সবাই হৈ হৈ করে সমর্থন জানালো। সে দিনই সূর্যাস্তের পূর্বে সব রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পেলো।

প্রশ্ন ঃ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে একথা গোপন রেখেছিলেন কেন?

আমরা আন্দোলনের জন্যেই আন্দোলন করছি না– আমরা আমাদের দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আলাপ করতে রাজী আছি। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কথাও তা– একমাত্র তোহা সাহেব বললেন, আন্দোলন ক্রমাগতই জোরদার হচ্ছে– এমনি সময় আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলে কর্মীদের উপর সুবিচার করা হবে না– কারণ আন্দোলন এখন কেবল ঢাকায় সীমাবদ্ধ নয়– সব মফঃস্বল শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-মুন্সিগঞ্জের কর্মীরা সেদিন আসবে। অনেক আলোচনার পর দাবী-দাওয়ার উপর যে ড্রাফ্‌ট করেছিলাম সেটা উপস্থিত করি। এবার তোহা সাহেব ও তাজুদ্দীন সাহেব রাজী হলেন অবশ্য কিছু রদবদল করে। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল অতসব দাবী সরকার মেনে নেবে না– সুতরাং ফয়সালাও হবে না। মাঝখান থেকে নাজিমুদ্দীন সাহেব আর বলতে পারবেন না যে, আমরা পাকিস্তান ভাংগার জন্যে এবং যুক্ত বাংলার জন্যে আন্দোলন করছিলাম।

আমরা বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে বর্ধমান হাউসে গেলাম। নাজিমুদ্দীন সাহেবের সেক্রেটারী এস.এন. বাকের, আই.সি.এস. আমাদের তাঁর ঘরে নিয়ে বসালেন এবং খাজা সাহেবকে খবর দিলেন। খাজা সাহেব নীচে নেমে এলে আমরা তাঁর ঘরে গেলাম। খাজা সাহেব কিছুক্ষণ ভূমিকা করে বললেন যে, তিনি বাংলার বিরুদ্ধে না। তিনি জিন্নাহ্ সাহেবকে বাংলা ভাষার জন্যে যে তাঁর দরদ আছে তা জানাবেন। আমরা বললাম, আমাদের দাবীগুলো যদি তিনি মেনে নেন তবে আমরা আন্দোলন বন্ধ করতে রাজী আছি– তবে তা কার্যকরী হবে যদি যাঁরা আজ বাংলা ভাষার জন্যে ঢাকা জেলে বন্দী হয়ে আছেন তাঁদের মত হয়। খাজা সাহেবের কাছে

উত্তর ঃ চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে একথা শুনে ওরা ক্ষেপে গিয়ে বলবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে আমাদের মতামত নেওয়ার কি প্রয়োজন। এ আশংকায় আমি চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেছে এ কথা গোপন রেখেছিলাম। জেলখানা হতে ফেরার পথে রাষ্ট্রভাষার দাবীর শ্লোগানে মিছিল এগিয়ে আসতে দেখি। সে মিছিলের লোকজনসহ আমরা শহীদ মিনারের কাছে আসি। সেখানে কাসেম সাহেব বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে চুক্তির বিষয়সমূহ পাঠ করে শুনান। কিছু বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন আমরা আন্দোলনের স্বার্থে আন্দোলন করি না। আমরা যা দাবী করেছিলাম তা মানা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ এরপর কি ঘটলো ?

উত্তর ঃ চুক্তি ও মুক্তির কাজ সমাধা করে আমি ১৬ই মার্চ সিরাজগঞ্জ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ভাষণ দেওয়ার জন্য যাই। ১৭ই মার্চ আমি ঢাকায় ফিরে আসি। ১৮ই মার্চ শুনি চুক্তি কেউ মানছে না। না সরকার পক্ষ, না সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ। উভয় পক্ষই পরস্পরের ওপর দোষারূপ করছে। নাজিমুদ্দীন সাহেব জানালেন শেখ মুজিব সহ তাদের গ্রুপ চুক্তি লংঘন করে পরিষদ ঘেরাও করেছে। এমন কি তোফাজ্জল আলী MLA এবং ডঃ মালিক MLA কে মারধর করেছে। আমি এ ব্যাপারে সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানালেন সরকারও চুক্তি মানছে না। তারা মানলে আমরা মানবো। পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠনের পরিবর্তে সরকার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ

আমাদের দাবীগুলো উপস্থিত করা হলে– তাঁর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তিনি বললেন, এসব দাবী মেনে নিলে পাকিস্তান থাকবে না। আমরাও বললাম, দাবীগুলো যদি আপনি না মেনে নেন তবে আমরা বিদায় হই। তিনি আমাদের বসিয়ে রেখে বাকেরের ঘরে গিয়ে আজিজ আহ্‌মেদের সঙ্গে টেলিফোনে দাবীর কথা বলে তাঁকে আসতে বললেন। আজিজ আহ্‌মেদ বোধ হয় রাজী হননি। আবার আমাদের চা খাওয়াতে বলে তিনি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, বলে গেলেন– দশ মিনিটের মধ্যে তিনি ফিরবেন। আমরা বুঝলাম চীফ্ মিনিষ্টার চীফ্ সেক্রেটারীর বাড়ী যাচ্ছেন। মিনিট পনেরো পরে তিনি এলেন– এবং বললেন যে, তিনটি ব্যাপারে তাঁর আপত্তি আছে। একটি হচ্ছে– সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে, তবে যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তাদের ছাড়া যাবে না। দ্বিতীয়, পুলিশের বিরুদ্ধে কমিশন না বসিয়ে তাদের বিরুদ্ধে "ডিপার্টমেন্টাল ইন্‌কোয়ারী" করা হবে আর যেসব কলকাতার খবরের কাগজ পাকিস্তান-বিরোধী সেগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে না। আমরা বললাম আমাদের দাবী নিম্নতম–এর মধ্যে কোন রদবদল হবে না। তিনি যেন মনে হল রাজী হবেন চুক্তিপত্র সই করতে। তখন তোহা সাহেব বললেন যে, চুক্তিপত্রে যা লেখা আছে তাছাড়াও তাঁকে লিখে দিতে হবে যে, তিনি দেশবাসীর নিকট যেসব অসত্য বিবৃতি দিয়েছিলেন তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তোহা সাহেব আলোচনা ভেঙ্গে দেবার জন্যে শেষ বাণ নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু খাজা সাহেব তখন ভেঙ্গে পড়েছেন–সুতরাং তাও মেনে নিলেন।[১]

দিয়েছেন। তোয়াহা ও তাজউদ্দীন পরিষদ ঘেরাও, MLA তোফাজ্জল আলী ও ডঃ মালিককে মারধর করার জন্য শেখ মুজিবকে দায়ী করেন। তাঁরা জানালেন রাষ্ট্র-ভাষার দাবী আদায়ের চেয়ে পার্লামেন্টারী রাজনীতির উপদলীয় কোন্দলের সুযোগ গ্রহণেই শেখ মুজিব বেশী আগ্রহী।

সত্যিকারে ব্যাপারটা ছিল তাই। রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়ে যারা আন্দোলন করতে চেয়েছিল তারাও দাবী আদায়ের জন্য একটা আইনগত চুক্তির ভিত্তি পেয়েছে। নাজিমুদ্দীন সরকারও জিন্নাহ সাহেবের আগমনের প্রাক্কালে চুক্তির মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করার সুযোগ লাভ করেছেন। কিন্তু শেখ মুজিব কিছুই পায়নি। তার উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের সুযোগে নাজিমুদ্দীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে উপদলীয় কোন্দলের সুযোগে সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপকে ক্ষমতায় আনার ব্যবস্থা করা। সে ব্যবস্থা তখনও হয়নি বলে পরিষদ ঘেরাও করে চলছে। তোফাজ্জল আলী ও ডঃ মালিককে মারধর করার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ সাজানো যা নাজিমুদ্দীনও আঁচ করতে পারেন নি। তাই তিনিও মারধর খাওয়া তোফাজ্জল আলী ও ডঃ মালিকের পক্ষেই মুজিবকে দায়ী করে বক্তব্য রেখেছেন। তোফাজ্জল আলী ও ডঃ মালিক উভয়ের সাথে শেখ মুজিবের নেপথ্য দহরম মহরম ছিল। তাঁরা সাজানো মার খেয়ে চেয়েছিলেন নাজিমুদ্দীনের সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে। অপর দিকে নাজিমুদ্দীনের পতন ঘটিয়ে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে। এই হলো '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনা প্রবাহের এক অধ্যায়।

চুক্তিপত্রে আমি ও খাজা সাহেব সই করলাম। পূর্বের কথা মত আমরা জেলখানায় গেলাম। জেলার বললেন, আপনাদের ভেতরে যেতে দেয়া হবে না– এক একজন করে ডেকে দেব কারণ এটা জেল-গাইডে বারণ করা রয়েছে। আমি জেলারের ঘর থেকে খাজা সাহেবকে টেলিফোন করলাম, ধরলেন এস.এন. বাকের। তাঁকে বললাম যে, জেলার যা বলছেন তাতে চুক্তি বাতিল করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। বাকের গেলেন মুখ্য মন্ত্রীকে খবর দিতে– কিছুক্ষণ পরে বাকের আমাকে টেলিফোন জেলারকে দিতে বললেন– আমি জেলারের হাতে "রিসিভার" দিলাম। কিছুক্ষণ কি কথা হ'ল। তারপর জেলার বললেন– আপনারা ভেতরে যেতে পারেন এ বলে সুবেদারকে পাঠালেন আমাদের দোতলায় নিয়ে যেতে। এদিকে আমাকে ঢুকতে দেখে শওকত আলী সাহেব ভেবেছেন আমাকে বুঝি পুলিশ গ্রেফতার করে এনেছে– তাঁর কি স্ফূর্তি–আমার কাছে এসেই শ্লোগান দিলেন–"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। ভারি ভাল লাগল। দোতালায় গিয়ে দেখলাম সবাই সেখানে আছেন। ছোটোখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম– তারপর চুক্তির কথা বললাম তাঁরা রাজী হলেন। আমরা খাজা সাহেবকে জানিয়ে দিলাম। সব ঠিক আছে– তবে রাজবন্দীদের তক্ষুণি ছেড়ে না দিলে সেদিনের বিক্ষোভ থামানো যাবে না। খাজা সাহেব বললেন তখনই ছেড়ে দেয়া হবে। প্রফেসর আবুল কাসেম বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে এসে চেষ্টা করতে লাগলেন বিক্ষোভকারীদের ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।"

প্রশ্ন ঃ বায়ান্ন সালের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের ২০শে ফেব্রুয়ারীর বৈঠকে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? সে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। আবুল হাশিম সাহেবের সভাপতিত্বে সে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ অভিমত ছিল শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন করা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা। তাই সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অলি আহাদ প্রতিবাদ করে বলেন, এ প্রস্তাব আমরা মানতে পারি না, এ সিদ্ধান্ত ছাত্ররা মানবে না। আবুল হাশিম সাহেব তখন রাগতস্বরে বলেন, এ প্রস্তাব যদি মানা না হয় তবে আরেকটি প্রস্তাব নেওয়া হউক, যে কেউ এ প্রস্তাব লংঘন করলে স্বাভাবিকভাবে সংগ্রাম পরিষদ ভেঙ্গে যাবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে বৈঠকে কোন বিতর্ক ছিল না।

প্রশ্ন ঃ বৈঠকে অলি আহাদ সাহেব ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সোচ্চার হলেন অথচ কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশের প্রতীক্ষায় নাকি তোয়াহা সাহেব ভোট দানে বিরত রইলেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ কমিউনিষ্ট পার্টির যুবকেরা একদিকে, দাদারা অন্যদিকে ছিলেন। নইলে দু'রকম ভূমিকা হবে কেন।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে কমিউনিষ্ট পার্টির সামগ্রিক ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর ঃ কমিউনিষ্ট পার্টি দাবী আদায় বা মীমাংসার চেয়ে আন্দোলন জিইয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিল বেশী। উত্তেজনা আর বিক্ষোভের পরিবেশকে টিকিয়ে রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এদেশে প্রতিটি আন্দোলনেই তাদের এ ভূমিকা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

প্রশ্ন ঃ সে সময়কার সংবাদপত্রে কার্যরত বামপন্থী আন্দোলনের সাথে জড়িত কিছু সাংবাদিকের নাম বলতে পারেন কি?

উত্তর ঃ সে সময় পত্রিকায় কার্যরত অনেক বামপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী সাংবাদিক ছিলেন। কে, জি, মোস্তফা (সংবাদ), মতিন (পাকিস্তান অবজারভার), জামাল জাহেদী (অবজারভার)। জামাল জাহেদীর পুরানা পল্টনের একটি পুরোনো ছাড়া বাড়ীতে মিটিং

---

১ সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে জনাব কামরুদ্দীন আহ্মদের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার কথা সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ তিনি সরকার ও সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই স্বাক্ষর করতে পারেন। সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব শামসুল আলম সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে চুক্তিপত্রে তিনিই স্বাক্ষর করেছিলেন। – গ্রন্থকার

করার সময় অলি আহাদ, তোয়াহা সহ বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হন।

প্রশ্ন ঃ '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কিছু পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ আমার চোখে যে মূল পার্থক্যটি ধরা পড়েছে, তা হলো '৪৮ সালের আন্দোলন তৎকালীন সরকারকে রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। অথচ রক্ত দিয়েও '৫২ সালে সরকারকে টলানো যায়নি। ভাষার দাবী আদায়ের ব্যাপারে দাবী উঠাবার নৈতিক বল যতটুকু এসেছিল তা ১৫ই মার্চের চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ চুক্তি লংঘিত হয়েছিল বলেই '৫২ সালের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। ১৫ই মার্চে চুক্তি সম্পাদিত না হলে চুক্তি লংঘনের প্রশ্ন আসতো না। '৫২ সালের আন্দোলন মূলতঃ ২১, ২২, ২৩ এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। এরপর পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার এটাকে তছনছ করে দেয়। আজো ভাববার বিষয়– ভাষার দাবী কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

প্রশ্ন ঃ সাক্ষাৎকারে দু'একটি তথ্যগত ভুলের কথা বলেছেন, সেগুলি কি?

উত্তর ঃ কয়েকজন ইউনিভার্সিটি গেইটে সিটি এস.পি. মাসুদ মাহমুদের অবস্থানের কথা বলেছেন। কিন্তু মাসুদ মাহমুদ ছিলেন পরিষদের গেইটের দায়িত্বে। ইউনিভার্সিটি গেইটে ছিলেন ইদ্রীস সাহেব।

প্রশ্ন ঃ ডাইজেস্টের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সত্যিকার ইতিহাসের সন্ধান মিলবে কি?

উত্তর ঃ নিরপেক্ষভাবে সবাই প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দিলে সত্যিকার ইতিহাসের সন্ধান না পাওয়ার কোন কারণ নেই। এ ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী সবাইকে নিজস্ব পরিসীমার মধ্যে সত্যি ঘটনা প্রকাশ করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
জুন, ১৯৭৯

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী

[বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৪৮ সালের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলিতে ভাষা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি '৪৮ সালে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

'৪৮ সালের মার্চে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে ছাত্র ঐক্য স্থাপনের জন্য তাঁর সঙ্গে ছাত্র নেতৃবৃন্দের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সে বৈঠকে জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দেন। উক্ত বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে ছাত্রদের পক্ষ হতে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিও গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপিত হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

'৪৮ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে তাঁকে ২৭শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের পক্ষ হতে রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দাবী সম্বলিত যে ঐতিহাসিক মেমোরেণ্ডাম প্রদান করা হয়, তা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তৎকালীন তুখোড় ইংরেজী জানা ছাত্রনেতা আবদুর রহমান চৌধুরীর ওপর। তিনি সে দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করেন। বস্তুতঃ সে মেমোরেণ্ডাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক দাবীর একটি ঐতিহাসিক দলিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের পক্ষ হতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সহ পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক দাবীর এই ঐতিহাসিক মেমোরেণ্ডামটি তৎকালীন ডাকসু-র জি.এস. জনাব গোলাম আযম (অধ্যাপক

গোলাম আযম) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাশিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত লিয়াকত আলী খানের ছাত্র-জনসভায় স্বতঃস্ফূর্ত করতালি মুখর পরিবেশে পাঠ করেন এবং তাঁকে প্রদান করেন। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে এ সব দাবীর ভিত্তিতেই জাতীয়তাবাদী ও স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ১৯২৬ সালের ১লা ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মরহুম আলহাজ্ব খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী। প্রাক্তন জমিদার জনাব আবদুল লতিফ চৌধুরী 'কাউন্সিল অব ষ্টেট্স অব ইণ্ডিয়া' এবং 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের' অন্যতম সদস্য ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার এক জমিদার পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী ছিলেন গণমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

জনাব চৌধুরী ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুল থেকে জুনিয়র কেম্ব্রিজ এবং ১৯৪২ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ষ্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য 'ডি' সিল্‌ভা স্বর্ণপদক লাভ করেন।

এরপর তিনি কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে আই,এ, এবং ১৯৪৬ সালে বি,এ, পাশ করেন। ১৯৪৭ সালের শেষভাগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শাস্ত্রে এম,এ-তে ভর্তি হন এবং এম,এ, ডিগ্রী লাভ করেন।

জনাব আবদুর রহমান চৌধুরীর ছাত্র এবং কর্মজীবন অনন্য সফলতায় উজ্জ্বল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র ইউনিয়নের ১৯৪৮-৪৯ সেশনে ভি,পি, ছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার ছাত্র-যুব সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাত্র-যুব প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি বাংলায় ভাষণ দেন। কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এটাই প্রথম বাংলায় ভাষণ হিসাবে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনেও জনাব চৌধুরী উজ্জ্বল কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর রাখেন। '৪৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 'ডিবেটিং টিম' ঢাকা সফরে এলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিবেটিং দলের' নেতৃত্ব দেন।

জনাব চৌধুরী ১৯৫৫ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন এবং '৫৮ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন।

তিনি ১৯৬৬-৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী এবং ১৯৬৯ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৮ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত 'অল পাকিস্তান বার এসোসিয়েশানের' নির্বাচিত সেক্রেটারী জেনারেল পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৯৬৬ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে'ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের' নির্বাচিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদেও বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৮৫ সালে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব-আইন সম্মেলনে' তিনিই ছিলেন বাংলাদেশ হতে একমাত্র আমন্ত্রিত 'জুরিস্ট'। এই সম্মেলনের একটি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৮৬ সালের জুনে আমেরিকায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলনেও ভাষণ দানের জন্য তিনিই ছিলেন বাংলাদেশ হতে একমাত্র আমন্ত্রিত 'জুরিস্ট'। এই সম্মেলনেও একটি অধিবেশনে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব চৌধুরী 'ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস এণ্ড ল' এ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ' এবং 'শেরে বাংলা জাতীয় একাডেমী'র সভাপতি। তিনি 'সুপ্রিম কোর্ট কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টেরও' প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। 'বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি', 'জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি', 'বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির' আজীবন সদস্য হিসেবেও তিনি মানবিক কাজে তৎপর রয়েছেন।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবনে খুবই বিনয়ী ও সদালাপী, তিনি ভাষা আন্দোলনের সাক্ষাৎকার সিরিজের খুবই প্রশংসা করেন। তিনি এ সম্পর্কে ইতিহাসের উপকরণ সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং গভীর আগ্রহের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।]

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এডমিশন' নেন? ছাত্র জীবনে আপনি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ সঠিক তারিখ মনে নেই। কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে '৪৬ সালে গ্রাজুয়েশন নেওয়ার পর সম্ভবতঃ '৪৭ সালের শেষ ভাগে অথবা '৪৮ সালের প্রথম ভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এডমিশন নেই।

আমরা পাকিস্তান আন্দোলনে যুবকর্মী ছিলাম। '৪৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দিল্লী সম্মেলনে আমি কাউন্সিলর হিসেবে যোগদান করি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকায় চলে এলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হই। এর জন্য রক্ষণশীল এবং কমিউনিস্ট উভয়ের সাথেই আমাদের লড়াই করতে হয়েছিল। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর আদর্শিক কারণেই আমি কোন দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত হইনি। বলতে গেলে তখন থেকেই আমার রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি।

প্রশ্ন ঃ '৪৮ সালের ১১ই মার্চের আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে '৪৮ সালের আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। সত্যি বলতে কি ১১ই মার্চের আন্দোলন না হলে '৫২-এর আন্দোলন হতো না। '৪৮-এর ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষার যে দাবী নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়, '৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে তা পূর্ণতা পায়।

প্রশ্ন ঃ ১১ই মার্চের আন্দোলন কোন দলীয় বা একক সংগঠনের সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি ছিল

কি? আন্দোলনের জন্য এ তারিখটি নির্ধারণের পেছনে কোন বিশেষ কারণ ছিল কি? এ আন্দোলন সৃষ্টির তাৎক্ষণিক কারণগুলি কি ছিল?

উত্তর ঃ ১১ই মার্চের আন্দোলন কোন দলীয় বা একক সংগঠনের সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি ছিল না। এ আন্দোলন ছিল সমগ্র ছাত্রসমাজ এবং রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রামরত অগ্রপথিকদের সংগ্রামী সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি। ১১ই মার্চে আন্দোলনের ফলেই প্রমাণ হয় এ দাবী জনগণের দাবী।

আন্দোলনের জন্য তারিখটি স্বাভাবিকভাবেই স্থির করা হয়। এর জন্য বিশেষ কোন কারণ ছিল না। বাংলা ভাষার প্রতি তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ বৈরীতা এবং অবহেলা, করাচীতে অনুষ্ঠিত আইন পরিষদে ধীরেন দত্তকে বাংলায় বক্তৃতা প্রদান করতে না দেয়া প্রভৃতি এ আন্দোলন সৃষ্টির তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন হলে থাকতেন? আপনার কক্ষে কোন রাজনৈতিক বৈঠক বসতো কি? সরকার বিরোধী রাজনীতি তখন হলে বা ক্যাম্পাসে কেমন চলতো?

উত্তর ঃ আমি এস.এম. হলে থাকতাম। যতদূর মনে পড়ে আমার রুম নাম্বার ছিল ১৫৬। আমাদের তখনকার ক্যাম্পাসের রাজনীতি মূলতঃ ছাত্রদের সমস্যার সাথেই বেশী সংশ্লিষ্ট ছিল। ক্যাম্পাসে সরকারের গণ-বিরোধী রাজনীতির ব্যাপক সমালোচনা চলতো। এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার তৎপরতা চলতো। তবে তখনকার পরিবেশই ছিল আলাদা। আমার মনে পড়ে একবার নাজিমুদ্দীন সাহেব এস.এম. হল পরিদর্শনে এলেন। ছাত্ররা হলের সমস্যা এবং ছাত্রদের কিছু অভিযোগ সম্পর্কে নাজিমুদ্দীন সাহেবের কাছে বলার জন্য আমাকে অনুরোধ করলে আমি (সেখানে উপস্থিত) তোয়াহা সাহেবকে দিয়ে বলালে ভাল হবে বলে ছাত্রদের বলি। তোয়াহা সাহেব ছাত্রদের পক্ষ থেকে নাজিমুদ্দীন সাহেবের নিকট অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে বলেন।

'৪৮ এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে এস. এম. হল প্রাঙ্গণে বিরোধী দলের উদ্যোগে এক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মাওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, মিয়া আরিফ ইফতেখার উদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সম্ভবতঃ এটাই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর ক্যাম্পাসে বিরোধী দলের প্রথম মিটিং। আমাকে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি তখন এস.এম. হলের ভি.পি. ছিলেন? আপনার সভাপতিত্ব করার কারণ কি ছিল?

উত্তর ঃ না, আমি তখনও ভি.পি. নির্বাচিত হইনি। তখন ভি.পি. ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আমি ভি.পি. নির্বাচিত হই '৪৯ সালের গোড়ার দিকে। তখনকার

পরিস্থিতিতে ছাত্ররা আমাকে সভাপতিত্ব করার জন্য যোগ্য মনে করেছিলেন বলেই তাঁদের অনুরোধে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কি তখন রাজনীতি হতে দূরে ছিলেন?

উত্তর ঃ আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি তখন সি.এস.এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাই হয়তো তিনি সভা-সমিতি এবং আন্দোলন থেকে সে সময়কার জন্য নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুব সম্মেলনে প্রতিনিধি মনোনীত হয়েও যান নি। পরে সত্যিই তিনি সি.এস.এস. পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করে ইনকামট্যাক্স অফিসার হিসেবে কিছুকাল কর্মরত ছিলেন। কিছুদিন কাজ করে পরে ছেড়ে দেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার সঙ্গে হল সংসদে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ?

উত্তর ঃ আমাদের প্যানেলে আমি ভি.পি. এবং জহুরুল কাইয়ুম জি.এস. এর জন্য, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্র গ্রুপের পক্ষে এনায়েত করিম (প্রাক্তন পররাষ্ট্র সেক্রেটারী) ভি.পি. এর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ভি.পি. প্রার্থী আরো ছিলেন জিয়াউর রহমান (কুমিল্লার এডভোকেট) এবং আরো অনেকে। সবার নাম মনে পড়ছে না। পাকিস্তান হওয়ার পর এটা প্রথম হল সংসদের নির্বাচন। আমরাই নির্বাচিত হই।

প্রশ্ন ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুব সম্মেলনের কথা বলেছেন। এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন কে? কারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলে ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করি। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, শামসুল হক, শহিদুল্লাহ কায়সার, মনসুর হাবিব এবং লিলি খান। কোলকাতায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই যুব সম্মেলনে আমি বাংলায় বক্তৃতা করি। সম্ভবতঃ এটাই আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রথম বাংলা বক্তৃতা।

প্রশ্ন ঃ এই সম্মেলন নাকি কমিউনিষ্ট প্রভাবিত ছিল? প্রতিনিধি দলে যারা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই নাকি কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ প্রতিনিধি দলের অনেকে প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু কেউ কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন বলে কোনদিন প্রকাশ করেন নি। তবে এই সম্মেলন কমিউনিষ্ট প্রভাবিত বলে অনেকে তখন অভিযোগ করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে কায়েদে আযম ঢাকা সফরে এলে ছাত্র প্রতিনিধি দলের সাথে যে সব বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ মুসলিম ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য কায়েদে আযম ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। হ্যাঁ, সে বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। শাহ সাহেব (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী) এক গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন,

আমি অপর গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম। কায়েদে আযম ছাত্র ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ উক্ত সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আমরা আমাদের দাবী পেশ করেছিলাম। আলোচনায় বোঝা গেল, তাঁকে বোঝানো হয়েছিল বাংলা হিন্দুদের ভাষা। কারণ তিনি মন্তব্য করেছিলেন, বাংলা ভাষায় মুসলমানদের সাহিত্য কোথায়, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের পরিচিতি আছে কি? এটাকে কি করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিসিক্ত করা যায়?

আমরা বললাম, শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালী মুসলমান পিছিয়ে ছিল বলেই বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবনের প্রতিচ্ছবি নেই। বাঙ্গালী মুসলমানেরা নিজেরা এখন তাদের সাহিত্য রচনা করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা মুসলমানদেরই ভাষা, অতীতে মুসলিম শাসকরাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

কায়েদে আযমকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম, এ ভাষায়ই আমরা ইসলামকে জেনেছি। পাকিস্তান আন্দোলনের কথা মানুষকে বুঝিয়েছি। আপনার বাণী প্রচার করেছি। এ ভাষা বিজাতীয় ভাষা নয়।

প্রশ্ন ঃ এত কথা বলার অবকাশ ছিল কি?

উত্তর ঃ তিনি যখন কথা বলতেন তখন সবাইকে চুপ থাকতে হতো। তবে বলা শেষে তিনি মন দিয়ে শুনতেন। আমাদের বলার অবকাশ ছিল। তাঁর কথা শুনে মনে হতো সবই 'মেজার্ড'। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার সামনে কথা বলা অবশ্য সোজা কথা ছিল না। কারণ চাহনীতেই এমন একটা ভাব ছিল যে, তিনি অতি সহজেই সত্য-মিথ্যা বা যুক্তিহীন কথা বাছাই করে নিতে পারতেন। তাই অবান্তর কথা বলার কোন প্রশ্নই ছিল না। তবে আমার মনে হয় আমরা আমাদের বক্তব্য এবং দাবী যুক্তিগ্রাহ্য করে পেশ করতে পেরেছি, তাই তিনি মন দিয়ে শুনেছেন, বলার সুযোগ দিয়েছেন এবং স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ আন্দোলন সম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন কি?

উত্তর ঃ তিনি বলেছিলেন, "I don't tolerate any unconstitutional methods."

প্রশ্ন ঃ আন্দোলন সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কি ছিল?

উত্তর ঃ আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে অভিযোগ ছিল 'এসব আন্দোলন পাকিস্তান বিরোধী', 'কমিউনিষ্ট প্ররোচিত।' আমরা তার জবাবে বলেছি, জনগণের দাবীর কথা বললেই তাকে এভাবে চিহ্নিত করা হয়। আমরা সবাই পাকিস্তান আন্দোলনে পরীক্ষিত

কর্মী। আমাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ প্রাদেশিক সরকারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ষড়যন্ত্র। অথচ পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচনে দাঁড়িয়ে যে সৈয়দ মোঃ আফজাল নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁকেই নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ '৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। তখন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্বলিত এক মেমোরেণ্ডাম প্রদান করেন। এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারেন কি?

উত্তর ঃ (মৃদু হেসে) হ্যাঁ, রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্বলিত এ মেমোরেণ্ডাম প্রণয়নের ভার আমার উপরই অর্পিত হয়েছিল। ডাকসুর তৎকালীন জি.এস. গোলাম আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাশিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত লিয়াকত আলী খানের জনসভায় তা পাঠ করেন এবং ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে লিয়াকত আলী খানকে প্রদান করেন। বস্তুতঃ সে মেমোরেণ্ডাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী সম্বলিত এক ঐতিহাসিক দলিল। এই দাবী আদায়ের জন্যই পরবর্তীকালে সব জাতীয়তাবাদী এবং স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে। উক্ত মেমোরেণ্ডামে প্রতিরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানের সম-অধিকার, চাকুরি-বাকুরির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রামে নৌ-সদর দফতর স্থাপন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দাবীসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
আগষ্ট, ১৯৭৯

An Address of Wel-come
To the hon'ble Janab Liaquat Ali Khan
Prime Minister of Pakistan

Sir,

It is with a heart, throbbing with joy and emotion that, we, the students of the University of Dacca, welcome you in our midst as the first Prime Minister of our new, free and sovereign State of Pakistan. Even in the midst of these joyful surroundings our thoughts naturally go back to the day when only a few months back we have the honour and privilege of welcoming the beloved Quaid-e-Azam in our midst. Though he is no more with us his message and his work are our most precious heritage which shall continue to guide and inspire us in future. The most fitting homage that we can pay to his memory is to build up our State in accordance with the Islamic ideals of equality, brother-hood and justice.

Sir, with the dawn of independence a great responsibility has devolved on us. We can assure you that, we, who have contributed our mite to the national cause, are quite alive to the fact that the future wellbeing and stability of the state rest on us. Hence the task of building up those, who will build up the state should be given the utmost importance. We must revolutionise our outlook and reconstruct our thought to shape ourselves in the new order of life. The present system of education, which was introduced by the Britishers to suit their requirements should be throughly reorganised in the light of the altered circumstances. The lamentable failure of your provincial Government to give any lead in the matter till now and the present pitiable plight of primary, secondary and University education in our province have compelled us to draw your kind attention to the matter. The exodus of non-Muslim teachers who formed the bulk of the teaching staff in pre-partition period in the secondary and the University stages, couped with the dirth of efficient substitutes, has been a serious blow. The technical branches of education, viz., the Engineering, the Medical and the Agricultural which should be given the utmost care are also badly suffering for want of efficient teachers and technical equipment. Steps should be taken to secured efficient teachers and technical equipment, if necessary, from abroad, and more students from East Pakistan should be sent overseas for higher education and training. Female education is another subject which is also not receiving its due attention. More facilities

and encouragement should be given to our sisters who are now coming forward in increasing number to avail themseleves of every opportunity of education and serving the country. We also urge on you sir, to introduce compulsory free military training in all the colleges and the Universities with facilities for our sisters too. The problem of accommodation is getting more and more acute since the partition. Both students and teachers are greatly suffereing on this account and the authorities are also experiencing great difficulties in accommodating the growing number of students in different educational institutions. We therefore appeal to-you to use your good offices to remedy the present deplorable state of affairs affecting the growth and future wellbeing of the nation.

Sir, the magnificent efforts that you are making to strengthen the defences of Pakistan has evoked the admiration of all. We however beg to impress upon you with all the emphasis at our command that to encourage our youth to join the armed forces we need Army, Naval and Air Academies in this province. The only cause for this ather slow response from our youth is not lack of enthusiasm or determination on their part but the absence of these facilities in this province. We pledge our whole-hearted support and can assure you that given proper facilities you shall have from amongst us the best in every branch of the armed forces.

Sir, the food problem is causing us a great concern. The price of essential commodities and cloth have gone beyond the purchasing power of the average citizen and perhaps the cost of living here in East Pakistan is the highest in the world except in China. Steps should be taken to increase our food production to make ourselves self sufficient. This can only be made possible by abolishing the Permanent Settlement without compensation and thoroughly re-organising our land tenure system and by the introduction of co-operative farming on a scientific basis.

Let us tell you, Sir, that we greatly appreciate your determination to ruthlessly deal with corruption and blackmarketting. Here in East Pakistan the anti-corruption department was doing splendid work. But unfortunately the department has been amalgamated with another department and the work has alarmingly showed down through the corruption here is still as rampant as ever. We hope you will kindly see that the work and efficiency of the department is not allowed to be hampered by interested individuals however big they may be.

Sir, there can not be any economic progress in the country unless it is industrialised. We hope, Sir, that, in any indus-

trial planning of the country, East Pakistan would legitimately get a major share.

Sir, though the two parts of our state happen to be separated by nearly two thousand miles we are one with our brethren of West Pakistan in their joys and sorrows, happiness and tribulations. Provincialism is a word unknown to us and quite foreign to our sentiment. We take this opportunity of conveying through you our best wishes and most sincere greetings to our brethren in West Pakistan and the youth in particular.

Sir, the policy of the Britishers to impart education through the medium of a foreign language accounts for the poor percentage of literacy amongst our people. The best way to impart education is through the medium of the mother tongue, and we are glad that our Provincial Government has already accepted this principle. The introduction of Bengali as the medium of instruction and as the official language has opened before us a great opportunity of educating our people and developing ourselves according to our own genius. We are happy to note that our Central Government, under your wise guidance, has given Bengali and honoured place. This is a step in the right direction which shall go a long way to further strengthen our cultural ties, with our brethren in West Pakistan. Interchange of thoughts and ideas and mutual understanding are essential if we have to develop a homogeneous and healthy national outlook. We have accepted Urdu as our Lingua Franca but we also feel very strongly that Bengali, by virtue of its being the official language of the premier province and also the language of the 62% of the population of the state, should be given its rightful place as one of the state languages togehter with Urdu. Otherwise we in East Pakistan shall always be under a permanent handicap and disadvantage. Thus alone we shall have full scope of development and forge closer affinity with our brethren of the other part and march forward hand in hand.

Sir, you are aware of the pitiable plight of the people of East Bengal, and Muslims in particular, who were victims of the worst kind of political oppression and economic exploitation. We are confident, Sir, that our legitimate claim in our Armed Forces and the Central Services on the basis of population-percentage shall be given effect to immediately.

Sir, we appreciate the tremendous odds that you had to surmount and we are also to the difficulties that face us today. We would however take this opportunity of requesting

you most earnestly to see that the framing of our constitution is not delayed any further. The last general elections were in fact a plebiscite on the issue of Pakistan and now that we need more able men and fresh blood to come in and shoulder responsibility, we beg to impress upon you the necessity of having an early general election on a wider basis.

Sir, we have been watching with increasing grief and concern the repressions to which our student friends, most of whom are tried Muslim League workers with admirable record of service and sacrifice, are being subject of. Many of us are being harassed and even put under detention without trial in our attempt to fight out corruption and injustice and bring them to the notice of the Government. The bogey of communism is raised to justify these injustices but we assure you most sincerely that, all other "isms" excepting Islamic message of peace, equality and social justice are quite foreign to our outlook.

We hope, Sir, and we are confident that the points we have raised shall receive your earnest attention and sympathetic consideration.

Sir, we are afraid that we have taxed you long enough but we could not help expressing our feelings. So, we have been frank to you even at the risk of being misunderstood only out of our sincere and intense love for the future wellbeing of the State. We are happy that the reins of administration of our State are in the able hands of one who enjoys the full confidence and love of all the Pakistanis. We have watched with admiration and regard your services and sacrifice to the cause of the nation. We pray to the Almighty for your sound health and long life to enable you to lead us through the critical times ahead. We thank you most cordially for the honour you have done to us in consenting to come and address us. Pakistan Zindabad.

Dacca
The 27th November, 1948.

We beg to subscribe ourselves,
The students of the University
of Dacca.

'৪৮ সনে ঢাকা সফররত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের পক্ষ হতে প্রদত্ত রাষ্ট্রভাষা ও 'পূর্ব পাকিস্তানের' সামগ্রিক দাবী সম্বলিত ঐতিহাসিক 'অভ্যর্থনা স্মারকলিপি'। ভাষা আন্দোলন তথা বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের এই দুর্লভ ঐতিহাসিক দলিলটি বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অধ্যাপক শাহেদ আলী

[অধ্যাপক শাহেদ আলী ভাষা আন্দোলনের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ভাষা আন্দোলনের গোড়ার দিকে প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা নির্ভিক ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি তমদ্দুন মজলিসেরও নিরলস সংগঠক ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের নির্ভিক মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জনাব শাহেদ আলী ১৯২৫ সালে সিলেট জেলার মাহমুদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সিলেটেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪৩ সালে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা, ১৯৪৫ সালে ২য় বিভাগে আই.এ. পরীক্ষা এবং ১৯৪৭ সালে ডিষ্টিংশন সহ কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সংগ্রাম এই তিনটি কর্মের সাথে অতি তরুণ বয়স হতেই জনাব শাহেদ আলী ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। পাকিস্তান আন্দোলনের বিপ্লবী মুখপত্র মাসিক প্রভাতীর সম্পাদক হিসেবে তিনি ১৯৪৪ সাল থেকে '৪৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্বভার পালন করেন। পাকিস্তান উত্তরকালে ১৯৪৮ হতে '৫০ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের নির্ভিক মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিকের' সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়া তিনি 'দৈনিক বুনিয়াদ'-এর সম্পাদক হিসেবে ১৯৫৫ সালে, 'দৈনিক মিল্লাতের' সহযোগী সম্পাদক হিসেবে ১৯৫৬ সালে, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, পরে ইসলামী ফাউণ্ডেশন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ১৯৬২ সাল হতে এবং 'মাসিক সবুজ পাতার' সম্পাদক

হিসেবে ১৯৬৩ সাল হতে দীর্ঘ দিন যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনাব শাহেদ আলীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁর 'জিবরাইলের ডানা' (গল্প সংগ্রহ) সুধী মহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী ক্লাসে পাঠ্য। গল্পটি ইংরেজী, উর্দু ও রুশ ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে 'ফিলিস্তিনে রুশ ভূমিকা', 'একমাত্র পথ', 'তরুণ মুসলিমের ভূমিকা' (আলোচ্য বিষয়ঃ পাকিস্তান আন্দোলন তথা সামগ্রিক মুক্তি আন্দোলনে তরুণদের বৈপ্লবিক ভূমিকা), 'বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান', গল্পগ্রন্থ 'একই সমতলে' (এ গ্রন্থের নাম গল্পটি মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বহু বছর ধরে পাঠ্যক্রমভুক্ত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিভিন্ন মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকায় এখনও তাঁর লেখা প্রকাশিত হচ্ছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে। History of Political Theory by G. H. Sabine, Modern Science and Modern Man by Couant, Fundamentals of Economics by Umbreath, Principles of State and Govt. in Islam by Mohammad Assad, Road to Mecca by Mohammad Assad–প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন।

তাঁর বহু গল্পের নাট্যরূপ, কথিকা রেডিও ও টেলিভিশন হতে প্রচারিত হয়েছে। তিনি ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমীর সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

জনাব শাহেদ আলী বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজে (১৯৫১-৫৩), কারমাইকেল কলেজে (১৯৫৩-৫৪), সিটি কলেজে (চট্টগ্রাম-১৯৬১) অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাই অধ্যাপক নামটি তাঁর নামের প্রথম দিকে জুড়ে আছে।

জনাব শাহেদ আলীর রাজনৈতিক জীবনও বৈচিত্র্যময়। অতি তরুণ বয়স হতে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস গঠিত প্রাদেশিক সরকার সমূহের স্বৈর-শাসন হতে মুক্তি লাভ উপলক্ষে মুসলিম লীগ আহূত 'নাজাত দিবসে' মিটিং অর্গানাইজ করতে নেমে পড়েন স্কুলের তরুণ ছাত্র শাহেদ আলী। 'নাজাত দিবসের' ঐ মিটিং-এ প্রদত্ত বক্তব্যই তাঁর জীবনের প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা। ১৯৪২ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমা ষ্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী এবং পরে সিলেট জেলা মুসলিম ষ্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী তৎপরতায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালের সিলেট রেফারেণ্ডামে পশ্চিম সুনামগঞ্জে কর্মতৎপরতা চালানোর দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল।

১৯৫২ সালে তিনি খেলাফতে রব্বানী পার্টির প্রেসিডিয়ামের সদস্য এবং পরে সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি খেলাফতে রব্বানী পার্টির টিকেটে যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগ প্রার্থীদ্বয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এসেম্বলীর সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি এখনও অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলনের সাথে জড়িত। ১৯৬২ সালের এপ্রিলে তিনি প্রকাশনা অফিসার হিসেবে ইসলামিক একাডেমীতে যোগদান করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকল্প অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী জনাব শাহেদ আলীর সাথে ঢাকা ডাইজেস্টের এই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি ইতিহাসের কিছু মূল্যবান উপকরণ জোগাবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ '৪৭ সালে যখন তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয় তখন আপনি কোথায়? আপনি কখন থেকে মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট হন?

উত্তর ঃ আমি তখন সিলেট এম, সি, কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের প্রতীক্ষা করছি। এ সময়, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক যুবকর্মী সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমি ঢাকায় আসি। এখানেই আবুল কাসেম সাহেবের সাথে প্রথম পরিচয়। তিনি তখন তমদ্দুন মজলিস গঠন করে কিছু সহযোগী নিয়ে কাজ শুরু করেছেন মাত্র। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য তিনি আগ্রহভরে আমাকে ঢাকায় চলে আসতে বলেন। এরপর সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের দিকে ঢাকায় আসার পর হতেই মজলিসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রতি কাসেম সাহেবের এত আগ্রহের কারণ কি? তিনি পূর্বে আপনার সম্পর্কে জানতেন কি?

উত্তর ঃ আমার লেখার সাথে তাঁর পূর্ব পরিচিতি ছিল। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাতে প্রায়ই আমার লেখা প্রকাশিত হতো। সৈয়দ নজরুল ইসলাম (সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি), আবদুল মতিন খান চৌধুরী (বিচারপতি), জিন্নাত আলী (পরবর্তীকালে তথ্য বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী) এঁরা সবাই আমার লেখার অনুরাগী পাঠক ছিলেন। সিলেটের রেফারেণ্ডামে সৈয়দ নজরুল সহ এঁদের অনেকের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এঁরাই কাসেম সাহেবকে আমার সম্পর্কে বলেন এবং ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগের সম্মেলনে আমার আগমনের খবর দেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি যে যুবকর্মী সম্মেলনের কথা বলেছেন, সে সম্মেলনেই কি ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ গঠিত হয়? সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এই যুবকর্মী সম্মেলনেই ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ গঠিত হয়। ১৫০, মোগলটুলীতে সম্ভবতঃ তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আপনাদের অন্য এক সাক্ষাৎকারে খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাসায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্মেলনের পূর্বে বা পরে অন্য কোন মিটিং হয়েছে কিনা জানি না, তবে যুবকর্মী সম্মেলনের অধিবেশনগুলো ১৫০, মোগলটুলীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে আমার স্পষ্ট মনে আছে।

প্রশ্ন ঃ সিলেট থেকে আর কারা সম্মেলনে যোগদানের জন্য এসেছিলেন?

উত্তর ঃ তাসাদ্দুক আহমদের কাছেই প্রথম আমি যুবকর্মী সম্মেলনের কথা শুনি। তাসাদ্দুক, পীর হাবিবুর রহমান (বর্তমান মোঃ ন্যাপ নেতা), হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আর দু'একজনের নাম এখন মনে পড়ছে না। আমরা এই ক'জন এক সাথেই সিলেট থেকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আসি।

প্রশ্ন ঃ ঢাকায় এসেই কি আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন?

উত্তর ঃ ঢাকায় এসেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। কিন্তু মজলিস ও সৈনিকের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার সাথে এত জড়িয়ে পড়ি যে, নিয়মিত ক্লাস করতে না পারায় প্রয়োজনীয় পার্সেন্টেজের অভাব হয়ে পড়ে। তাই আমাকে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রথমে আপনার ওপর মজলিসের কি দায়িত্ব অর্পিত হয়?

উত্তর ঃ সাহিত্যিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। সৈয়দ শাহাদাত হোসেন ছিলেন এ কাজে আমার সহকারী। এর পূর্বে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মজলিসের তেমন কোন কর্মতৎপরতা ছিল না। বর্তমান মেডিকেল কলেজের পেছনে কাজী সাখাওয়াত উল্লাহ (তখন তিনি সাবডিভিশনাল ফুড কন্ট্রোলার) সাহেবের একতলা বাড়ীতে আমাদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ঃ মজলিসের সাহিত্য সভাগুলোতে কারা উপস্থিত থাকতেন? ছাত্রদের নিকট থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যেতো কি?

উত্তর ঃ অনেক কবি-সাহিত্যিকই উপস্থিত হতেন। ছাত্রদের নিকট থেকে সাহিত্য সভাগুলোতে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যেতো। সত্যিকথা বলতে কি, এখনকার অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও নাট্যকারই তখন মজলিসের সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন।

প্রশ্ন ঃ এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমন কিছু নাম বলুন না।

উত্তর ঃ মুনির চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু রুশদ মতিন উদ্দীন, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আসকার ইবনে শাইখ, আখতার-উল্ আলম, বদরুদ্দীন উমর প্রমুখ ব্যক্তিগণ সবাই একদা মজলিসের সাহিত্য তৎপরতার সংস্পর্শে ছিলেন এবং সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ করতেন।

প্রশ্ন ঃ কবি শামসুর রাহমান এবং বদরুদ্দীন উমরও কি তমদ্দুন মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন?

উত্তর ঃ কবি শামসুর রাহমান মজলিসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। তিনি

সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ করতেন। সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম কবিতা সৈনিকেই ছাপা হয়। আর বদরুদ্দীন উমর তো প্রথম দিকে মজলিসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। মজলিসের প্রথম প্রকাশিত বইটি তাঁরই লেখা।

প্রশ্ন ঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কি তমদ্দুন মজলিসের কর্মী ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তিনি মজলিসের কর্মী ছিলেন। মজলিসের অনেক মিটিং এস, এম, হলে তাঁর কক্ষে অনুষ্ঠিত হতো। প্রথমে মজলিসের কোন গঠনতন্ত্র ছিল না। পরে আমার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হলে সৈয়দ নজরুলের রুমে বসেই মজলিসের জন্য একটি গঠনতন্ত্র তৈরী করি। এটাই মজলিসের প্রথম গঠনতন্ত্র। পরে অবশ্য মজলিসের ভিন্ন গঠনতন্ত্র তৈরী হয়।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী প্রশ্নে তখন যে প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করছিল সে সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

উত্তর ঃ প্রথম দিকেতো পরিবেশ একেবারেই প্রতিকূল ছিল। সাধারণ ছাত্ররাও প্রথমে ততটা গভীরভাবে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি ভেবে দেখেনি। আর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ তো রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীটি প্রথম থেকেই ভালো চোখে দেখেন নি। পুরোনো ঢাকাতে ভাষার দাবী নিয়ে কোন আলাপই করা যেতো না। আর পুরোনো ঢাকার কথাই বা বলি কেন? আমার নিজের জেলা সিলেটের অবস্থাও ছিল তার-চেয়ে সঙ্গীন। সেখানে ভাষার দাবী নিয়ে মুখ খোলার কোন উপায় ছিল না। সবাই তখন পাকিস্তান নিয়ে বিভোর! নতুন বিতর্ক শুনতে কেউ রাজী নয়। '৪৮ সালে আমি সিলেটের এম, সি, কলেজে গেলাম মজলিসের উদ্যোগে ভাযা প্রশ্নে কিছু আলাপ-আলোচনা করতে। কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী নিয়ে অনেকে রীতিমত উপহাস করলেন। এসব গুণী ব্যক্তিগণ এখন অতি উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁরা তখন বাংলা যে রাষ্ট্রভাষা হতে পারে এটা কল্পনাও করতে পারেন নি।

সিলেটে তমদ্দুন মজলিসের সেক্রেটারী জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ ওহিদুর রেজা চৌধুরীর উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে মিটিং আহ্বান করা হয়। কিন্তু জনমত এত প্রতিকূল ছিল যে মিটিং থেকে জোর করে মাইক কেড়ে নেয়া হলেও আমাদের কিছু করার ছিল না।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে যেসব সেমিনার বা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো সেগুলোর কথা আপনার স্মরণ আছে কি?

উত্তর ঃ সব না হলেও কিছু ঘটনার কথা তো স্মরণ আছেই। ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারের কথা মনে আছে, যে সেমিনারে আবুল মনসুর আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে সে সেমিনার ছাত্র ও শিক্ষিত মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ সব সেমিনার এবং আলোচনা সভা কি ফজলুল হক হলেই অনুষ্ঠিত হতো?

উত্তর ঃ অধিকাংশ সেমিনারই ফজলুল হক হলেই অনুষ্ঠিত হতো। ফজলুল হক হলের অডিটোরিয়ামের বারান্দা ছিল আমাদের মজলিস কর্মীদের রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে বুকলেট, ইশতেহার ও পুস্তিকা বিতরণের প্রধান কেন্দ্র।

প্রশ্ন ঃ আপনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এমন কোন উল্লেখযোগ্য সেমিনারের কথা কিছু বলুন না।

উত্তর ঃ বাংলা স্ক্রিপ্টের উপর একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফজলুল হক হলেই। আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলা ভাষার স্ক্রিপ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক। বাংলা ভাষার স্ক্রিপ্ট যে বৈজ্ঞানিক এর ওপর ইংরেজীতে একটি বই লিখেছিলেন ফেরদৌস খান। আমি তার বাংলা অনুবাদ করেছিলাম। অনুবাদটি আমি সেমিনারে পাঠ করি। এর উপর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হয়। সরদার ফজলুল করিম, অজিত কুমার গুহ প্রমুখ উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বলে মনে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ পুরোনো ঢাকায় ভাষা প্রশ্নে সংঘটিত কোন প্রতিকূল ঘটনার কথা মনে পড়ে কি?

উত্তর ঃ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা স্মরণ নেই। তবে মনে পড়ে ভাল 'ঢাকাইয়া' ভাষা জানতেন বলে আবদুল মান্নানকে (নবকুমার ইনষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার) পুরোনো ঢাকায় দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হতো।

প্রশ্ন ঃ গাজীউল হক সাহেবের সাথে তখন আপনার আলাপ-আলোচনা হতো কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। গাজীউল হক ১৯ নম্বর আজিমপুর মজলিস অফিসে গিয়ে আমাদের বাঁশী বাজিয়ে শুনাতেন, কখনো বা 'অহমিয়া' ভাষায় গান গেয়ে শুনাতেন। আমরা বেশ উপভোগ করতাম।

প্রশ্ন ঃ মজলিস অফিস তাহলে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আন্দোলনের মিলনকেন্দ্র ছিল।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তাই। মজলিস অফিস সব সময় অনুরাগীদের ভিড়ে সরগরম থাকতো।

প্রশ্ন ঃ শুনেছি মাওলানা ভাসানীও নাকি মজলিস তথা সৈনিক অফিসে যেতেন?

উত্তর ঃ একবার আসাম থেকে ঢাকায় এসে মাওলানা ভাসানী আলহামরা হোটেলে ওঠেন। আমিই তাঁকে সেখান থেকে প্রথম মজলিস অফিসে নিয়ে যাই। তিনি মজলিসের বিপ্লবী কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেন এবং মজলিসকে সব দিক থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

প্রশ্ন ঃ মাওলানা ভাসানী কি পূর্ব থেকেই আপনাকে জানতেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সিলেটে যখন আমি 'প্রভাতী' পত্রিকার সম্পাদনা করি তখন থেকেই মাওলানা ভাসানীর সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়। ভাসানী আসাম থেকে প্রায়ই সিলেটে

আসতেন। প্রভাতী পত্রিকা তখন আসাম-বাং‌লার বিপ্লবী মুখপত্র। সে সূত্র ধরে পরিচয় আরো গভীর হয়।

প্রশ্ন ঃ তোহা সাহেব তো ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এছাড়া তিনি সিলেটের রেফারেণ্ডামে আপনাদের সুনামগঞ্জে কাজ করেছেন। আপনাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ঘটেছিল কি?

উত্তর ঃ (মৃদু হেসে) তোহা তখন স্কুলের ছাত্র। একদিন দেখি মাহমুদ আলী সাহেবদের বাড়ীর সামনে যে টেনিস খেলার ছোট মাঠ আছে, সেখানে হাল্‌কা-পাতলা গড়নের ধুতি পরা এক ছেলে হাত নেড়ে পাকিস্তানের স্বপক্ষে বক্তৃতা করছে। লম্বা নাকবিশিষ্ট সেদিনের সেই তরুণ ছেলেটিই ছিল তোহা, পরে তাঁর সাথে আমার আলাপ-পরিচয় হয়।

প্রশ্ন ঃ কার্জন হলে কায়েদে আযমের মিটিং-এ আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ না, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের রেসকোর্সের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কি? সেখানে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি সে জনসভায় উপস্থিত ছিলাম। না, সেখানে কোন প্রতিবাদ হয়নি। আপনাদের দু'একটা সাক্ষাৎকারে প্রতিবাদ উঠেছিল বলে কেউ কেউ বলেছেন, তা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো '৫০ সালেই ঢাকা ছেড়ে বগুড়া চলে যান। '৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর সেখানকার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চয়ই বলতে পারবেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি তখন বগুড়া কলেজের অধ্যাপক। উর্দুভাষী এ, জি, হক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ঢাকার গুলিবর্ষণের খবর, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশের হামলার খবর এলো দাবানলের মতো। আরো খবর রটে গেলো গাজীউল হক মারা গেছেন। এ খবর পেয়ে, শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা নষ্ট এবং গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আমরা উডবার্ণ সিনেমা হলে প্রতিবাদ সভা ও মিছিলের আয়োজন করলাম। উর্দুভাষী প্রিন্সিপ্যাল এ, জি, হক প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সরকারের কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে সভাশেষে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। কিন্তু সেদিনও অধ্যাপকদের অনেকে মিছিলের পুরোভাগে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পরিশেষে আমি, বদরুজ্জামান, জহিরুদ্দীন, শামসুল হুদা এ ক'জন অধ্যাপক পুরোভাগে থেকে প্রতিবাদ মিছিল পরিচালনা করি। তখন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতা ছিলেন তৌফিকুল আলম খান (বর্তমানে বিমান বাহিনীতে কার্যরত)।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবাদ সভায় মিছিলের পর কোন পুলিশী তৎপরতা বা গ্রেফতার চলে কি?

উত্তর ঃ পরদিন আমার নামে তলব এলো। বলা হলো ডি, সি-সাথে দেখা করতে। দেখা করতে গেলাম। ডি, সি বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি, এখানে যা কিছু ঘটছে সবই আপনার তৎপরতার জন্য।' আমি বললাম, 'সারা দেশব্যাপী যা ঘটছে তাতে আমার কি হাত আছে? সবই স্পন্টিনিয়াসলী হচ্ছে। আমি যদি এর জন্য দায়ী হতাম, তাহলে নিজেকে সৌভাগ্যবানই মনে করতাম।' এরপর ডি, সি, কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, 'আলতাফুননেছা ময়দানে মিটিং হতে যাচ্ছে, তা আপনাকে বন্ধ করতে হবে।' আমি বললাম, 'আমি কেন রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে অনুষ্ঠিতব্য মিটিং বন্ধ করতে যাব?' ডি, সি-র সাথে আলোচনার সমাপ্তি টেনে আমি ফিরে এলাম। এরপর কোন পুলিশী তৎপরতা চলেনি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
অক্টোবর, ১৯৭৮

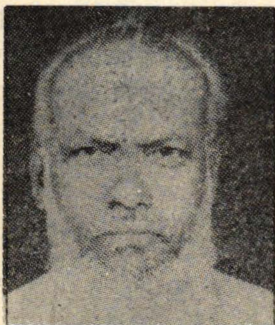

অধ্যাপক আবদুল গফুর

[ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীজ বপনকারী অগ্রসেনানীদের মধ্যে অধ্যাপক আবদুল গফুর ছিলেন অন্যতম। ভাষা আন্দোলনের নির্ভিক মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও সম্পাদক হিসেবে তিনি যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন তা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে।

জনাব আবদুল গফুর ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার দাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি পাবনা জুনিয়র মাদ্রাসায় তিন বছর পড়াশুনা করেন। পরে ফরিদপুর মইজউদ্দীন হাই মাদ্রাসা হতে ১৯৪৫ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি বাংলা ও আসামের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান এবং বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি ঢাকা গভর্ণমেন্ট ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজ থেকে তিনি ১৯৪৭ সালে আই, এ, পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন।

এ সময় '৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেম সাহেবের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। কিছুদিন পর শাহেদ আলী সাহেবের উৎসাহে তিনি তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। সৈনিক ছিল তমদ্দুন মজলিসের পত্রিকা। তমদ্দুন মজলিস ও সৈনিক এ দু'মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর কর্মতৎপরতা। ভাষা আন্দোলনের দুর্বার সংগ্রামের পথে এগিয়ে যান তিনি এক দুঃসাহসী অভিযাত্রিকের মতো।

আন্দোলনের প্রতি সহজাত আকর্ষণের জন্য তিন বৎসরের অনার্স কোর্স সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও

তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। লেখাপড়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ফলে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি।

১৯৪৮ সালে আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য তমদ্দুন মজলিস সাপ্তাহিক সৈনিক প্রকাশ করে। তখন অধ্যাপক শাহেদ আলী ছিলেন সৈনিকের সম্পাদক। আব্দুল গফুর প্রথমে ছদ্মনামে এ পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন।

প্রথম দিকে তিনি সৈনিকের সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং পরে সম্পাদক নিযুক্ত হন। সৈনিকে যোগদানের পূর্বে তিনি কাজী আফসার উদ্দীন (ঔপন্যাসিক) ও এস, এম, বজলুল হকের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জিন্দেগী'তে কাজ করেন।

'৫২ সালে আবদুল গফুর সম্পাদিত সৈনিকের ভূমিকা জনমনে ব্যাপক সাড়া জাগায়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর গুলিবর্ষণের পর সৈনিকের বিশেষ শহীদ সংখ্যা বের হয়। এটা জনমনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে।

সৈনিকের ভূমিকায় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বিক্ষুব্ধ হন। পুলিশ রাতে ১৯ নম্বর আজিমপুর রোডে অবস্থিত সৈনিক অফিসে হানা দেয়। অধ্যাপক আবুল কাসেম ও আবদুল গফুর বাড়ীর দেওয়াল টপ্‌কে শেখ সাহেব বাজারের জঙ্গল ও কবরস্থানের মধ্য দিয়ে সরে পড়েন। মাসাধিক কাল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থাকেন তাঁরা।

১৯৫৬ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজে বি, এ, ক্লাসে নৈশ বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সালে মিল্লাতের সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।

১৯৫৮ সালে বি, এ, পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে এম, এ, ক্লাশে ভর্তি হন। এক বছর ক্লাস করে ইংরেজী পড়া বন্ধ করে দেন। এ সময়ে নাজাত পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন।

১৯৬২ সালে সমাজকল্যাণে এম, এ, পাশ করেন। এম, এ, পাশ করে এক বৎসর চট্টগ্রামে 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজার' হিসেবে চাকুরী করেন। রাজেন্দ্র কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি কিছুদিন আবুজর গিফারী কলেজের সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

বর্তমানে তিনি 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর প্রকাশনা পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

এককালের 'সৈনিক' সম্পাদক, ভাষা আন্দোলনের নির্ভিক সৈনিকের এ সাক্ষাৎকার ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণে সমৃদ্ধ হবে বলে আমরা মনে করি।]

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মাধ্যমেই কি আপনি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, একরূপ তাই বলা যায়। তমদ্দুন মজলিস আর তার মুখপত্র সৈনিক পত্রিকার মাধ্যমেই আমি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কিভাবে তমদ্দুন মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট হন? তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাসেমের সাথে কি আপনার পূর্ব পরিচিতি ছিল?

উত্তর ঃ শাহেদ আলী সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি তমদ্দুন মজলিসে যোগ দিই। আবুল কাসেম সাহেবের সাথে কোন পূর্ব পরিচিতি ছিল না। তবে অপরিচিত অবস্থায়ই আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ ঘটে।

আমি তখন 'জিন্দেগী' পত্রিকার একজন ষ্টাফ। (মরহুম) কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ ও এস, এম, বজলুল হকের যুগ্ম সম্পাদনায় তখন 'জিন্দেগী' বের হচ্ছে। একদিন কাসেম সাহেব 'জিন্দেগী' অফিসে গিয়ে তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত "রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?" শীর্ষক পুস্তিকাটি আমাকে দিলেন 'জিন্দেগী'তে রিভিউর জন্য। কাসেম সাহেব তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি পুস্তিকাটি গ্রহণ করি সত্য কিন্তু ভাষা নিয়ে এতখানি তৎপরতা আমার কাছে তখন যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না বলে ব্যাপারটি ততটা ভাল লাগে নি।

প্রশ্ন ঃ ভাষা প্রশ্নটি আপনার তখন ভাল না লাগার কারণ কি ছিল?

উত্তর ঃ কারণ আর কি, সবেমাত্র পাকিস্তান হয়েছে, এ নিয়ে সে সময় ততটা বাড়াবাড়ি আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন থেকে মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত কর্মতৎপরতার সাথে সরাসরি যুক্ত হন?

উত্তর ঃ ঠিক কখন যুক্ত হয়েছি বলা মুশকিল। তবে প্রত্যক্ষভাবে তমদ্দুন মজলিসে যোগ দেয়ার পূর্ব থেকেই শাহেদ আলী সাহেবের সঙ্গে মজলিস সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনায় এর প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠি এবং স্বেচ্ছায় মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত সেমিনার ও আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকতে শুরু করি। পোষ্টারিং লেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজেও নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত করে ফেলি। প্রথম দিকে বিচ্ছিন্নভাবে অংশ নিলেও পরে মজলিসের কর্মতৎপরতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ঃ সৈনিক পত্রিকা কোন সময় থেকে প্রকাশিত হয়? তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র হিসেবে সৈনিক সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালের ১৪ই নভেম্বর হতে সৈনিকের প্রকাশনা শুরু হয়। সৈনিক, তমদ্দুন মজলিস, রাষ্ট্রভাষা–এর কোনটিকে কোনটি থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো নয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সৈনিকের নিরবচ্ছিন্ন বলিষ্ঠ ভূমিকা সংবাদপত্র জগতে এবং জাতীয় জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজন করেছে।

প্রশ্ন ঃ মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত সব সেমিনার ও আলোচনা সভাগুলির রিপোর্ট

কি সৈনিকে প্রকাশিত হতো?

উত্তর ঃ হ্যাঁ,সব রিপোর্ট তো প্রকাশিত হতোই, এছাড়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে অনেক ফিচার, প্রবন্ধ এমনকি কার্টুন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো। ছাত্র-জনতাকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে সচেতন এবং আন্দোলনকে দুর্বার করার জন্য সৈনিক সদা সচেষ্ট ছিল।

প্রশ্ন ঃ মজলিসের অফিস কোথায় ছিল? মজলিসের ঘরোয়া তৎপরতা বা সাংগঠনিক সভাগুলি কোথায় অনুষ্ঠিত হতো?

উত্তর ঃ ১৯ নম্বর আজিমপুরে মজলিস ও সৈনিকের অফিস ছিল। প্রথম দিকে কিছুদিনের জন্য রশিদ বিল্ডিং-এর নিকটে সুরুজ্জামান মেসে মজলিসের অফিস ছিল। পরে আবার ১৯ নম্বর আজিমপুর রোডে মজলিসের অফিস স্থানান্তরিত হয়। এখানে কাসেম সাহেব থাকতেন। সৈনিকের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি শাহেদ আলী সাহেবও এখানে থাকতেন। ১৯ নম্বর আজিমপুরের এই মজলিস অফিসকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের অনেক তৎপরতা চলতো। এছাড়া ইউনিভার্সিটি হলে অবস্থানরত দু' একজন মজলিস কর্মীর কক্ষেও সভা অনুষ্ঠিত হতো। এস, এম, হলে সৈয়দ নজরুলের কক্ষেও মাঝে মধ্যে মজলিসের ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো।

প্রশ্ন ঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কি তমদ্দুন মজলিসের কর্মী ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তা না হলে মজলিসের বৈঠক তাঁর কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে কেন?

প্রশ্ন ঃ ১৯৫২ সালে সৈনিকের সম্পাদনা কে করতেন?

উত্তর ঃ তখন আমিই সম্পাদক ছিলাম। আমিও কাসেম সাহেবের সাথে ১৯ নম্বর আজিমপুরে থাকতাম।

প্রশ্ন ঃ নবাবপুরে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের মিটিংএ আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উপস্থিত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ কর্মপরিষদের সদস্য হিসেবে না এমনি সৈনিকের সংবাদ সংগ্রহের জন্য?

উত্তর ঃ কর্মপরিষদের সদস্য হিসেবেই আমি উপস্থিত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ মিটিং এর সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ আছে কি?

উত্তর ঃ ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার জন্যই মিটিংএ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে ছাত্রদের দাবীর মুখে বলা হয় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা বটতলার ছাত্রসভায় ছাত্রদের ভূমিকার ওপর নির্ভর করবে। সেখানে কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে স্বাভাবিকভাবে কর্মপরিষদ ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন ঃ গুলিবর্ষণের সময় কি আপনি ঘটনাস্থল বা তার আশেপাশে উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর ঃ গুলিবর্ষণের সময় সম্ভবতঃ আমি সৈনিক অফিসে ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীর গুলিবর্ষণের পর পরবর্তী পরিস্থিতিতে সৈনিক প্রকাশিত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীতে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে সৈনিকের বিশেষ শহীদ সংখ্যা বের হয়। ঢাকাতেই স্বল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার সংখ্যা বিক্রি হয়ে যায়। আন্দোলনের ব্যাপারে সৈনিকের স্বাধীন মত জানার জন্য ছাত্র-জনতার প্রচুর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। সৈনিকের অফিসে ভোর ছ'টা থেকে কারফিউর পূর্ব পর্যন্ত (রাত নয়টা) ছাত্র-জনতার ভিড় লেগে থাকতো সে সময়।

প্রশ্ন ঃ সৈনিকের এই ভূমিকার জন্য পুলিশের হামলা হয়নি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হামলা হয়েছিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত ৩টায় পুলিশ এসে সৈনিক অফিস ঘিরে ফেলে। আমরা পূর্ব থেকেই পরিস্থিতি আঁচ করে একটু সতর্ক ছিলাম। কাসেম সাহেবের স্ত্রী বুদ্ধি করে দরজা না খুলে অনেক্ষণ পুলিশের কার্যক্রম নিয়ে তাদের সামনে বিতর্কে মেতে ওঠেন এবং আমাদেরকে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার সময় করে দেন।

আমরা শেখ সাহেব বাজারের কবরস্থান ও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অপর দিকের কারো বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু ভয়ে কেউ দরজা খুলে আশ্রয় দেয়নি। ফলে আমি ও কাসেম সাহেব জঙ্গলেই রাত কাটাই। খুব ভোরে মসজিদে নামাজ পড়ে আমি নবাবগঞ্জে আমার পুরোনো লজিং বাড়ীতে আশ্রয় নেই। কাসেম সাহেবও পাশের এক বাড়ীতে আশ্রয় নেন। লজিং-এর ছেলেরা দিনের বেলায় আমাকে একটি গুদাম ঘরের বাইরে তালা দিয়ে সতর্কতার সাথে পাহারা দিত এবং কাসেম সাহেবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো।

এরপর উভয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। ঢাকা ত্যাগের পূর্বে গোপনে একবার ইকবাল হলে যাই কিন্তু দুর্ভাগ্য এমন যে তখনই পুলিশ এসে হল ঘেরাও করে। আমি কোন প্রকারে বর্তমান ইডেন কলেজের পাশ দিয়ে (সে আমলে মেথর পট্টি) হল থেকে ফিরে আসি।

এরপর ঢাকার বাইরে চলে যাই। প্রথমে ময়মনসিংহে কাসেম সাহেবের শ্বশুর বাড়ী যাই। সেখানেও পুলিশ টের পেয়ে যায়। অতঃপর কুষ্টিয়ার ডঃ সদরুদ্দীনের বাড়ীতে এবং তারপর ভেড়ামারার ব্যারিষ্টার আবদুল হকের (পরবর্তীকালে জাগদল নেতা) বাড়ীতে থাকি। এইভাবে বেশ কিছুদিন ঘুরে বেড়াবার পর পুনরায় ঢাকা ফিরে আসি।

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিসের কর্মতৎপরতা কি ঢাকার বাইরেও বিস্তৃত ছিল? '৫২ সালে ঢাকার বাইরে কারা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন বলতে পারেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ঢাকার বাইরেও মজলিসের কর্মতৎপরতা বিস্তৃত ছিল। '৫২ সালে বিভিন্ন

জেলায় অনেক তমদ্দুন মজলিস সংগঠক এবং কর্মী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেকে গ্রেফতার হয়েছেন।

চট্টগ্রাম থেকে আজিজুর রহমান, মাহফুজুর রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক), চৌধুরী শাহাবুদ্দীন খালেদ (চট্টগ্রাম তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা, পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম সিটি কলেজের অধ্যাপক। তিনি কাসেম সাহেবের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন) আন্দোলনে অংশ নেন।

রংপুর থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম (তখন রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক) ও জমির উদ্দীন (তিনিও উক্ত কলেজের অধ্যাপক) আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম গ্রেফতার হয়েছিলেন।

রাজশাহী থেকে অংশ নেন আনসার আলী (বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট)।

কুমিল্লা থেকে বাহাদুর মুন্সি (তখন কলেজের ছাত্র, পরবর্তীকালে ই, পি, সি, এস, অফিসার। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি মুন্সিগঞ্জের S. D. O. ছিলেন), নূরুদ্দীন আহমদ (ইউনিভার্সিটি ল্যাবোরেটরী স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল), আনজুমান মনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

খুলনা থেকে আন্দোলনে অংশ নেন এস, এম, আমজাদ হোসেন (প্রাক্তন মুসলিম লীগ মন্ত্রী) এবং মমিন উদ্দিন।

কুষ্টিয়া থেকে এম, এ, সাত্তার (কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের সিনিয়র প্রফেসর)।

বগুড়া থেকে মসিউল ইসলাম (এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট)।

সিলেট থেকে অংশ নেন আরব আলী (এখন ইংল্যণ্ডে আছেন), মাসুদ খান (সন্তোষ সিটি ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল) প্রমুখ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

সানাউল্লাহ নূরী

[জনাব সানাউল্লাহ নূরী ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর অনন্যসাধারণ ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জনাব নূরী ১৯২৭ সালের মে মাসে নোয়াখালী জেলার রামগতি থানার এক ঐতিহ্যবাহী, সংস্কৃতিবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি একজন কৃতী সাংবাদিক। বর্তমানে "দৈনিক দেশ"-এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে কার্যরত। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর থেকে তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু। সাংবাদিক জীবনে তিনি বহু পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। নীচে তা প্রদত্ত হলো ঃ

সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক নয়া দুনিয়া (১৯৬৩-৬৪), সম্পাদকীয় লেখক ঃ দৈনিক ইত্তেফাক (১৯৫৯-৬৩), বার্তা সম্পাদক ঃ দৈনিক নাজাত (১৯৫৮-৫৯), সহকারী বার্তা সম্পাদক ঃ দৈনিক সংবাদ (১৯৫৬-৫৮), নৈশ সম্পাদক ঃ দৈনিক মিল্লাত (১৯৫৮), সিনিয়র সহ-সম্পাদক ঃ দৈনিক সংবাদ (১৯৫৩-৫৬), সহ-সম্পাদক ঃ দৈনিক সংবাদ (১৯৫১)। সিনিয়র সহ-সম্পাদক ঃ দৈনিক আজাদ ঃ (১৯৫২), অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাসিক সওগাত (১৯৫৬-৫৮), বার্তা সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক খবর (১৯৫৬), যুগ্ম সম্পাদক ঃ অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ইনসান' (১৯৪৭-৪৮)।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিকতার উচ্চতর দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন ঃ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ দৈনিক বাংলা (ডিসেম্বর, ১৯৭৪), নির্বাহী সম্পাদক ঃ দৈনিক গণ বাংলা (১৯৭২), সম্পাদনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ঃ দৈনিক বাংলা (১৯৭৩-জুন, '৭৬) এবং সিনিয়র সহকারী সম্পাদক ঃ দৈনিক বাংলা (১৯৬৪-৭৯)।

১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে তিনি "দৈনিক দেশ"-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে উক্ত পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রো-এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, তৃতীয় বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের ওপর তাঁর অর্ধ সহস্রাধিক পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মিলে তাঁর ৩৫টি গ্রন্থ রয়েছে।

সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৮২ সালে 'একুশে পদক', ১৯৮৪ সালে 'অতীশ দীপঙ্কর' ও 'হাসান হাফিজুর রহমান' পদক লাভ করেন।

সাংবাদিক নূরী বহু দেশ সফর করেন। এসব সফরের মধ্যে রয়েছে ঃ

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান, ১৯৬৬ সালে সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া সফর, ১৯৫৭ সালে সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর, ১৯৭৭ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত সাংবাদিক শুভেচ্ছা প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফর।

ঢাকা ডাইজেস্টের সাথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী সাংবাদিক সানাউল্লাহ্ নূরীর ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত এই বিশেষ সাক্ষাতৎকার অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান দেবে বলে আমরা মনে করি।]

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন সময় হতে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন?
উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালে এর সূচনালগ্ন থেকেই আমি এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্ন ঃ '৪৮ সালে কি আপনি তমদ্দুন মজলিস বা অন্য কোন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ '৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে তমদ্দুন মজলিসের সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে আমি তমদ্দুন মজলিসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম। এছাড়া এর পূর্ব থেকে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিসে কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছেন?

উত্তর ঃ তমদ্দুন মজলিস গঠনের সময় আমি এর সাথে যুক্ত ছিলাম না। আমি তখন জগন্নাথ কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার কমার্সের ছাত্র। জগন্নাথ কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপালের বাড়িটি তখন আমরা ছাত্রাবাস হিসেবে অধিকার করে আছি। আমার কক্ষে ইনসান পত্রিকারও অফিস ছিল। আমি ছিলাম ইনসান পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। কলেজে ছাত্রনেতা হিসেবে তখন আমার বেশ পরিচিতি। একদিন আমি প্রিন্সিপালের রুমের

সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় একজন ছিপছিপে যুবক সাইকেল থেকে নেমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলো, সানাউল্লাহ নূরীকে কোথায় পাওয়া যাবে? আমি নিজের পরিচয় দিলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে এসেছেন? তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলায় আমি তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভেবে নিয়েছি। পরে জানতে পারলাম তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম।

তিনি তমদ্দুন মজলিস গঠনের কথা বললেন এবং এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য আমার কাছে ব্যাখ্যা করলেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীর কথা যখন তিনি বললেন, তখন তমদ্দুন মজলিসের প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে গেলো। তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে কলেজ থেকে বেরিয়ে লায়ন সিনেমা হল পর্যন্ত এলাম। কাসেম সাহেব নূরপুর ভিলায় তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য একটি আলোচনা সভার কথা জানালেন। এবং আমাকে উপস্থিত থাকতে বললেন। কাসেম সাহেবের সাথে এই আমার প্রথম আলাপ এং পরিচয়। এই সূত্র ধরেই আমি তমদ্দুন মজলিসে যোগ দিই।

প্রশ্ন ঃ নূরপুর ভিলার মিটিং-এ উপস্থিত হয়েছিলেন? সেখানে কি আলোচনা হয়েছিল? উল্লেখযোগ্য করা ছিলেন?

উত্তর ঃ নূরপুর ভিলার সে আলোচনা সভার সে মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী নিয়েই সেখানে আলোচনা হয়েছিল।। যতদূর মনে পড়ে, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, কবি জসিম উদ্দীন, অধ্যাপক কাজী আকরাম, শাহেদ আলী, অধ্যাপক আবুল কাসেম প্রমুখ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। আলোচনা শেষে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে স্বাক্ষর অভিযান, সেমিনার, আলোচনা সভা, জনসভা, ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রশ্ন ঃ এর পর থেকেই কি আপনি মজলিসের কর্মতৎপরতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এর পর থেকেই আমি মজলিসের কর্মতৎপরতার সাথে যুক্ত হই। এ ছাড়া ইনসান পত্রিকার মাধ্যমে আমি রাষ্ট্রভাষার দাবী তুলে ধরতে থাকি।

প্রশ্ন ঃ ইনসান পত্রিকা সম্পর্কে একটু বলবেন কি?

উত্তর ঃ ইনসানের সম্পাদক ছিলেন জনাব আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী। তিনি ছিলেন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন। ইনসান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র হিসাবে কাজ করে।

ঢাকা এসে প্রথমে তিনি ইনসান পত্রিকাতে জয়েন্ট এডিটর হিসেবে যোগ দেন। সেখানে নীতির প্রশ্নে একমত হতে না পেরে পরে অর্ধ-সাপ্তাহিক ইনসান বের করেন। আমিও যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে তাতে যোগ দিই।

প্রশ্ন ঃ ইনসান কবে থেকে বের হয়? আপনি ইনসানকে ভাষা আন্দোলনের মুখপত্র

বলেছেন, তখন সৈনিক পত্রিকা প্রকাশ হতো না কি?

উত্তর ঃ ১৯৪৭ সালের নভেম্বর ইনসান আত্মপ্রকাশ করে। ৮-৯ মাস চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়। ইনসান সংগ্রামী ছাত্র সমাজের মুখপত্র হিসেবে ভাষা আন্দোলনের দাবীকে সোচ্চার কণ্ঠে তুলে ধরে।

প্রশ্ন ঃ ইনসানে প্রকাশিত রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত কোন লেখা বা দাবীর কথা আপনার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে কি?

উত্তর ঃ আমার মনে আছে, একবার ইনসানে ক্যাপশন দিয়েছিলাম –'ডাণ্ডার জোরে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা' –সে সংখ্যা কায়েদে আযমের রেসকোর্সের জনসভার আশেপাশে প্রচুর বিক্রি হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি কায়েদে আযমের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উপস্থিত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ লোকসংখ্যা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ সে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। গ্রাম-বাংলার প্রত্যেক অঞ্চল হতে নারী-পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ, শিশু সে জনসভায় উপস্থিত হয়েছিল। মানুষের একটা আবেগ ছিল পাকিস্তানের নির্মাতাকে দেখার জন্য। বিশাল রেসকোর্স মাঠ ভরে লোক উপচে পড়েছিল চারিদিকে। সাত আট লাখ লোকতো হবেই।

প্রশ্ন ঃ রেসকোর্সের জনসভায় কায়েদে আযমের মন্তব্যের প্রতিবাদ হয়েছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, প্রতিবাদ হয়েছিল। 'না, না' প্রতিবাদ উঠলে কায়েদে আযম বক্তৃতা থামিয়ে খানিক চুপ করে থাকেন। তারপর পুনরায় বলতে থাকেন।

প্রশ্ন ঃ জনসভার অনেক উপস্থিত শ্রোতা সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রেসকোর্সে প্রতিবাদ ওঠার কথা ঠিক নয়। আর ছাত্রদের এ ধরনের কোন কর্মসূচীও ছিল না। আপনি বলছেন, প্রতিবাদ উঠেছিল?

উত্তর ঃ আমি হাইকোর্টের শেরে বাংলার মাজার যে দিকে, সে দিকে রেসকোর্সে কোণায় দাঁড়ানো ছিলাম। আমরা তো লোকদের বাংলা ভাষার দাবীর কথা বুঝাচ্ছিলাম এবং প্রতিবাদ করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ সম্মিলিতভাবে 'না, না' ধ্বনি উঠেছিল? কত জন এই ধ্বনি তুলেছিলেন বলে আপনার অনুমান?

উত্তর ঃ বিভিন্ন কর্ণার থেকে ছাত্রদের 'না, না', ধ্বনি উঠে। হাজার দু'য়েকের মতো এই প্রতিবাদ ধ্বনি তোলে। সভার কাজে এর দ্বারা খুব একটা ব্যাঘাত হয়নি।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে '৪৮ সালের ১১ই মার্চের তাৎপর্য কতটুকু?

উত্তর ঃ ১১ই মার্চ তো ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সফল গণবিক্ষোভ দিবস। ১১ই মার্চ ছাড়া ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস অপূর্ণ। ১১ই মার্চে সারা ঢাকা শহর এক বিক্ষুব্ধ নগরীতে পরিণত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা মন্ত্রীদের রাস্তায় আটক করে পদত্যাগে বাধ্য করে। এ দিবসের আন্দোলনের ফলে ভাষা আন্দোলন সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ এর পূর্বে কি ভাষা আন্দোলন সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে নি?

উত্তর ঃ সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করাতো দূরের কথা ঢাকাতেও অনেক স্থানে রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে প্রচার চালাতে গেলে নাজেহাল হতে হতো। পুরোনো ঢাকার চকবাজার, সিদ্দিকবাজার, কলতাবাজার প্রভৃতি এলাকায় সব সময় রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়ে কথা বলা যেতো না। কলতাবাজার, রায়সাহেব বাজার দিয়ে ছাত্রদের নিরাপদে আসার উপায় ছিল না। ছাত্র দেখলেই তারা এইসব আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে মারধর করতো তাই আমরা নবাবপুর রোড দিয়ে না এসে শাখারী পট্টির ভেতর দিয়ে নয়া বাজার, বংশাল হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসতাম।

প্রশ্ন ঃ '৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে আপনি ছাত্র ছিলেন কি?

উত্তর ঃ না, আমি তখন আজাদের সাব এডিটর। একুশে ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বর্তমান শহীদ মিনারে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা দানের অভিযোগে আজাদ কর্তৃপক্ষ চার্জ করলে আমি আজাদ হতে পদত্যাগ করি এবং সংবাদে যোগদান করি।

প্রশ্ন ঃ আজাদ তো তখন ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। তবু কেন আপনার বিরুদ্ধে চার্জ আনলো?

উত্তর ঃ আমার প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করা আজাদ কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেন নি তাই হয়তো।

সাক্ষাৎকার ঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

অধ্যাপক গোলাম আযম

[অধ্যাপক গোলাম আযম ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্রভাষার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ আন্দোলনের গোড়ার দিকে যে ক'জন ছাত্রনেতা নিরলস সংগ্রামে রত হন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম।

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী যখন উত্থাপিত হয়, তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসুর) জি, এস, (জেনারেল সেক্রেটারী) নির্বাচিত হন। স্বভাবতই ডাকসুর জি, এস, এবং পুরোভাগের ছাত্রনেতা হিসেবে ভাষা আন্দোলনে তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

১৯৪৪ সালে আই, এ, পাস করার পর জনাব গোলাম আযম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। '৪৬ সালে বি, এ, পাশ করার পর '৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে তিনি যখন এম,এ-র ছাত্র তখন ফজলুল হক মুসলিম হলের জি, এস, নির্বাচিত হন। '৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের জি, এস, নির্বাচিত হন। '৪৮-৪৯ সালেও তাঁদের সংসদ কার্য পরিচালনা করে। '৪৮ সালে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে ২৭শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাসিয়াম মাঠে এক বিরাট ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দেন। সে ঐতিহাসিক ছাত্রসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে 'ডাকসু'র জি, এস, জনাব গোলাম আযম ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত করতালির মধ্যে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত মেমোরেণ্ডাম পাঠ করেন এবং তা লিয়াকত আলী খানকে প্রদান করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২২ সালের ৭ই নভেম্বর মুতাবেক ১৩২৯ বাংলা সনের ৫ই অগ্রহায়ণ ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস সাবেক কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার অন্তর্গত বীরগাঁও-এ।

শিক্ষাজীবনে পূর্বাপর তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি প্রথম বিভাগে জুনিয়ার এবং ১৯৪২ সালে ত্রয়োদশ স্থান নিয়ে কৃতিত্বের সাথে হাই মাদ্রাসা পাশ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৪৬ সালে বি, এ, এবং ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ, পাশ করেন। এ বছরই ডিসেম্বরেঅধ্যাপক হিসাবে তিনি কারমাইকেল কলেজে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনায় রত অবস্থায় তিনি ১৯৫২ সালে রংপুরে ভাষা আন্দোলনের নেতা হিসেবে গ্রেফতার হন।

ছাত্রজীবনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন না কিন্তু '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে ছাড়া পাওয়ার পর তমদ্দুন মজলিসে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন এবং যখন এই দলের সদস্যপদ লাভ করেন, তখন তিনি রংপুর জেলে বন্দী।

প্রকৃতিগতভাবে জনাব গোলাম আযম একজন সংগ্রামী ব্যক্তি। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষার দাবীতে পিকেটিং করতে গিয়ে প্রথম তিনি গ্রেফতার হন। '৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নেতা হিসেবে পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর রুল জারি হলে আবার গ্রেফতার হন। এবং হেবিয়াস কার্পাসের ফলে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬৪ সালে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য হিসাবে গ্রেফতার হয়ে দু'মাস লাহোর জেলে আটক থাকেন। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে তিনি সাবেক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ঢাকা প্রেরিত হন এবং পুনরায় ঢাকা বিমান বন্দরে গ্রেফতার হয়ে প্রায় ৬ মাস কারারুদ্ধ থাকেন। এবারেও তিনি হেবিয়াস কার্পাসের ফলে মুক্তিলাভ করেন।

জনাব গোলাম আযম ১৯৫৬ সালে প্রাদেশিক জামায়াতের জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং ১৯৫৭ সালে জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ বছরই তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রধান (আমির) নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষভাগে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং এ যোগদানের জন্য তিনি সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে যান। ৩রা ডিসেম্বর তিনি করাচী থেকে ঢাকা রওয়ানা হন। ঢাকার ওপর তখন ভারতীয় বিমান হামলার দরুন তাঁদের বিমান ঢাকার অতি নিকটবর্তী হয়েও ফিরে গিয়ে কলম্বোয় অবতরণ করতে বাধ্য হয়। এবং অবশেষে তাঁদেরকে জেদ্দা নিয়ে যায়। এভাবেই তিনি বিদেশে আটকা পড়ে যান।

১৯৭৩ সালের এপ্রিলে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করেন এবং তাঁকে প্রবাস জীবন যাপনে বাধ্য করেন। ১৯৭৮ সালের ৯ই জুলাই ভিসা নিয়ে তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। তাঁর নাগরিকত্বের প্রশ্নটি বর্তমান বাংলাদেশের সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। সুদীর্ঘ ৫ বছর বিদেশে থাকাকালেও জনাব গোলাম আযম অনন্যসাধারণ কর্মতৎপর জীবনের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ইসলামিক যুব সম্মেলনে'র প্রথম 'ডেলিগেট মিটিং'-এ তিনি সভাপতিত্ব করেন।

এছাড়া তিনি অতিথি বক্তা হিসাবে ঃ ১. ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে লিবিয়ার ত্রিপোলীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলনে ভাষণ দেন, ২. ১৯৭৩ সালের আগস্টে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত FOSIS-এর বার্ষিক কনভেনশনে ভাষণ দেন, ৩. ১৯৭৩ সালের আগস্টে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইসলামিক মিশনের

বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দেন, ৪. ১৯৭৭ সালের জুলাইতে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত IIFSO-এর বার্ষিক সম্মলনে ভাষণ দেন, ৫. 'ওভারসীজ গেস্ট স্পীকার' হিসাবে তিনি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকার মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত MSA-এর বার্ষিক কনভেনশনে ভাষণ দেন।

প্রবাস জীবনে গোলাম আযম আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসেবেও বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এগুলো হলোঃ

১. ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে 'রাবেতা-আল-আলমে ইসলামীর' উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন সমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২. ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে ইউরোপীয় ইসলামিক কাউন্সিলের উদ্যোগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্স' ৩. ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে 'ইমাম মোহাম্মদ বিন সৌদ ইউনিভার্সিটির' উদ্যোগে রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স সম্মেলন' ৪. ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে 'কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি'র উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন'।

জনাব গোলাম আযম বেশ কিছু গ্রন্থের রচয়িতা ঃ উহাদের মধ্যে Economic Solution to Modern Economic Problems, A Guide to Islamic Movement. পাকিস্তানে আদর্শিক সংঘাত, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষবাদ, নবী জীবনের আদর্শ, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের এককালীন জি, এস-এর বিশেষ সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে মনে হলো, তিনি ঢাকা ডাইজেস্টের একজন নিবিষ্ট পাঠক। কর্মব্যস্ততা এবং ব্যক্তিগত অসুবিধে সত্ত্বেও তিনি অশেষ ধৈর্য সহকারে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত এ বিশেষ সাক্ষাৎকারটি দিয়েছেন। তাঁর এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় অনেক মূল্যবান উপকরণ যোগাবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ কোন সময় হতে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় বলে আপনি মনে করেন? সূচনার লগ্ন থেকেই কি আপনি এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ তমদ্দুন মজলিস এ আন্দোলনের সূচনা করেন। তবে ঠিক কোন সময় তা সঠিক খেয়াল নেই। যতদূর মনে পড়ে কায়েদে আযমের আগমনের পূর্বে '৪৮-এর মার্চের শুরুতে আমি এর সাথে জড়িত হই।

প্রশ্ন ঃ এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত তমদ্দুন মজলিসই এর উদ্যোক্তা। কায়েদে আযমের আগমনের পূর্বে রাষ্ট্রভাষার দাবী প্রথম আন্দোলনের রূপ নেয়। ১১ই মার্চের পর সরকারের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের চুক্তি এবং কায়েদে আযমের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আন্দোলন স্তিমিত হয়। কিন্তু ব্যাপক আন্দোলনে রূপ না নিলেও ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের '৫২ সালের পল্টনের ঘোষণার পর পরই এ আন্দোলন সত্যিকার অর্থে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের রূপ নেয় এবং গুলিবর্ষণের পর সর্বপ্রথম গণ আন্দোলনে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন? কোন সালে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের (ডাকসু) G. S. নির্বাচিত হন? তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের তৎপরতা কিরূপ ছিল?

উত্তরঃ ১৯৪৪ সালে আই, এ, পাশ করার পরই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। '৪৬ সালে বি, এ, পাশ করি এবং '৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে যখন এম, এ-র ছাত্র তখন ফজলুল হক মুসলিম হলের জি, এস, নির্বাচিত হই। ৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) G. S. নির্বাচিত হই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকেই আবাসিক ছিল। হলগুলোতে Extra Academic Activities এতো বেশী ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের তৎপরতার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। দুটো মুসলিম হল এবং দুটো হিন্দু হলের নিয়মিত সাহিত্যানুষ্ঠান, ড্রামা এবং স্পোর্টস ছাড়াও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হলগুলোকে কর্মচঞ্চল রাখতো।

পাকিস্তান আন্দোলন হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রদেরকে সুস্পষ্ট দুটি ক্যাম্পে বিভক্ত করায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর সর্বপ্রথম '৪৬ সালের শেষ দিকে আবার শুরু হয় এবং এর পরবর্তী বছর আমি G. S. নির্বাচিত হই। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের তেমন কোন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। রাজনৈতিক তৎপরতা হলগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন ঃ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রথম ছাত্রদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?

উত্তর ঃ কায়েদে আযমের '৪৮-এর মার্চের আগমনের পূর্বে এ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে তেমন খবরই ছিল না। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ১১ই মার্চের প্রচেষ্টা এ দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্র মহলে এর বিরোধিতা দেখা যায়নি। হয় সমর্থন না হয় নির্লিপ্ততা ছিল। ব্যাপক প্রতিক্রিয়া '৫২ সালেই হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ ছাত্রজীবনে আমি প্রত্যক্ষভাবে মজলিসের সাথে জড়িত ছিলাম না। রংপুরে আমি যখন কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করি, তখন '৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার দায়ে গ্রেফতার হই। জেল থেকে বের হওয়ার কিছুদিন পর মরহুম সুলায়মান ভাইয়ের মাধ্যমে প্রথম দাওয়াত পাই এবং মজলিসে যোগদান করি। '৫৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মজলিসের রংপুর জেলা শাখার প্রধান ছিলাম। তখন নিয়মিত মজলিসের সম্মেলন ও শিবিরে অংশগ্রহণ করতাম।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন কবে থেকে এবং কিভাবে?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালে মার্চ থেকে ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে শরীক হই। মনে পড়ে ১১ই মার্চ আমরা হলের একদল ছাত্র সংগঠিত হয়ে T & T অফিসের সামনে (বর্তমানে

টেলিফোন একচেঞ্জ ভবন) পিকেটিং করতে যাই। সেখানে আমরা ১০/১২ জন গ্রেফতার হই। আমাদের গ্রেফতার করে তেজগাঁ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এমন এক ঘরে আমাদের আটক রাখে, যার চালা ভাঙ্গা ছিল। এক সময় বৃষ্টি এলে আমরা সবাই ভিজে যাই। আরো মনে পড়ছে, আশে-পাশের মানুষ আমাদের জন্য গুড়-মুড়ি নিয়ে আসে। তা খেয়েই আমরা সারাদিন কাটিয়ে দেই। সন্ধ্যায় আমাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষার দাবীর প্রশ্নে প্রথমে যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে একটু আলোকপাত করুন না। পুরোনো ঢাকায় সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার কিছু জানা আছে? সে সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার কথা বলুন না।

উত্তর ঃ অন্যেরা এ বিষয়ে যা বলেছেন তাই যথেষ্ট। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকেই সিদ্দিক বাজার, বংশাল ও চকবাজার এলাকা মুসলিম প্রধান বিধায় যে কোন আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থনের জন্য সেখানে যেতে হতো। একদল ছাত্র নিয়ে মিছিল সহকারে একদিন চকে গিয়েছিলাম। চুংগা ফুঁকে রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে শ্লোগান দিচ্ছি। জেলের প্রধান ফটক অতিক্রমকালে জেলের ভেতর থেকেও আমাদের গ্রেফতারকৃত সাথীরা শ্লোগানে সাড়া দিয়ে আমাদের সমর্থন জানালো। চক পর্যন্ত যেতে যেতে আমরা তাদের শ্লোগান শুনলাম।

চকবাজার মসজিদের পাশে যখন ভাষার দাবীতে চুংগার মাধ্যমে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তখন সরকার সমর্থক এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার কিছু বিরোধী লোক হামলা করে, আমার হাত থেকে চুংগা কেড়ে নিয়ে মাথায় ও গায়ে চুংগা দ্বারা মারতে থাকে। আমরা বুঝিয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করি। যারা সেদিন ভাষা প্রশ্নে এমন ব্যবহার করেছেন আজো তাঁদের অনেকে বেঁচে আছেন। কর্মজীবনে বহুবার তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে।

টিনের চুংগা ফুঁকে পুরোনো ঢাকার আরো অনেক জায়গায় বক্তৃতা করেছি। শ্লোগান দিয়েছি–'বাংলা উর্দু ভাই ভাই, উর্দুর সাথে বাংলা চাই'। ঢাকার আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল এক ধরনের অশুদ্ধ উর্দু, তাই ভাষা প্রশ্নে তাদের সমর্থন পাওয়া যায়নি। তবে বাংলার বিপক্ষে সব জায়গা থেকে হামলা হয়নি। পুরোনো ঢাকায় মাওলানা দীন মুহাম্মদ (মরহুম), মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী প্রমুখের প্রভাব থাকায় এখানকার অধিবাসীরা উর্দুর পক্ষে ছিল।

তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকার রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিকে ভারতের উস্কানী ও হিন্দুদের আন্দোলন বলে প্রচার করায় জনমনে এ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এ আন্দোলনে সবাই একই উদ্দেশ্যে শামিল হয়নি।

আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। পূর্ব-পাক সাহিত্য সংসদের একজন সক্রিয় সদস্য

হিসেবে সৈয়দ আলী আহসানের সাথে আমার খানিক পরিচয় ছিল। সে সূত্রে তাঁর সাথে পুরোনো রেডিও অফিসে (বর্তমান বোরহান উদ্দীন কলেজ) রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরোধী ছিলেন। এমনি ধরনের আরো অনেকে ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় অনেক বুদ্ধিজীবী এবং সুধী মহলের সমর্থন তখনও বাংলার পক্ষে ছিল না।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের পেছনে কি যুক্তি ছিল? তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন না।

উত্তর ঃ পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণ ছিল বাংলাভাষী। তাই বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে এটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত দাবী।

উর্দু যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাতৃভাষা নয় এটা বাংলাভাষীরা অনেকেই জানতেন না। আর এ জন্যই কায়েদে আযম যখন ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', তখন এটাকে পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা বলে গণ্য করা হয়। অবাঙালী পাকিস্তানীরা যেহেতু উর্দুতেই কথা বলতেন, তাই এটাকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাষা মনে করা হতো। স্বভাবতঃই ছাত্র সমাজের মনে তীব্র বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে।

পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে দুটো গ্রুপ ছিল। এক গ্রুপের নেতা ছিলেন নাজিমুদ্দীন-নূরুল আমিন এবং অন্য গ্রুপের নেতৃত্ব দেন সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম। নাজিমুদ্দীন গ্রুপ উর্দুর পক্ষে ছিল এবং তাই সোহরাওয়ার্দী সাহেব বাংলার পক্ষাবলম্বন করেন। আমরা শামসুল হকের সহকর্মীরা এ গ্রুপেই ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ শামসুল হক সম্পর্কে কিছু বলুন না?

উত্তর ঃ তিনি ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের একজন অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী। পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

প্রশ্ন ঃ বাংলাভাষার বিরোধিতা করেছেন কারা? কোন মানসিকতা তাঁদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

উত্তর ঃ এঁদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক ছিলেন। কেউ কেউ কায়েদে আযমের অন্ধ অনুরাগী। কায়েদে আযম যা বলেছেন এর বিরোধিতা করার কথা এঁরা চিন্তা করতে পারতেন না।

এ দেশের ওলামা সমাজ উর্দুর পক্ষে ছিলেন। এর কারণ হয়ত তাঁদের পরিচিতি বাংলার চেয়ে উর্দুর সাথে ছিল ঘনিষ্ঠতর। এ প্রসংগে পল্টনে মাওলানা দীন মোহাম্মদ সাহেবের এক জনসভার কথা মনে পড়ে, তিনি সভায় উর্দুতে বক্তৃতা শুরু করলে আমরা ছাত্ররা

'বাংলায় বলুন' বলে ধ্বনি তুলি। তখন তিনি বলে উঠেন, 'সিনেমা হলে উর্দু ছবি না হলে মন ভরে না, এখন চান বাংলায় বক্তৃতা'। আমরা চুপ করে যাই। আমাদের তেমন সমর্থকও ছিল না। তখন তিনি উর্দুতেই বক্তৃতা করেন।

নাজিমুদ্দীন সাহেবের সমর্থকরা উর্দুর পক্ষে ছিলেন। কারণ পাকিস্তানের সংহতির জন্য তাঁরা একটা রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনীয়তাবোধ করতেন এবং এজন্য ভাষা আন্দোলনকারীদের তাঁরা হিন্দু কমিউনিষ্টদের এজেন্ট মনে করতেন।

আর একটা শ্রেণীও বাংলা ভাষার বিরোধিতা করেছেন। এঁরা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উর্দুকে হিন্দির বিরুদ্ধে মুসলিম জাতির সাধারণ ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন।

প্রশ্ন ঃ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের ঘটনা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে কতটুকু তাৎপর্যবহ? ১১ই মার্চের পূর্বে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে কোন গণ-বিক্ষোভ বা ধর্মঘট পালিত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ ১১ই মার্চের পূর্বে ভাষা প্রশ্নে কোন গণবিক্ষোভ বা ধর্মঘটের কথা মনে পড়ছে না। কায়েদে আযমের আগমনের পূর্বে এই দাবীর যথার্থতা তুলে ধরার জন্যই প্রথম গণদাবী হিসাবে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন শুরু হয়। ১১ই মার্চ সে বিচারে ঐতিহাসিক মর্যাদা পাওয়ার দাবী রাখে। '৪৮ সালে এটা ছাত্রপ্রধান বিক্ষোভই ছিল।

প্রশ্ন ঃ নাজিমুদ্দীনের সাথে ছাত্রদের ৭ দফা চুক্তি কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হয়? এই চুক্তি কি ১১ই মার্চের ফলশ্রুতি?

উত্তর ঃ পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য নাজিমুদ্দীন সরকার ছাত্রদের সাথে সাত দফা চুক্তি সম্পাদন করেন। কায়েদে আযমের সফর উপলক্ষে পরিস্থিতিকে শান্ত করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ১৫ই মার্চ এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। হ্যাঁ, এই চুক্তি ১১ই মার্চের আন্দোলনের ফল।

প্রশ্ন ঃ ১১ই মার্চে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন না?

উত্তর ঃ আপনাদের পূর্বের সাক্ষাৎকারগুলিতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। নতুন করে আর তেমন কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযম কখন ঢাকা সফরে আসেন? কায়েদে আযমের আগমন উপলক্ষে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছিল কি?

উত্তর ঃ '৪৮ সালের ১৯শে মার্চ তিনি ঢাকা আগমন করেন। ২১শে মার্চ তিনি রেসকোর্সে বক্তৃতা করেন। কায়েদে আযম ইংরেজীতে ভাষণ দিয়েছিলেন। আমি

মঞ্চের পেছনের দিকে এক পাশে বসেছিলাম। পেছন থেকে বক্তৃতারত কায়েদে আযমকে লক্ষ্য করছিলাম। তিনি কখনো কখনো হাত নেড়ে খানিক পা উঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একমাত্র উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হবে শুনার পর আমি ক্ষুব্ধ হয়ে হলে ফিরে আসি এবং সেখানেই রেডিওতে বাকী বক্তৃতাটুকু শুনি।

কার্জন হলে 'নো, নো' প্রতিবাদ ছাড়া অপ্রীতিকর আর কিছু ঘটেনি।

প্রশ্ন ঃ রেসকোর্সের জনসভায় প্রতিবাদ উঠেছিল কি?

উত্তর ঃ আমি কোন প্রতিবাদ উঠতে দেখিনি। অবশ্য আমার বসার স্থান থেকে বিশাল জনসভার সামান্য অংশই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তেমন কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। আমি ক্ষুব্ধ মনে চলে আসার সময়ও কোথাও থেকে কোন আওয়াজ শুনিনি। পরেও কেউ এ প্রসঙ্গে বলেনি।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের সঙ্গে ছাত্র প্রতিনিধি দলের যে সব সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্পর্কে কিছু আলোচিত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ শুধু হল ইউনিয়নের V. P. ও G. S.-রাই উক্ত সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন। আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমাদের হলের V. P. ছিলেন তোয়াহা সাহেব। আমরা একই দলের ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্বলিত কোন স্মারকলিপি দেয়া হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, স্মারকলিপি দেয়া হয়েছিল। শুনেছি, একাধিক রাষ্ট্রভাষার নজীর দেখালে তিনি তা অবগত আছেন বলে জানান। কিছুটা বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন, 'Now leave It to me'.

প্রশ্ন ঃ কার্জন হলের কনভোকেশনে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ ওটা ছিল বিশেষ কনভোকেশন। আমি তখন এম, এ, পড়ি। তাই সে কনভোকেশনে উপস্থিত ছিলাম না। সেখানকার ঘটনা পরে বন্ধুদের কাছে জেনেছি।

প্রশ্ন ঃ তোয়াহা সাহেব আপনার হলের V. P. ছিলেন বলেছেন। তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তর ঃ পূর্বেই বলেছি, তখন আমরা একই দলে ছিলাম। আমাদের মাঝে খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল। একই সাথে ওঠা-বসা, চলাফেরা ছিল। হল কেন্টিনে একসাথে নাস্তা খেতে যেতাম। তোয়াহা সাহেব খুব ভাল কোরআন তেলাওয়াত করতেন। নামাযও পড়তেন।

প্রশ্ন ঃ লিয়াকত আলী খান কখন ঢাকা সফরে আসেন? তিনি ঢাকায় কোন ছাত্র

সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন কি?

উত্তর ঃ '৪৮ সালে তিনি ঢাকা সফরে আসেন। কোন মাসে ঠিক মনে নেই। তবে শীতকাল ছিল বলে মনে পড়ে। হ্যাঁ, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাসিয়াম মাঠে এক বিরাট ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দেন। সভাপতি ছিলেন কার্যরত ভাইস চ্যান্সেলর জনাব সুলতান উদ্দীন আহমদ।

প্রশ্ন ঃ ছাত্রদের পক্ষ হতে লিয়াকত আলী খানকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত কোন মেমোরেণ্ডাম প্রদান করা হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ছাত্রদের পক্ষ হতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত একটি মেমোরেণ্ডাম প্রদান করা হয়। ডাকসুর জি, এস, হিসাবে আমি ঐ মেমোরেণ্ডাম পাঠ করি। ভাষার কথাটা ছিল প্রায় শেষের দিকে। এর পূর্বে আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার নিন্দা ছিল। মনে পড়ে, ভাষার দাবীর প্যারাটা দু'বার পড়েছিলাম। একবার পড়ার পর ছাত্র সমাবেশে তুমুল করতালি পড়ে। করতালি শেষ হলে আমার কানে এলো– বেগম রানা লিয়াকত আলী রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত প্যারাটি শুনে লিয়াকত আলী খানকে বলছেন, "ল্যাঙ্গুয়েজকে বারে মে সাফ সাফ বাতা দেনা।" যেখানে দাঁড়িয়ে স্মারকলিপি পাঠ করছিলাম, তার পাশে রানা লিয়াকত বসেছিলেন। তাঁর কথা শুনে, আমি 'Let me repeat this' বলে আবার ভাষার দাবীর প্যারাটা পড়লাম। আবারও এ দাবীর সমর্থনে সমাবেশে তুমুল করতালি পড়ে।

প্রশ্ন ঃ সমাবেশে রাষ্ট্রভাষার স্মারকলিপিটি পাঠ করার দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পিত হলো কিভাবে?

উত্তর ঃ চারটি হল ইউনিয়নের ছাত্র নেতৃবৃন্দ সঙ্গত কারণেই ডাকসুর কাউকে দিয়ে স্মারকলিপি পেশ করতে ঐকমত্যে পৌঁছেন। V. P. অরবিন্দু বোস ছিলেন হিন্দু। তাঁকে দিয়ে পাঠ করালে সরকার তা ভিন্নভাবে চিত্রিত করতে পারেন। তাই ডাকসুর জি, এস, হিসাবে দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়।

প্রশ্ন ঃ ভাষা প্রশ্নে লিয়াকত আলী খান কি মন্তব্য করেছিলেন?

উত্তর ঃ বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "If it is not provincialism, then what is provincialism?" তাঁর একথাগুলো শুনে আমরা ভেবেছিলাম, তিনি হয়ত ভাষা প্রশ্নে সুস্পষ্ট কোন মন্তব্য রাখবেন। কিন্তু না, তিনি আর কিছু বলেন নি। গোটা প্রসংগটাই এড়িয়ে গেলেন।

প্রশ্ন ঃ '৪৮-এর ১১ই মার্চের কর্মসূচীর উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ হল ইউনিয়ন সমূহের নেতৃবৃন্দ এবং প্রথম রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নেতৃবৃন্দের যৌথ উদ্যোগেই ১১ই মার্চের হরতাল ও গণবিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ছিল?

উত্তর ঃ '৪৮ সালের পর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পাকিস্তানের উজীরে আযম খাজা নাজিমুদ্দীনের পল্টনের ঘোষণা। '৫২ সালে পল্টন ময়দানে তিনি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত কায়েদে আযমের উক্তির পুনরাবৃত্তি করার পরই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন প্রথম গণ-দাবীতে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কখন গঠিত হয়।

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে আমি অবগত নই। আমি তখন অধ্যাপনা করি।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ বামপন্থীরা পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী থাকায় তাতে মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য ছিল। বামপন্থীদের কোন প্রকাশ্য তৎপরতা ছিল না। '৫২ সালের পর তাঁরা সক্রিয় হন। কিন্তু তখনও উল্লেখযোগ্য কোন সংগঠন গড়ে উঠেনি। অধিকাংশই আওয়ামী মুসলিম লীগের মাধ্যমে কাজ করতেন। সুতরাং আন্দোলনে তাদের ভূমিকা পৃথক করে দেখার কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতায় শেখ মুজিবের সাথে আপনার কোন আলাপ-পরিচয় গড়ে উঠেছিল কি?

উত্তর ঃ শেখ মুজিব তখন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারের প্রাক্কালে। '৫৪ সালে রংপুর নির্বাচনী সফরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এক গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরে ভাষণ দিতে যান। শেখ মুজিবও তাঁর সাথে ছিলেন। আমি তখন অধ্যাপনা করি। সে সময় শেখ মুজিব আমাকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন– 'ইনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের প্রাক্তন জি, এস,। '৪৮ সালে লিয়াকত আলী খানের নিকট রাষ্ট্রভাষা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি ইনিই পেশ করেছিলেন।' শেখ মুজিব আমার তখনকার পরিচিতিও তুলে ধরেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি ঢাকা ডাইজেস্টে প্রকাশিত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিশেষ সাক্ষাৎকারগুলি পড়েছেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পড়েছি খুব মনোযোগ দিয়ে, আগ্রহের সাথে।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ব্যাপারে ঢাকা ডাইজেস্ট যে উদ্যোগ নিয়েছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে বলে মনে করেন নি?

উত্তর ঃ এ প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত হচ্ছে কিনা জানি না। ঢাকা

ডাইজেস্টে প্রকাশিত বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ ইতিহাসের একই ঘটনাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

প্রশ্ন ঃ '৫২ সালে আপনি কোথায় ছিলেন? সেখানে আন্দোলনের পরিস্থিতি কেমন ছিল?

উত্তর ঃ রংপুর কারমাইকেল কলেজে। সেখানে কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক এবং ছাত্রনেতা ও রাজনীতিক এ আন্দোলন চালান। আমি ও বাংলার অধ্যাপক জমির উদ্দীন (বর্তমানে কুমিল্লায় আছেন) এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার হই।

প্রশ্ন ঃ আন্দোলন সম্পর্কে আপনার আর কোন বক্তব্য আছে কি?

উত্তর ঃ বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও একে এতদিন সরকারী পর্যায়ে মর্যাদা দেয়া হয় নি। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হওয়ায় সে সুযোগ এসেছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
জানুয়ারী ১৯৭৯

সৈয়দ মুজিবুল্লাহ

[জনাব আবুল হাশিম এই উপমহাদেশে একজন বিরল প্রতিভার অধিকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে স্বভাবতঃই তাঁর নাম স্মরণে আসে। ১৯৫২ সালের ২০শে জানুয়ারী বিকেলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং তাঁর সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠিত হয়। কর্মপরিষদের এ মিটিংয়েই পরদিন (একুশে ফেব্রুয়ারী) ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী সকালে তিনি গ্রেফতার হন এবং প্রায় ১৬ মাস কারারুদ্ধ থাকেন।

আবুল হাশিম ১৯০৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোঃ আবুল কাসেম ভারতের একজন নামযাদা ব্যক্তি এবং মুসলমানদের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন।

জনাব আবুল হাশিম ১৯২৮ সালে কোলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি বর্ধমান জেলা বারে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪১ সালে তিনি প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে তিনি 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগের' জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এবং পাকিস্তান অর্জন পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শরৎ বোস সহ 'ইউনাইটেড সভরীন বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে 'বাংলা' ভাগ হওয়ার পর হতে ১৯৫০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি পশ্চিম বঙ্গে অবস্থান করেন। এবং পশ্চিম বঙ্গ পরিষদের বিরোধী দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালে তিনি পাকিস্তানে আগমন করতে বাধ্য হন।

তিনি পাকিস্তানে এসে তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করেন, কিন্তু বিরোধী

দলে যোগ দেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬০ সালে তিনি 'ইসলামিক একাডেমীর' প্রথম ডিরেক্টরের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৬২ সালের আগষ্টে তিনি 'পাকিস্তান ইসলামিক কাউন্সিলের' সদস্য মনোনীত হন। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের 'চীফ অর্গানাইজারের' দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আবুল হাশিম

জনাব আবুল হাশিম একজন প্রখ্যাত লেখক এবং চিন্তাবিদ। ১৯৫০ সালে তাঁর প্রথম বই "Creed of Islam" প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে "Arabic Made Easy," 'সুরা ফাতেহার তফসির', "As I see it" প্রভৃতি গ্রন্থ।

১৯৭৪ সালের ৫ই অক্টেবর বিকেলে জনাব আবুল হাশিম ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি বেঁচে থাকলে আমরা ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ইতিহাসের অনেক তথ্য আহরণ করতে পারতাম। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা তাঁর পি, এ, এবং সর্বক্ষণের সহচর জনাব সৈয়দ মুজিবুল্লাহর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। তিনি কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ী হয়েও ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাভাষা সম্পর্কে আবুল হাশিমের দৃষ্টিভঙ্গী এবং অবদান সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন। আমরা আশা করি এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে কিছু মূল্যবান তথ্য জোগাবে।]

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন থেকে জনাব আবুল হাশিমের নিত্য সহচর?

উত্তর ঃ ১৯৫০ সালের এপ্রিলে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঢাকায় চলে আসেন। বলা যায় তখন থেকে আমি তাঁর নিত্য সহচর। অন্ধ মানুষ ছিলেন তিনি। মিটিং, সেমিনার, সরকারী, বেসরকারী, ব্যক্তিগত সব কাজে আমিই নিয়ে যেতাম তাঁকে।

প্রশ্ন ঃ তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন কোন সালে? তাঁর প্রাথমিক রাজনৈতিক জীবন এবং মানসিকতা সম্পর্কে কিছু বলুন না।

উত্তর ঃ ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে যখন পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন তিনি বর্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট তখন মাওলানা আকরাম খাঁ এবং জেনারেল সেক্রেটারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগের জেনালের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। বলতে গেলে তখন থেকে তাঁর 'mighty leadership' আরম্ভ হয়। মুসলিম লীগের রাজনীতিকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসার জন্য বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা শুরু করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের যুবকর্মীরা তখন তাঁর বক্তৃতা শুনার জন্য পাগলপারা। যুব কর্মীদের সংগঠিত করার জন্য ১৯৪৪ সালে ঢাকায় ১৫০, মোগলটুলীতে মুসলিম লীগের ক্যাম্প অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। শামসুল হককে এই অফিসের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মোগলটুলীকে কেন্দ্র করে যুবকর্মীদের প্রধান রাজনৈতিক শিবির গঠিত হয়। এই

শিবিরের কর্মী ও নেতারা পাকিস্তান অর্জনের পর আবুল হাশিম গ্রুপ হিসেবে পরিচিত ছিল। বস্তুতঃ এরা সবাই আবুল হাশিমের রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। আবুল হাশিম সাহেব মুসলিম লীগকে আহসান মঞ্জিলের অভ্যন্তর থেকে সাধারণ কর্মীদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর গণমুখী কর্মতৎপরতার জন্য তিনি যুবকর্মী ও সাধারণ মুসলিম লীগ কর্মীদের নিকটে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ 'Sovereign United Bengal Movement'- এর সাথেও নাকি তিনি জড়িত ছিলেন। এ আন্দোলনের সাথে তিনি কখন জড়িত হন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, শরৎ বোসকে সাথে নিয়ে তিনি 'Sovereign United Bengal'- প্রতিষ্ঠার জন্যও আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি একান্ত বিশ্বাস নিয়েই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। মুসলিম ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে এ আন্দোলনের পরিকল্পনা করলেও সামগ্রিকভাবে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং সমর্থকরা 'Sovereign United Bengal' প্রতিষ্ঠাকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে পিছিয়ে যায়। ফলে এ আন্দোলন আর সফল হয় না। যতদূর মনে পড়ে '৪৭-এর জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারীর দিকে কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, Sovereign United Bengal-এর যে পরিকল্পনা তাঁর ছিল তার রাষ্ট্রভাষা ছিল বাংলা।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তান অর্জনের পূর্বে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত তাঁর আর কোন প্রচেষ্টার কথা আপনার জানা আছে কি?

উত্তর ঃ ১৯৪৫ সালে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে তিনি দলের একটি মেনিফেষ্টো তৈরী করেছিলেন। সে মেনিফেষ্টোতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। মুসলিম লীগ কমিটিতে সে মেনিফেষ্টো পাশ হয়নি। উল্লেখযোগ্য যে, উদ্যমশীল তরুণ কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ডঃ নিখিল চক্রবর্তী এই মেনিফেষ্টো তৈরীর কাজে জনাব আবুল হাশিমকে সহযোগিতা করেছিলেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগে এই মেনিফেষ্টো পাশ না হলেও তিনি ছেপে তা কর্মীদের মাঝে বিতরণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ স্বাধীনতার পূর্বে কোন সভায় ভাষা প্রশ্নটি আলোচিত হয়ে ছিল কি?

উত্তর ঃ আমার জানামতে '৪৭-এর আগষ্টের দিকেই কোলকাতার বউ বাজারের এক হোটেলে এক সভা হয়। হোটেলটির নাম আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এটাই ছিল একটি প্রধান রাজনৈতিক আড্ডাস্থল। ঐ সভায় ছিল আতাউর রহমান (রাজশাহী), আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী (দৈনিক বাংলার জয়েন্ট এডিটর), আবদুর রশিদ খান (রাজশাহী), শহীদুল্লাহ কায়সার, আলম (গাইবান্ধা) প্রমুখ। এদের সাথে Forward Block-এর কয়েকজন ছিল বলে মনে পড়ে। Forward Block- সে সময় Bengali Nationalism এ বিশ্বাস করতো। সে

সভায় ভাষা প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে ফ্রি শিক্ষাদানের একটি দাবী সে সভায় আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তান লাভের পর প্রথম কারা রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি উত্থাপন করে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ পাকিস্তান লাভের পর প্রথম তমদ্দুন মজলিসই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করে।

প্রশ্ন ঃ আবুল হাসিম সাহেব তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে জড়িত হন কি ভাবে?

উত্তর ঃ ১৯৫০ সালে এখানে আগমনের পর তিনি রাজনৈতিক যুবকর্মীদের আন্দোলনের দিশারীতে পরিণত হন। সকলেই আসতো তাঁর কাছে উপদেশ নেয়ার জন্য। মজলিস কর্মীরাও আসতো। পরে তিনিই মজলিস সংগঠক, নেতা ও কর্মীদের প্রধান পথনির্দেশকে পরিণত হন। এর পর তিনি মজলিসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। এমন কি পরিশেষে মজলিস কর্মী ও নেতাদের নিয়ে খেলাফতে রাব্বানী পার্টি গঠন করেন। তিনিই খেলাফতে রাব্বানী পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

প্রশ্ন ঃ কোন সালে খেলাফতে রাব্বানী পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে এই পার্টির বক্তব্য কি ছিল?

উত্তর ঃ ১৯৫১ সালে তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিস কর্মী এবং সমর্থক সবাই রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে কাজ করেছিল। বস্তুতঃ মজলিস কর্মীরাই ছিল ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিক। আর আবুল হাশিম সাহেব ছিলেন পার্টির চেয়ারম্যান। সুতরাং খেলাফতে রাব্বানী পার্টির মেনিফেষ্টোতে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সুস্পষ্ট দাবী হিসেবে সন্নিবেশিত হয়।

প্রশ্ন ঃ '৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী নবাবপুরে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের যে মিটিং হয় তাতে কি তিনিই সভাপতিত্ব করেন? আপনিই তো তাঁকে সব জায়গায় নিয়ে যেতেন, সে সভায় কি আপনি উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভায় তিনিই সভাপতিত্ব করেন। আমিই সাধারণতঃ সব জায়গায় তাঁকে নিয়ে যেতাম। কিন্তু সেদিন বিশেষ কি কারণে আমি সাথে যাই নি। মিটিং থেকে ফিরতে তাঁর দেরী হলে আমরা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী কি তিনি কোন সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন?

উত্তর ঃ সভাপতিত্ব করার জন্য তাঁকে নেয়া হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ভার্সিটির কয়েকজন ছেলে আসলো তাঁকে নেয়ার জন্যে। কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল থেকে ধর্মঘটের জন্য গাড়ী-ঘোড়া বন্ধ। সুতরাং তাঁকে নেয়ার উপায় কি। পরিশেষে তাঁকে সাইকেল-সিটে বসিয়ে টেনে টেনে ভার্সিটি গেলাম। সেখানে বেশ কিছু সময় প্রতীক্ষা করার পরও উদ্যোক্তারা সভা আয়োজন করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে পুলিশের Action শুরু হয়ে গেছে। তখন তাঁকে পরিষদ ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হল) পাশে

এক বিল্ডিং এর দোতলায় নিয়ে বসাই। আমরা সেখানে অবস্থান কালেই গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। বেলা সাড়ে তিনটা চারটার দিকে মেডিকেলের পশ্চিমের গেইট দিয়ে বের হয়ে বক্‌শী বাজার হয়ে অনেক কষ্টে এক বাসায় উঠি। বৃদ্ধ অন্ধ মানুষ হাঁটতে পারেন না যানবাহনও নেই। কি অসুবিধা আর দুর্ভোগে যে পড়েছিলাম বুঝতেই পারছেন।

প্রশ্ন ঃ তিনি কি পরে গ্রেফতার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী সকালে গোপীবাগ থার্ড লেনের বাসা হতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী খুব ভোরে পুলিশ এসে বাসা ঘেরাও করে। জনাব আবুল হাশিম দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে ডেকে সস্নেহে বলেন, 'বাবা, গ্রেপ্তার যখন করতে এসেছো করো। তবে আমাকে ওজু গোসল সেরে নামাজ ও খাওয়া দাওয়া সারতে দাও।' পুলিশ অফিসার তাঁর কথায় সম্মতি জানান। তিনি সব কাজ সেরে বেলা ১১টার দিকে পুলিশের সঙ্গে যান। তাঁকে প্রথম সুত্রাপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমিও হাশিম সাহেবের সঙ্গে থানা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক অজিত গুহ গ্রেপ্তার হয়েছেন। সুত্রাপুর থেকে হাশিম সাহেবকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে তাঁকে স্থানান্তর করে নেওয়া হয় সিলেট জেলে। মুক্তির পূর্বে তাঁকে পুনরায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আনা হয়। বৃদ্ধ বয়সে প্রায় ১৬ মাস তিনি কারারুদ্ধ থাকেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯

আতাউর রহমান খান

[জনাব আতাউর রহমান খান বাংলাদেশের অন্যতম প্রবীণ রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব তিনি। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের" তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের অনেকের গ্রেফতার ও আত্মগোপনের পর, পরবর্তী পর্যায়ে পুনর্গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের তিনি আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

জনাব আতাউর রহমান ১৯০৭ সালে ঢাকা জেলার ধামরাই থানার বালিয়া গ্রামে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় গ্রামে ও ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরকপুর জেলায় তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন।

১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে জনাব খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল' পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে আইন পাশ করেন।

১৯৩৭ সালে আইন ব্যবসা শুরু করার মাধ্যমে তিনি কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি বিচার বিভাগে মুনসেফ পদে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে মুনসেফের পদ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে এবং ১৯৫৩ সালে সুপ্রিম কোর্টে এডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৬০ সালে তিনি 'ঢাকা জেলা বার এসোসিয়েশনের' সভাপতি এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তিনি হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৪ সাল হতেই জনাব আতাউর রহমান খানের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। এ সময় তিনি

কৃষক-প্রজা পার্টির ঢাকা জেলার জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে জনাব খান ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনেই 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। তিনি দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং বিভিন্ন সময়ে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও পালন করেন।

১৯৫০ সালে তাঁর সভাপতিত্বেই ঢাকায় পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত জাতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার দাবীও জানানো হয়।

১৯৫২ সালে জনাব আতাউর রহমান খান পিকিং-এ অনুষ্ঠিত 'এশীয় এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় পিস কনফারেন্সে' যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে জনাব খান লণ্ডন, জুরিখসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ সফর করেন।

১৯৫৪ সালে জনাব আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ও ডেপুটি লিডার নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালে জনাব আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের 'চীফ মিনিস্টার' নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়া পর্যন্ত সে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

জনাব খান ১৯৬২ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লীগের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

১৯৭০ সালে তিনি পাক–সোভিয়েট মৈত্রী সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তাসখন্দ, সমরখন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান সফর করেন।

১৯৭০ সালে রাজনৈতিক সহযোগীদের নিয়ে তিনি জাতীয় লীগ গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। এবং বিরোধী দলের নেতৃত্ব লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে জনাব খান জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তঃ-পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন কাউন্সিলে এক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৭৫ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অপর একটি পার্লামেন্টারী দলের সদস্য হিসাবে লণ্ডন সফর করেন। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে পুনর্গঠিত করে দলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তিনি ১৯৮১ সালে সরকারী প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জাপান, ১৯৮৩ সালে ইরাক এবং ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে পুনরায় চীন সফর করেন।

জনাব খান ১৯৭৭ সালে হজ্জ পালন করেন। জনাব খান "ওজারতির দুই বছর" ও "স্বৈরাচারের দশ বছর" নামে দু'টি পরিচিত গ্রন্থের লেখক।

১৯৮৪ সালের ৩০শে মার্চ তিনি লেঃ জেনারেল হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদের মন্ত্রী পরিষদের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

জনাব আতাউর রহমান খানের তিন পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে।

'৭৮ সালের জুলাই মাসে পেশাগত কাজে ব্যস্ত থেকেও জনাব আতাউর রহমান খান অশেষ

ধৈর্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত ঢাকা ডাইজেস্টের এ বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আমরা আশা করি এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য প্রদান করবে।]

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই কি রাজনীতিকরা এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ না, প্রথম দিকে এ আন্দোলন মূলতঃ ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর '৫২ সালের জানুয়ারীতে খাজা নাজিমুদ্দীনের উর্দুর স্বপক্ষে ভাষণের পূর্ব পর্যন্ত এ আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত ছিল, তাই এ আন্দোলন '৫২ সালের পূর্বে সামগ্রিকভাবে জনগণের মাঝে যথার্থ সাড়া জাগাতে পারে নি। রাজনীতিকগণ প্রথম থেকে প্রত্যক্ষভাবে এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন না।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কখন, কোন ঘটনার সূত্রে ভাষা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হন?

উত্তর ঃ ১৯৫০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত "মূলনীতি নির্ধারক কমিটির" সুপারিশ পেশ করা হয়। এই কমিটির অন্যান্য অবাঞ্ছিত সুপারিশের সাথে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

"মূলনীতি নির্ধারক কমিটির" পেশকৃত সুপারিশের প্রতিবাদে ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর ঢাকা বার লাইব্রেরীর এসোসিয়েশন হলে এক জাতীয় মহাসম্মেলন (Grand National Convention) অনুষ্ঠিত হয়। আমার সভাপতিত্বেই এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় মহাসম্মেলনে যে শাসনতান্ত্রিক সুপারিশসমূহ পেশ করা হয় তার মধ্যে বাংলাকেও পকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ তা হলে ১৯৫০ সালের পূর্বে কি ভাষা প্রশ্নে রাজনীতিকদের উদ্যোগে কোন আনুষ্ঠানিক দাবী উত্থাপিত হয়নি?

উত্তর ঃ দাবী যে উত্থাপিত হয়নি একথা ঠিক নয়। তবে রাজনীতিকদের কোন সভা বা সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাষা প্রশ্নে এর পূর্বে কোন দাবী উত্থাপিত হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা আমার জানা নেই।

প্রশ্ন ঃ তবে কি ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত অবহিত নন?

উত্তর ঃ পূর্বেই বলেছি, তখন এ আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখন আমরা এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। তাই তখনকার সকল ঘটনা বিস্তারিতভাবে আমার জানা নেই। যে দু'একটি ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ছিলাম বা উপস্থিত ছিলাম তাও দেখছি বিকৃতভাবে পরিবেশিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ সে দু' একটি ঘটনার কথা বলুন না।

উত্তর ঃ যেমন কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেবের ভাষণের কথা। ঢাকা ডাইজেস্টের এক সাক্ষাৎকারেও বলা হয়েছে, কোন ছাত্র প্রতিবাদ করেছিল, তা চিহ্নিত করা হাস্যকর; কিন্তু তা ঠিক নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো জিন্নাহ সাহেব উর্দুর স্বপক্ষে মন্তব্য করার পর আমাদের দুই 'রো' সামনে বসা নঈমুদ্দীন 'নো নো' বলে দাঁড়িয়ে উঠার সাথে আমরা সহ আশে পাশের সবাই 'নো নো' বলে দাঁড়িয়ে উঠি।* জিন্নাহ সাহেব 'it is my view' বলে বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করেন নি। 'I hope Bengal will not fail me' বলে তিনি সেখানেই বক্তব্য শেষ করে চলে যান। তখন এলোমেলোভাবে বের হবার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি– শেষে ঘেরাও করে 'নো, নো' বলার হোতাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলে নাকি ভেবে। কারণ তখন কায়েদে আযমের মতো নেতার মন্তব্যের প্রতিবাদ করা সোজা কথা ছিল না। তবে তেমন কিছু ঘটেনি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আবদুল মতিন সাহেব প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন বলে যে বলা হয়ে থাকে, তা কি ঠিক নয়?

উত্তর ঃ ঘটনাটি আমার সামনেই ঘটেছিল এবং নঈমুদ্দীন আমাদের দু'সারি সামনেই বসা ছিল। নঈমুদ্দীন ছাড়া অন্য কাউকে প্রথম দাঁড়াতে আমি দেখিনি। নঈমুদ্দীনের ওঠে দাঁড়ানোর কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কার্জন হলের সভায় কি হিসেবে গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ ইউনিভার্সিটির রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট হিসেবে আমি দাওয়াত পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের রেসকোর্সের জনসভায় প্রতিবাদে কারা উদ্যোগ নিয়েছিল? আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ কায়েদে আযমের রেসকোর্সের জনসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে কোন প্রতিবাদ হয়নি। সে ধরনের পরিবেশও তখন ছিল না। আমি যতদূর জানি তেমন কোন পরিকল্পনাও ছাত্রদের ছিল না।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎকারে আপনি উপস্থিত ছিলেন বলে জনাব বদরুদ্দীর উমরের নেওয়া ইন্টারভিউতে যে বিবরণ দিয়েছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে জনাব বদরুদ্দীন উমর সে সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সে প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি? আপনি কি তা হলে কায়েদে আযমের সাথে সাক্ষাৎকারে আপনার কাল্পনিক উপস্থিতির কথাই বর্ণনা করেছেন?

---

* জিন্নাহ সাহেব তাঁর বক্তৃতা 'নো, নো' প্রতিবাদ ধ্বনি উঠার পর সমাপ্ত করেন নি। –মো. কা. (পরিশিষ্টতে কায়েদে আযম জিন্নাহর ভাষণের অনুলিপি দ্রষ্টব্য)

উত্তর ঃ জনাব বদরুদ্দীন উমরের সাথে আমার কোন 'ফরমাল' ইন্টারভিউ হয়নি। তাঁর 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' বইটির প্রথম খণ্ড পড়ে দেখতে পেলাম, এতে কয়েকটি ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। একদিন বদরুদ্দীন উমর আমার সাথে দেখা করতে আসলে বললাম, 'তোমার বইতে কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তি রয়েছে। অন্যের মুখে শুনেছ, হয়তো তারাই ভুল বলেছে। যেমন শামসুল হকের নির্বাচনী মামলায় বিচারকের একজনের নাম দিয়েছ আমির উদ্দীন আহমদ। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন বিচারপতি আমিন আহমদ। আর একজনের নাম ছিলো টি হোসেন–তাসাদ্দুক হোসেন তাঁর নামের পরিবর্তে অন্য এক নাম দিয়েছ। উনিশ শ' ঊনপঞ্চাশ সালে গোলাববাগে যে সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল, সে সম্মেলনে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। একথা উল্লেখ করোনি। সম্মেলনের প্রাক্কালে মাওলানা ভাসানীর অবস্থান সম্পর্কে যা লিখেছ তাও ঠিক নয়। তার একরাত পূর্বে তিনি সারারাত আমার বাসায় ছিলেন।'

বদরুদ্দীন উমর আমার সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলো করেছে তা পড়ে আমি অবাক হয়েছি। কায়েদে আযমের সাথে সাক্ষাৎকারে আমার উপস্থিতির ওপর কোন গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি। কথাটা উঠেছিল এই প্রসঙ্গে যে, শামসুল হক নামাজ পড়বার জন্য জায়নামাজ চায় এবং জায়নামাজ আসলে সেটা নিয়ে আমরা নামাজ পড়ি। এখানেই আমার বক্তব্য। আমি বলেছিলাম, এই নামাজের ঘটনা আমার উপস্থিতিতে ঘটে। জিন্নাহ সাহেবের সাথে কথা বলার পর শামসুল হক নামাজের সময় হওয়ায় জায়নামাজের কথা বলে। মিলিটারী সেক্রেটারী জায়নামাজ এনে দিলে, সেই জায়নামাজ নিয়ে লনে গিয়ে শামসুল হক সহ নামাজ পড়ি। আমি নামাজ পড়াই। আর কেউ ছিল কিনা মনে পড়ে না। এই সাক্ষাৎকার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ছিল এমন কথা বলিনি। এ সাক্ষাৎকারে শামসুল হক ছিলেন। সম্ভবতঃ তোয়াহা সহ আরো ৩-৪ জন ছিলেন। নামাজের প্রসঙ্গ আসাতেই আমি বলেছিলাম, সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলাম। সেটা যে সাক্ষাৎকারেই হউক না কেন, হয়ত শামসুল হকই এটাকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে জুড়ে নিয়েছেন। এ সাক্ষাৎকারে আমার উপস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে আমি কোন উক্তি করিনি। প্রয়োজনও ছিল না। এ প্রসঙ্গে এত সব কথাও হয়নি। কামরুদ্দীন সাহেবের সাথে টেলিফোনে এ নিয়ে আলাপ করার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। অথচ বদরুদ্দীন উমর এমনভাবে বর্ণনা দিয়েছে যে, মনে হয় এ ব্যাপারে বারবার আমাকে জেরা করা হয়েছে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি প্রথমে আঁতকে উঠেছি, এক পর্যায়ে বার বার জেরার মোকাবেলায় দুর্বল হয়ে পড়েছি, তারপর ঘটনার বিবরণ দিতে সক্ষম হয়েছি, কারণ বহুবার শুনে শুনে গল্পটি এত পরিচিত হয়েছে যে আমি ভুলবশতঃ তাতে নিজের উপস্থিতিও ধরে নিয়েছি। ইত্যাকার গল্পের অবতারণা বড়ই দুঃখজনক। এমন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আমার মানসম্মান নির্ভর

করছিল এ সাক্ষাৎকারের সত্যতার ওপর এবং যে প্রকারেই হউক আমি আমার উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। কিন্তু বদরুদ্দীন উমর আমার সে চেষ্টা বিফল করে দিয়েছে। এমন প্রকৃতি আমার নেই। এমন কোন কল্পনাও ছিল না। বদরুদ্দীন উমর পিতৃ-সুবাদেও আমার স্নেহভাজন সুলেখক। তাই ভেবে অবাক হই, কেমন করে এতগুলো কথার সমাবেশ সে করতে পারলো।

কথা প্রসঙ্গে পূর্বে বলেছি যে, বদরুদ্দীনের বইতে দু'এক জায়গায় ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছি যে, অনেক জনের মুখে মুখে তথ্যের বিকৃতি ঘটতে পারে। ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের অপলাপ করেছে এ কথা কখনো বলিনি। বলতে পারবো না। তবু এরই ওপর এমন ঘটনার অবতারণা? তাও প্রায় এক যুগ পর!

প্রশ্ন ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের যে বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ না, সে বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম না। কারণ আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কেসের ব্যাপারে ময়মনসিংহ ছিলাম। মোনায়েম খান তখন ময়মনসিংহ কোর্টে প্র্যাক্টিস করছেন। কোর্টে আমার সাথে দেখা হলে তিনিই প্রথম আমাকে বলেন, 'আরে, আপনি এখনও এখানে, ঢাকায় গুলি হয়েছে, শুনেন নি?' এর পরদিনই ঢাকায় চলে আসি। ঢাকায় এসে দেখি ধর্মঘটে জীবনযাত্রা একেবারে অচল, বাক্সপেটরা নিয়ে হেঁটেই অনেক কষ্টে পুরোনো ঢাকায় বাসায় পৌছি।

প্রশ্ন ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্তকে আপনি গণতান্ত্রিক মনে করেন কি?

উত্তর ঃ যে পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক বলতে হয়।

প্রশ্ন ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের কোন সাব কমিটি বা শাখা ইউনিট গঠিত হয়েছিল কি। বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমন কোন শাখা ইউনিটের অস্তিত্ব ছিল না– এ কথা কি সত্যি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের কোন সাব-কমিটি বা শাখা ইউনিট গঠিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমন কোন শাখা ইউনিটের অস্তিত্ব থাকার কথা নয়।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণজনিত ঘটনার ব্যাপারে সে সময়ের প্রশাসনিক বাড়াবাড়ি ও পুলিশী তৎপরতাকে আপনি কতটুকু দায়ী মনে করেন?

উত্তর ঃ ঘটনার অবনতি এবং গুলীবর্ষণজনিত ঘটনার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনিক বাড়াবাড়ি ও পুলিশী তৎপরতাই দায়ী। ১৪৪ ধারা জারি করার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। সরকার চরম ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে গুলিবর্ষণের দুঃখজনক ঘটনা ঘটতো না।

প্রশ্ন ঃ কর্মপরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব সহ অনেকে গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের কোন উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতা ছিল না। আপনি কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য তেমন কোন চেষ্টা করেন নি। এসব অভিযোগের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ এসব অভিযোগ সত্যি নয়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার সকল চেষ্টাই আমরা করেছি। আমি আহ্বায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য আমাদের চেষ্টা ও আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। গুলিবর্ষণজনিত ঘটনার যথার্থ তদন্তের জন্য সরকার 'এলিস কমিশন' গঠন করলে আমরা তার প্রতিবাদ করি এবং 'এলিস কমিশন' বয়কট করি।

প্রশ্ন ঃ 'এলিস কমিশন' কখন গঠিত হয়? কমিশনের বয়কটের ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি ছিল?

সম্ভবতঃ মার্চ-এপ্রিলের দিকে 'এলিস কমিশন' গঠিত হয়। আমাদের বক্তব্য ছিল– আগে দেখতে হবে ১৪৪ ধারা জারি করা সঙ্গত ছিল কিনা, তারপর গুলিবর্ষণের প্রশ্ন। অযৌক্তিকভাবে ১৪৪ ধারা জারি না করলে গুলিবর্ষণের প্রশ্ন আসতো না। সুতরাং ১৪৪ ধারা জারির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে গুলিবর্ষণের যৌক্তিকতা নিরূপণ অর্থহীন। কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য থেকে সরকার প্রকারান্তরে যেন এই বলতে চান, 'যাহারা গুলি খাইয়া মরিয়া গিয়াছে তাহাদের এইভাবে মরিয়া যাওয়াই উচিত ছিল।' কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে আমরা বলিষ্ঠভাবে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম এবং কমিশন বয়কট করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ 'এলিস কমিশনের' কোন রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ না, এলিস কমিশনের কোন রিপোর্ট প্রকাশ হয়নি।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কতজন গ্রেফতার হয়েছিলেন? কারা গ্রেফতার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ কতজন গ্রেফতার হয়েছিলেন আজ স্মরণ নেই। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাই সবার নাম বলাও সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ শুধু ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসই নয়, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যেভাবে বিকৃতির চেষ্টা চলছে তাতে শংকিত হওয়ার কারণ রয়েছে। জাতীয় ইতিহাস এবং ঘটনাক্রম বিকৃতির যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তা জাতির জন্য কোনক্রমেই শুভ নয়। সত্য ঘটনা এবং ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে ঐ প্রবণতার প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। অতি দুঃজনক হলেও সত্যি যে, রেডিও-টিভির মত জাতীয় প্রচার

মাধ্যমগুলি পর্যন্ত আমাদের দেশের জাতীয় ইতিহাস এবং ঘটনাক্রম বিকৃতির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ জাতীয় ইতিহাস বিকৃতির এমনি ধরনের দু'একটি দৃষ্টান্ত পেশ করবেন কি?

উত্তর ঃ এ ধরনের দৃষ্টান্তের তো শেষ নেই। ডাইজেস্টেই এ ধরনের দু'একটি দৃষ্টান্ত মুদ্রিত হয়েছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা দেখলে খুবই দুঃখ হয়। পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবের আগমনের কথা মনে পড়ছে। লণ্ডন দিল্লী হয়ে শেখ মুজিব বাংলাদেশে ফিরছেন। এদিকে টিভি ও বেতারে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ* (ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রী) শেখ মুজিবের আগমন বার্তা ও গুণগান প্রচার করতে গিয়ে এমন সব তথ্য বিবৃত করে যাচ্ছিলেন যার সাথে সত্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি এক পর্যায়ে কিভাবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে ভাষার দাবীর সংগ্রামে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হচ্ছিল তার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন অথচ তিনি তখন কারাগারে। এ ছাড়া কে, জি, মোস্তফার সাথে এক টিভি সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব বলেছিলেন, কি ভাবে ১৯৪৭ সালে ৩রা জুন দেশ বিভাগের পরিকল্পনা পেশ হওয়ার পর কোলকাতা সিরাজদ্দৌল্লা হলে জিন্নাহ সাহেবের ভাষণের চ্যালেঞ্জ করে পাকিস্তান টিকবে না বলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অথচ উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনীতিতে জিন্নাহ সাহেবের ভাষণের চ্যালেঞ্জ করার কথা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। আর শেখ মুজিব ছিলেন তখন নেহায়েত ছেলে মানুষ।

ভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকতকে নিয়ে ইদানিং বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালেও হুমকি ও পাল্টা হুমকির মাধ্যমে এমন সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক অপ্রিয় ঘটনা আলোর মুখ দেখেছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী একদল আর একদলকে কোণঠাসা করার জন্য যেসব তথ্য প্রকাশ করছেন তাতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অনেক অধ্যায় নতুন করে সাজাতে হবে।

স্বাধীনতার পর একদিন জনাব তাজউদ্দীন এলেন আমার বাসায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে ওসমানী সাহেব সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ তুললেন আমি রীতিমত তাজ্জব বনে গেলাম। তিনি জানালেন যুদ্ধের ফ্রন্টের ধারেকাছেও তিনি যাননি। সারাদিন বাংলোতেই কাটাতেন। মাঝে মাঝে খড়ম পায়ে দিয়ে করিডোরে বেড়িয়ে আয়েশ করেই সময় কাটিয়ে দিতেন। আমি বললাম, তাই যদি হয় তবে তাঁকে স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বানিয়ে রাখা হয়েছিল কেন? তাজউদ্দীন বললেন, 'তখন কিছু করার ছিল না। নামমাত্র প্রধান সেনাপতিকে বদল

---

* বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের মন্ত্রীসভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী।

করারও কোন অর্থ ছিল না। তাজউদ্দীন বলে চললেন, আত্মসমর্পণের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য তাঁকে খোঁজা হচ্ছে ঢাকা পাঠানোর উদ্দেশ্যে। কাউকে না জানিয়ে তিনি তখন গোহাটি চলে গেছেন।' এসব কথা শুনতে শুনতে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

কি আশ্চর্য যে, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং তার সঠিক সময় নিয়েও জাতির সাথে প্রতারণা চলছে।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য এ ধরনের সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের সাথে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা বেঁচে থাকতেই এই অবস্থা, পরে তো প্রতিবাদ করার বা সত্যি কথা বলার লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার মাধ্যমে অনেক ভ্রান্তি ও বিকৃত তথ্য দূর করা যাবে। তবে এ ব্যাপারে সবাইকে আত্মপ্রচারণা ছেড়ে সত্যি কথা বলতে হবে। ভাবাবেগ নিয়ে কখনও ইতিহাস রচিত হয় না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কেন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন? যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনি এ আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন আজো তা অটুট রয়েছে কি?

উত্তর ঃ ভাষা হলো জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা ও কৃষ্টির বাহন। আর সমগ্র পাকিস্তানে বাংলা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা। সে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা যথার্থ মর্যাদা পাবে না–তা জাতীয় সংহতির পক্ষে ছিল আশংকাজনক। এই বিশ্বাস থেকেই আমি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। আমার দৃষ্টিভঙ্গি আজো অটুট রয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
জুলাই ১৯৭৮

আবু নছর মোহাম্মদ গাজীউল হক

[আবু নছর মোহাম্মদ গাজীউল হক ১৯৪৮ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে যাঁরা দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় যে ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়, জনাব গাজীউল হকই সে সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় তিনি সভাপতি হিসেবে এক চেতনাদীপ্ত ভাষণ দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাবেক নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্গত নিচিন্তা গ্রামে জনাব গাজীউল হক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মাওলানা সিরাজুল হক ছিলেন একজন সুপরিচিত পীর।

স্থানীয় ছাগলনাইয়া হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত তাঁর পড়াশুনা চলে। তারপর ১৯৪২ সালে পিতা পরিবার-পরিজনসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বগুড়া চলে আসলে তিনি বগুড়া জেলা স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর বগুড়া কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে বি, এ, (অনার্স) ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে অনার্স পাশ করেন। এরপর ১৯৫২ সালে এম, এ, পাশ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন পাশ করেন।

১৯৫৬ সাল থেকে জনাব গাজীউল হক বগুড়ায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে ১৯৭২ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকা সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এখনও তিনি এ পেশায় নিয়োজিত আছেন।

জনাব গাজীউল হক অতি তরুণ বয়স থেকেই রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হন। প্রথম জীবনে

তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বগুড়া 'মুসলিম ছাত্রলীগের' প্রেসিডেন্ট এবং 'ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগের' বগুড়া জেলার জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৫১ সালে 'যুব লীগের' কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ১৯৫২ সালে 'ছাত্র ইউনিয়নের' কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার কারণে ৪ বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন। ঐ বছরই ন্যাশনাল কনভেনশনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে ভাসানী ন্যাপের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৫৩ সাল থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত জনাব গাজীউল হক বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার কারণে ৮ বার কারাজীবন ভোগ করেন। বাহ্যতঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকেও তিনি সুদীর্ঘ ১৮ বছর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। '৭০ সালের পর থেকে তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন না।

ব্যক্তিগত জীবনে জনাব গাজীউল হক খুবই সদালাপী। তিনি ১ পুত্র ও ৪ কন্যার পিতা। নিজের আইন ব্যবসা নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এ সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য তিনি প্রচুর সময় দিয়েছেন। আত্মপ্রচার এড়ানোর একটা সতর্ক প্রয়াস তাঁর মধ্যে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে বলা দু'একটা কথা প্রকাশ না করার ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়োজনে আমরা তাও প্রকাশ করলাম। ভাষা আন্দোলনের এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ জোগাবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ সাংগঠনিকভাবে বাংলা ভাষার দাবী কখন উত্থাপিত হয়?

উত্তর ঃ ১৯৪৭ সালের ৬ই এবং ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাসায় জনাব তাসাদ্দুক হোসেনের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান যুবকর্মী সম্মেলনে 'ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ' নামে একটি অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই সম্মেলনেই প্রথম বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস ও আইন-আদালতের ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার জন্য দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ এই যুব সম্মেলনের উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ জনাব তাসাদ্দুক, জনাব শামসুল হক, জনাব মোঃ তোয়াহা, জনাব আলী আহাদ, জনাব তাজউদ্দীন, জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী (বর্তমানে বিচারপতি),★ আতাউর রহমান (রাজশাহী), লিলি খান এঁরাই উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন।

★ বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।

প্রশ্ন ঃ এই সম্মেলন কি সারা প্রদেশভিত্তিক ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এটা প্রদেশভিত্তিক সম্মেলন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জেলা থেকে প্রায় দেড়শত প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করেন। বগুড়া থেকে আমরা অধ্যাপক খায়েরের নেতৃত্বে ১০ জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করি।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন, এ সম্মেলনে বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাহলে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার দাবী উত্থাপিত হয় কখন?

উত্তর ঃ যুবকর্মী সম্মেলনে এই মর্মে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, তা জনগণই স্থির করবেন। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবী প্রথম সুস্পষ্টভাবে 'তমদ্দুন মজলিস'ই পেশ করে। ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর মজলিস 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' –এ নামে একটি পুস্তিকা বের করে। এ পুস্তিকাতে উর্দুর সাথে বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদা দেয়ার দাবী জানানো হয়।

প্রশ্ন ঃ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি তখন বগুড়া আজিজুল হক কলেজের ছাত্র। ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় ছাত্রদের মধ্যে ভাষার দাবী বেশ দানা বেঁধে উঠে। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ঢাকার বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। আমরা সংবাদ পেয়ে ২৮শে ফেব্রুয়ারী বগুড়া কলেজে ভাষার দাবীতে প্রথম সভা করি। ঢাকা থেকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ভাষার দাবীতে প্রদেশব্যাপী হরতালের আহ্বান জানালে আমরা বগুড়ার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১ই মার্চ হরতাল পালন করি। এদিন ভাষার দাবীতে মিছিল করি এবং মিছিল শেষে বগুড়া জেলা স্কুল প্রাঙ্গণে এক বিরাট ছাত্র-জনসভা করি। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সে সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রশ্ন ঃ ডক্টর শহীদুল্লাহ সেখানে কি করতেন?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কথা মনে পড়ছে। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তখন বগুড়া কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমরা যখন মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছি তখন দেখি যে, ডক্টর শহীদুল্লাহ রিক্শায় করে কলেজের দিকে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর রিক্শা থামিয়ে তাঁকে আমাদের মিছিলের নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করি। তিনি রিকশা থেকে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিছিলের ছাত্ররা তুমুল করতালির মাধ্যমে তাঁকে অভিনন্দিত করে। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ স্টাইলে বললেন, "মানে কি যে অ্যাঁ, আমাকে কি করতে হবে?" আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, "স্যার, আপনাকে এ মিছিলের নেতৃত্ব দিতে হবে। এটা আমাদের দাবী।" তিনি খানিকটা ভাবলেন,

তারপর একটু হেসে আমার হাতে তাঁর ব্যাগটি দিয়ে বললেন, "মানে কি যে অ্যাঁ, পীর সাহেব, তাহলে তুমি আমার বোঝাটা নাও। আমি তোমার বোঝার দায়িত্ব নিলুম।" মিছিলের শেষে তিনি সেদিনের ছাত্র-জনসভায় সভাপতি হিসেবে ভাষার দাবীতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা সত্যিই অপূর্ব ছিল।

(গাজীউল হক সাহেবের পিতা পীর ছিলেন বলে, ডক্টর শহীদুল্লাহ তাঁকে 'পীর সাহেব' বলে ডাকতেন।)

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ই মার্চ ভাষার দাবীতে প্রদেশব্যাপী হরতালের আহ্বান জানায়। ১৯৪৮ সালেই কি 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়েছিল? '৫২ সালে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' হতে এটা কি ভিন্ন ছিল?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালে গঠিত 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এবং ১৯৫২ সালে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। ১৯৪৮ সালের সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। তিনি তমদ্দুন মজলিসের সদস্য ছিলেন। আর ১৯৫২ সালে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' আহ্বায়ক ছিলেন জনাব কাজী গোলাম মাহবুব।

প্রশ্ন ঃ '৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কি তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ তমদ্দুন মজলিস এবং গণতান্ত্রিক কর্মীদের উদ্যোগে এ পরিষদ গঠিত হয়। '৪৮ সালেই এর বিলুপ্তি ঘটে। অবশ্য পরে ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। জনাব আবদুল মতিন এ কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি এর আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করেন। এ কমিটির উদ্যোগে ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল পালিত হয়।

প্রশ্ন ঃ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' কেন গঠিত হয়?

উত্তর ঃ ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান ঢাকা সফরে আসেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে ঢাকার ছাত্র সমাজে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কারণ ঢাকা আসার কিছুদিন আগে করাচীতে গণ-পরিষদের বৈঠকে জনাব লিয়াকত আলী খান, 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাই এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে জনাব লিয়াকত

আলী খানকে কালো পতাকা দেখানোর মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে ডঃ মাহমুদ হোসেনের (তদানীন্তন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট) পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জিমনেসিয়াম গ্রাউণ্ডে' লিয়াকত আলী খানের যে ছাত্রসভা হবে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের জি, এস, জনাব গোলাম আযম (অধ্যাপক গোলাম আযম) ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটা মানপত্র পাঠ করবেন। সে মানপত্রে উর্দুর সাথে বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জোরালো দাবী সন্নিবেশিত থাকবে।

সিদ্ধান্ত অনুসারে জনাব গোলাম আযম সে জনসভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করেন। গোলাম আযম সাহেব যখন মানপত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবী পাঠ করছিলেন, তখন ছাত্ররা তুমুল করতালির মাধ্যমে এ দাবীর প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। এতে বাহ্যতঃ লিয়াকত আলী খান ক্ষুব্ধ হন।

লিয়াকত আলী খান চলে যাওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষার স্তিমিত আন্দোলনকে জোরালো করার জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়।★

প্রশ্ন ঃ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' আহূত '৫০ ও '৫১ এর ১১ই মার্চের বিশ্ববিদ্যালয় হরতাল কি সফল হয়েছিল? ছাত্রদের মধ্যে সে সময় ধর্মঘটের প্রশ্নে কোন ভিন্নমত ছিল কি?

উত্তর ঃ '৫০ এবং '৫১ সালের ১১ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্থকভাবে হরতাল পালিত হয়। এসব হরতালে সাধারণ ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল। ধর্মঘট সম্পর্কে ভিন্নমতের কথা বলছেন, না, ছাত্রদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ ছিল না। তবে দু' একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়।

আমার মনে পড়ছে, '৫১ সালের ১১ই মার্চ সংগ্রাম কমিটি আহূত হরতালে সব সাধারণ ছাত্রই সাড়া দেয়। শুধুমাত্র একজন ছাত্র ভিন্নমত প্রকাশ করে। সে ছিল তদানীন্তন আর্টস ফেকাল্টির ডীন ডঃ সাদানীর ভাতিজা। হরতাল উপেক্ষা করে সে ক্লাস করছিল। তাকে ছাত্ররা ক্লাস থেকে মধুর রেস্তোরাঁয় ডেকে আনে। সেখানে মতিন সাহেব সহ আমরা সবাই তাকে ছাত্রঐক্য প্রশ্নে বুঝাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই আমাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল না। ঠিক এ সময় হাসান হাফিজুর রহমান (কবি হাসান হাফিজুর রহমান) উত্তেজিত হয়ে চট করে তার পা

★ '৪৮ সালের ২৭শে নভেম্বর লিয়াকত আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'জিমনেসিয়াম গ্রাউণ্ডে' ছাত্রসভায় ভাষণ দেন। ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। -মো. কা.

থেকে সেগুেল খুলে দু'ঘা লাগিয়ে দেন। তারপর নূর নবী (বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের এড্ভোকেট) সজোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে চড়ে বসে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা বিস্মিত হয়ে পড়ি। মতিন সাহেব সহ আমরা সবাই মিলে তাকে ছাড়িয়ে দিই। অবশ্য এ ধরনের ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ ১৯৪৮ সালের জুনের দিকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে (অনার্স) ভর্তি হই।

প্রশ্ন ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আপনি এখানকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে কিভাবে সংশ্লিষ্ট হন।

উত্তর ঃ পূর্ব থেকেই আমি গণতান্ত্রিক যুবলীগের (Democratic Youth League) সূত্রে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ঃ আপনার আগমনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন কি ছিল?

উত্তর ঃ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন। এ আন্দোলনে ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে নঈমুদ্দীনসহ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কিছু নেতা কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এ জন্য নঈমুদ্দীন ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত হন।

প্রশ্ন ঃ এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেন। পরে অলি আহাদ ছাড়া প্রত্যেকের ওপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। জনাব অলি আহাদকে বি, কম, পরীক্ষা দিতে দেয়া হলেও আর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রেগুলার' ছাত্র হিসেবে ভর্তি করা হয়নি। এমনকি বি, কম, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেও তাঁকে এম, কম-এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি।

প্রশ্ন ঃ এ সময় আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল কি, যা ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল?

উত্তর ঃ 'দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন', 'নো ফি ক্যাম্পেইন', 'পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন'– এসব ঘটনা এ সময় ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠনের দিক থেকে বেশ প্রভাবিত করে।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীতে কোলকাতায় সংঘটিত দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা ও অন্যান্য জেলায় দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য আমরা ছাত্ররা প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। অতি দুঃখজনক যে, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র দাঙ্গা প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করে। বাকী অংশ নির্লিপ্ত থাকে। এ নির্লিপ্ততা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রভাবের বাইরে ছাত্রদের মধ্যে একটা 'থার্ড ফোর্স' সংগঠিত করার অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীকালে এই 'থার্ড ফোর্সই একুশে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

এপ্রিল মাসে সংঘটিত হয় ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে 'নো ফি ক্যাম্পেইন'। এ আন্দোলন আংশিক সাফল্য লাভ করে।

এ আন্দোলনের সূত্র ধরে ছাত্রদের উদ্যোগে ফজলুল হক হলের অডিটোরিয়ামে 'পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন' নামে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ছাত্রদের শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। শিক্ষার প্রধান বাহন হিসেবে বাংলা ভাষার প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ঃ এ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ উদ্যোক্তাদের মধ্যে মোহাম্মদ তোয়াহা, তাসাদ্দুক, অলি আহাদ, আবদুল মতিন এঁরাই পুরোভাগে ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ছাত্রদের মধ্যে 'থার্ড ফোর্সের' সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা কি কোন গ্রুপ হিসেবে পরিচিত ছিল?

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গে আপনাকে পূর্বের ঘটনার সূত্র ধরে বলতে হয়। নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে মূলতঃ ছাত্রদের তিনটি গ্রুপ ছিল। একটি গ্রুপ খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের সমর্থক, আরেকটি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সমর্থক এবং অপরটি কমিউনিস্ট বা বামপন্থী প্রভাবিত। বামপন্থী প্রভাবিত এবং প্রগতিশীল মনোভাবসম্পন্ন ছাত্র গ্রুপটিই পরবর্তী পর্যায়ে 'থার্ড ফোর্স' হিসেবে সংগঠিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও তাঁরা দলগতভাবে ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল না, তবুও সত্যিকারে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন আন্দোলন এবং কর্মকাণ্ডে তাঁদের তৎপরতা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ইউনিভার্সিটির সেরা সেরা ছাত্ররা এই 'থার্ড ফোর্স' বা 'তৃতীয় শক্তি'র সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। ইউনিভার্সিটির হল ইলেকশানগুলোতে এই 'থার্ড ফোর্স' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ঃ ইউনিভার্সিটি হল ইলেকশনে কি আপনারা নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাতেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমরা নিজেদের মনোনীত প্রার্থী দাঁড় করাবার চেষ্টা করতাম। ১৯৫০ সালে এস, এম, হলের ইউনিয়ন ইলেকশানে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভি, পি, প্রার্থী ছিলেন সৈয়দ মোকসেদ আলী (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক), আর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের 'অফিসিয়াল' ভি, পি, প্রার্থী ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। 'থার্ড ফোর্স' হতে আমাদের প্রার্থী ছিলেন মোস্তফা নূরুল ইসলাম (জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। যদিও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাথে আমাদের নির্বাচনী মৈত্রীজোট ছিল, কিন্তু তবু গোলাম মাহবুব এবং মোস্তফা নূরুল ইসলামের মনোনয়ন নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। এ নিয়ে ভোট ভোটি হয়। ভোটাভোটিতে কাজী গোলাম মাহবুব সমর্থকরা হেরে যায়, মোস্তফা নূরুল ইসলামের মনোনয়নই টিকে যায়। নির্বাচনের সময় দেখা যায় নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের একটা বিশেষ অংশ মোস্তফা নূরুল ইসলামকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে। তবুও মোস্তফা নূরুল ইসলাম জয়ী হন। এটাই প্রগতিশীল বামপন্থীদের প্রথম বিজয়।

অনুরূপভাবে ১৯৫১ সালে এস, এম, হলের ইলেকশনে 'থার্ড ফোর্সে'র ভি, পি, প্রার্থী ছিলেন হাবিবুর রহমান শেলী (বর্তমানে হাইকোর্টের বিচারপতি)। নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রার্থী ছিলেন মুজিবুল হক (বর্তমানে শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারী) এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রার্থী ছিলেন আনোয়ারুল হক চৌধুরী (ডেপুটি এটর্নী জেনারেল)। নির্বাচনে হাবিবুর রহমান শেলী নির্বাচিত হন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ জোট বেঁধে বাজেট ফেল করিয়ে দেয়।

ফজলুল হক হলেও 'থার্ড গ্রুপ' ক্যাণ্ডিডেট দাঁড় করায়। এ কেবিনেটে ভি, পি, প্রার্থী ছিলেন শামসুল আলম এবং জি, এস, আনোয়ারুল হক খান। নির্বাচনে 'থার্ড গ্রুপে'র ফুল কেবিনেট রিটার্ন করে।

প্রশ্ন ঃ এই 'থার্ড গ্রুপে'র ছাত্ররা ভিন্ন কোন সংগঠন গড়ে তোলে নি কেন?

উত্তর ঃ ১৯৫১ সালে এই 'থার্ড গ্রুপে'র প্রত্যক্ষ উদ্যোগেই যুবলীগের জন্ম হয়। সম্ভবতঃ এই যুবলীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন মাহমুদ আলী (সিলেট) এবং সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ।

প্রশ্ন ঃ এই যুবলীগ কি '৪৮ সালে গঠিত 'ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ' থেকে ভিন্ন সংগঠন ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ভিন্ন সংগঠন।

প্রশ্ন ঃ '৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের উর্দুর স্বপক্ষে ভাষণ দানের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়?

উত্তর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ৩০শে জানুয়ারী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের খালেক নেওয়াজ সে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। পরে মিছিল বের করার প্রস্তাব উঠলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীদের মিছিল বের করার বিরোধিতা সত্বেও প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিল ফুলার রোড দিয়ে ঘুরে বর্ধমান হাউসের (বর্তমান বাংলা একাডেমী ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের সরকারী বাসভবন) সম্মুখ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয় এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারীকে সফল করার জন্য ৩রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ছাত্রদের প্রস্তুতি বৈঠক বসে।

প্রশ্ন ঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী কি কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উত্তর ঃ ৩০শে জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিবাদ মিছিলের বিরোধিতায় তাদের আন্দোলন বিমুখতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এবং তাদের প্রতি আমাদের প্রবল সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাই স্থির হয়, ৪ঠা ফেব্রুয়ারীকে সফল করার জন্য সজাগ এবং তৎপর থাকতে হবে। অন্য কোন নাম প্রস্তাবের পূর্বেই সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করতে হবে বলেও স্থির হয়। আরো ঠিক হয়, এম, আর, আখতার মুকুল (চরমপত্রের পাঠক) প্রস্তাব করবেন এবং কমরুদ্দীন শহুদ সমর্থন করবেন। পরে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর মিছিল বেরুবে।

প্রশ্ন ঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী সফল হয়েছিল কি?

উত্তর হ্যাঁ, সফল হয়েছিল। মিছিল বিরোধী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্যদের কোন প্রকার সুযোগ না দেওয়ার জন্য প্রগতিশীল 'থার্ড গ্রুপে'র ছাত্ররা তৎপর ছিল। মধুর রেস্তোরাঁ হতে একটি ছোট টেবিল নিয়ে আসা হয়। টেবিলে দাঁড়িয়ে এম, আর, আখতার মুকুল সভাপতিত্ব করার জন্য আমার নাম প্রস্তাব করে। তার প্রস্তাব করার সময় নূরুল আলম (জনাব আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের পুত্র) এম, আর, আখতার মুকুলের প্যান্ট ধরে টেনে টেবিল থেকে নামিয়ে দিয়ে সভাপতি হিসেবে আমার নাম বলতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এম, আর, আখতার মুকুল আমার নাম প্রস্তাব করে ফেলে এবং পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির মতো লম্বা কমরুদ্দীন শহুদ টেবিলে দাঁড়াবার সুযোগ না পেয়ে নীচে দাঁড়িয়েই আমার নাম সমর্থনের ঘোষণা দেয়। মুকুল টেবিল থেকে নেমে পড়লে কর্মী এবং সমর্থকদের

তৎপরতায় আন্দোলনের স্বার্থে আমাকে চট্ করে টেবিলের ওপর গিয়েই সভাপতির আসন গ্রহণ করতে হয়। সংক্ষিপ্ত দু'একটি কথা বলেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিছিলের কথা ঘোষণা করি। মিছিল সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় একুশে ফেব্রুয়ারীকে সফল করার কথা ঘোষণা করা হয়।

প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিব কি তখন জেলে ছিলেন?

উত্তর ঃ শেখ মুজিব তো এর বহু পূর্ব থেকেই গ্রেফতার হয়ে জেলে ছিলেন। ঢাকা জেলে থাকা অবস্থায় শেখ মুজিব ১৬ই ফেব্রুয়ারী স্বীয় মুক্তির দাবীতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানান্তরের পূর্বে তাঁর অনশনের কথা আমাদের কাছে পৌঁছলে ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ে দোতালায় ক্লাস রুমে ছাত্রসভা করে তাঁর মুক্তি দাবী করি। সে সভায় রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয় রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি' গঠন করি। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক)। আমাকে এ কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, '৫২ সালের মার্চে মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি ফরিদপুর জেলেই আটক ছিলেন। জনাব মহিউদ্দিনও তখন ফরিদপুর জেলে আটক ছিলেন এবং শেখ মুজিবের সংগে অনশন করে যাচ্ছিলেন।★

প্রশ্ন ঃ ১৯৭৩ সালে জনাব আবদুস সামাদ আজাদ এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় জনাব শেখ মুজিবুর রহমান নাকি ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের জানালা দিয়ে সামাদ সাহেবকে ১৪৪ ধারা ভাংগার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কে. জি. মোস্তফাও অনুরূপ সাক্ষাৎকারে সামাদ সাহেবের কথা সমর্থন করেছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ (বিস্ময়ের সাথে) এটা কি করে সম্ভব! ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩ টায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। শেখ মুজিব এর পূর্বেই ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত হন। সামাদ সাহেব কি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জানালা দিয়ে শেখ মুজিবের মৌখিক নির্দেশ পেলেন। এটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। এ সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা।

★ '৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেল হতে মুক্তি লাভ করেন এবং স্বাস্থ্যগত কারণে কিছুদিন ফরিদপুরে তাঁর গ্রামের বাড়ীতেই অবস্থান করেন। –(ইত্তেফাক ৫ই মার্চ, ১৯৫২ দ্রষ্টব্য)

প্রশ্ন ঃ এবার আমরা পূর্ব প্রসংগে ফিরে যাই। আপনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন কি?

উত্তর ঃ না, আমি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্য ছিলাম না।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভাংগার প্রশ্নে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের মিটিং-এ কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে দিনের মিটিং-এ পনেরো জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। জনাব আবুল হাশিম উক্ত মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন। ১১ জন ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে এবং ৪ জন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। ৪ জন হলেন জনাব অলি আহাদ, আবদুল মতিন, মরহুম ডাঃ গোলাম মাওলা এবং শামসুল আলম। জনাব তোয়াহা ভোট দানে বিরত থাকেন।

কর্মপরিষদের আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, জনাব শামসুল হক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করবেন। যদি ছাত্ররা কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত না মেনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, তবে স্বাভাবিকভাবেই কর্মপরিষদের বিলুপ্তি ঘটবে।

প্রশ্ন ঃ জনাব তোয়াহা কেন ভোটদানে বিরত ছিলেন?

উত্তর ঃ কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশ ছিল না বলে তিনি ভোটদানে বিরত থাকেন।

প্রশ্ন ঃ সে সময় থেকেই কি জনাব তোয়াহা কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ (মৃদু হেসে) হ্যাঁ, তখন থেকেই তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন। আমরা অনেকেই তখন কর্মপরিষদের সাথে জড়িত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তকে আপনি গণতান্ত্রিক মনে করেন কি?

উত্তর ঃ প্রক্রিয়াগত দিক থেকে কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত অবশ্যই গণতান্ত্রিক ছিল। কিন্তু দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের এবং সংগ্রামী ছাত্রসমাজের মানসিকতা সে সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়নি। কর্মপরিষদ সে মানসিকতার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, নতুবা সচেতনভাবে তা উপেক্ষা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য যে দু'জন ছাত্র প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল, আপনি তাঁদের নাম বলতে পারেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আবদুল মোমিন (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী) এবং শামসুল আলমকে (সে সময়ের ফজলুল হক হলের ভি, পি,) পাঠানো হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোথায় কিভাবে এ সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তর ঃ মূলতঃ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্ররা ২০শে ফেব্রুয়ারী নিজ নিজ হলে দুটি পৃথক সভায় মিলিত হয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ১৭৬ নম্বর কক্ষে জনাব ফকির শাহাবুদ্দিনের (প্রাক্তন এটর্নী জেনারেল) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মত প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে জনাব আবদুল মোমিনের সভাপতিত্বে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। এই সভায় জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদের প্রস্তাবক্রমে জনাব আবদুল মোমিন এবং শামসুল আলমকে ছাত্রদের সিদ্ধান্তের কথা জানানোর জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠকে পাঠানো হয়।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠকে ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিলো? আপনারা কি ভিন্ন কোন কর্মপন্থা নিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ আমরা বিভিন্ন হলের প্রভাবশালী ছাত্রনেতাদের নিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এবং ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী স্থির করার জন্য বিশেষ বৈঠকে মিলিত হই। ফজলুল হক হলের পুকুরের পূর্ব ধারের সিঁড়িতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে পরদিন (অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারী) যে কোন মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ এ বৈঠকে কতজন উপস্থিত ছিলেন? সবাই কি ছাত্র?

উত্তর ঃ এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এগারো জন। এঁরা হলেন– ১. হাবিবুর রহমান শেলী (বর্তমানে হাইকোর্টের বিচারপতি), ২. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর), ৩. মোহাম্মদ সুলতান (ন্যাপের এক সময়ের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল সেক্রেটারী এবং ইয়থ লীগের সেক্রেটারী), ৪. এস, এ, বারী এ, টি, (ন্যাপ মশিয়ুর গ্রুপ-এর সেক্রেটারী) ৫. আবদুল মোমিন (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী), ৬. জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী), ৭. এম, আর, আখতার মুকুল (চরমপত্রের পাঠক), ৮. কমরুদ্দীন শহুদ (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর), ৯. আনোয়ারুল হক খান (ফজলুল হক হলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকালে অস্থায়ী সরকারের তথ্য সচিব), ১০. আনোয়ার হোসেন

এবং ১১. আমি।

প্রশ্ন ঃ আনোয়ার হোসেন সাহেবের তো কোন পরিচয় দিলেন না? তিনি পরবর্তীকালে কি করতেন?

উত্তর ঃ তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা সত্যিই দুঃখজনক। তিনি বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ইকবাল হলে থাকতেন। ভাষা আন্দোলনের চার পাঁচ মাস পর জানা যায়, তিনি আসলে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের লোক এবং সাব-ইন্সপেক্টর র‍্যাঙ্কের একজন অফিসার। আউয়াল নামক একজন ছাত্র (এফ, ডি, সি-র প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল জনাব বাহাউদ্দিন সাহেবের ভাগ্নে) প্রথমে খালেক নেওয়াজ খান এবং কে, জি, মোস্তফাকে এ খবর দেন। আউয়াল জানান যে তিনি আনোয়ার হোসেন সাহেবকে তৎকালে তোপখানা রোডে অবস্থিত আই, বি, অফিসে যাতায়াত করতে দেখেছেন। শুধু তাই নয়, একদিন আই, বি, অফিসে প্রবেশ করার সময় পুলিশের সেন্ট্রি যে তাকে 'সেলিউট' করেছে তাও দেখেছেন। এ তথ্য জানার পর খালেক নেওয়াজ খান, কে, জি, মোস্তফা ও অন্যান্য ছাত্ররা তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং তাঁর বাক্স খুলে গোয়েন্দা বিভাগের আইডেন্টিটি কার্ড খুঁজে পান। এরপর ছাত্ররা মারধর করে তাঁকে সে রাতেই হল থেকে তাড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন ঃ গভীর রাতের ছাত্রবৈঠকে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়?

উত্তর ঃ প্রথমে সবাই একমত হলাম, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে। তারপর প্রশ্ন এলো– বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় কে সভাপতিত্ব করবেন? সিদ্ধান্ত হলো আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে। যদি আমি সভা আরম্ভের পূর্বে গ্রেফতার হই তবে যথাক্রমে এম, আর, আখতার মুকুল এবং তাঁরও গ্রেপ্তারজনিত অপারগতায় জনাব কমরুদ্দীন শহুদ সভাপতিত্ব করবেন। আরো সিদ্ধান্ত হয়, সভায় শুধুমাত্র শামসুল হক সাহেব এবং তৎকালীন 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র আবদুল মতিনকেই বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হবে। এরপর সভাপতি হিসেবে আমি বা যিনি সভাপতিত্ব করবেন, তিনি বক্তব্য রেখে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। রাতের বৈঠকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, হাবিবুর রহমান শেলী ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য প্রথম 'ব্যাচে'র নেতৃত্ব দেবেন।

প্রশ্ন ঃ প্রথম 'ব্যাচে' নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জনাব হাবিবুর রহমান শেলীকে কেন নির্বাচিত করা হয়?

উত্তর ঃ হাবিবুর রহমান শেলী ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের অন্যতম। ইতিহাসে অনার্স এবং এম, এ,– এ দুটো পরীক্ষাতেই তিনি ফার্স্ট ক্লাস

ফার্স্ট হয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর বিনম্র ব্যবহার এবং আচরণের জন্য তিনি সাধারণ ছাত্রদের প্রিয় ছিলেন। সে কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, তিনি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার নেতৃত্ব দিলে সাধারণ ছাত্ররা অধিক মাত্রায় উদ্বুদ্ধ হবে। জনাব হাবিবুর রহমান শেলীও তাঁর সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল 'ক্যারিয়ারে'র কথা আদৌ না ভেবে মোহের উর্ধে উঠে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কখন যান?

উত্তর ঃ সে দিন রাতে বৈঠকের শেষে অন্যেরা চলে যাওয়ার পর জনাব আবদুল মোমিন, মোহাম্মদ সুলতান এবং এম, আর, আখতার মুকুল সহ পরামর্শ হলো যে, রাতেই আমাকে ভার্সিটি ক্যাম্পাসে চলে যেতে হবে। সে পরামর্শ অনুযায়ী রাত প্রায় সাড়ে তিনটায় আমি মেডিকেল কলেজের হোষ্টেলের ব্যারাক দিয়ে ঢুকে মধুর রেস্তোরাঁর পাশের ছোট পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ঢুকি এবং মধুর রেস্তোরাঁয় শুয়ে থাকি। পরদিন সকালে ৭টা ৮টার মধ্যে পূর্ব রাত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন হলের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত হতে থাকে। এছাড়া ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, প্যাগোজ স্কুল, ওয়েস্ট এণ্ড হাইস্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সংগঠিত করে নিয়ে আসার জন্য পাঠানো হয়।

প্রশ্ন ঃ পরদিন সকাল বেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন না।

উত্তর ঃ পূর্বেই বলেছি যে, সকাল বেলা ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জমায়েত হতে থাকে। সকাল সাড়ে আটটায় জনাব শামসুল হক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসেন। তাঁর আসার পর থেকেই ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা তাঁর আসার পূর্ব থেকেই ছাত্ররা গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে উত্তপ্ত আলোচনায় রত ছিল এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছিল। পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাকর ছিল। এ সময় পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে রেখেছিল এবং এটা স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করে। আবার শামসুল হক সাহেব মধুর রেস্তোরাঁয় বসে কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ছাত্রদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করলে হাসান হাফিজুর রহমান এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শামসুল হক সাহেবের মাথা থেকে জিন্নাহ ক্যাপটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং চীৎকার করে বলেন, "You have no right to say anything here, get out." এছাড়া আমানুল্লাহ খান এবং শহীদ নামে আরেকজন ছাত্র একটা বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষে বক্তৃতা জুড়ে দেন। এসব কারণে একটা উত্তপ্ত, বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ঃ পরিশেষে একুশে ফেব্রুয়ারী আমতলার সভায় আপনিই কি সভাপতিত্ব

করেছিলেন? এ নিয়ে কোন বিতর্ক হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমিই সভাপতিত্ব করেছিলাম। না, এ নিয়ে কোন বিতর্ক হয়নি। সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীকে সভাপতিত্ব করার জন্য ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। প্রথমে তিনি রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু পরে ডক্টর জুবেরীর পরামর্শে তিনি ছাত্রদেরকেই সভাপতিত্ব করতে বলেন।

প্রশ্ন ঃ সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ সভায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী মিলে প্রায় দেড় হাজার থেকে দু'হাজারের মতো ছিল।

প্রশ্ন ঃ সভায় কে কে বক্তব্য রাখেন? তাঁদের মতামত কি ভিন্ন ভিন্ন ছিল?

উত্তর ঃ শামসুল হক, আবদুল মতিন এ দু'জনই বক্তৃতা করেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হক পরিষদের পূর্ব দিনের ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত পেশ করেন। এরপর বক্তৃতা করেন জনাব আবদুল মতিন। তিনি পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন এবং ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষে নিজ মত প্রকাশ করেন। এরপর সভাপতি হিসেবে আমি আমার বক্তব্য রাখি এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যখন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করি, তখন সাধারণ ছাত্ররা একবাক্যে তা সমর্থন করে। আমি পাঁচ জন পাঁচ জন করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার কথা বলি, কিন্তু আবদুস সামাদ সাহেব একটি সংশোধনী এনে বলেন, ১০ জন করে ব্যাচ গঠন করা উচিত এবং 'সত্যাগ্রহীরা' এসেম্বলীর দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। সভায় ছাত্র সাধারণের মত নিয়ে এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ পরিশেষে কিভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রচেষ্টা চলে?

উত্তর ঃ স্থির হয় ১০ জনের 'ব্যাচ' করে ছাত্ররা বেরিয়ে যাবে। প্রথম 'ব্যাচ' বের হয় হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে। দ্বিতীয় 'ব্যাচ' ইব্রাহীম তাহা এবং আবদুস সামাদের যৌথ নেতৃত্বে এবং তৃতীয় 'ব্যাচ' আনোয়ারুল হক খান ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খানের যুক্ত নেতৃত্বে। এই তিনটি 'ব্যাচ'কেই পুলিশ ট্রাকে তুলে নেয়। এরপর মেয়েদের দিয়ে প্রচেষ্টা চালানো হয়। মেয়েদের 'ব্যাচ' শফিয়ার নেতৃত্বে বের হয়। এবং মেয়েরা প্রায় বিনা বাধায় রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মধুর রেস্তোরাঁর পূর্ব ধার পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তারপর পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া ও লাঠি চার্জ শুরু হয়। পুলিশের আক্রমণের মুখে মেয়েরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহীমসহ কয়েজন পুলিশের লাঠির আঘাত প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের ব্যাচে কারা কারা ছিলেন, আপনার স্বরণ আছে কি?

উত্তর ঃ শাফিয়া, সুফিয়া ইব্রাহীম, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন নাহার, হালিমা, বানী সবার নাম এখন আর স্মরণ নেই।

এঁদের মধ্যে শাফিয়া এবং রওশন আরা বাচ্চুই ছিলেন রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকতর সচেতন।

প্রশ্ন ঃ ছেলেদের আর কোন 'ব্যাচ' বের হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ মেয়েদের 'ব্যাচ' অগ্রসর হওয়ার পর পরই সৈয়দ ফজলে আলী (চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট) এবং শামসুল হকের (রাশিয়ায় প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত) নেতৃত্বে চতুর্থ 'ব্যাচ' অর্থাৎ মেয়েদের 'ব্যাচ'সহ পঞ্চম 'ব্যাচ' বের হয়। তারপর পুলিশের বাধা ও আক্রমণ উপেক্ষা করে ব্যাহতভাবে ছাত্ররা গ্রুপে গ্রুপে বেরুতে থাকে। এ সময় পুলিশের লাঠি চার্জ হতে থাকে। কাঁদানে গ্যাসও নিক্ষিপ্ত হয়। নির্বিচারে কাঁদানে গ্যাসে সারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রায় ধোঁয়াময় হয়ে যায়।

এ সময় একটি কাঁদানে গ্যাসের শেল এসে আমার বুকে লাগে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। পরে জেনেছি জুলমত আলী খান সহ কয়েকজন বন্ধু আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

আমার অজ্ঞান হওয়ার খানিক পূর্বে দেখেছি ছাত্ররা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে পুলিশের সাথে রীতিমত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। একদল ছাত্র মেইন গেইট দিয়ে বের হতে না পেরে মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বধারের ছোট্ট পাঁচিলটি ভেঙ্গে মেডিকেল কলেজের গেইটের দিকে বের হওয়ার চেষ্টা করছে। মোটকথা পরিস্থিতি তখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পরে শুনেছি হাসান হাফিজুর রহমানের মত ছাত্র অন্যান্য ছাত্রদের ইট-পাটকেল ছোঁড়া থেকে নিবৃত্ত করতে যেয়ে নিজেই পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছোঁড়ার কাজে লেগে যায়।

প্রশ্ন ঃ এ সময় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের প্রতিনিধি জনাব শামসুল হকের কি ভূমিকা ছিল?

উত্তর ঃ আতমলায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর শামসুল হক সাহেব সে সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং সংগ্রামে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠকে কেন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের প্রধান অঙ্গদল ছিল তদানীন্তন আওয়ামী

মুসলিম লীগ এবং তার অঙ্গ ছাত্র দল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের একটি প্রধান অংশের যুক্তি ছিল এ আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না, যার সুযোগ নিয়ে মুসলিম লীগ নির্বাচন পিছিয়ে দিতে পারে। তদানীন্তন কমিউনিষ্ট পার্টিও আওয়ামী মুসলিম লীগের সিদ্ধান্তের বিরোধী কোন বক্তব্য দিতে প্রস্তুত ছিল না।

প্রশ্ন ঃ তাহলে কর্মপরিষদের মিটিং-এ কমিউনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্তের জন্যেই কি তোয়াহা সাহেব ভোট দানে বিরত থাকেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কারণ কর্মপরিষদের সভায় তোয়াহা সাহেব ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মত দিলেও ভোটাভোটির সময় পার্টির সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই ভোট দানে বিরত থাকেন।

প্রশ্ন ঃ আপনিও তো কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে আপনার ওপর পার্টির কোন নির্দেশ ছিল না?

উত্তর ঃ (মৃদু হেসে) সে সব কথা লিখে কাজ নেই। ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার জন্যই আমার ওপর কঠোর নির্দেশ ছিল। তখন তো এখানকার কমিউনিষ্ট পার্টির নিজস্ব কোন কর্মপদ্ধতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তখনকার কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির 'লেজুড় বিশেষ'। আর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড়রা (কর্মকর্তারা) তো ছিলেন প্রায় সবাই হিন্দু। তাঁরা আদর্শের দিক থেকে যতটুকু কমিউনিষ্ট ছিলেন, তার চেয়ে বেশী ছিলেন হিন্দু।

প্রশ্ন ঃ তখন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান ছিলেন কে?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ রনদীভে।

প্রশ্ন ঃ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

উত্তর ঃ এখানে তো কোন পার্টির প্রেসিডেন্ট ছিল না। সেক্রেটারী ছিলেন সাজ্জাদ জহীর।

প্রশ্ন ঃ আমতলার মিটিং-এ আপনি সভাপতিত্ব করলেন, কিন্তু ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সময় আপনি প্রথম ব্যাচে ছিলেন না কেন?

উত্তর ঃ প্রথমেই বলেছিলাম যে, সিদ্ধান্ত ছিল প্রথম 'ব্যাচে' নেতৃত্ব দেবেন হাবিবুর রহমান শেলী। আমি নিজে প্রতিটি 'ব্যাচ'কে সংগঠিত করে বের করে দিচ্ছিলাম। এমন অবস্থায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এছাড়া সাধারণ ছাত্ররা আন্দোলনের স্বার্থে আমাদেরকে বের হতে দেয়নি্।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি গ্রেফতার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ না, আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর আমি 'আত্মগোপন' করি।

প্রশ্ন ঃ এই আত্মগোপন বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?

উত্তর ঃ বামপন্থী আন্দোলনের স্বার্থে আমাকে আত্মগোপন করতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার নামে কোন গ্রেফতারী পরওয়ানা বের হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, প্রায় চার মাস পর জানতে পারি সে গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রতাহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ অনেকে জেলে রইলো অথচ আপনাদের হুলিয়া প্রত্যাহার করা হলো, কেন?

উত্তর ঃ এপ্রিল মাসের শেষে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রদের জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। এবং ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত সবার গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রত্যাহার করা হয়।

প্রশ্ন ঃ অনেককে জেলে রেখে আপনাদের ছেড়ে দেয়া হলো, তাতে কি মনে হয় না যে, সরকারের দৃষ্টিতে আপনারা বিপজ্জনক ছিলেন না?

উত্তর ঃ হয়তো তাই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা চলছে।

উত্তর ঃ আমি মনে করি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে এবং তা দু'দিক থেকে। একদিকে কিছু নূতন দাবীদারকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং অন্যদিকে কারো কারো নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারার কাঠামোতে ফেলার জন্য এ মহান আন্দোলনের ইতিহাসকে ভিন্ন রূপ দেয়ার চেষ্টা করছেন অনেকে।

প্রশ্ন ঃ সাক্ষাৎকারে কেউ কেউ বলেছেন, জনাব অলি আহাদ বামপন্থী ছিলেন না, বামপন্থীরা তাঁকে ব্যবহার করছে। আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ না, আমি মনে করি জনাব অলি আহাদ সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য শুধুমাত্র সত্যের অপলাপই নয়, বরং তাঁর সম্পর্কে এটা একটা অত্যন্ত নির্দয় মন্তব্য। জনাব অলি আহাদ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সেরা ছাত্রদের একজন ছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৮ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়, তখন 'মুসলিম' শব্দের দরুন প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রদায়িক রূপ প্রকাশ হওয়ায় তিনি সংগঠনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন হয়েও শেষ পর্যন্ত সংগঠনে যোগ দেন নি।

১৯৫১ সালে যে যুবলীগ গঠন করা হয়, অলি আহাদ সাহেব ছিলেন তার সাধারণ সম্পাদক। সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মীর চিন্তাধারার মাপকাঠি মনে করি। সে বিচারে তিনি নিশ্চিতভাবে একজন বামপন্থী ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ কাজী গোলাম মাহবুব সাহেবের সাক্ষাৎকারে জানতে পারলাম, মৌলবী ফরিদ আহমদ ভাষা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারেন কি?

উত্তর ঃ আমি যতদূর জানি, জনাব ফরিদ আহমদ ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ঢাকা শহরের ছাত্রদের যে সাধারণ সভা হয়, তাতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে লিখিত প্রস্তাব পেশ করে বক্তৃতা করেন। ফরিদ আহমদ সাহেব তখন একদিকে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ঢাকা গভর্ণমেন্ট কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপকও ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার জন্য তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী জনাব আজিজ আহমদ তাঁকে সতর্ক করে দিলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

প্রশ্ন ঃ অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেব 'বরকত পুলিশের গোয়েন্দা ছিলেন' বলে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ শহীদ বরকতের সাথে শ্রদ্ধেয় রাজ্জাক সাহেবের ব্যক্তিগত পরিচিতি কতটুকু ছিল আমার জানা নেই, কিন্তু আমরা–যেমন আমি, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু নাসের মোহাম্মদ ওয়াহেদ (সিটি 'ল' কলেজের উপাধ্যক্ষ) বরকতকে ব্যক্তিগতভাবে জানি। বরকত সম্পর্কে এ ধরনের কথা আদৌ সত্য নয়, হতে পারে না। রাজ্জাক সাহেব যে পুলিশ অফিসারের সূত্র উল্লেখ করে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন তা কোনক্রমে সত্য হতে পারে না। কারণ পুলিশ কখনো কোন অবস্থায় তাদের গোপন 'সোর্সে'র নাম প্রকাশ করে না। সে জীবিত হউক কি মৃত হউক।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ
জুন, ১৯৭৮

কাজী গোলাম মাহবুব

[কাজী গোলাম মাহবুব ১৯৪৮ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' তিনিই ছিলেন আহ্বায়ক। এই 'কর্মপরিষদের' নেতৃত্বেই ১৯৫২ সালে সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়।

কাজী গোলাম মাহবুব বরিশাল জেলার গৌরনদী থানা কাজী কসবা গ্রামে ১৯২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম কাজী আবদুল মজিদ ছিলেন বরিশালে কৃষক আন্দোলনের (রায়ত আন্দোলন) প্রতিষ্ঠাতা।

জনাব মাহবুব গ্রামের টর্কী স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং ১৯৪২ সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। কাজী গোলাম মাহবুব ১৯৪৭ সালে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সেখান থেকে ১৯৪৭ সালে বি, এ, পাশ করেন। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, ল' ক্লাসে ভর্তি হন। '৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে তিনি গ্রেফতার হন। তাই আর পরীক্ষা দেয়া হয়নি। পরে ১৯৫১ সালে আইন পাশ করেন।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছাড়াও তিনি 'মিনিয়াল ষ্ট্রাইক', ১৯৫০ সালের 'ফুড ডেমোনষ্ট্রেশন', 'শাসনতন্ত্র আন্দোলন' প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৫৩ সালে তিনি বরিশালে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এ সময় তিনি বরিশাল জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা-জেনারেল সেক্রেটারী এবং প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম

সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘকাল কারাজীবন ভোগ করেন। মুক্তি পেয়ে পুনরায় জননিরাপত্তা আইনে ৩ মাস পটুয়াখালী সাবজেলে আটক থাকেন।

১৯৫৮ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় আইন-ব্যবসা শুরু করেন। এখনও তিনি এই পেশায় নিয়োজিত আছেন।]

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন সময় থেকে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন ?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালে যখন ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তখন থেকেই আমি এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কখন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলাম। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরের দিকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. (ল') ক্লাসে এডমিশন নেই।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরই কি আপনি ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন?

উত্তর ঃ না, তখনও ছাত্র রাজনীতি পুরোপুরিভাবে সংগঠিত হয়ে উঠেনি। সবেমাত্র পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে। সবার দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে সবেমাত্র জাতীয় রাজনীতি সংগঠিত হতে শুরু করেছে। ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। আমরা কলিকাতা থেকে আগত ছাত্রদের হল সমস্যা, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, ছাত্রদের রিডিং রুম, লাইব্রেরী প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ছাত্র সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া জাতীয় রাজনীতি নিয়ে ছাত্রদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন তখনো আসেনি। পরে বিকাশমান রাজনীতির এ ধারায় আমরা ক্রমে ক্রমে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। পরে অবশ্য ছাত্রদের যাবতীয় সমস্যা এবং দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামে প্রগতিশীল ছাত্রদের একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। নঈমুদ্দিনকে ও অলি আহাদকে কনভেনার করে একটি কনভীনিং কমিটিও গঠিত হয়। কমিটি এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেদিন যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন- (জাষ্টিস) আবদুর রহমান চৌধুরী, নঈমুদ্দিন, অলি আহাদ, মোঃ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, মোল্লা জালালউদ্দিন, আবদুল হামিদ (ফরিদপুর) প্রমুখ। এই কনভীনিং কমিটির মিটিং-এর সময় সম্ভবতঃ আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে? এর উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ সরকারী তরফ থেকে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার তৎপরতা, বাংলার পরিবর্তে উর্দু বর্ণমালা এবং আরবী হরফে বাংলা প্রবর্তনের চেষ্টা আমাদের শংকিত করে তোলে। তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন জনাব ফজলুর রহমান, প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ এবং শিক্ষা সেক্রেটারী ফজলে করিম ফজলী। এঁরাই এসব তৎপরতা চালাতেন। বিশেষ করে ফজলে করিম ফজলী এসব তৎপরতার স্বপক্ষে বিভিন্ন বুকলেট প্রচারের ব্যবস্থা করতেন। সরকার এবং বিশেষ মহলের এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। আমরা মনেপ্রাণে চাইতাম বাংলাও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হোক। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভাষা বাংলা। আর এই বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা আমাদের আশাহত এবং বিক্ষুব্ধ করেছিল। Economic, social এবং religious exploitation থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে, সে পাকিস্তানে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার মুখের ভাষা কেড়ে নেয়া হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে জনগণের বিক্ষুব্ধ হওয়ার কথা। তাই মনে রাখা দরকার ভাষা আন্দোলনের সামগ্রিক গুরুত্ব বুঝতে হলে এবং এর সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে উপমহাদেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। যে economic এবং social exploitation থেকে মুক্তি লাভের জন্য পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে একই কারণেই ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামও হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তমদ্দুন মজলিসই প্রথম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী উত্থাপন করে। পরে ছাত্ররা সংঘবদ্ধভাবে এই দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। মূলতঃ ভাষা আন্দোলন ছিল ছাত্রদের আন্দোলন। ছাত্ররাই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন economic এবং social exploitation থেকে মুক্তিলাভের প্রেরণাই ভাষা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। এ মুক্তি কি পাকিস্তানের রাষ্ট্র-কাঠামোর ভেতরে থেকে? না স্বাধীন কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আপনারা দেখেছিলেন?

উত্তর ঃ অবশ্যই তা পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর থেকে। তখন ভিন্ন কোন চিন্তার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ পাকিস্তান আন্দোলন ছিল আমাদের গভীর বিশ্বাস এবং একাগ্র সংগ্রামের ফলশ্রুতি। সে সম্পর্কে আপনাকে পরে বলছি। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হলে আমরা আবার exploited হবো, আমাদের এ আশংকা অত্যন্ত সঙ্গত ছিল। তাছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙ্গালী মুসলমানেরাই সবচেয়ে বেশী আত্মত্যাগ করেছে এবং তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং তাদের

ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হবে না, এ ছিল ন্যায়-নীতি এবং যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে আপনাদের (ছাত্রদের) প্রথম সাংগঠনিক পদক্ষেপ কি ছিল এবং তা কখন নেয়া হয়?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে ছাত্রদের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সংগ্রাম পরিষদে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক আবুল কাসেম, নূরুল হক ভূঁইয়া, আবদুল গফুর, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, কামরুদ্দীন, নঈমুদ্দীন, লিলি খান, নূরুল আলম (টাঙ্গাইল), শামসুল আলম (টাঙ্গাইল), নুরুল হুদা (ইনজিনিয়ারিং কলেজ) এবং আমি। শামসুল আলমকে এই পরিষদের কনভেনার করা হয়। এই পরিষদের অধিকাংশ ছিল ছাত্র।

প্রশ্ন ঃ সংগ্রাম পরিষদের সাংগঠনিক মিটিংগুলো কোথায় অনুষ্ঠিত হতো?

উত্তর ঃ ফজলুল হক হলের ক্যাফেটেরিয়াতেই পরিষদের অধিকাংশ সাংগঠনিক মিটিং অনুষ্ঠিত হতো। আর ফজলুল হক হলই ছিল তখন ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের এ সংগ্রাম পরিষদের উদ্দেশ্য এবং প্রাথমিক তৎপরতা কি ছিল?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করা এবং জনমত গড়ে তোলাই ছিল এ পরিষদের উদ্দেশ্য। প্রথমে আমরা ৪ঠা মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করি। আমাদের এ তৎপরতা শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়নি। তবে আমরা এ পদক্ষেপের ফলে 'অরগানাইজড' হয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ জনগণের মাঝে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ জনগণের মাঝে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঢাকার অধিবাসীরা এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে ছিল। তাদের মনোভাব ছিল, পাকিস্তান সবেমাত্র দুধের বাচ্চা, আর তোমরা এর মুখের 'দুধের বোতল' নিয়ে টানাটানি শুরু করেছো? তাই ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে প্রাথমিক তৎপরতাগুলো তারা ভালো চোখে দেখতো না। অনেক শিক্ষিত লোকের মাঝেও এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল।

প্রশ্ন ঃ ৪ঠা মার্চের পর আপনাদের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য তৎপরতা কি ছিল?

উত্তর ঃ ৪ঠা মার্চের পর ১১ই মার্চের 'জেনারেল স্ট্রাইক' ছিল আমাদের উল্লেখযোগ্য তৎপরতা। সম্ভবতঃ আমরা ৫ই মার্চ সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ১২ই মার্চ 'জেনারেল স্ট্রাইক' ডাকা হবে এবং সেভাবেই কর্মসূচী প্রণয়ন করা হলো। প্রভিন্সিয়াল এসেম্বলির

সেশানকে সামনে রেখে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ ১১ই মার্চের তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন না।

উত্তর ঃ ১১ই মার্চের প্রধান কর্মসূচী ছিল 'জেনারেল স্ট্রাইক', পরিষদের সামনে 'ডেমোনস্ট্রেশন' এবং সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং করে সরকারী কর্মচারীদের অফিসে যাওয়া থেকে বিরত রাখা। সকাল দশটা থেকে আমরা গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে পিকেটিং শুরু করি। পিকেটিং এর সময় পুলিশ ছাত্রদের বেদমভাবে প্রহার শুরু করে এবং বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করতে থাকে। পিকেটিং-এ যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মধ্যে খালেক নেওয়াজ, অলি আহাদ, মোঃ বায়তুল্লাহ, শামসুল হক এবং শেখ মুজিব উল্লেখযোগ্য। পিকেটিং করতে গিয়ে শেখ মুজিব সম্ভবতঃ প্রথমেই গ্রেফতার হয়ে যান। আমি সেক্রেটারিয়েটের সেগুন বাগিচার গেইটে পিকেটিং-এ ছাত্রদের সংগঠিত করতে যাই। তখন পুলিশের আই,জি, জাকির হোসেন গাড়ী নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বাধা দিয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ি। পুলিশ এসে আমাদের মারধোর শুরু করে। আই,জি-র রক্ষী পুলিশ আমাকে চুল ধরে টেনে তুলে বেদম প্রহার করে। এ পর্যায়ে আই,জি-র সাথে আমার ধাক্কাধাক্কি হয়। এর জন্য পরে কোতওয়ালী থানায় আমার নামে আই,জি, জাকির হোসেন সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেন। ঘটনাস্থলে ডি,আই,জি, চেথাম ও সিটি এস,পি, গফুর সাহেব ছিলেন। গফুর সাহেব আমাকে গ্রেফতার করে তাঁর জীপে নিয়ে যান।

প্রশ্ন ঃ আপনারা সেদিন মোট কতজন গ্রেফতার হয়েছিলেন? পরে কবে মুক্তি পেলেন।?

উত্তর ঃ আমরা পঁয়ষট্টি জনের মতো গ্রেফতার হই। ১১ তারিখ হতে ১৫ তারিখ পর্যন্ত জেলে ছিলাম। পনেরো তারিখে আমরা মুক্তিলাভ করি।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা চুক্তির ফলেই মুক্তিলাভ করেছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তাই। আমার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা ছিল বলে আমার মুক্তির ব্যাপারে জটিলতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত আই,জি-কে আমার কেসটা উঠিয়ে নিতে হয়। তবে এ চুক্তি ছাড়াও আমাদের মুক্তির আরো কারণ রয়েছে। পার্লামেন্টের ভেতর নাজিমুদ্দীন সরকারের বিরোধী এম.এল.এ-গণ ভাষার দাবীকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হচ্ছিল। এ ছাড়া কায়েদে আযম পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসছিলেন। সুতরাং এমন মুহূর্তে নাজিমুদ্দীন চাচ্ছিলেন ব্যাপারটা আপোশে মিটিয়ে ফেলে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে। এ কারণগুলোও আমাদের মুক্তিকে প্রভাবিত করেছিল।

প্রশ্ন ঃ পরিষদে কারা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে বক্তব্য রাখতেন? তারা কি কোন গ্রুপ হিসেবে পরিচিত ছিলেন?

উত্তর ঃ খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আলী আহমদ খান (বিচারপতি মোরশেদের পিতা), খান সাহেব ওসমান আলী, তোফাজ্জল আলী, মোঃ আলী, ডাঃ মালেক (পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্ণর) প্রমুখ রাষ্ট্রভাষার পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। পরিষদের ভেতরে এঁরা সোহরাওয়ার্দী সমর্থক বলে পরিচিত ছিলেন। তাই বলে এঁদের সবাই যে মনপ্রাণ দিয়ে পরিষদের অভ্যন্তরে ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতেন তা নয়। এঁদের অনেকে ভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে নাজিমুদ্দীন সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গঠনে তৎপর হন। কেউ কেউ আবার পরবর্তী সময়ে নাজিমুদ্দীনের সাথে 'নেগোসিয়েশন' করে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা চালান এবং ভাষা আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে পরিষদের অভ্যন্তরে ৬৪ জন এম.এল.এ. নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো। সোহরাওয়ার্দী সমর্থক বলে পরিচিত এই ফ্রন্ট গড়ে তোলার ব্যাপারে শেখ মুজিবও তৎপর ছিলেন। কারণ শেখ মুজিব ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের 'ফ্যানাটিক' সমর্থক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ফ্রন্ট রাষ্ট্রভাষাকে ইস্যু হিসেবে নিয়ে মুসলিম লীগ এম.এল.এ- দের তাঁদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা চালায়। এ ছাড়া পরিষদে নাজিমুদ্দীন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত পদ এবং ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যও এক শ্রেণীর এম.এল.এ-র মধ্যে কার্যকর ছিল।

আরো নির্মম সত্য এই যে, এই গ্রুপের যারা ভাষা আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পদ লাভ করেছেন পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মত ব্যক্তিত্বও তাঁদের সাথে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে কাজ করেছেন। সেদিন মহান ভাষা আন্দোলনকে ব্যবহার করে তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'টাউট ইজমের' অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাও পরবর্তীকালে তাঁদের সাথে 'কমপ্রোমাইজ' করেছেন– এটা আজো আমার কাছে দুঃখজনক বলে মনে হয়। বলতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের রাজনৈতিক জীবনে 'টাউট ইজমের' এ ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। জাতিকে অবশ্যই এই 'রাজনৈতিক টাউট ইজমের' কবল হতে মুক্তি লাভ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমাদের রাজনীতিতে আজো 'টাউট ইজমের ধারা অব্যাহত রয়েছে।'– এর

দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?

উত্তর ঃ রাজনীতিতে 'টাউট ইজমের ধারা অব্যাহত রয়েছে' এই জন্য বলছি যে, যারা আদর্শ ও নীতিচ্যুত হতে পারছে, তারাই আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে সমাদৃত হচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ পেশ করলেই তা বুঝতে পারবেন। যে মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) পদের লোভে নীতিচ্যুত হয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের গ্রুপ ত্যাগ করলেন, তাঁর ক্যাবিনেটেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মত নেতা পরবর্তীকালে ল' মিনিষ্টার হিসেবে যোগদান করেন। যে (খান বাহাদুর) আবদুল ওহাব খান পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছেন এবং পরে ভাষা আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছেন, তিনিই ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের টিকেট থেকে বঞ্চিত হয়ে যুক্তফ্রন্টে ভিড়লে সোহরাওয়ার্দী–হক সাহেবের আশীর্বাদে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন পান। তিনি ছিলেন হক সাহেবের ভাগ্নী জামাতা। হয়তো এই যোগ্যতার বলেই তিনি মনোনয়ন পেয়েছেন। ঠিক এমনি ধরনের ব্যাপার ঘটে ১৯৭০ সালে। শেখ মুজিব তাঁর ভগ্নিপতি সেরনিয়াবাতকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেন। অথচ সেরনিয়াবাত কোনদিন আওয়ামী লীগ করতেন না। রাজনীতিতে, যখন 'ডেডিকেশন' এবং 'সিন্‌সিয়ারিটির' মূল্য দেয়া হয় না, তখনই এতে 'টাউট ইজমের' অনুপ্রবেশ ঘটে, আর 'রাজনৈতিক টাউট ইজম' থেকে সৃষ্টি হয় 'ন্যাশনাল ক্রাইসিস'।

প্রশ্ন ঃ নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার সাথে নেগোসিয়েশন করে যেসব এম.এল.এ. পদ লাভ করেছেন, তাঁরা কারা?

উত্তর ঃ তোফাজ্জল আলী, মোহাম্মদ আলী, ডাঃ মালেক প্রমুখ। সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক বলে পরিচিত আরো অনেক এম.এল.এ. রং বদল করেছেন। অথচ সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁদের সাথেই পরবর্তীকালে হাত মিলিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১১ই মার্চের কর্মসূচী সম্পর্কে আরেকটা বিষয় জানা হয় নি। সেদিন পরিষদের সামনে ডেমোনস্ট্রেশন হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ছাত্ররা পরিষদের সামনেও গ্রুপে গ্রুপে ডেমোনস্ট্রেশন করেছিল। আমি সেক্রেটারিয়েটের গেইটে পিকেটিং করতে আসার সময় ছাত্রদেরকে এসেম্বলীর সামনে সংঘবদ্ধ হতে দেখেছি।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের সাথে ছাত্র প্রতিনিধি দলের যে সাক্ষাৎকার হয়েছিল তাতে কি আপনি উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর ঃ না, আমি উপস্থিত ছিলাম না। ১১ই মার্চে গ্রেফতার হয়ে ১৫ তারিখ পর্যন্ত আমরা জেলে ছিলাম। এরই মধ্যে কারা কায়েদে আযমের সাথে সাক্ষাৎ করবেন

তাঁদের নাম ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং আমার সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না।

প্রশ্ন ঃ কার্জন হলে কায়েদে আযমের মন্তব্যের বিপক্ষে কারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল?

উত্তর ঃ এ প্রসঙ্গে অনেক অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কারা প্রতিবাদ করেছে, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। কারণ কায়েদে আযম উর্দুর স্বপক্ষে মন্তব্য করার পর সম্মিলিতভাবে 'নো, নো' প্রতিবাদ উঠেছিল। সেখানে কোন ছাত্রের নেতৃত্ব দেয়ার কথা সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত। কোন্ কোন্ ছাত্র 'নো-নো' বলে কণ্ঠ মিলিয়েছিল তা চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ হাস্যকর। 'নো, নো' প্রতিবাদের পর পরই কায়েদে আযম- 'it is my view' সংযোজন করে তাঁর বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করেন।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের রেসকোর্সের জনসভায় কোন প্রতিবাদ হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ না, সেখানে কোন প্রতিবাদ ওঠে নি। সেখানে প্রতিবাদ হয়েছিল বলে যেসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা সঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ উর্দু ভাষার স্বপক্ষে কায়েদে আযমের মন্তব্য এবং উপমহাদেশের বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কায়েদে আযম সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ কায়েদে আযম ছিলেন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি একজন 'লিবার‍্যাল ডেমোক্রাট' ছিলেন। নইলে উপমহাদেশের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গভর্ণর জেনারেল হয়েও পূর্ব পাকিস্তানে এসে ছাত্র নেতাদের খোঁজখবর নিয়ে তিনি সাক্ষাৎকারে মিলিত হতেন না এবং কার্জন হলে তিনি 'it is my view' সংযোজন করে গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিতেন না। কার্জন হলের এ প্রতিবাদের পর কায়েদে আযম রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আর কোনদিন কোন বিতর্কমূলক মন্তব্য করেন নি। আমার বিশ্বাস তিনি বেঁচে থাকলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী আন্তরিকভাবে মেনে নিতেন। বাংলা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা পেতো।

অনেকে হয়তো জানেন না যে, কায়েদে আযমই প্রশাসনে পূর্ব পাকিস্তানী ছেলেদের (বাংলাদেশী) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের জন্য সুপিরিয়র সার্ভিসে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কোটা নির্দ্ধারিত করে যান। পূর্ব পাকিস্তানী ছেলেরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং যোগ্যতায় অনগ্রসর বলেই তিনি এই ব্যবস্থা করে গেছেন। এমন মহান নেতার বিরূপ এবং মিথ্যা সমালোচনা অনুচিত।

কায়েদে আযমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়ে আজ আবেগে অনেকে অসত্য এবং অতিরঞ্জিত বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, উপমহাদেশের

দু'একজন মুসলিম নেতা ছাড়া আর তখন এমন কেউ ছিলেন না, যে কায়েদে আযমের চোখে চোখ রেখে কথা বলার যোগ্যতা রাখতেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলুন আর যে কোন mighty নেতার কথাই বলুন, কায়েদে আযমের সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের সামনে চোখ অবনত করে কথা বলতে হতো সবাইকে। সুতরাং ভাবাবেগে সত্যের অপলাপ করে কোন লাভ নেই।

প্রশ্ন ঃ তোয়াহা সাহেবের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে জানতে পারলাম, ভাষা আন্দোলনে গোলাম আযম সাহেবও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গোলাম আযম সাহেব তখন কি ছিলেন? তাঁর কথা কিন্তু আর কেউ বলেন নি।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, গোলাম আযম, (মৌলবী) ফরিদ আহমদ এঁরা অনেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অবদান রেখেছেন। কিন্তু কে কার কথা বলে বলুন। অন্যের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার মতো হৃদয়বৃত্তি আমাদের আছে কি? আমরা তো সবাই আত্মপ্রচারে ব্যস্ত। অরবিন্দ বোস ছিলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের V.P. এবং গোলাম আযম ছিলেন G.S.। অত্যন্ত চরিত্রবান এবং আদর্শ প্রকৃতির ছাত্র ছিলেন তিনি।

প্রশ্ন ঃ ১১ই মার্চ সম্পর্কে আরো কিছু জানা প্রয়োজন। পরে কি ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হতো?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ১১ই মার্চ সংগ্রামী দিবস হিসেবে উদযাপিত হতো কিন্তু পরে এ দিবস পালনের উৎসাহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর ঃ বামপন্থীদের ভূমিকা থাকবে কোথা থেকে? তখন কমিউনিষ্ট পার্টি তো 'ব্যাণ্ড' ছিলো। তাঁদের কোন ভূমিকা পালনের প্রশ্ন ওঠে কি করে?

প্রশ্ন ঃ কেন, তোয়াহা সাহেব, অলি আহাদ সাহেব এঁরা কি বামপন্থী ছিলেন না?

উত্তর ঃ তোয়াহা সাহেব তখন গণতান্ত্রিক শক্তির সাথেই কাজ করতেন। নেপথ্য থেকে কমিউনিষ্ট পার্টি তাঁকে কি নির্দেশ দিত জানি না। তবে বাহ্যতঃ তিনি আমাদের কাছে সে পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন না। আর অলি আহাদ সাহেব কিসের বামপন্থী ছিলেন? বামপন্থীরা নেপথ্য থেকে তাঁকে কাজে লাগাতো। তিনি ছিলেন 'হাইলি এমবিশাস'। এ জন্য বামপন্থীরা প্রয়োজন মতো তাঁকে 'ইউটিলাইজ' করতো। তিনি বামপন্থী ছিলেন না। বরং বলা যায়, তিনি বামপন্থীদের 'ট্র্যাপের' মধ্যে ছিলেন।

এ ছাড়া আর যাঁরা বামপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন– যেমন মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ

কায়সার, তাসাদ্দুক, গাজীউল হক তাঁদের সবার স্ব স্ব ভূমিকা তো দৃশ্যপটে আছেই। আপনি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন আন্দোলনে থেকেও বামপন্থীরা পদ ও সুযোগ লাভের জন্য অধিকতর তৎপর ছিল আর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির সদস্যরা তো শুধু 'সাফার' করেছেন।

প্রশ্ন ঃ 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' কখন গঠিত হয়? এই পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। বিভিন্ন হল পরিষদ থেকে দু'জন করে সদস্য নিয়ে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে এই রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। আমি এই পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হই। পরিষদের কার্যক্রমকে জাতীয় রূপ দেওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন আবুল হাশিম, মাওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, মোঃ তোয়াহা, অলি আহাদ, কামরুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, মজিবুল হক, শামসুল আলম, আবদুল মতিন, খালেক নেওয়াজ প্রমুখ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নাজিমুদ্দীন গভর্ণর জেনারেল হিসেবে ২৭শে জানুয়ারীতে পল্টন ময়দানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। নাজিমুদ্দীনের ঘোষণা ছাত্র সমাজকে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ করে। এমনি পরিস্থিতিতে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' ওপর গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোথাও 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' কোন ইউনিট গঠিত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ না, আর কোথাও ইউনিট গঠিত হয়নি। সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনৈক্য সৃষ্টি হতে পারে, যার যার ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে–এ আশঙ্কায়ই আমরা আর কোন কমিটি গঠন করতে দেই নি।

প্রশ্ন ঃ 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' উদ্যোগে আপনারা কি পদক্ষেপ নেন?

উত্তর ঃ এই কর্মপরিষদ গঠনের পর পরই সারা দেশে এই কমিটি গঠনের জন্য ইশতেহার পাঠিয়ে দিই। বার লাইব্রেরী হলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করি। সে সভায় মাওলানা ভাসানী সভাপতিত্ব করেন। নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আহবায়ক হিসেবে কর্মপরিষদের উদ্দেশ্য এবং সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখি।

প্রশ্ন ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদই কি একুশে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদই একুশের কর্মসূচী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

নেয়।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীকে সফল করার জন্য এর পূর্বে কি কি তৎপরতা চালানো হয়?

উত্তর ঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন, ১১ই ফেব্রুয়ারী জেনারেল ষ্ট্রাইক, ১৩ এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী ফ্লাগ ডে পালন–এ সব তৎপরতাই ছিল একুশে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচীকে সফল করার জন্য।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়? কোথায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়?

উত্তর ঃ ৯৪নং নবাবপুরের আওয়ামী লীগ অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবুল হাশিম সাহেবের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং ধীর স্থিরভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২১ ভোট ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে এবং ৪ ভোট ভঙ্গের পক্ষে ছিল। এরূপ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এবং সেভাবেই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল আহ্বান করা হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন? এর পেছনে কি যুক্তি ছিল?

উত্তর ঃ আমরা ভাষা আন্দোলনকে সারা দেশে জনগণের মধ্যে বিস্তৃত করে পর্যায়ক্রমিকভাবে দুর্বার আন্দোলনের রূপ দিতে চেয়েছিলাম। যার ফলে ভাষা আন্দোলন এমন রূপ নিত যে, এর সামনে যে কোন প্রশাসনিক বা সরকারী প্রতিরোধ চুরমার হয়ে ধ্বসে পড়তো। তাই সেদিনই আমরা চরম সিদ্ধান্ত নিতে চাইনি। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে পর্যায়ক্রমিকভাবে দুর্বার গতি দিতে চেয়েছিলাম। আমাদের আশংকা ছিল, চরম সিদ্ধান্ত নিলে সরকারী স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপও চরমে উঠবে এবং আমাদের আন্দোলনের মূল কাঠামো বা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হবে। প্রকৃতপক্ষে সরকার সে সুযোগের জন্যই ওঁত্ পেতে ছিল। আর বাস্তবে তাই ঘটেছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি এর পূর্বে বরকতকে দেখেছেন কি? ছাত্রদের কোন মিটিং-এ তাঁকে লক্ষ্য করেছেন কি?

উত্তর ঃ আমি এর পূর্বে আর কখনও ছাত্রসভায় বরকতকে দেখেছি বলে মনে হয় না। বরকত আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

প্রশ্ন ঃ বরকত পুলিশের 'ইনফরমার' ছিল বলে অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেব যে তথ্য পরিবেশন করেছেন সে সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেব পুলিশ অফিসারের নিকট শুনেছেন। সুতরাং পুলিশের রক্ষিত রেকর্ডপত্র থেকেই এ তথ্যের সঠিক প্রমাণ আহরণ করা যেতে পারে। তবে বরকত যা-ই হউক না কেন, আমরা তাঁকে শহীদ মনে করি। কারণ ঘটনার অনিবার্য পরিণতি তাঁকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ তখন ছাত্রদের মধ্যে পুলিশের 'ইনফরমার' থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, থাকতে পারে। কারণ, পরিষদের এম.এল. এ-গণ যখন ভাষা আন্দোলনকে পুঁজি করে নেপথ্যে পদ লাভের চেষ্টা চালাতে পারেন, তখন ছাত্রদের মধ্যেও সরকারী 'এজেন্ট' বা পুলিশের 'ইনফরমার' থাকা বিচিত্র কিছু নয়। সকল মহান আন্দোলনের পেছনেই স্বার্থান্বেষী শক্তির 'স্যাবোটাইজ' মূলক কারসাজি থাকতে পারে।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার মিটিং-এ আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? ঐ সভায় কে সভাপতিত্ব করেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি উপস্থিত ছিলাম। গাজীউল হক সাহেব ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তগুলো সভায় কে ঘোষণা করেন?

উত্তর ঃ কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে সভায় শামসুল হক বক্তব্য রাখেন।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের ঐ ছাত্রসভার প্রাক্কালে পুলিশ কি কোন উস্কানীমূলক কিছু করেছিল, যার ফলে পরিস্থিতি অবনতির দিকে যায়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পুলিশ উস্কানীমূলকভাবে ইউনিভার্সিটি গেইটের সামনে অবস্থান করছিল। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররাও তাদের উপস্থিতি সহ্য করছিল না, এইভাবেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সূত্রপাত ঘটে।

প্রশ্ন ঃ গুলিবর্ষণের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি গুলিবর্ষণ হওয়ার পর বরকতকে দেখেছেন?

উত্তর ঃ মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসার পর আমি বরকতের মৃতদেহ দেখতে পাই।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্তকে অনেকে আন্দোলন হতে পিছু

হটে আসা এবং এক প্রকার 'বিট্রেয়াল' বলে আখ্যায়িত করেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ তা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁরা এ ধরনের মন্তব্য করেন তাঁরা পরিস্থিতির অপব্যাখ্যা করে সস্তায় প্রশংসা কুড়াতে চাচ্ছেন মাত্র। হালকা 'সেন্টিমেন্ট' বা উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর করে কোন মহান জাতীয় আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া যায় না। আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমরা কত সংগঠিত এবং সঠিক পন্থায় এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, পরবর্তী ঘটনাক্রমের আলোকে বিচার করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। একুশের পর পরিস্থিতি এমন হয় যে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের পরও পুলিশ এবং সরকারী প্রশাসন নির্মম অত্যাচারের ষ্টিমরোলার চালাতে থাকে। সরকার বাংলা ভাষাকে নীতিগত স্বীকৃতি দিলেও যাঁরা জীবনমরণ প্রচেষ্টায় এই মহান আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তাঁদের উপর নির্যাতন বন্ধ করেনি। আমরা যারা প্রায় দেড়টি বছর জেলে ছিলাম, তাদের মুক্তির জন্যও তেমন কোন প্রচেষ্টা চলেনি। যারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে মন্তব্য করেন তাঁদের অনেককে কিন্তু সেদিন চরম মুহূর্তে পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন ঃ এ ঘটনার পরের দিনগুলোতে কি হরতাল পালিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ একুশে ফেব্রুয়ারী যে হরতালের আহ্বান করে পরবর্তী তিন দিন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। এসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই জনাব ওসমান আলীর (এম.এল.এ.) বাড়ী লুট হয়, নারায়ণগঞ্জের মর্গান স্কুলের হেড মিস্ট্রেস চরমভাবে নির্যাতিত হন। এমনি ধরনের বহু ঘটনা ঘটতে থাকে এবং তা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় নিয়ে আসে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের পরবর্তী তৎপরতা কি ছিল? ঘটনাপ্রবাহ কিভাবে এগিয়ে যায়?

উত্তর ঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী আমাদের নয় জনের নামে হুলিয়া বের হয়। স্বরাষ্ট্র (স্পেশাল) বিভাগ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত ঢাকা গেজেটে (এক্সট্রা অর্ডিনারী) আমাদের নামের তালিকা প্রকাশ করে ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নিজ নিজ জেলা প্রশাসকের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যাঁদের নামে হুলিয়া বের হয় তাঁরা হলেন– কাজী গোলাম মাহবুব (আহবায়ক, রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ), খালেক নেওয়াজ (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ), শামসুল হক (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ), অলি আহাদ (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ), আবদুল মতিন (আহবায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ), সৈয়দ এম. নুরুল আলম, আজিজ আহমদ, আবদুল আউয়াল এবং মোহাম্মদ তোয়াহা।

আমরা পালিয়ে পালিয়ে আবার আন্দোলনকে 'রিভাইব' করতে চেষ্টা করি। বিভিন্ন স্থানে ঘরোয়া মিটিং করি। ২৪শে ফেব্রুয়ারী মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেই ৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে এবং পুলিশী নির্যাতন ও ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ই মার্চ হরতাল আহ্বান করা হলো। সংগঠিত তৎপরতার অভাবে কিন্তু হরতাল সফল হলো না। ঘটনাপ্রবাহ ক্রমাগতভাবে আন্দোলনের প্রতিকূলে যাচ্ছিল। তার সাথে সরকারী নির্যাতনের মাত্রাও বাড়ছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা পুনরায় আন্দোলনকে সংগঠিত করতে চেষ্টা করি এবং ৭ই মার্চ সন্ধ্যায় ৮২, শান্তিনগরে এক ঘরোয়া মিটিং-এ মিলিত হই। এই ঘরোয়া বৈঠকে আমি ছাড়া আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেনঃ অলি আহাদ, আবদুল মতিন, মীর্জা গোলাম হাফিজ, মোহাম্মদ তোয়াহা, মজিবুল হক (সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ), হেদায়েত হোসেন চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ), মোঃ সাদেক খান, হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামান (বর্তমানে ডক্টর আনিসুজ্জামান)। তোয়াহার অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ বক্তৃতার জন্য বৈঠকের কাজ শেষ করতে দেরী হয়ে যায়। সভার কাজ প্রায় শেষ এমন সময় পুলিশ এসে ৮২ নম্বর শান্তিনগরের বাসাটি ঘেরাও করে। পালাবার আর কোন পথ নেই দেখে সকলে পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য কেউ ঘরের চাকর সাজে, কেউ খাটের নীচে আত্মগোপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। অলি আহাদ তাড়াতাড়ি ঘরের এক কোণে রাখা মশলা-বাটার পাটা নিয়ে ঘরের কাজে ব্যস্ত রয়েছে এমন ভাব দেখায়। কিন্তু পুলিশের তীক্ষ্ণ নজরকে ফাঁকি দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি অবশ্য ঘরের বাঁশের মাচার উপর উঠে অন্ধকারে পোকা মাকড়ের কামড় সহ্য করে এমনভাবে শুয়েছিলাম যে, পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও সে যাত্রায় আমাকে খুঁজে পায়নি। হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামান ছাড়া বাকি সবাই গ্রেফতার হন। আনিসুজ্জামান ও হাসান পারভেজ গ্রেপ্তার না হওয়ার ব্যাপারটি তখন আমাদের কাছে রহস্যজনকই মনে হয়েছে। আনিসুজ্জামান ৮২, শান্তিনগরে অলি আহাদকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ অলি আহাদ বৈঠকের ঠিকানা জানতেন না। এছাড়া আমরা শুনেছি বশির নামে আনিসুজ্জামানের একজন আত্মীয় আই.বি. ইন্‌সপেক্টর ছিলেন। তাই আনিসুজ্জামানের গ্রেপ্তার না হওয়ার কারণে আমাদের স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে আনিসুজ্জামানের মাধ্যমে পুলিশ আমাদের অবস্থান সম্পর্কে ভালভাবে জেনে বাড়ী ঘেরাও করেছিল। পুলিশ চলে যাওয়ার পর আমি গভীর রাতে ৮২ নম্বর শান্তিনগরের বাসাটি থেকে বের হয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আত্মগোপন করি। কিন্তু পুলিশ এমনভাবে পিছু লেগেছিল যে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করতে বাধ্য হই।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কারা গ্রেফতার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ সবার নাম তো মনে নেই। তবে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জনাব আবুল হাশিম, জনাব মওলানা ভাসানী, খন্দকার মোশতাক, জনাব আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, জনাব ওসমান আলী, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক সুনিল দে, জনাব আজিজ আহমদ, মোঃ তোয়াহা, জনাব অলি আহাদ, জনাব খালেক নেওয়াজ প্রমুখের কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন, আপনার গ্রেফতারের পর কি কর্মপরিষদ ভেঙ্গে যায়?

উত্তর ঃ আমার গ্রেফতারের পর কর্মপরিষদের কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য জনাব আতাউর রহমান খান আহ্বায়কের কার্যভার লাভ করেন। কিন্তু এর পর তাঁরা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারেন নি। আমাদের মুক্তির ব্যাপারেও কিছু করতে পারেন নি।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী সরকারের নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ এবং পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন এমন কোন স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের কথা জিজ্ঞেস করলে আপনি কার কথা বলবেন?

উত্তর ঃ জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন-এর কথা বলবো। সে দিনের নিদারুণ সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব সাহসিকতার সাথে পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। তাঁর সে দিনের সাহসিক ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মানসিক পটভূমি আপনার কিভাবে গড়ে উঠে? পরবর্তী জীবনে যেসব আন্দোলনে আপনি অংশগ্রহণ করেছেন তাতে সে মানসিকতার প্রতিফলন হয়েছে কি?

উত্তর ঃ ১৯৪৩ সালে বাংলায় চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় আমি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের 'সেকেণ্ড ইয়ার' আই,এ-র ছাত্র। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস মানুষের জীবনে যে কি নিদারুণ এবং ভয়াল পরিণতি আনতে পারে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। একদিকে উপরতলার মানুষের বিলাসী জীবনযাপন অন্যদিকে তাদের উচ্ছিষ্ট নিয়ে বুভুক্ষু ও অসহায় মানুষ আর কুকুরের কাড়াকাড়ি, এসব দৃশ্য কোন দিন ভোলার নয়।

আর সমাজের এই হতভাগ্য চরম অবস্থায় পতিত মানুষের শতকরা পঁচানব্বই জনই ছিল মুসলমান। বাঙ্গালী মুসলমানেরাই ছিল তখন সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত, শোষিত এবং নিরন্ন। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস এবং মুসলমানদের নিদারুণ পরিণতি আমার

যুবকমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আর তাই একদিকে যেমন বৃটিশের ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতি চরম ঘৃণা জন্মে তেমনি অগ্রসরমান হিন্দু সমাজের কবল হতেও বাঙ্গালী মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মুক্তির জন্য মানসিক পটভূমি গড়ে ওঠে। এই মানসিক অনুভূতিই আমার পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং আমাকে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে যে মুসলমানদের মুক্তি অর্জন করা যাবে– এ বিশ্বাস আপনার কেন জন্মালো?

উত্তর ঃ আপনাকে পূর্বেই বলেছি তখন মুসলমানেরাই ছিল সর্ব নিম্নস্তরে। সমাজে তাদের করুণ পরিণতি বুঝতে হলে তখনকার সামাজিক পটভূমি তুলে ধরা প্রয়োজন। উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে আমাদের গভীর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমেই মুসলমানদের মুক্তি অর্জন সম্ভব। এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে হিন্দুদের সেই সাম্প্রদায়িক শোষণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য পাকিস্তান আন্দোলনই যে অনিবার্য এবং সঠিক পথ সে কথা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। এই আন্দোলনকে আমি Human Rights-এর মহান struggle বলে মনে করি। And it was the struggle for human rights of those people who were Muslims and who were being subjugated and economically exploited.

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার আর কোন বক্তব্য আছে কি?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করার সময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠান এর একক কৃতিত্বের দাবীদার নয়। সকল শ্রেণীর জনগণ তথা সমগ্র জাতি এ আন্দোলনকে সফল করার দাবীদার। সেদিন সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বলেই ভাষা আন্দোলন মহান জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। আজ এ মহান আন্দোলন সকল অবিচার অত্যাচার আর শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ
মে, ১৯৭৮
ডিসেম্বর, ১৯৮৬

এস. এ. বারী এ. টি.

[এস. এ. বারী এ.টি. ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনের ছাত্র ছিলেন। '৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে জনপ্রিয় ছাত্রনেতায় পরিণত করে। বস্তুতঃ জনাব বারীর রাজনীতিই শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রতিবাদী মিছিলে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে গিয়ে তিনি দীর্ঘ ১৩ মাস কারাবরণ করেন।

জনাব এস.এ. বারী এ.টি-র জন্ম দিনাজপুরে। তাঁর পিতা ছিলেন বৃটিশ আমলের একজন স্কুল ইন্‌সপেক্টর। ভাইবোনদের সবাই উচ্চ শিক্ষিত। পিতা চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তিনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। সুতরাং জনাব বারী পারিবারিক দিক থেকে শিক্ষা ও রাজনীতির অনুকূল পরিবেশ পান।

জনাব বারীর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন দিনাজপুরেই অতিবাহিত হয়। দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে তিনি ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৮ সালে আই.এস-সি পাশ করেন। পরে আর্টস গ্রুপে পড়াশুনা করেন এবং ১৯৫১ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কলেজ জীবনে তিনি তৎকালীন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিনি যুবলীগের সাথে জড়িত হন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫২ সালে জেলে জনাব বারীর সাথে মাওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎ ঘটে। এই দুর্লভ সাক্ষাৎই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পথ রচনা করে। জেলের অভ্যন্তরে মাওলানা ভাসানীর ব্যক্তিত্ব, ব্যবহার ও কর্মতৎপরতা তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি মাওলানা ভাসানীর জনসেবামূলক রাজনৈতিক

আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। আর তাই ১৯৫৭ সালে ন্যাপের জন্ম থেকেই তিনি ন্যাপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে রাজনীতি করেছেন।]

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন?

উত্তর ঃ ১৯৫১ সালের নভেম্বরের দিকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই।

প্রশ্ন ঃ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারেন কি?

উত্তর ঃ সে সময় আমি দিনাজপুরে পড়াশুনা করি। ১১ই মার্চের ঘটনা আমাদের তুমুলভাবে আলোড়িত করেছিল। রাষ্ট্রভাষার অধিকার সম্পর্কে তখন মানুষ অধিকতর সচেতন হয়।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের পর কোন্ ঘটনার সূত্র ধরে আপনি ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত হন? আপনি তখন কোন ছাত্র বা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্পর্কে আমি পূর্বেই সচেতন ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের পর আমাদের তেমন কোন পরিচিতি ছিল না। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আমার পরিচিতি বিস্তৃত হয়। সত্যিকারে বলতে কি, সেই পরিচিতি এবং ভাষা আন্দোলনের ভূমিকার জন্যই আমি ৫৩-৫৪ সালে ডাকসুর ভি.পি. নির্বাচিত হই। আমি যুবলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের দফতর সম্পাদক ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ যুবলীগের ভূমিকা কিরূপ ছিল? কারা যুবলীগে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ যুবলীগ ছিল এ দেশের প্রগতিশীল ছাত্র সমাজের একটি সংগ্রামী যুব সংগঠন। এ দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন সৃষ্টির জন্যই এই সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। আমি যখন যুবলীগের দফতর সম্পাদক ছিলাম তখন অলি আহাদ সাহেব ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারী। মাহমুদ আলী সাহেব প্রেসিডেন্ট এবং তোয়াহা সাহেব ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেনঃ আবদুস সামাদ আজাদ (বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা), কে, জি, মোস্তফা (প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত), আবদুল মতিন প্রমুখ।

প্রশ্ন ঃ আপনি যখন ডাকসুর ভি.পি. নির্বাচিত হন তখন জি.এস. নির্বাচিত হন কে?

উত্তর ঃ জুলমত আলী খান (বর্তমানে এডভোকেট)। আমাদের কেবিনেটই ডাকসুর প্রথম নির্বাচিত কেবিনেট।

প্রশ্ন ঃ কেন, পাকিস্তান হওয়ার পর ডাকসুতে অরবিন্দ বোস (ভি.পি) এবং

(অধ্যাপক) গোলাম আযমের (জি.এস) কেবিনেট প্রথম ছিল না কি?

উত্তর ঃ (কিছুক্ষণ ভেবে) হ্যাঁ, ছিল। তখন হল ভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে ডাকসু গঠিত হতো। সংগঠন ভিত্তিতে কোন নির্বাচন হতো না। তাই সংগঠনগত কোন কেবিনেট ছিল না। তবে স্বাধীনতার পর অরবিন্দ বোস এবং গোলাম আযমই যথাক্রমে ডাকসুর ভি.পি. এবং জি.এস. ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা ডাইজেস্টের বিশেষ সাক্ষাৎকারে গাজীউল হক সাহেব বলেছিলেন, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মিটিং-এ ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আপনারা কিছু সংখ্যক ছাত্র নেতা ফজলুল হক হলের পূর্ব দিকের পুকুর পাড়ের সিঁড়িতে বসে এক মিটিং-এ ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতে যে কোন মূল্যে একুশে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেন। সে বৈঠকে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? সে বৈঠক কি কোন ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে হয়েছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সে বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। যে কোন মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমরা প্রত্যেক হলে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য ছাত্রদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেই এবং সে রাতেই আমরা তৎপর হয়ে উঠি। না, কোন ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে এ বৈঠক হয় নি।

প্রশ্ন ঃ পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কে?

উত্তর ঃ গাজীউল হক।

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন গ্রেপ্তার হন?

উত্তর ঃ প্রথম দিকেই আমি গ্রেপ্তার হাই। সভা শেষ হওয়ার পর দেখি ইউনিভার্সিটির গেইট বন্ধ। গেইটের বাইরে পুলিশের ব্যারিকেড। যদিও যুব লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল আন্দোলনের স্বার্থে যথাসম্ভব গ্রেপ্তার এড়িয়ে কাজ করার জন্য। কিন্তু আন্দোলনের স্বার্থেই আমার পক্ষে গ্রেপ্তার হতে এড়িয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। আমরা ক'জন ছুটে গিয়ে গেইট খুলে দিই এবং ৫ জন ৫ জন করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে বের হয়ে পড়ি। তবে ৫জন ৫জনের গ্রুপ শেষে আর ঠিক থাকে নি। আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রশ্ন ঃ গ্রেপ্তারের পর আপনাদের কোথায় নেয়া হয়?

উত্তর ঃ গ্রেপ্তারের পর আমাদের তেজগাঁ থানাতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে নেয়া হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেখানে প্রথমে ৫ নম্বর খাতায় ও পরে ৪০ নম্বর খাতায় আমাকে রাখা হয়।

প্রশ্ন ঃ কবে আপনি ছাড়া পান?

উত্তর ঃ দীর্ঘ ১৩ মাস পর আমি ছাড়া পাই। ২ মাস পর প্রায় সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু আমি, আনোয়ারুল হক (এফ.এইচ. হলের প্রাক্তন জি.এস) ও ডাঃ আজমল ছাড়া পাইনি। আমাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছিল।

দু'মাস পর যেদিন আমার চোখের সামনে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয় অথচ আমাকে ছাড়া হয় না সে দিন এবং রাতটির কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না।

সে রাতটি আমাকে সম্পূর্ণ একা পাগলদের আস্তানার সামনে ৫ নম্বর খাতায় বিরাট টিন শেডের একটি ঘরের মেঝেতে রাত কাটাতে হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনার সে সময়ের মানসিক অবস্থা এবং কারাগারের অভ্যন্তরের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন না।

উত্তর ঃ সে পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে খুবই খারাপ লাগছিল। তবে পূর্ব থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম বলে মনোবল হারাইনি। কিছুদিন পর আমাকে ৪০ নম্বর খাতায় স্থানান্তরিত করা হলে সেখানে আবুল হাশিম, মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, হাশিমুদ্দিন, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, আবদুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব, ওসমান দালাল (নারায়ণগঞ্জ) প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীদের সাথে দেখা হয়।

এর কিছুদিন পর অন্য জেল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মাওলানা ভাসানী এলেন। মাওলানা ভাসানীর আগমনের পর ৪০ নম্বর খাতায় জেলের চেহারা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। মাওলানা ভাসানীর আগমনের পূর্বে কোন নেতাকেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নজর দিতে দেখিনি। ভাসানী এসে খাওয়া-দাওয়া নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করতে থাকেন। তাঁর এ মানবিক এবং সাম্যবাদী কর্মতৎপরতা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। মাওলানা সকলের খোঁজ খবর নিতেন। আমি তখন M.A. পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তিনি আমাকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করার জন্য যত্ন সহকারে সব অসুবিধা দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। মাওলানার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে তো কিছু বললেন না?

উত্তর ঃ ৫২-র ভাষা আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এর বহু পূর্ব হতেই তিনি জেলে। সম্ভবতঃ ৫২-এর আন্দোলনের সময় তিনি ফরিদপুর জেলে। সুতরাং বায়ান্নতে তাঁর কোন ভূমিকা থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৯

এ. আই. এম. তাহা

[জনাব এ.আই.এম. তাহা ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। বায়ান্ন'র উত্তপ্ত প্রহরে যাঁদের দৃপ্ত পদচারণায় রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়ে মিছিল এগিয়ে গিয়েছিল জনাব তাহা ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে।] ভাষা আন্দোলনে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা কোন দিন ম্লান হবার নয়।

জনাব তাহা ১৯৩২ সালের জুন মাসে কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম ডাঃ আবুল খায়ের ছিলেন উপমহাদেশে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম এম.বি. (এম. বি.বি.এস)। বাড়ী চব্বিশ পরগণা জেলার ভাঙ্গর গ্রামে।

কোলকাতা মাদ্রাসা এ.পি-তে (এঙ্গলো-পার্সিয়ান ডিপার্টমেন্টে) জনাব তাহা প্রাথমিক পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং সেখান থেকে ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর ঢাকায় এসে জগন্নাথ কলেজে আই.এ-তে ভর্তি হন।

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের দাবীর সমর্থনে এ সময়ে জগন্নাথ কলেজে ছাত্র ধর্মঘট হয়। এই ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তিনি জগন্নাথ কলেজ হতে বহিষ্কৃত হন। পরে কায়েদে আযম কলেজ হতে পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫১ সালে আই.এ. পাশ করেন।

১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ-তে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে কৃতিত্বের সাথে বি.এ. পাশ করেন এবং '৫৬ সালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে এম.এ. পাশ করেন।

স্কুলজীবন হতেই জনাব তাহা ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। স্কুলের ছাত্র অবস্থায় তিনি কাউন্সিলর হিসেবে কোলকাতা জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের কনফারেন্সে যোগদান করেন। তখন তিনি মুকুল ফৌজেরও সদস্য ছিলেন। পরে ১৯৪৬-৪৭ সালে কোলকাতা জেলা মুকুল ফৌজের

সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

জনাব তাহা ১৯৪৫ সালে "রশীদ আলী মুভমেন্ট" এবং ১৯৪৬ সালে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পাকিস্তান ইস্যুর ওপর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে 'সিলেট-রেফারেণ্ডামে' নির্বাচনী প্রচারণায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি নবম বা দশম শ্রেণীর তরুণ ছাত্র।

১৯৪৮ সালে সংঘটিত কোলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গা প্রতিরোধে নিরলসভাবে স্বেচ্ছাসেবকের কাজে অংশগ্রহণ করেন। দাঙ্গা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জেনারেল শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর তরুণ বয়সের সাহসিকতাপূর্ণ মানবিক ভাষণ আজো স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল' এসোসিয়েশন-এর G.S. নির্বাচিত হন। ১৯৫৫-৫৬ সালে তিনি রেকর্ড সংখ্যক ভোট পেয়ে এস, এম, হলের V. P. নির্বাচিত হন। জনাব তাহা V. P. থাকাকালীন সময়ে এস, এম, হলের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অভূতপূর্ব কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। সেমিনার, আলোচনা-সভা, বুক-এক্সিবিশন সহ বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফলে সে সময় ছাত্রদের মেধা ও সৃজনীশক্তি বিকাশে অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। এসব তৎপরতার নেপথ্য রূপকার ছিলেন জনাব তাহা।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে নিরলস কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর রাখেন। পরবর্তী সময় ৯২ (ক) ধারা জারী করা হলে তার বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তৎপর হন। এবং ৯২ (ক) ধারার বিরুদ্ধে কমলাপুরে এক মিটিং করার প্রাক্কালে ইশতিয়াক আহমদ, এম, এ, আউয়াল, এস, এ, বারী এ, টি, এ, এস, এম, সোলায়মান ও সাত্তার সহ তিনি গ্রেফতার হন।

১৯৫৭ সালে সুয়েজ খালের ওপর বৃটিশ, ফ্রান্স এবং ইসরাইলের সম্মিলিত শক্তির আক্রমণের প্রতিবাদে ঢাকায় যে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়, তিনি ছিলেন সে বিক্ষাভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার সংগঠকদের অন্যতম। বৃটিশ কাউন্সিল ও ফ্রান্স কনসুল্যাটের সামনে এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশের লাঠি চার্জে (ব্যারিষ্টার) মওদুদ ও অন্যান্যদের সাথে তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হন।

জনাব তাহা অতি তরুণ বয়স হতে ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতির সাথে জড়িত হলেও ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার দু-এক বছরের মধ্যেই রাজনৈতিক জীবন হতে দূরে সরে যান।

জনাব তাহা ১৯৬৭ সালে আবুজর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক হিসেবে এর সাথে জড়িত ছিলেন। জনাব তাহা'র স্ত্রী অবশ্য এখনও সে কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপিকা হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

জনাব ইব্রাহীম তাহা এখন কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ী। ১৯৬৪ সাল হতে তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসা ছাড়া বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মতৎপরতার সাথে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন। টঙ্গী কলেজ, টঙ্গি হাই স্কুল, গাছা হাই স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তিনি ইসলামী মিশন এতিমখানা কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সমাজসেবামূলক কর্মতৎপরতার সাথেও জড়িত রয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি দুই

পুত্রের পিতা।

জনাব তাহা প্রকৃতিগতভাবে খুবই বিনয়ী। নিজের ব্যবসায়ের কর্মব্যস্ততা নিয়েও তিনি এই সাক্ষাৎকারের জন্য ধৈর্য্য ধরে প্রচুর সময় দিয়েছেন। স্মৃতিচারণে যেখানেই খানিক সন্দেহ হয়েছে সেখানেই যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার কাছে ছুটে গিয়েছেন, যোগাযোগ করেছেন। সাক্ষাৎকারকে প্রকৃত ঘটনার আলোকে তথ্যভিত্তিক করার জন্য তাঁর সচেতন প্রয়াস অতুলনীয়। এই সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় অনেক মূল্যবান উপকরণ জোগাবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চে সংঘটিত ধর্মঘট ও গণবিক্ষোভের সাথে কি আপনি জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ না, '৪৮ সালের ঘটনাপ্রবাহের সাথে আমি জড়িত ছিলাম না। কারণ তখন আমি কোলকাতায়।

প্রশ্ন ঃ বিভাগ-পূর্বকালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি কোলকাতায় কখনো কোথাও আলোচিত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ উপমহাদেশ বিভক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পর '৪৬ সালের দিকে 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন' নামে এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল মনসুর আহমদই প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেছিলেন, "বাংলা মুসলমানদের ভাষা। পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এ ভাষায় কথা বলে। সুতরাং ভবিষ্যতে ভাষা প্রশ্নে সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে বিবেচনা করতে হবে।" আমার মনে পড়ছে সম্মেলনে মোদাব্বের সাহেবের লেখা 'পাকিস্তান' নামক একটি ছোট নাটিকায় আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি আলোচনা হওয়ার পর সাধারণভাবে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল কি? অর্থাৎ সোসাইটির আলোচনার সূত্র ধরে 'বাংলাও যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হতে পারে' –এ ধরনের ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ না, তখনো সাধারণভাবে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় নি। পাকিস্তান অর্জনের প্রশ্নটি তখন উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে এত বেশী আবেগ আপ্লুত রেখেছিল যে অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করার মতো মানসিক ফুরসত তাঁদের ছিল না। তখন পাকিস্তান অর্জনের আন্দোলন ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের 'কমন-স্ট্রাগল।' তাই বলে তখন বাঙ্গালী মুসলমানদের বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের কোন কমতি ছিল না।

আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে দিয়ে আমার কিছু টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে গেলো। ১৯৪৬ সালে দিল্লীর এঙ্গলো এরাবিয়ান কলেজ প্রিমিসে কায়েদে আযমের সভাপতিত্বে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের কাউন্সিল সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এই কাউন্সিল সেশনে নদীয়া জেলার ডেলিগেট হিসেবে জনাব গোলাম আকবর খান (চুয়াডাঙ্গা সাবডিভিশনাল মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক ছিলেন) যোগদান করেন। কাউন্সিল সেশনে বক্তৃতা দিলেন প্রথমে ইজাজ রসুল। এরপর বেগম শাহনেওয়াজ এবং কাজী মোঃ ইসহাক। জনাব ইসহাকের বক্তৃতার পরই গোলাম আকবর খান সোচ্চার কণ্ঠে বাংলায় শ্লোগান দেন "পাকিস্তান মানতে হবে –তবেই ভারত স্বাধীন হবে।" এই শ্লোগান কাউন্সিল সেশনের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সেদিনও আলোচনা প্রসঙ্গে গোলাম আকবর খানের সাথে এই ছোট স্মৃতিটি নিয়ে আলাপ হলো। দিল্লীর এই কাউন্সিল সেশনে শামসুল হক (আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী), শাহ আজিজুর রহমান ও আনোয়ার সাহেব (অল বেঙ্গল মুসলিম লীগের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী) উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে শেখ মুজিবও উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ জনাব গোলাম আকবর খানের শ্লোগানকে কি আপনি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের প্রকাশ বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই। তখনকার দিনে দিল্লীর মত স্থানে সর্বভারতীয় অধিবেশনে বাংলার প্রতি একান্ত অনুরাগ থাকলেই বাংলায় হৃদয়-উৎসারিত শ্লোগান আসতে পারে। বস্তুতঃ বাংলা ভাষার প্রতি এ দেশে মুসলমানদের প্রথম থেকেই অনুরাগ ছিল। নইলে বাংলা ভাষা এতো সমৃদ্ধি লাভ করতো না। এসব কথা বলতে গিয়ে কতো স্মৃতি মনে পড়ছে– ১৯৪৬ সালের কোলকাতায় কায়েদে আযমের ঐতিহাসিক জনসভা। ফররুখ আহমদ জনসভায় বসে লিখে ফেলেন– "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান/কবুল মোদের জান পরাণ।" ফররুখ আহমদ রচিত শ্লোগান খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তেমনি ১৯৪৭ সালের সিলেট গণভোটে কবি তালিম হোসেন রচিত একটি গান খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যতদূর মনে পড়ে গানের কলিগুলি ছিল–

নিশানে আল হেলাল
বিষাণে হাঁকে বেলাল
চল সেই দেশে মুজাহিদ বেশে
দৃপ্ত প্রাণের সাঁজ----।

কবি তালিম হোসেনের গানটি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, সিলেটের গ্রামে-

গঞ্জে সবার কণ্ঠে এ গান গীত হতে শুনেছি। নৌকায় করে সুনামগঞ্জে যাওয়ার সময় গ্রামের অশিক্ষিত ছেলেমেয়েদেরকেও এ গান গাইতে শুনেছি। কথাগুলো বলছিলাম এজন্য যে, বাংলা ভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ না থাকলে এমন গান লেখা যায় না, সমাদৃতও হয় না।

প্রশ্ন ঃ আপনি ঢাকায় আসেন কখন?

উত্তর ঃ ১৯৪৯ সালের এপ্রিল-মে'র দিকে আমি ঢাকায় এসে জগন্নাথ কলেজে আই, এ, ক্লাসে ভর্তি হই।

প্রশ্ন ঃ তখন এখানকার ছাত্র আন্দোলনের পরিস্থিতি কেমন ছিল? ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে তখন কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি ঢাকায় আসার পর দেখি, মিনিয়াল ষ্ট্রাইককে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ছাত্রনেতা গ্রেফতার হয়েছেন। প্রশাসনিক তৎপরতার ফলে ছাত্র আন্দোলনে অনেকটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

যাঁরা তখন আন্দোলন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক তৎপরতার সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেনঃ ওদুদ ভাই (এম, এ, ওদুদ পরবর্তীকালে ছাত্রলীগের সম্পাদক ছিলেন এবং বর্তমানে পেপার বোর্ডের ডিরেকটর), সর্বজনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, খালেক নেওয়াজ, গোলাম আযম (অধ্যাপক গোলাম আযম), ঢাকা কলেজের ছাত্র এম, এ, আওয়াল (জাসদ নেতা), ইনজিনিয়ারিং কলেজের নূরুল হুদা, জগন্নাথ কলেজের দবির উদ্দিন আহমদ (দিনাজপুর), আর, আই, চৌধুরী (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক), করিম ভাই (জগন্নাথ কলেজের তখনকার ভি, পি,), আবদুস ছাত্তার মাহমুদ (জগন্নাথ কলেজের জি, এস, প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান এ, জি মাহমুদের বড় ভাই) এবং আমিনুল হক প্রমুখ।

প্রশ্ন ঃ সাংস্কৃতিক তৎপরতার কথা বলছিলেন। সে সম্পর্কে বলুন না।

উত্তর ঃ তখনকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটা পরিচ্ছন্ন সুস্থ পরিবেশ ছিল। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তখন তমদ্দুন মজলিস খুবই তৎপর ছিল।

তমদ্দুন মজলিসই মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্মদাতা হিসেবে তমদ্দুন মজলিসের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠকদের মধ্যে অধ্যাপক আবুল কাসেম, জনাব শাহেদ আলী, জনাব আবদুল গফুর, জনাব সানাউল্লাহ নূরী প্রমুখের নামও জাতি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ রাখবে।

প্রশ্ন ঃ কোন ঘটনার সূত্র ধরে আপনি এখানকার ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত হন?

উত্তর ঃ কোলকাতায় ছাত্র আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ছিলাম বলে অনেকের সাথে কিছুটা পূর্বপরিচিতি ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে জগন্নাথ কলেজের ভি, পি, করিম ভাই এবং জি, এস, ছাত্তার মাহমুদের ক্যাবিনেটের অভিষেক অনুষ্ঠান ও নবাগতদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নবাগতদের পক্ষ থেকে আমি বক্তৃতা দিই। এটা ঢাকা ছাত্রসমাজে আমার আনুষ্ঠানিক পরিচিতি। বলতে গেলে তখন থেকেই এখানকার বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ঃ আপনার পরিচিতি লাভের পর এমন কোন উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয়েছিল কি যাতে আপনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন?

উত্তর ঃ জগন্নাথ কলেজে আমাদের প্রথম আন্দোলন ছিল কলেজ পর্যায়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়টি চালু করা। এই আন্দোলনে ফজলুর রহমান (অবজারভার পত্রিকার প্রাক্তন চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ও আবদুল গণি হাজারীর ভাগ্নে) যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এই আন্দোলনে আমরা সফলকাম হই। আমাদের আন্দোলনের ফলেই এ বিষয়টি কলেজ পর্যায়ে চালু হয়।

এরপর '৪৯ সালের শেষের দিকে আরবী হরফে বাংলা প্রচলনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার বিভিন্ন কলেজে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এম, এ, ওদুদ (ওদুদ ভাই), শামসুল আলম (বরিশাল) প্রমুখসহ আমরা কলেজে অনুরূপ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করি। আমি ঘোড়ার গাড়ীতে করে প্রতিবাদ সভার প্রচার করতে গিয়ে নয়া বাজারের নিকট গ্রেফতার হই। আমার সাথে আর কে গ্রেফতার হয়েছিল মনে পড়ছে না। গ্রেফতার করে আমাদের কোতোয়ালী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সারারাত আমাদের আটকে রেখে পরদিন ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ ভাষা প্রশ্নে প্রচার চালাতে গিয়ে এই কি আপনার প্রথম গ্রেফতার?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এই প্রথম গ্রেফতার।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে জগন্নাথ কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কেন? বহিষ্কৃত হওয়ার পর নিশ্চয়ই আপনার ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা দেয়া হয়নি?

উত্তর ঃ ঢাকা কলেজ বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা ও পরীক্ষার তারিখ সম্পর্কিত ব্যাপারে তখনকার ঢাকা কলেজের ছাত্রনেতা এম, এ, আউয়ালের (জাসদ নেতা ও জনমুক্তি সম্পাদক) নেতৃত্বে ধর্মঘট পালন করি। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আমি জগন্নাথ কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হই। ঢাকা কলেজ থেকে এম, এ, আউয়াল এবং মেসবাহ উল-ইসলাম সহ আরো অনেক ছাত্রনেতা বহিষ্কৃত হন। আমার গ্রেফতারের প্রতিবাদে জগন্নাথ কলেজে জাকারিয়া চৌধুরী (জাগদল নেতা ও প্রেসিডেন্টের

প্রাক্তন উপদেষ্টা), আমিনুল হক (বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু যদিও আমার বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়নি, তবু এর ফলে আমার পরীক্ষা দেয়া বন্ধ হয়নি। ঐ সেশনেই আমি কায়েদে আযম কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করি। এম, এ, আউয়ালও ঢাকা কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর কায়েদে আযম কলেজে চলে আসেন।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা কলেজ ভবন পূর্বে অন্য কোথায় ছিল কি? এর স্থানান্তরের জন্য আন্দোলন হয় কেন?

উত্তর ঃ পূর্বে ঢাকা কলেজ ছিল পুরনো ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে। প্রথমে ইশতিয়াক আহমদের নেতৃত্বে কলেজকে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের আন্দোলন চলে এবং সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা কলেজ বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও এই কাজ বিলম্বিত হওয়ার দরুনই পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়।

প্রশ্ন ঃ 'সৈনিক' পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কি? সৈনিক কি তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র ছিল?

উত্তর ঃ 'সৈনিক' পত্রিকা শুধুমাত্র তমদ্দুন মজলিসের নয় বরং বিরোধী দলের মুখপত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা আন্দোলনে 'সৈনিক' পত্রিকার ভূমিকা লিপিবদ্ধ করে রাখার মত।

বিরোধী দলের মুখপত্র হিসেবে জনগণের অভাব-অভিযোগের চিত্রও 'সৈনিক' অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তুলে ধরতো। আমার মনে আছে, ১৯৫০ সালে খুলনায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সে সম্পর্কে 'সৈনিকে' বিস্তারিত রিপোর্ট বেরিয়েছিল। আমরা ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে খুলনায় যে সাহায্য তৎপরতা ও স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধ নির্মাণের কাজে অংশ নিয়েছিলাম তার বিস্তারিত রিপোর্টও ছাপা হয়েছিল 'সৈনিকে।' আখতার হামিদ (কুমিল্লা একাডেমীর প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক) ও, জে, টার্ণার- (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ) সে সময় এসব তৎপরতা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করতে খুলনা গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন?

উত্তর ঃ ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ক্লাসে ভর্তি হই।

প্রশ্ন ঃ '৫১ সালে ভাষা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ছিল?

উত্তর ঃ '৫১ সালে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটেনি।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কি?

উত্তর ঃ এর পরবর্তী ঘটনা হলো খাজা নাজিমুদ্দীনের উর্দুর স্বপক্ষে উক্তির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন, প্রতিবাদ সভা ও মিছিল অনুষ্ঠান। '৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী পল্টনে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করলে ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী কর্মসূচীকে সফল করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা ও প্রস্তুতি চলে।

প্রশ্ন ঃ ১৪৪ ধারা জারির কথা কখন ঘোষিত হয়?

উত্তর ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘটের শোভাযাত্রা ও অন্যান্য কর্মসূচীকে সফল করার জন্য ২০শে ফেব্রুয়ারীর সকাল থেকে আমরা শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রচারণার কাজে তৎপর ছিলাম। আমি যখন নাজিমুদ্দীন রোডে ঘোড়ার গাড়ীতে করে একুশের কর্মসূচীকে সফল করার জন্যে মাইকযোগে প্রচার করছি, বেলা তখন তিনটে কি সাড়ে তিনটে। আমার ঘোড়ার গাড়ীর পাশে এসে একজন ঢাকাইয়া ভাষায় বললো, "আরে শুনছেন নাকি সায়েব, ১৪৪ ধারা তো জারি হইয়া গেছে।" আমি প্রচার কাজে এতই মশগুল ছিলাম যে, ১৪৪ ধারা কখন জারি হয়েছে তার খোঁজ-খবরই নেই নি। লোকটির কথা শুনে খোঁজ নেয়ার জন্য ইউনিভার্সিটিতে ফিরে আসি।

প্রশ্ন ঃ ইউনিভার্সিটিতে এসে কি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন?

উত্তর ঃ ইউনিভার্সিটিতে এসে দেখি ১৪৪ ধারা জারির খবরে ছাত্রদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ১৪৪ ধারা জারি সম্পর্কে আরো তথ্য পেলাম। ঢাকার ডি, সি, ছিলেন হায়দার সাহেব। তিনি পুরোনো আই, সি, এস, অফিসার এবং খুবই ধীর-স্থির ব্যক্তি। তিনি সরকারকে ১৪৪ ধারা জারি না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সরকার তাঁর পরামর্শ গ্রহণ না করায় তিনি ১৪৪ ধারা জারি করতে অস্বীকৃতি জানান। এর ফলে তাঁকে ও, এস,ডি, করে ডি, সি, পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং জরুরী ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জের এস, ডি, ও, জনাব কোরায়েশীকে এনে অফিসিয়েটিং ডি, সি, করা হয়। তিনিই সরকারের নির্দেশে ১৪৪ ধারা জারি করেন।

প্রশ্ন ঃ এরপর আপনি কোথায় যান?

উত্তর ঃ এরপর সন্ধ্যার দিকে নবাবপুরে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠকে খবর জানার জন্য যাই। ১৪৪ ধারার সিদ্ধান্ত নিয়ে বৈঠকে বেশ সরগরম তর্ক-বিতর্ক হয়। পরে ১৪৪ না ভাঙ্গার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন?

উত্তর ঃ না, আমি রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্য ছিলাম না।

প্রশ্ন ঃ তবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কি করে?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠকে অনেক ছাত্রই উপস্থিত ছিল যারা পরিষদের সদস্য ছিল না, আমিও ছিলাম। উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল আনিসুজ্জামান (ডঃ আনিসুজ্জামান)। ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিলে সেখানে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করি কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ নবাবপুরে কর্মপরিষদের মিটিং থেকে আপনি কোথায় ফিরে যান?

উত্তর ঃ কর্মপরিষদের মিটিং হতে আমরা বিক্ষুব্ধ মনে এস, এম, হলে ফিরে আসি। সাধারণভাবে ছাত্রদের মধ্যে পরদিন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। এস, এম, হল থেকে গেণ্ডারিয়ার বাসায় যাওয়ার জন্য রওয়ানা হই। ইউনিভার্সিটি হয়ে ফিরবার পথে গেইটে বরকতের (শহীদ বরকত) সাথে দেখা। বরকত বাসায় ফিরে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কিছু বাক্য বিনিময় হলো। এরপর বিদায় নিয়ে আমি গেণ্ডারিয়ার বাসায় ফিরে আসি।

প্রশ্ন ঃ বরকত সম্পর্কে অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেব পুলিশ অফিসারের সূত্র থেকে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ বরকত অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। পড়াশুনায়ও সে ছিল অত্যন্ত মনোযোগী। রাজনীতির ব্যাপারে সে ছিল একেবারেই নির্লিপ্ত। শ্রদ্ধেয় রাজ্জাক সাহেব বরকত সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, সম্ভবতঃ তা কোন অশুভ চক্রের ইঙ্গিতে। এই দিনটিকে এবং এই দিনের বীরদেরকে খাটো করাই এ চক্রের উদ্দেশ্য। শ্রদ্ধেয় রাজ্জাক সাহেবকে পূর্বাপর যতটুকু জানি এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আদর্শ ও বিশ্বাসকে হীনভাবে আঘাত হানাই যেন তাঁর জীবনের ব্রত।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো রাতে গেণ্ডারিয়ার বাসায় চলে যান, পরদিন অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারী কখন আপনি ইউনিভার্সিটিতে আসেন? তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলুন না।

উত্তর ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীর খুব ভোরেই আমি ইউনিভার্সিটিতে আসি। সকাল থেকেই ছাত্ররা স্থানে স্থানে জটলা করে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সম্পর্কে উত্তেজিত আলোচনায় রত হয়। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছিল। স্কুল ও কলেজগুলো থেকে সংগঠিত হয়ে ছাত্ররা ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে জড়ো হচ্ছিল। এম, এ, আউয়ালের (বর্তমানে জাসদ নেতা ও জনমুক্তির সম্পাদক) নেতৃত্বে কায়েদে আযম কলেজ, ইষ্ট বেঙ্গল ইনষ্টিটিউট, কলেজিয়েট স্কুল, প্যাগোজ স্কুল, মুসলিম স্কুল, ইসলামিয়া

ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হতে ছাত্ররা ঢাকা কলেজে এসে জড়ো হয়। সেখান থেকে সংগঠিত হয়ে ইউনিভার্সিটিতে আসে। সম্ভবতঃ সাড়ে এগারোটার দিকে জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে আমতলায় সভা শুরু হয়।

প্রশ্ন ঃ সভাপতিত্ব করার জন্য জনাব গাজীউল হককে নির্বাচিত করা হয় কেন?

উত্তর ঃ ঠিক নির্বাচনের প্রশ্ন নয়, সে দিনের প্রতিকূল পরিবেশে ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করার জন্য জনাব গাজীউল হকের মতো সাহসী ছাত্র নেতারই প্রয়োজন ছিল। ছাত্রদের সংগঠিত করার জন্য তিনি যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সভাপতিত্ব করাই স্বাভাবিক ও যথার্থ ছিল। আমাদের সবারই তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল।

সেদিন ছাত্রদের সংগঠিত করার ব্যাপারে অলি আহাদ সাহেবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমি ঢাকা আসার পর থেকে অলি আহাদ সাহেবকে একজন সাহসী, নিষ্ঠাবান এবং একাগ্রচিত্ত ছাত্রনেতা হিসেবে তৎপর দেখেছি।

প্রশ্ন ঃ সভায় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের শামসুল হক ও আবদুল মতিন সাহেবের বক্তৃতা শুনেছেন কি? শুধুমাত্র এ দুজনই কি বক্তা ছিলেন?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ এ দুজনই বক্তা ছিলেন। শামসুল হক সাহেব ও আবদুল মতিন সাহেবের বক্তব্য আমি শুনেছি। কিন্তু গাজীউল হক সাহেবের বক্তব্য শুনার পূর্বেই আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য বিক্ষুব্ধ হয়ে মেইন গেইটে ছুটে যাই। শামসুল হক সাহেবের বক্তৃতার কথা মনে পড়লে আজো আমার অবাক লাগে। তাঁর সাথে আমার মতের মিল ছিল না। তিনি ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার জন্য বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু সে দিনের উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজের কটুক্তি আর বিরূপ বাক্যবাণের সামনে তিনি যেভাবে তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তা মনে পড়লে আজো আমার বিস্ময় লাগে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর নিষ্ঠা থাকলেই বোধ হয় এমনটি সম্ভব। মতিন সাহেব ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছাত্রদের মতেরই প্রতিধ্বনি করেন।

প্রশ্ন ঃ আপনারা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল করার প্রচেষ্টা চালালে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়?

উত্তর ঃ ইতিমধ্যে পুলিশ কর্ডন দিয়ে ইউনিভার্সিটি গেইটের প্রায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা শ্লোগান দিতে দিতে বের হয়ে পড়ি। সিটি এস, পি, মাসুদ মাহমুদ এসে আমার সার্টের কলার চেপে ধরেন। আমি দুই হাতে ঝট্‌কা মেরে তাঁকে সরিয়ে দিতেই দুজন পুলিশ ছুটে এসে আমাকে চ্যাংদোলা করে ট্রাকে তুলে ফেলে।

আমাদের ঐ গ্রুপে গ্রেফতার হয়েছিল সম্ভবতঃ এস, এ, বারী এ, টি, (জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী), মোহাম্মদ সুলতান, হাবিবুর রহমান শেলী, শামসুল হক (প্রাক্তন পাটমন্ত্রী এবং বর্তমানে মস্কোয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত) এবং চিওড়া কাজী বাড়ীর আজিম। গ্রেফতার করে প্রথমে আমাদের লালবাগ থানায়, পরে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যায়। আমাদের অনেকের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কেস দায়ের করা হয়। যতদূর মনে পড়ে জেলখানার ভেতর জেলারের রুমে একটি কোর্ট বসেছিল। সেখানে আলী আমজাদ সাহেব, আমার বড় ভাই এ, টি, এম, মোস্তফা (পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী) প্রমুখ আইনজীবীরা আমাদের বেইল পিটিশন মুভ করেন, কিন্তু তা রিজেক্টেড হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনারা গ্রেফতার হওয়ার পর বাইরের আন্দোলনের খবরাখবর পেতেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আন্দোলনের সব খবরই আমরা পেতাম। নতুন করে যারা গ্রেফতার হচ্ছিল তাদের কাছেতো খুব পেতামই, এছাড়া বিভিন্নভাবে প্রতিটি ঘটনার খবর আমাদের কাছে পৌঁছতো। একবার বাইরে খবর বেরুলো, জেলের ভেতরে আমরা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, জেল কর্তৃপক্ষের দেয়া খাবার খাচ্ছি না। তখন মনোয়ারা আপা (বর্তমানে হোম ইকোনমিক্স কলেজের অধ্যাপিকা) সহ ইডেনের কিছু সংখ্যক ছাত্রী প্রচুর খাবার তৈরী করে আমাদের জন্য নিয়ে যায়। আমরা জেল গেটে এসে সে খাবার গ্রহণ করি।

প্রশ্ন ঃ গ্রেফতার ধর-পাকড় ও পুলিশী তৎপরতার পর আন্দোলনের কি অবস্থা হয়?

উত্তর ঃ আমাদের গ্রেফতারের পর আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্য এস, এম, হলের অভ্যন্তরে মাইক লাগিয়ে ছাত্রদের পক্ষ থেকে রীতিমত বিভিন্ন নির্দেশ জারি হতে থাকে। এ সময় অন্যান্য ছাত্রদের সাথে একরামুল মাওলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ঃ হলের এসব তৎপরতায় পুলিশ বা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতো না কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হলের অভ্যন্তরে এসব তৎপরতার কারণে পরে আর্মি 'ব্যাটল ফরম'- এস, এম, হল রেইড করে। সম্ভবতঃ একুশে ফেব্রুয়ারীর এক দিন কি দুদিন পর আর্মি এসে এস, এম, হল ঘিরে ফেলে। হলের অবাঙ্গালী হেড দারোয়ান নাজু তখন কলাপসিবল গেইট বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেয়। আর্মি অফিসার যখন বন্দুক উঁচিয়ে গেইট খুলে দিতে নির্দেশ দেয় তখন নাজু গেইট খুলে দিতে এবং চাবি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলে–

"হাম জান দেঙ্গে
মাগার চাবি নেই দেয়েংগে
গেইট নেই খুলেঙ্গে।"

হল রেইডের খবর পেয়ে এস, এম, হলের প্রভোষ্ট ডঃ এম, ও, গণি ছুটে আসেন। তিনি আর্মি অফিসারের উদ্ধত অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বিনা অনুমতিতে হলে প্রবেশের কোন অধিকার নেই বলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে হল রেইডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। আর্মি তখন কর্ডন দিয়ে ডঃ এম, ও, গণি ও নাজুকে সরিয়ে দেয় এবং এক পর্যায়ে গেট ভেঙ্গে হলে প্রবেশ করে।

প্রশ্ন ঃ হল রেইড করে কাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল?

উত্তর ঃ এস, এম, হল থেকে গ্রেফতার হন জনাব আবদুল আলিম, মজিবুল হক এস, এম, হলের ভি, পি (বর্তমানে কর্ণফুলী লিঃ-এর মানেজিং ডিরেক্টর), আক্তার উদ্দীন (ব্যরিষ্টার আক্তার উদ্দীন, বর্তমানে সৌদী এয়ার লাইন্সের লিগেল এডভাইজার হিসেবে কার্যরত) প্রমুখ ছাত্রনেতা।

প্রশ্ন ঃ সরকার কোন গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রচার করেছিলেন কি?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ একুশে ফেব্রুয়ারী রাতে ৯ কি ১০ জনের বিরুদ্ধে রেডিওতে এবং পরদিন পত্রিকার মারফত গ্রেফতারী পরওয়ানা ঘোষিত হয়। এর পরদিন আলুর বাজার হতে গ্রেফতার হয়ে এম, এ, আউয়াল জেলে আসেন।

প্রশ্ন ঃ আপনারা গুলিবর্ষণের সংবাদ পান কখন?

উত্তর ঃ রাতে আমরা গুলিবর্ষণের সংবাদ পাই।

প্রশ্ন ঃ গুলিবর্ষণ, গ্রেফতার, পুলিশী তৎপরতার বিরুদ্ধে পরিষদে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল কি?

উত্তর ঃ গুলিবর্ষণ ও সরকারের নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন পরিষদের সদস্যপদ হতে পদত্যাগ করেন। পরিষদ থেকে ওয়াক আউট করেন সর্বজনাব আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন এবং মাদার বক্স।

প্রশ্ন ঃ পরবর্তী পর্যায়ে আর কারা গ্রেফতার হন?

উত্তর ঃ পরবর্তী পর্যায়ে আরো অনেক ছাত্রনেতাসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন।

তাঁদের মধ্যে মাওলানা ভাসানী, জনাব আবুল হাশিম, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, খোন্দকার মোশতাক, জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, জনাব অলি আহাদ, জনাব, এম, এ ওয়াদুদ, মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, এম, এ, ওসমান আলি, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক সুনিল দে

প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রশ্ন ঃ ঢাকার বাইরে কারা গ্রেফতার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ফেনী থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন ফরমান উল্লাহ। তখন তিনি ফেনী রাষ্ট্রভাষা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের কনভেনার। পরে ১৯৫৫ সালেও ভাষা আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ময়মনসিংহ থেকে এম, এম, কলেজের ছাত্র মাহবুব আনাম (আবুল মনসুর সাহেবের বড় ছেলে), রফিক উদ্দীন ভূঁইয়া, হাতেম আলী তালুকদার, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, শহিদুজ্জামান, মতলুব আনাম (আবুল মনসুর সাহেবের ছোট ছেলে) প্রমুখ গ্রেফতার হন। এছাড়া অন্যান্য স্থান থেকেও অনেকে গ্রেফতার হন।

প্রশ্ন ঃ ১৯৫২ থেকে '৫৫ সাল পর্যন্ত আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন অথচ গ্রেফতার হননি এমন কারো নাম বলার আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মরহুম ডঃ মাহমুদ উল হক, ডঃ আর, আই, চৌধুরী, এফ, এম, ইয়াহিয়া (যুগ্ম সচিব লোকাল গভর্ণমেন্ট, তখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি ছিলেন), নুরুল আলম (বর্তমানে বাংলাদেশ বিমানের আইন উপদেষ্টা), মুস্তাফিজুর রহমান, ডাঃ এম, এ, সাত্তার (Population Control & Family Planning এর Secretary), জাকিউদ্দিন (কলেজের ছাত্র) প্রমুখ।

ভাইয়া, তমদ্দুন মজলিসের একজন ডেডিকেটেড কর্মীর নাম বাদ পড়ে গেছে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে তাঁর নাম স্মরণ করা উচিৎ।

প্রশ্ন ঃ তিনি কে?

উত্তর ঃ তিনি হলেন শওকত ভাই। তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ অগ্রপথিক। অত্যন্ত ডেডিকেটেড কর্মী ছিলেন তিনি। তিনি আজ আর বেঁচে নেই। '৭১ সালের ২৫ কি ২৬শে মার্চ তারিখ রাতে শামসুল আলম সাহেবের (যুগ্ম সচিব Textile Ministry) বেইলী রোডের বাসায় ছিলেন। পাক বাহিনীর রেইডে ঘটনা স্থলেই গুলিতে তিনি নিহত হন। সৌভাগ্যক্রমে শামসুল আলম বেঁচে যান। '৫২ সাল থেকে '৫৫ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেনঃ শামসুল হক চৌধুরী (সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট), আবদুর রব চৌধুরী (৫৪-৫৫ সালে 'ডাকসু'র জি,এস, ছিলেন পরবর্তী কালে এগ্রিকালচারাল সেক্রেটারী, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট), অধ্যাপক সাজ্জাদ ইউসুফ (আমেরিকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় রত), মেসবাহ উদ্দীন আহমদ (লতিফ বাওয়ানী

টেক্সটাইল মিলের জেনারেল ম্যানেজার), ডঃ মকসুদ আলী (নিপার ডিরেক্টার), সৈয়দ মাহবুব আলী (বর্তমানে ঢাকা পৌরসভার একজন কমিশনার), নূরুল হক (পরিকল্পনা কমিশনের সেকশন চীফ), শহীদ উদ্দীন (প্রাক্তন ই, পি, সি, এস, অফিসার বর্তমানে লোকাল গভর্ণমেন্টে কর্মরত), মিঃ খোরশেদ আলম (লোকাল গভঃ সেক্রেটারী), আবদুস সাত্তার (ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি, বর্তমানে হাইস্পীড নেভিগেশনের সাথে জড়িত) প্রমুখ।

প্রশ্ন ঃ আপনি ভাষা আন্দোলনে '৫৫ সালের প্রসঙ্গ টেনেছেন। '৫৫ সালে গুরুত্বপূর্ণ কি ঘটেছিল?

উত্তর ঃ '৫২ সালের একুশের ঘটনা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য আনেনি। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদায় স্বীকৃতি লাভ '৫৫ সালের আন্দোলনের পর। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে '৫৫ সালের ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, '৫৩ সালের ঘটনাও সমভাবে গুরুত্ব বহন করে। অতএব এসব ঘটনা ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ তা হলে '৫৩ সালের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শুরু করা যাক। '৫৩ সালে কি ঘটেছিল?

উত্তর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে একুশ উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুতি চলছে, সে সময় আমাদের জানানো হলো চীফ সেক্রেটারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। তখন চীফ সেক্রেটারী ছিলেন হাফেজ মোহাম্মদ ইসহাক। চীফ সেক্রেটারী ইসহাক সাহেব ছিলেন খুবই ধীরস্থির প্রকৃতির লোক। আমরা আট/নয় জনের এক ছাত্র প্রতিনিধি দল চীফ সেক্রেটারীর সাথে দেখা করতে যাই। প্রতিনিধি দলে ছিলেন জনাব গাজীউল হক, শামসুল হক, (ব্যারিষ্টার) আক্তার উদ্দীন, আবদুস সামাদ আজাদ (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন মন্ত্রী) এস, এ, বারী এ, টি, (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী), আবদুল আলিম (বস্ত্রশিল্প মন্ত্রী), জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী), মোঃ সুলতান (ভাসানী ন্যাপ নেতা) এবং আমি। সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখতে পাই আলোচনা কক্ষে চীফ সেক্রেটারীর সাথে রয়েছেন তখনকার জি, ও, সি, জেনারেল আদম এবং পুলিশের আই, জি, দোহা সাহেব।

প্রশ্ন ঃ তা হলে আলোচনা কি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সরকার যখন আমন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে গেছেন তখন আনুষ্ঠানিকই বলতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ কি আলোচনা হলো?

উত্তর ঃ জেনারেল আদম প্রথমে জানতে চান আসন্ন একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমাদের কর্মসূচী কি। আমরা জানতে চাই সরকারের মনোভাব কি? এ নিয়ে জেনারেল আদমের সাথে আমার সরগরম কথা কাটকাটি হলো। তিনি খুব চটে যান। তখন চীফ সেক্রেটারী ইসহাক সাহেব আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং আলোচনায় শান্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনেন। ইসহাক সাহেব জানান একুশে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা জারি করার ইচ্ছে সরকারের নেই। তিনি ছাত্রদের প্রসেশনে বাধা দিতেও চান না তবে আমরা যেন প্রসেশন করতে গিয়ে গভর্ণমেন্ট প্রোপার্টির ক্ষতিসাধন না করি।

আমরা তাঁকে জবাবে জানাই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, আমাদেরই সম্পত্তি। আমরা তার ক্ষতিসাধন করবো না। তবে পুলিশ যেন আমাদের সভা এবং প্রসেশনে ভিজিবল না থাকে। আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তই উভয় পক্ষ মেনে নেয়।

[আলাপের এক পর্যায়ে ছাত্র প্রতিনিধি দলের নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাহা সাহেব স্মৃতিচারণ করতে থাকলে আমি বললাম, গাজীউল হক সাহেব যখন উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁকে টেলিফোন করে দেখতে পারেন, তিনিও হয়তো এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন। তখন আমার কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে তিনি গাজীউল হক সাহেবকে টেলিফোন করলেন। তাহা সাহেব বেশ কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করে আমাকেও রিসিভার দিলেন। বেশ কিছু সময় আলাপ করে এ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি কিছু নূতন তথ্যও দিলেন এবং প্রতিনিধি দলের এস, এ,বারী এ, টি, ও আবদুল আলিম সম্পর্কে জানালেন যে, 'যতদূর মনে পড়ে, দু'জন ছিলেন না'।

গাজীউল হক সাহেব আরো জানালেন, 'সেদিন আমরা (সম্ভবতঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী) একুশের শহীদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য রোজা রেখেছিলাম। আমাদের আশংকা ছিল যে, আমরা গ্রেফতার হয়ে যেতে পারি। এই জন্য একুশের তৎপরতা চালানোর জন্য (ব্যারিষ্টার) ইশতিয়াক আহমদের নেতৃত্বে একটা কমিটি করে যাই। আলোচনা শান্তভাবে চালানোর জন্যই আমরা স্থির করে যাই। কিন্তু জেনারেল আদমের সাথে তাহা সাহেবের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য বিনিময়ে আমি হতবাক হয়ে পড়ি। জেনারেল আদম যখন কটাক্ষ করে বললেন, 'তোমরা তো সুখে আছো। কেনো এ সব করছো?' তখন তাহা সাহেব আমাদের মুখের ওপর জবাব দেন, 'দেখো জেনারেল, তোমার কুকুর প্রতিদিন যে গোশ্‌ত খায়, আমরা হলে ছাত্ররা এক সপ্তাহেও তা খেতে পাই না।' তাহা সাহেবের অযাচিত দুঃসাহস দেখে আমি তাজ্জব বনে যাই। এলাম কি শান্তি আলোচনার জন্য আর হচ্ছে কি? সে যাক উত্তপ্ত বিতর্কে চীফ সেক্রেটারী হস্তক্ষেপ করলেন। পরিস্থিতি শান্ত করে হাসতে হাসতে তিনিও আমাদের পরিহিত কালো ব্যাজ পরতে চাইলেন। তখন 'তাহা সাহেব তাঁর নিজের

কালো ব্যাজটি চীফ সেক্রেটারীর বুকে' পিন-আপ করে দেন। আলোচনা শেষে জেনারেল আদমের সাথেও আমাদের করমর্দন করিয়ে দেন]

প্রশ্ন ঃ এসব কথা কি সত্যি?

উত্তর ঃ (মৃদু হেসে) তখন অল্প বয়সের উদ্দামতা ছিল আর স্বাধীনচেতা ছিলাম। কটাক্ষ বরদাস্ত হতো না। এসব কথা আর কি লিখবেন?

প্রশ্ন ঃ তা হলে '৫৩ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী যথাযথভাবে পালন হয়েছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ ছাত্রদের বিরাট মিছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক জনাব আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, শেখ মুজিব সহ অনেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ '৫৪ সালে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছিল কি?

উত্তর ঃ '৫৪ সালে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি। ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় একটি ছোট শহীদ মিনার তৈরী হয়। এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি আবদুল মোমিন তালুকদার।

প্রশ্ন ঃ এবার '৫৫ সালে সংঘটিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। '৫৫ সালে গুরুত্বপূর্ণ কি ঘটেছিল?

উত্তর ঃ '৫৪ সালের নির্বাচনের পর হক সাহেবের (শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক) মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার হক সাহেবের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন এবং ৯২ (ক) ধারা জারি হয়। গভর্ণর হয়ে এলেন ইস্কান্দার মীর্জা।

এ সময় আমরা স্থির করি ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন করবো। কারণ তখনো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দেয়া হয়নি। প্রস্তুতির পর্যায়ে ১৪৪ ধারা জারি হওয়ার পর সিদ্ধান্ত হলো যে কোন পরিস্থিতিতে আমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবো।

কর্মসূচী সফল করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা শুরু হলো। গোপনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে কনভেনার নির্বাচিত হলো। শেষ কনভেনার ছিলেন ফরমান উল্লাহ খান।

এসব তৎপরতায় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন ফরমান উল্লাহ খান, এম, এ,

আউয়াল, এম, এ, মোহিত (এস, এম, হলের তৎকালীন ভি, পি), মাহবুব আনাম (এস, এম, হলের জি, এস),মনসুর (ফজলুল হক হলের ভি, পি), শরীফ আবদুল্লাহ হারুন (ফজলুল হক হলের জি, এস), ইকবাল হলের ওয়াজী উল্লাহ, আবদুল মোমিন তালুকদার, আবদুস সাত্তার, মতিউর রহমান।

প্রশ্ন ঃ এই সব তৎপরতার মূল কর্মসূচীগুলি কি ছিল?

উত্তর ঃ শহীদ মিনার ও মাজারে ফাতেহা পাঠ। আমতলায় ছাত্রসভা এবং যে কোন মূল্যে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে শোভাযাত্রা। যেহেতু '৫২ এর আত্মত্যাগের পরও বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা পায়নি সে জন্যে '৫৫ সালের কর্মসূচীর সংগ্রামী তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাকে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। কর্মসূচীকে সফল করার জন্য আমরা খুব সতর্কতার সাথে গ্রেফতার এড়িয়ে কাজ করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই গ্রেফতারের আশংকা ছিল কি?

উত্তর ঃ আশংকা ছিল মানে! ১৬ কি ১৭ই ফেব্রুয়ারী হল রেইড করে এম, এ, আউয়াল (এস, এম, হল), এম, এ, মোহিত (এস, এম, হলের ভি. পি. বর্তমানে এক্সটার্নাল রিসোর্স ডিভিশনের সেক্রেটারী), মাহবুব আনাম (এস, এম, হলের জি, এস), মনসুর (ফজলুল হক হলের ভি, পি), ফজলুল হক হলের জি, এস, (তাঁর নাম স্মরণ করতে পারছি না) প্রমুখ ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। আমি তখনও গ্রেফতার এড়িয়ে কাজ করছি। ফরমান উল্লাহও তখন পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি। ১৯ তারিখ আমার গেণ্ডারিয়ার বাসা ঘেরাও হয়। কিন্তু আমি বাসায় ছিলাম না বলে রক্ষা পেয়ে যাই।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনি আর গ্রেফতার হন নি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, গ্রেফতার হয়েছিলাম, আর গ্রেফতার যে হবো তা একরূপ নিশ্চিতই ছিল। তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল একুশের কর্মসূচীকে সফল করে গ্রেফতার হই। ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতে হলে থাকি। সারা রাত শ্লোগানে ইউনিভার্সিটি এরিয়া প্রকম্পিত হয়। খুব ভোরে এস, এম, হল থেকে বেরিয়ে হল ক্যান্টিনে চা খেতে যাচ্ছি। ঠিক এমন সময় সাদা পোশাক পরা আই, বি-র লোক পিছনে রিভলবার ঠেকিয়ে বলে ওঠে, 'you are under arrest'. তখন আর গ্রেফতার এড়ানো সম্ভব ছিল না। আমি আই, বি, অফিসারের দিকে চেয়ে বলি, একটু পরে গ্রেফতার করলে হয়না ভাই? তিনি হাসতে হাসতে বলেন, 'আমার চাকুরি খাবেন নাকি?' আমি পুনরায় বলি, হলের ছাত্ররা যদি আমায় ছিনিয়ে নেয়? আই, বি, অফিসার সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'তেমন কিছু করতে যাবেন না, সশস্ত্র পুলিশ রেডি হয়ে আছে।'

হলের অবাঙ্গালী দারোয়ান চীৎকার জুড়ে দিয়েছে তাহা সাহেবকে পুলিশে গ্রেফতার করেছে বলে। নাজুর চীৎকারে হলের করিডোরে অনেক ছাত্র জড়ো হয়। তারা শ্লোগান দিতে থাকে এবং জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে আমায় বিদায় জানায়।

প্রশ্ন ঃ আপনার গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে ঠিকই কিন্তু সে বারই বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে নির্বিচারে পুলিশী তৎপরতা চলে। এমন কি এ তৎপরতা থেকে মেয়েদের হলগুলিও রেহাই পায়নি। তখন সিটি এস, পি, ছিলেন এ, মান্নান।

'৫৫ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেই প্রথম মেয়েরা গ্রেফতার হয়। এ ছাড়া এর পূর্বে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র কখনও গ্রেফতার হয় নি।

প্রশ্ন ঃ গ্রেফতার হওয়ার পর বাইরের আন্দোলনের খবর পেয়েছেন কি?

উত্তর ঃ মোটামুটি পাওয়া যেতো। আমরা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পরও কর্মসূচীকে সফল করার প্রচেষ্টা চলে। ঢাকার বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্ররা ইউনিভার্সিটির দিকে এগিয়ে আসলে পুলিশ বাধা প্রদান করে।

জগন্নাথ কলেজ থেকে (ব্যারিষ্টার) এ, আর, ইউসুফের (তখন জগন্নাথ কলেজে ভি, পি,) এক বিরাট ছাত্র মিছিল ইউনিভার্সিটির দিকে এগিয়ে এলে রায় সাহেব বাজারের নিকট পুলিশ বাধা প্রদান করে। এ, আর, ইউসুফ, শাহজাহান (জি, এস), কুদ্দুস সহ অনেক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে। অনুরূপভাবে ঢাকা কলেজ থেকে গ্রেফতার হন মওদুদ আহমেদ (বর্তমানে ডাক ও তার মন্ত্রী), শাহ মোয়াজ্জেম (নিষিদ্ধ ঘোষিত ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা) প্রমুখ। পুলিশের সর্বপ্রকার তৎপরতা ও গ্রেফতারের পরও আন্দোলন দুর্বার রূপ লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের মধ্যে কারা গ্রেফতার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ১. ফিরোজী বেগম ২. আলেয়া খান ৩. ফরিদা খানম ৪. ফরিদা বারী মালিক (প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরোজা বারীর মেয়ে), ৫. কামরুন নাহার লাইলী। গ্রেফতার হন নি কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন লতিফা খানম (তখনকার ছাত্রী পরিষদের সম্পাদিকা।

প্রশ্ন ঃ জনাব ফিরোজী বেগম কি তখন আপনার স্ত্রী ছিলেন?

উত্তর ঃ না, আমাদের বিয়ে হয় অনেক পরে। '৫৪–'৫৫ সালে ও ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদিকা ছিল।

প্রশ্ন ঃ তখন থেকে ভাব বিনিময় ছিল নাকি?

উত্তর ঃ (মৃদু হেসে) না, তেমনটি না--- ।

প্রশ্ন ঃ '৫৫ সালের আন্দোলনে কারা গ্রেফতার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ১. ফরমান উল্লাহ খান (সিনিয়র এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট), ২. এ, টি, এম,শামসুল হক (টেক্সটাইল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান), ৩. আবদুল হামিদ ভূঁইয়া, (এস, এম, হলের সমাজসেবা সম্পাদক ছিলেন, বর্তমানে ব্যবসায়ী), ৪. এম, এ, আশরাফ, (বর্তমানে শিল্প ব্যাঙ্কের পুঁজি বিনিয়োগ বিভাগের প্রধান), ৫. শরীফ আবদুল্লাহ্ হারুন (বর্তমানে ব্যবসায়ী), ৬. আবদুল মোমিন তালুকদার (বর্তমানে ব্যবসায়ী), ৭. সিদ্দিকুর রহমান (শিপিং এর সেক্রেটারী), ৮. কে, জেড, আলম (ব্যারিষ্টার), ৯. ডঃ আজিজুল হক (জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান), ১০. মরহুম এ, এফ, এম, আমিনুল ইসলাম, ১১. মোঃ আনসার আলী (রাজশাহী ফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর), ১২. আলতামাস-উল-ইসলাম (সম্ভবতঃ হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের অধ্যাপক), ১৩. মোসতাকুর রহমান (বিসিক-এর সিনিয়র অফিসার), ১৪. রফিকুল্লাহ চৌধুরী, ১৫. আমিনুল ইসলাম (সাংবাদিক), ১৬. মোকাম্মেল হক (এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান), ১৭. হাবিবুর রহমান (ইনফরমেশন বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর), ১৮. সা'দ আহমদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এসোসিয়েট প্রফেসর), ১৯. ডঃ মকসুদ (পি, জি-র রেডিওলজির প্রফেসর), ২০. ডঃ আনিসুর রহমান (প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য), ২১. ডঃ আবদুল হক (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'-এর প্রাক্তন ডীন ও প্রাক্তন এম, পি), ২২. শহিদুল হক (এডিটর, বাংলাদেশ টাইমস), ২৩. এ, এস, এম, জহুরুল হক (আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর), ২৪. শাহ আবদুল হালিম (জাগদলের শ্রমিক নেতা), ২৫. সৈয়দ মোহাম্মদ আলী (ব্যারিষ্টার), ২৬. জহুরুল হক (সুগার ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের পি, আর, ও), ২৭. ডঃ শাহাদত হোসেন শরীফ (এখন সম্ভবতঃ মধ্যপ্রাচ্যে আছেন), ২৮. আবদুল গফ্ফার চৌধুরী (জনপদ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, এখন লণ্ডনে আছেন), ২৯. মোঃ কাসেম (ওয়াটার বোর্ডের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার), ৩০. শামসুল আরেফীন (লাইফ ইনসিওরেন্সে কার্যরত), ৩১. মতিউর রহমান বিশ্বাস, ৩২. শহীদ উদ্দীন ইস্কান্দার (নোয়াখালী পৌরসভার চেয়ারম্যান), ৩৩. মিঃ ফজলুল হক (এডভোকেট), ৩৪. আবদুল মান্নান হাওলাদার (এডভোকেট), ৩৫. আবদুল মান্নান শিকদার (মাদারীপুরের এডভোকেট), ৩৬ আফজালুর রহমান (পাট ব্যবসায়ী), ৩৭. বজলুর রহমান(নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হন সাধারণ বীমায় কার্যরত), ৩৮. মোয়াজ্জেম হোসেন জামিল (পাট ব্যবসায়ী), ৩৯. ওয়াজী উল্লাহ

(পরে ইকবাল হলের ভি. পি. ছিলেন, বর্তমানে কুমিল্লা একাডেমীতে কার্যরত), ৪০. আবদুর রহমান (জেড এণ্ড কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার), ৪১. একরামুল হক (ইকবাল হলের ভি. পি.। বর্তমানে প্ল্যানিং কমিশনের পাবলিক রিলেশন্‌সের ডিরেক্টর), ৪২. শহীদুজ্জামান (টি, সি, বি'তে কর্মরত)।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের মুক্তির কোন প্রচেষ্টা চলে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মুক্তির প্রচেষ্টা চলেছিল। একবার চীফ সেক্রেটারী এ, এম, খান জেলে গিয়ে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বণ্ড সই করিয়ে আমাদের মুক্তিদানের প্রস্তাব দেন। আমরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। সে বারই বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্র জেলের ভিতর থেকে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ছিল।

প্রশ্ন ঃ '৫৫ সালের আন্দোলনকে আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন?

উত্তর ঃ '৫৫ সালের আন্দোলনের পরই বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে। এই আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, পুলিশ ও প্রশাসনের সকল নির্যাতনমূলক তৎপরতা সত্ত্বেও এটা সম্পূর্ণ অহিংস ছিল, কোন ভায়োল্যান্স ছিল না। এ আন্দোলন একটি সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গ্রেফতারের তালিকা দেখলেই তা বুঝা যাবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন অনুভূতি নিয়ে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাংলা ভাষায় কথা বলতো। বাংলা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ভাষা। বাংলা ভাষার সাথে আমার আত্মার যোগ। সে ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি না পেলে আমার বিক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। এই অনুভূতি থেকেই আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস রচনার কাজে এ ধরনের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ আপনাদের এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের অন্বেষায় ঢাকা ডাইজেস্ট যে প্রচেষ্টা শুরু করেছে আমি আন্তরিকভাবে তার সাফল্য কামনা করছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
আগষ্ট, ১৯৭৮

★ ১৯৮১ সালের ২রা আগস্ট জনাব এ, আই, এম, তাহা এন্তেকাল করেন।

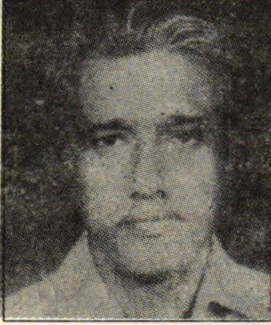

আবদুল মতিন

[জনাব আবদুল মতিন বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। স্বভাবতঃই তিনি আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কর্মতৎপর ছিলেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের ২০শে ফেব্রুয়ারীর নবাবপুরের মিটিং-এ যে চার জন ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৪৮ সালে কার্জন হলের কনভোকেশন সভায় আবদুল মতিন অন্যান্যদের সঙ্গে জিন্নাহ সাহেবের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর স্বপক্ষে বক্তব্যের পর 'নো, নো' বলে প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৯৫২ সালে মার্চের প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি কারাবরণ করেন।

জনাব আবদুল মতিন ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আবদুল জলিল দার্জিলিং-এ চাকরি করতেন বলে তাঁর ছোটবেলা দার্জিলিং-এ অতিবাহিত হয়। দার্জিলিং জেলা স্কুল থেকে ১৯৪৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ, পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে এম, এ, পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেন। ১৯৪৯ সালে মিনিয়াল ষ্ট্রাইক-এর সাথে জড়িত থাকার কারণে তিনি গ্রেপ্তার হন। ২ মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে এলে তৎকালীন ভি,সি, মাহমুদ হাসান মিনিয়াল ষ্ট্রাইকের সাথে জড়িত থাকার জন্য বণ্ড বা আণ্ডার রাইটিং জাতীয় কিছু দিতে বলেন। ভি,সি, মাহমুদ হাসান জানান শেখ মুজিবসহ অন্যান্যরা বণ্ড দিয়েছে– তাই তাদের ওপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। অন্যেরা বণ্ড দিলেও আবদুল মতিন রাজী হলেন না। তাই তাঁকে ৩ বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'এক্সপেলড' করা হয়। ১৯৫১ সালে 'এক্সপেলডের' মেয়াদ শেষ হলে

তিনি এম, এ, দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা দেন।

আবদুল মতিন বায়ান্নর মার্চে গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘ এক বছর পর '৫৩ সালের মার্চে মুক্তি লাভ করেন। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে কিছুদিন ঢাকা জেলে রাখা হয়। এরপর রাজশাহী জেলে স্থানান্তর করা হয়। রাজশাহী জেলের ২০ নম্বর সেলে তৎকালীন 'অল বেঙ্গল কমিউনিষ্ট পার্টির' প্রাদেশিক কমিটির সদস্য কৃষ্ণ বিনোদ রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং বামপন্থী আন্দোলনের সাথে জড়িত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর পূর্বেই সমাজ বিপ্লবে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবদুল মতিনের সংগ্রামী জীবনে অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনী তাঁদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেয় এবং তাঁর পিতা আবদুল জলিল ও ছোটভাই গোলাম হোসেনকে মেরে ফেলে। ১৯৪৭ সালে তাঁর আরেক ভাই আবদুল গাফ্ফারকে মুজিব সরকারের রক্ষী বাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর তাঁর ভাষায়, এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁদের পার্টি 'রুশ-ভারত' আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখে। ১৯৭২ সালে এমনি এক লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়ার সময় রাজশাহীর বাগমারা থেকে আহত ও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে জিয়া আমলে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

জনাব আবদুল মতিন বর্তমানে গণফ্রন্টের আহ্বায়ক। গণফ্রন্ট আবার বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দিয়ে সাম্যবাদী দলসহ অন্যান্য কয়েকটি দলের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে এবং সংগ্রামী ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি ভাষা আন্দোলনকে অতি কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে কিছু উপকরণ যোগাবে বলে আমরা মনে করি।]

প্রশ্ন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কখন কিভাবে গঠিত হয়? আপনি কিভাবে আহ্বায়ক নির্বাচিত হন?

উত্তর ঃ প্রতি বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উদ্যোগে ১১ই মার্চ, 'রাষ্ট্রভাষা-দিবস' হিসেবে উদযাপিত হতো। বস্তুতঃ ১১ই মার্চ তখন শুধু একটি দিবস উদযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৫০ সালে এমনি ১১ই মার্চের এক সভায় আমি প্রস্তাব দিলাম, 'এভাবে প্রতি বছর শুধু দিবসটি উদযাপন করতে থাকলে কখনো বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। এর প্রতি জনসমর্থন রয়েছে। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুললে জনগণ একে সমর্থন জানাবে। এর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হউক।' আমার এ প্রস্তাব সকলে সমর্থন করলো। কিন্তু ছাত্রনেতারা বললেন, আমরা এক সময় বসে একটি সংগ্রাম কমিটি করে দেব। তখন সাধারণ ছাত্ররা বললো, এখনই সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হউক। সাধারণ ছাত্রদের চাপের মুখে নেতারা তখনই সংগ্রাম কমিটি গঠন

করতে রাজী হলেন। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষ হতে সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করা হলো এবং সমর্থিতও হলো। আমি বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হলাম। উপস্থিত ছাত্রনেতারা তাতে খুব একটা খুশী হলেন বলে মনে হলো না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি তখন কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিলেন? ছাত্ররা আহ্বায়ক হিসেবে আপনার নাম প্রস্তাব করলো কেন? পুরোভাগের ছাত্রনেতা ছিলেন বলে কি? ছাত্রনেতারা খুশী হলেন না কেন?

উত্তর ঃ না, আমি তখন কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিলাম না। পুরোভাগের কোন ছাত্রনেতাও ছিলাম না। আমার পরিচিতি তখনও তেমন ছিল না। সাধারণ ছাত্ররা আমার নাম কেন দিয়েছিল তা জানি না, তবে মনে হয়, সংগ্রাম কমিটি গঠনের প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম বলেই হয়তো ওরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ছাত্রনেতারা চেয়েছিলেন তাদের নিজস্ব সংগঠন থেকে আহ্বায়ক নির্বাচিত হউক। অথচ মাঝখান থেকে সব ছাত্র সংগঠনের বাইরে আমি আহ্বায়ক হয়ে গেলাম এটা তাঁদের মনঃপূত হয়নি। তাই তাঁরা খুশী হতে পারেন নি।

প্রশ্ন ঃ পঞ্চাশ সালের বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের অন্য কোন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির অস্তিত্ব ছিল কি?

উত্তর ঃ '৪৮ সালে একটি কমিটি ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির তৎপরতা কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির মিটিং ডাকলে সদস্যদের অনেকেই অনুপস্থিত থাকতেন। এ নিয়ে কমিটির অনেক সদস্যের সাথে মধুর রেস্তোরাঁয় তর্ক হয়েছে। তাঁরা বাইরে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অনেক সংগ্রামী বক্তব্য রাখতেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে কমিটির মিটিং ডাকলে অনেকেই আসতেন না। কোরামের জন্যে অনেক সময় কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি। 'ফ্ল্যাগ-ডে'-র কর্মসূচী সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমাকেই নিতে হয়েছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির পক্ষ হতে 'ফ্ল্যাগ-ডে'-র কর্মসূচী সম্পর্কে একটি বিবৃতি তৈরী করে মাহবুব জামালের মাধ্যমে অবজারভার পত্রিকায় ছাপাতে দিই। পত্রিকায় 'ফ্ল্যাগ-ডে'-র কর্মসূচী সম্পর্কিত বিবৃতি ছাপা হওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সংগ্রাম কমিটির অনেক সদস্য জিজ্ঞেস করতে আসে কোন মিটিং-এ কর্মসূচী নেয়া হলো? আমি বলি, আপনারা মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন না, তাই জানবেন কি করে–কবে 'ফ্ল্যাগ-ডে'-র কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

প্রশ্ন ঃ 'ফ্ল্যাগ-ডে'র কর্মসূচী কি সফল হয়েছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সফল হয়েছিল। ছোট ছোট পাকিস্তানী পতাকার নীচে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবী সম্বলিত শ্লোগান লেখা ছিল। কিছু ছাত্র টিনের কৌটা এবং পতাকা নিয়ে চাঁদা তুলতে বের হয়। ছাত্রদের মধ্যেও এ নিয়ে অনেকে উপহাস করে বলেছিল, এভাবে কয় পয়সা চাঁদা উঠবে। তখনকার পরিস্থিতিতে শহরের সর্বত্র চাঁদা উঠানো সম্ভব না হলেও আমরা মোটামুটিভাবে সফল হয়েছিলাম। চাঁদা উঠানোর পর নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়, কোন দিন 'ফ্ল্যাগ-ডে'-তে উঠানো চাঁদা গণনা করা হবে। পরে হিসেব করে দেখা যায় যে, নয়শত কত টাকা যেন উঠেছে। টাকার পরিমাণই শুধু নয়, সবচেয়ে বড় কথা, রাষ্ট্রভাষার প্রতি জনসমর্থনের কথা আমরা বুঝতে পারি।

প্রশ্ন ঃ 'ফ্ল্যাগ-ডে'-তে উঠানো চাঁদার টাকা আপনারা কি কাজে লাগান?

উত্তর ঃ এ টাকা দিয়ে আমরা রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্বলিত পূর্ব পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অবিচারের উপর এক মেমোরেণ্ডাম ছাপাবার ব্যবস্থা করি। এই মেমোরেণ্ডাম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলিতে এবং গণপরিষদের সদস্যদের নামে পাঠিয়ে দিই। আমাদের মেমোরেণ্ডাম পাঠানোর পর এ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হলে গণপরিষদের অধিবেশন মূলতবী হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের 'টাইমস' সহ অন্যান্য পত্রিকায় এ নিয়ে আলোচনা হয়। সীমান্ত প্রদেশের 'খাইবার মেইলে' রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে সম্পাদকীয় লেখা হয়।

প্রশ্ন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে আর কি কি কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ বায়ান্নর ২৬শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দীনের উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বক্তব্যের প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করে। পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা শহরে ধর্মঘট আহ্বান করে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে দুটো ধর্মঘটই পুরোপুরি সফল হয়।

প্রশ্ন ঃ এবার '৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য আপনার কাছে জানতে চাইবো। '৪৮ সালের কার্জন হলের কনভোকেশন সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উপস্থিত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ উক্ত কনভোকেশনে জিন্নাহ সাহেবের 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'-এ

বক্তব্যের প্রতিবাদ কে বা কারা করেছিলেন? সে প্রতিবাদ কি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল?

উত্তর ঃ আমি প্রথম 'নো' 'নো' বলে প্রতিবাদ করি। আমার প্রতিবাদের সাথে সাথে অনেকে কণ্ঠ মিলিয়েছিল। না, প্রতিবাদ পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না।

প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিবই প্রথম কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। ঢাকা ডাইজেস্টের সাক্ষাৎকারে কেউ বলেছেন যে, নঈমুদ্দীন প্রথম 'নো' 'নো' বলে প্রতিবাদ করেন, এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ আপনি ইতিহাসের উপকরণ নিতে এসেছেন। ইতিহাসের অধ্যায়ে কোন বিকৃত বা কাল্পনিক তথ্যই টিকে থাকতে পারে না। শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট নন। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের বিশেষ কনভোকেশনে তাঁর উপস্থিত থাকার প্রশ্নই উঠে না। 'শেখ মুজিব কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন,- এসব বক্তব্য মনগড়া কাহিনী মাত্র। নঈমুদ্দীন কনভোকেশন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ আমার প্রতিবাদের সাথে সেও কণ্ঠ মিলাতে পারে কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছিল তাই আপনাকে বলেছি। তাতে সত্যের সামান্যতম অপলাপ নেই।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবাদের পর হলে পরিস্থিতি কিরূপ দাঁড়ায়?

উত্তর ঃ প্রতিবাদের পর সকলে থ' হয়ে যায়। তখনকার পরিস্থিতিতে জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদ-এটা কেউ ভাবতে পারে নি। 'নো' 'নো' প্রতিবাদের পর জিন্নাহ সাহেব ক্ষণিকের জন্য থেমে যান এবং এরপর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে সামান্য ক'টি কথা বলেই তিনি ভাষণ শেষ করেন। এরপর হল থেকে সকলে বের হয়ে যাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া করে ছুটে যায়। ভীড়ের মধ্যে আমিও বের হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' সদস্য ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির' প্রতিনিধি হিসেবে আমি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' সদস্য ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ '৫২-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় নবাবপুরের সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভার আলোচ্যসূচী কি ছিল? আপনি এ সভায় উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় নবাবপুর আওয়ামী লীগ অফিসে ২১শে ফেব্রুয়ারী হরতাল, মিছিল ও পরিষদ ভবন ঘেরাও করার কর্মসূচী পালন সম্পর্কে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে সরকার কর্তৃক রমনা এলাকায়

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা নির্দেশনামা ঘোষিত হওয়ায় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ প্রসঙ্গ। অলি আহাদ, আমি এবং অপর দু'জন সদস্য* ছাড়া রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সব সদস্য ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে ভোট দেন। এর অর্থ দাঁড়ায় ১৪৪ ধারা জারির প্রেক্ষিতে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষিত সকল কর্মসূচী বাতিল। আমরা সংগ্রামী ছাত্রসমাজের পক্ষ হতে এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করি।

প্রশ্ন ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী কে কে বক্তব্য রাখেন? সাধারণ ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উত্তর ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় তৎকালীন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী শামসুল হক, গাজীউল হক এবং আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখি। গাজীউল হক সভাপতিত্ব করেছিলেন। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সপক্ষে বক্তব্য রাখলে সাধারণ ছাত্ররা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন জানায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামী সিদ্ধান্তের সামনে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী শামসুল হক এবং ছাত্র লীগের সভাপতি ও রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুবের ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার আবেদন ও যুক্তি খড়কুটার মতো ভেসে যায়।

প্রশ্ন ঃ আপনি গ্রেপ্তার হন কবে এবং ছাড়া পান কবে?

উত্তর '৫২-র মার্চের প্রথম দিকে পুরানা পল্টনে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বৈঠকরত অবস্থায় অন্যান্যদের সাথে গ্রেপ্তার হই। '৫৩ সালের মার্চের দিকে আমি মুক্তিলাভ করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
ডিসেম্বর, ১৯৭৯

---

* অপর যে দু'জন সদস্য ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দেন তাঁরা হলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের ভি, পি (মরহুম) গোলাম মাওলা এবং ফজলুল হক মুসলিম হলের ভি, পি জনাব শামসুল আলম।

মোহাম্মদ সুলতান

[জনাব মোহাম্মদ সুলতান ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে একজন সংগ্রামী ছাত্রনেতা হিসেবে তৎপর ছিলেন। যে ক'জন ছাত্রনেতার অনমনীয় দৃঢ়তায় '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর ছাত্রসমাজের পক্ষ হতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত হয়, তিনি তাঁদের অন্যতম।

জনাব মোহাম্মদ সুলতান বৃটিশ ইণ্ডিয়ার জলপাইগুড়ি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম শমশের আলী আহমদ পুলিশ বিভাগে চাকুরি করতেন বলে জনাব সুলতানের প্রাথমিক পড়াশুনা রংপুর, মালদহ ও যশোহর প্রভৃতি স্থানে সম্পন্ন হয়। কলেজ জীবন অতিবাহিত হয় রাজশাহীতে। তিনি রাজশাহী সরকারী কলেজ হতে ১৯৪৮ সালে বি, এ, পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ, পাশ করেন। একই সাথে ল'তেও ভর্তি হয়েছিলেন বলে তিনি '৫৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ল' পরীক্ষা তাঁর আর দেয়া হয় নি। '৫২ সালের সংগ্রামমুখর দিনগুলির অনেক ঘটনা তিনি অতি কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় কিছু তথ্য সংযোজন করবে বলে আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ কলেজ জীবনে আপনি কি ছাত্র আন্দোলন বা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন? তখনকার কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা আপনার স্মরণ আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কলেজ জীবন থেকেই আমি প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। ১৯৪৮ সালের সম্ভবতঃ এপ্রিল-মে'তে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের কথা আমার মনে পড়ছে। সত্যিকারে বলতে কি, উত্তরবঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীকালে যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সহ অন্যান্য

প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন গঠন সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ঃ এই ছাত্র সম্মেলনের উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন একরামুল হক, গোলাম রহমান, (আমার বড় ভাই), হাবিবুর রহমান শেলী (বর্তমানে হাইকোর্টের বিচারপতি) প্রমুখ।

প্রশ্ন ঃ '৪৮ সালের ১১ ই মার্চের আন্দোলনের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি তখন রাজশাহীতে। ঢাকার আন্দোলনের জোয়ার সেখানেও প্রতিফলিত হয়। আমরা সেখানে আন্দোলনকে সংগঠিত করেছি।

প্রশ্ন ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কিভাবে গঠিত হয়?

উত্তর ঃ '৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীন '৪৮ সালের ১৫ই মার্চে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে পল্টন ময়দানে উর্দুর স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। এ বক্তব্যের মাত্র চার দিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের আয়োজন করেন।

৩০শে জানুয়ারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। বিকালে মোক্তার লাইব্রেরী হলে জনাব আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, মুসলিম ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। গোলাম মাহবুব এ কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। এছাড়া কমিটিতে ছিলেন জনাব আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন, খালেক নেওয়াজ প্রমুখ। এই কমিটিই প্রথম সভাতে সিদ্ধান্ত নেয়, সভা-শোভাযাত্রা ও হরতালের মাধ্যমে সারা প্রদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীকে সফল করার জন্য এর পূর্বে প্রস্তুতি ও তৎপরতাগুলি কি ছিল?

উত্তর ঃ এ দিবসের কর্মসূচীকে সফল করার জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট পালিত হয়। এ ছাড়া শোভাযাত্রা ও ছাত্র-জনতার সম্মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাস্তায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ এ সব কর্মতৎপরতায় কোন বাধা দেয়নি। এই সব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ভাসানী প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য ১১ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস উদযাপিত হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারী সরকার আন্দোলনের

শক্তিশালী মুখপত্র অবজারভার পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

প্রশ্ন ঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পূর্বে আঁচ করতে পেরে অলি আহাদ, আমি, ইমাদুল্লাহ ৪৩/১ এর যোগীনগর লেন এর যুবলীগের অফিসে মিলিত হই এবং সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। ইতিপূর্বে কমিউনিষ্ট পার্টিও ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার জন্য এক বিশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমাদের তা জানিয়ে দেয়। এসব জানার পর সংগ্রাম পরিষদের মিটিং-এ যুবলীগের মাধ্যমে চেষ্টা চালানোর জন্য আমরা তৎপর হই।

সংগ্রাম পরিষদের নবাবপুরের বৈঠকে যুক্তি উত্থাপিত হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হলে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হবে। গোলযোগের অজুহাতে সরকার নির্বাচন বন্ধ করে দিবে।

অলি আহাদ এ যুক্তির প্রতিবাদ করেন এবং এ সিদ্ধান্ত ছাত্ররা মানবে না বলে জানান। অলি আহাদের এ প্রতিবাদের ফলে ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার প্রস্তাবের সাথে আর প্রকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তা হলো, সংগ্রাম পরিষদের কোন অংগ সংগঠন যদি পরিষদের সিদ্ধান্ত লংঘন করে তবে স্বাভাবিকভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন ঃ সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি হলো?

উত্তর ঃ আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে কোন মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা রাত একটায় ফজলুল হক হল এবং ঢাকা হলের মধ্যবর্তী পুকুরের সিঁড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হই।

প্রশ্ন ঃ ঐ বৈঠকে কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাবিবুর রহমান শেলী, গাজীউল হক, কে, জি, মোস্তফা, কমরুদ্দীন শহুদ, আনোয়ার হোসেন (মুন্সিগঞ্জ) ও আমি। অনেকের নাম আমার এখন মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন ঃ গাজীউল হক সাহেব সাক্ষাৎকারে বলেছেন আনোয়ার হোসেন পরবর্তীকালে পুলিশের লোক এবং সরকারী গুপ্তচর বলে ছাত্রদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। তিনি কি বামপন্থী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ আমাদের দেশে বামপন্থী আন্দোলনের ধারা তাঁরা জানেন, দ্বিমত বাধলেই যে কোন সময় সরকারী চর বা পুলিশের এজেন্টে পরিণত হয়ে যায়। আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই।

প্রশ্ন ঃ রাতের বৈঠকে আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিলেন?

উত্তর ঃ সিদ্ধান্ত হলো, যে কোন মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে। এবং এ কাজ সফল করার জন্য আমাদের মধ্য হতে একজনকে আগামীকাল আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে। যাতে সভায় সিদ্ধান্ত ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে গৃহীত হয়। গাজীউল হককে এ দায়িত্ব দেয়া হলো। তাকে বলা হলো সভার সভাপতি হিসেবে তার নাম প্রস্তাব এবং সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে টিনের চেয়ারটি নিয়ে সভাপতির আসনে বসে যায়। তারপর গুলি বুলেট যাই আসুক সে যেন সভা শেষ হওয়ার পূর্বে আসন না ছাড়ে। সিদ্ধান্ত হলো সংক্ষিপ্ত সভার পর সে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার কথা ঘোষণা করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকরী হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনারা যে চারজন প্রথম ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য বেশী তৎপর ছিলেন তাঁরা সবাই কি তখন যুবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অলি আহাদ সেক্রেটারী এবং মোহাম্মদ ইমাদুল্লাহ জয়েন্ট সেক্রেটারী।

প্রশ্ন ঃ তোয়াহা সাহেব প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাই না।

উত্তর ঃ না, তোয়াহা সাহেব অনেক পরে ভাইস প্রেসিডেন্ট আর মাহমুদ আলী সাহেব প্রেসিডেন্ট।

প্রশ্ন ঃ মাহমুদ আলী সাহেব কি বামপন্থী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তিনি বহু পূর্ব থেকে বামপন্থী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ন্যাপের যে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান কমিটি গঠিত হয় মাওলানা ভাসানী ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট এবং মাহমুদ আলী ছিলেন সেক্রেটারী। তিনি মাওলানা ভাসানীর সাথে আসাম মুসলিম লীগেরও সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হাজেরা মাহমুদ আলী ছাত্র ফেডারেশনের মেম্বার ছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর সিলেটের মতো রক্ষণশীল জেলায় হাজেরা মাহমুদ আলী প্রথম মহিলাদের মিছিল বের করেন।

প্রশ্ন ঃ একদিকে কমিউনিষ্ট পার্টি ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। অপরদিকে এরই অঙ্গ সংগঠন যুবলীগ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যাপারে খুবই তৎপরতায় লিপ্ত হয়। একদিকে নবাবপুরের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে কমিটির ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানায়, অপরদিকে তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। অথচ উভয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বার এবং পার্টির

সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রণাধীন। এটা পরস্পর বিরোধী নয় কি?

উত্তর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি এবং ছাত্রসমাজের মনোভাব অনুযায়ী আমরা তখন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা যথার্থ মনে করেছি। যুবলীগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা পরিষদের বৈঠকে অলি আহাদ তাই সোচ্চার ছিলেন এবং সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তোয়াহা সাহেব পার্টির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে চাননি তাই ভোট দানে বিরত ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ তা হলে কি আপনি বলতে চান কমিউনিষ্ট পার্টির তখনকার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভুল ছিল। পরবর্তীকালের আন্দোলনেই তা প্রমাণ করে। সত্যিকারে বলতে কি কমিউনিষ্ট পার্টিই এদেশের গণ আন্দোলনের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে।

প্রশ্ন ঃ কমিউনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'হঠকারী' সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তৎপরতা চালানোর জন্য পার্টি থেকে আপনাদের কোন কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ কৈফিয়ৎ তলব করা আর হবে কি। পরে তো আমাদের সফলতা দিয়েই তাদের চলতে হতো। একুশে ফেব্রুয়ারী যতদূর মনে পড়ে নয়টার দিকে পার্টির পক্ষ থেকে শহীদুল্লাহ কায়সার এবং তোয়াহা সাহেবকে আমাদের কাছে পাঠানো হয় যাতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা থেকে বিরত থাকি তা সম্ভব না হলে যেন সীমিত সংখ্যায় সত্যাগ্রহের মতো তা ভাঙ্গা হয়।

প্রশ্ন ঃ সেভাবেই কি ছাত্ররা বের হয়?

উত্তর ঃ নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আবদুস সামাদের উত্থাপিত প্রস্তাব অনুসারে ১০ জন করে সত্যাগ্রহের মতো ছাত্ররা বের হয়। প্রথম গ্রুপ বের হয় হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে। পুলিশের অব্যাহত গ্রেপ্তারীর ফলে পরে আর গ্রুপ ঠিক থাকে না। ছাত্ররা বের হতে থাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ভ্যানে উঠাতে থাকে।

প্রশ্ন ঃ ছাত্রীদের কোন মিছিল বের হয় নি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ছাত্রীরাই প্রথম মিছিল করে মেডিকেল কলেজের গেইট পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছিল। তারপরই শুরু হয় টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ আর লাঠিচার্জ।

প্রশ্ন ঃ আপনি গ্রেপ্তার হন নি?

উত্তর ঃ না, আমি গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। আন্দোলনের স্বার্থে বাইরে থাকার প্রয়োজন ছিল। আমার উপর তখনকার দায়িত্ব ছিল গেইটে যারা গ্রুপ করে বের হচ্ছে তাদের নাম লেখা এবং একটির পর একটি গ্রুপকে বের করে দেয়া।

প্রশ্ন ঃ যারা গ্রুপ করে বের হয়েছিল তাদের সবার নাম লিখতে পেরেছেন কি?

উত্তর ঃ না, একশ জনের মতো লিখা সম্ভব হয়েছিল। তারপর তো পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জের ফলে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেলো।

প্রশ্ন ঃ ছাত্রনেতাদের কারা তখনো বাইরে ছিলেন?

উত্তর ঃ অলি আহাদ সহ অনেকে তখনও বাইরে। ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে নতুন করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। অলি আহাদ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এই পরিষদই পরবর্তী কয়েকদিন আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে।

প্রশ্ন ঃ নতুন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তো জনাব আতাউর রহমান খান হয়েছিলেন বলে আমরা শুনেছি।

উত্তর ঃ অলি আহাদ গ্রেপ্তার হওয়ার পর আতাউর রহমান সাহেব আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

প্রশ্ন ঃ অলি আহাদ সাহেব কোথায় কিভাবে গ্রেফতার হন?

উত্তর ঃ ৭ই মার্চ সন্ধ্যায় পুরানা পল্টনের এক বাসায় বৈঠক করার সময় অলি আহাদ, তোয়াহা, আবদুল মতিন, আবদুস সামাদ, এস, এ বারী এ,টি, প্রমুখ ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার হন। এক সাথে সবাই গ্রেপ্তার হওয়ার পেছনে অনেকে মুজিবুল হককে (তৎকালীন এস, এম, হলের ভি. পি. বর্তমান শিক্ষা সেক্রেটারী) ইনফরমার বলে মনে করেন। তিনি সেখানে ছিলেন কিন্তু গ্রেপ্তার হননি। কাজী গোলাম মাহবুব বস্তার ভেতরে লুকিয়ে থেকে রক্ষা পান, কিন্তু পরে গ্রেপ্তার হন।*

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আর কোন সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন কি?

উত্তর ঃ ১৯৭২ সালে টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম। সে সময় গাজীউল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, কামরুদ্দীন সাহেবও সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা হয়েছে বলে আপনার জানা আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ১৯৭৪ সনে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারেই তেমন একটি চেষ্টা হয়েছে। টিভির সাক্ষাৎকারে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ করছিলেন শেখ মুজিব এবং কে, জি, মোস্তফা। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব কে, জি, মোস্তফাকে জিজ্ঞেষ করেন, তোমার মনে নেই মোস্তফা, '৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আমি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার

---

* কাজী গোলাম মাহবুব ঘরের সিলিং-এ বাঁশের মাচার উপর লুকিয়ে থেকে রক্ষা পান।

নির্দেশ দিয়েছিলাম। .... এমনি ধরনের অনেক কথা। কে, জি, মোস্তফা মাথা নেড়ে, কখনো কথা বলে শেখ মুজিবের বক্তব্যের সমর্থন দিচ্ছিলেন। অথচ শেখ মুজিব তখন জেলে। আপনি নিজেই দেখুন, '৫৩ সালে প্রকাশিত একুশে ফেব্রুয়ারী নামক বইতে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কে, জি, মোস্তফার একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এটা কে, জি, মোস্তফার নিজের লেখা প্রবন্ধ। এতে আছে 'শেখ মুজিব তখন জেলে। ১৯৪৯ সালের মার্চ থেকেই তিনি জেল খাটছিলেন।' এ প্রবন্ধে '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিব সম্পর্কের কোন কথার উল্লেখ নেই। আর পরবর্তীকালে তিনি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবকে '৫২-র ভাষা আন্দোলনের ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার নেতা বানিয়ে ফেলেন। যার ফলে তিনি লেবাননের রাষ্ট্রদূত পদটি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন ঃ শুনেছি, আপনি ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। কিভাবে, কোন অনুপ্রেরণায় আপনারা এ ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটি অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ সম্পর্কে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা মেডিকেল কলেজের নার্স হোষ্টেলের পশ্চিম দিকে বক্সিবাজার রোডে অবস্থিত আমার নব প্রতিষ্ঠিত বইয়ের দোকান 'পুঁথিপত্র প্রকাশনী'তে অনুষ্ঠিত হয়।

আমি তখন ইকবাল হলে থাকতাম। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সমমনা ছাত্রদের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে লাগলাম। আমার বই এর দোকানেই এ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা কিছুদিন চললো। পরে ১নং মৌলবী বাজার মাহমুদ আলী সাহেবের নওবেলাল অফিসে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা ডাইজেস্টের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত এ বিশেষ সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় এ ধরনের বিশেষ সাক্ষাৎকার মূল তথ্য জোগাতে পারে। তবে যাঁরা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তাঁদের নিরপেক্ষভাবে সঠিক ঘটনার বর্ণনা দিতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
মে, ১৯৭৮

ডক্টর শাফিয়া

[ডক্টর শাফিয়া ভাষা আন্দোলনের একজন অন্যতম নেত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৫০-৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ওমেন ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নে'র জি, এস, (জেনারেল সেক্রেটারী) এবং ১৯৫১-৫২ সালে ভি, পি (ভাইস প্রেসিডেন্ট) ছিলেন। সুতরাং ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ডক্টর শাফিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপিকা এবং শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।

১৯৩১ সালে কোলকাতায় ডক্টর শাফিয়া জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ী রংপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার বিন্নাগাড়ী গ্রামে। বাড়ী রংপুর হলেও ছোটবেলা কোলকাতায় কাটিয়েছেন। পিতা মরহুম আজগর আলী ছিলেন নামকরা এডভোকেট। তিনি কোলকাতায় প্র্যাকটিস করতেন।

১৯৪৬ সালে ডক্টর শাফিয়া কোলকাতার 'সেন্ট মার্গারেট স্কুল' থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে 'লেডী ব্রাবোর্ন'কলেজ থেকে আই, এ, এবং পরে বি, এ, পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম, এ, এবং পরে এম, এড, ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে তিনি পি-এইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে 'পাকিস্তান একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট' শিক্ষা গবেষণা বিভাগের রিডার পদে কিছুকালের জন্য কর্মরত ছিলেন। ডক্টর শাফিয়ার শিক্ষা ও কর্মজীবন খুবই কৃতিত্বপূর্ণ।]

প্রশ্ন ঃ কোন সময় হতে আপনি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ ১৯৫০ সালে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। তখন থেকেই ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্ন ঃ এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আপনি কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কি?

উত্তর ঃ না, কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। এর পেছনে কোন রাজনৈতিক বা দলীয় কারণ ছিল না।

প্রশ্ন ঃ প্রথমে কিভাবে এ আন্দোলন আপনার মনে রেখাপাত করে? আপনি এর প্রতি কেন আকৃষ্ট হন?

উত্তর ঃ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীটি একজন সচেতন ছাত্রী হিসাবে স্বাভাবিক নিয়মেই আমার মনে রেখাপাত করেছিল। সমগ্র ছাত্রসমাজকেই এ দাবী আন্দোলিত করেছিল। ছাত্রী সংসদের ভি. পি. হিসাবে আমি চেয়েছিলাম, এ আন্দোলনে ছাত্রীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। এই সচেতন অনুভূতি থেকেই আমরা ছাত্রীরা এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হই।

প্রশ্ন ঃ কোন সময় আপনি ছাত্রী সংসদের ভি. পি. ছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৫১-৫২ শিক্ষাবর্ষে আমি ছাত্রী সংসদ বা 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওমেন ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নে'র ভি. পি. ছিলাম। এর পূর্বে ১৯৫০-৫১ শিক্ষা বর্ষে জি. এস. ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তা হলে দেখা যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনি ছাত্রীসমাজকে নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

উত্তর ঃ নেতৃত্ব বলুন আর যাই বলুন, সমগ্র ছাত্রসমাজের সাথে সংগঠিত হয়ে আমরা ছাত্রীরাও ভাষা আন্দোলনে কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনারা তখন কোন হলে থাকতেন? তখনকার সমাজ তো খুবই রক্ষণশীল ছিল। সুতরাং এসব আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণে কোন বাধা আসতো না কি?

উত্তর ঃ আমরা ছাত্রীরা তখন 'চামেরী হাউস' (বর্তমানে রোকেয়া হলের পাশে) বলে পরিচিত 'ইউনিভার্সিটি ওমেন ষ্টুডেন্স রেসিডেন্সে' থাকতাম। এ ছাড়া ছাত্রীদের জন্য অন্য কোন হল বা আবাসস্থল ছিল না। প্রথমে হাইকোর্টের পাশে তোপখানা রোডের চামেরী হাউসে ছাত্রীদের হোষ্টেল ছিল। পরে তা বর্তমান রোকেয়া হলের পাশে 'হুদা হাউসে' স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু চামেরী হাউসের নামানুসারেই 'হুদা হাউস'ও

পরবর্তীকালে 'চামেরী হাউস' নামে পরিচিত হয়।

সে যাক্। আপনি বলছিলেন আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণে সামাজিক বাধার কথা– সেসব প্রতিকূলতা তো ছিলই। আমরা যারা বাইরে বেরুতাম তাদেরকেও খানিকটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হতো। যেসব ছাত্রী হলের বাইরে থেকে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো, তাদের মধ্যে তেমন কেউ এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতো না বা তার সুযোগ পেতো না। অবশ্য সুফিয়া (বিচারপতি ইব্রাহীমের কন্যা ব্যরিষ্টার ইশতিয়াক আহমদের স্ত্রী) ছিল এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। সুফিয়া হলের বাইরে থেকেও আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ঃ তখন ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রীদের সংখ্যা কত ছিল? সবাই কি আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়েছিল?

উত্তর ঃ পুরো ইউনিভার্সিটিতে তখন আশি-পঁচাশিজন ছাত্রী ছিল। তখনকার পরিবেশের তুলনায় এ সংখ্যা কম ছিল না। আন্দোলনে কি সবাই অংশগ্রহণ করে? কেউ কেউ 'ইনএকটিভ'ও ছিল।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে ১১ই মার্চকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালন করা হতো, তা নয় কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ১১ই মার্চকে মর্যাদার সাথে পালন করা হতো। সে সম্পর্কে আমি তেমন কিছু বলতে পারবো না। কারণ আমিতো ৫০ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছি। এ সম্পর্কে তোয়াহা সাহেব, অলি আহাদ সাহেব, গাজীউল হক সাহেব– এঁদের কাছে সঠিক তথ্য পেতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ পরবর্তী পর্যায়ে কোন সময় হতে ভাষা আন্দোলন দুর্বার গতি লাভ করে?

উত্তর ঃ নাজিমুদ্দীন সাহেবের ঘোষণার পর হতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ বিক্ষোভের সূত্র ধরেই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে দুর্বার গতি লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলন কোন প্রকৃতির আন্দোলন ছিল বলে আপনি মনে করেন? এ আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করতে চান?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলন ছিল মাতৃভাষাকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার একটি জাতীয় আন্দোলন। মূলতঃ এটা ছিল ছাত্র আন্দোলনের ফসল। রাজনৈতিক দল–যে যাই দাবী করুক, ছাত্ররাই জীবনপণ করে এ আন্দোলনকে গড়ে তুলেছিল। পরে আন্দোলন সামগ্রিক রূপ লাভ করলে পুরো জাতিই এর সাথে জড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ আমতলায় যেসব ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হতো তাতে আপনারা ছাত্রীরা কি

অংশগ্রহণ করতেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অধিকাংশ সময়ই আমরা অশগ্রহণ করতাম। তবে এখনকার মতো এমন প্রত্যক্ষভাবে ছেলেদের সাথে একত্র হয়ে সভা-সমিতি করার অবকাশ তখন ছিল না। তখন ইউনিভার্সিটিতে কোন ছাত্র কোন ছাত্রীর সাথে কথা বলতে হলেও প্রোক্টরের অনুমতি লাগতো। এবার বুঝতে পারছেন তখনকার পরিবেশটা কেমন ছিল।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার প্রশ্নে আগের দিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের যে সভা হয়েছিল, তাতে কি আপনি উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর ঃ না, ঐ সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম না আর অন্য কোন ছাত্রীরও উপস্থিত থাকার কথা নয়। তবে ঐ সভার সিদ্ধান্ত এবং ২১শে ফেব্রুয়ারীতে যে কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল– তা আমাদের ছাত্রীদেরকেও জানানো হয়েছিল। পরদিন আমতলার মিটিং-এ সবাইকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীকে সফল করার জন্য এর আগের দিন কোন তৎপরতায় আপনারা অংশগ্রহণ করেছিলেন কি?

উত্তর ঃ 'ওমেনস স্টুডেন্টস ইউনিয়নে'র ভি. পি. হিসেবে আমি শুধু ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্বই পালন করতাম। ছাত্রীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে মেয়েদের স্কুলে পাঠাই। তখন ছাত্রীদের মাঝেও এমন উৎসাহ লক্ষ্য করেছি যে, তা কোনদিন ভুলবার নয়। পায়ে হেঁটে মেয়েরা বাংলা বাজার গার্ল স্কুলে গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারীর আমতলার সভায় যোগ দেয়ার জন্য ছাত্রীদেরকে সংগঠিত করেছে। একুশের আন্দোলনকে সফল করার পেছনে এসব তৎপরতা অপরিসীম অবদান রেখেছে।

প্রশ্ন ঃ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন মেয়েদের মধ্যে এমন কার কার নাম এ মুহূর্তে আপনার মনে আসছে?

উত্তর ঃ সুফিয়া আহমদ, শামসুন্নাহার, রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর মাহমুদ (ইতিহাসের ছাত্রী), মাহফিল আরা (অর্থনীতির ছাত্রী) ও খোরশেদী খানম (বাংলার ছাত্রী) এদের নামই এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। এছাড়া আরো অনেকেই ছিলেন যাদের নাম আজ ভুলে গেছি।

প্রশ্ন ঃ এবার একুশে ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত ঘটনাগুলির কথা বলুন না।

উত্তর ঃ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সভা আরম্ভ হয়। এর পূর্বেই বাইরে থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে ইউনিভার্সিটির আমতলায় জড়ো হয়। ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষেই

ছাত্রনেতারা বক্তব্য রাখেন। অর্থাৎ পূর্বদিনের সিদ্ধান্তই ছাত্রনেতাদের বক্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিতর্কমূলক যুক্তির অবতারণা হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে ছাত্রনেতারা চারজন চারজন করে দূরত্ব বজায় রেখে মিছিল বের করার পক্ষপাতি ছিলেন। এর মধ্যে দু-একজন হয়তো ব্যতিক্রম থাকতে পারেন। আমি কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে অনড় ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উত্তর ঃ আমি বললাম, এভাবে চারজন চারজন করে দূরত্ব বজায় রেখে মিছিল করা যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তার চেয়ে এখনই আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবো। এবং এভাবে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে গেলে আমাদের কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। আর তা না হলে সিদ্ধান্তহীনভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি না। আমরা ছাত্রীরা এভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্যে এগিয়ে যাব না। এ বলে আমি স্থির সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বপক্ষে সভা বর্জন করে ছাত্রীদের নিয়ে মেয়েদের কমনরুমে চলে যাই।

প্রশ্ন ঃ আপনার বক্তব্যে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার ঐতিহাসিক ছাত্রসভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, তা নয় কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তাই সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, চার জন চার জন করে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ মিছিল এগিয়ে যাবে। তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা লংঘনের আইনগত অভিযোগ আনা যাবে না। অথচ আমাদের বিক্ষোভ মিছিলের উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু আমি ছাত্রীদের নিয়ে এ ধরনের দুর্বল সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিলাম। আমার বক্তব্য ছিল, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাবো। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের লক্ষ্য নিয়ে আমাদের রাজপথে নামা উচিত। মাতৃভাষার দাবীর প্রশ্নে মিছিলে নেমে ১৪৪ ধারা রক্ষা করার চিন্তা করা আমাদের উচিত নয়। এটা ভীরুতা ও সিদ্ধান্তহীনতারই লক্ষণ। আমতলার সভায় চারজন চারজন করে মিছিল করার সিদ্ধান্তকে কোনক্রমেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত বলা চলে না। আজ যদি কেউ নিজেকে 'সংগ্রামী' প্রতিপন্ন করার জন্য ভিন্ন কথা বলেন, তা হবে সত্যের অপলাপ। মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের অসত্য তথ্য সংযোজিত হওয়া উচিত নয়। সে দিন আমতলার সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ছাত্র নেতৃবৃন্দ স্থির সিদ্ধান্ত নেন নি বলেই আমরা সভা বর্জন করে মেয়েদের কমনরুমে চলে গিয়েছিলাম। পরে বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে যে ভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয় তা ছিল সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী

মনোভাবের ফল। আমতলার সভার সিদ্ধান্তের জন্য তা হয়নি। আমতলার সভার চারজন চারজন করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেউ মেনে চলেনি বা চলতে পারেনি।

প্রশ্ন ঃ তখন আপনার কেন এটা মনে হয়েছিল যে, স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে গেলে আপনাদের কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না?

উত্তর ঃ ছোটবেলা থেকে তো কলকাতায় কাটিয়েছি। যদিও 'কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টে'র সময় ছোট ছিলাম, তবুও যা দেখেছি এবং শুনেছি, তাতে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, লক্ষ্যে স্থির, সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ জনতাকে পুলিশ বা সামরিক বাহিনী ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যথেচ্ছ আক্রমণও চালাতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ পরিশেষে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হলো?

উত্তর ঃ আমরা তো আমতলা মিটিং বর্জন করে ছাত্রীদের কমনরুমে চলে এলাম। এরপর বেশ কয়েকবার ছাত্ররা এসে আমাদের ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। আমরা পূর্ব মতামত ব্যক্ত করলাম। পরিশেষে কয়েকজন এসে বললো, সিদ্ধান্ত যাই হয়েছে ছাত্রঐক্যের স্বার্থে আপনারা আসুন, দূরে থাকবেন না। ছাত্রঐক্যের প্রসঙ্গ উঠায় আমরা ছাত্রীরা আর দূরে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম–ঠিক আছে যা হয়, we will face it together.

প্রশ্ন ঃ তখন কি পুলিশ ইউনিভার্সিটি এরিয়ার আশেপাশে অবস্থান নিয়েছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ইতিমধ্যে পুলিশ ইউনিভার্সিটি এরিয়ার চারিদিকে অবস্থান নিয়েছে এবং রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরছে।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে আপনারা মিছিল করলেন?

উত্তর ঃ আমতলার মিটিং শেষে চারজন চারজন করে বের হওয়ার জন্য ব্যাচ করা হলো। আমরা ছিলাম ৩য় ব্যাচে। ছাত্ররা বের হতেই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ছাত্রদের দু'টি গ্রুপকেই গেইটের বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ট্রাকে তুলে নেয়। তারা মিছিল করে এগিয়ে যেতে পারেনি। আমরা ছাত্রীরা চারজন চারজন দূরত্ব রেখে বের হলাম। গেটের পাশে পানিভর্তি একটা বালতি রাখা ছিলো। সবাইকে বলা হয়েছিলো, রুমাল ভিজিয়ে নেয়ার জন্য। কাঁদানে গ্যাস হতে চোখ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ এগিয়ে আসছিল বাধা দেয়ার জন্যে। পাশে থেকে ওদের কোন অফিসার বোধ হয় বললেন, 'ছোড় দো'। আমরা বাধা পেলাম না। ইতিমধ্যে বেশ কিছুদূর এগিয়েছি। কিছুটা মিছিলের আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ আমাদের ছাত্রীদের ব্যাচ-ই প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এগিয়ে যায়।

মিছিলের মাঝে মাঝে মেয়েদের সাথে বোধ হয় কিছু ছেলেও ঢুকে গিয়েছিল। আরেকটু এগিয়ে আমরা মধুর রেস্তোরাঁর পাশে (বর্তমান মেডিকেল কলেজের পূর্ব দিকের বাউণ্ডারী দেয়ালের কাছে) এসেছি, এমন সময় একজন পুলিশ আমার পেছন দিয়ে এসে আমাকে আঘাত না করে আমার পাশে বারো-তেরো বছরের একটি ছেলেকে সজোরে লাঠির আঘাত হানলো এবং পরে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিল। এ সময় আমাদের মিছিলের রওশন আরা বাচ্চু লাঠির আঘাত পায়। পেছনেও লাঠির আঘাতের ফলে মিছিল বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এলোমেলো হচ্ছিল। এ বাধার মধ্যেও আমরা বর্তমান মেডিকেল কলেজের মেইন গেইটের কাছে এসেছি এমন সময় আমাদের ওপর টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া শুরু হলো। টিয়ার গ্যাসের একটা শেল আমার পায়ের সামনে এসে পড়ে। টিয়ার গ্যাসের ফলে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কে যেন আমাকে ধরে নিয়ে রাস্তার অপর দিকের পানের দোকানের কাছে নিয়ে চোখে পানি ছিটা দিচ্ছিল। কিন্তু টিয়ার গ্যাস খুব 'সিরিয়াসলি এফেক্ট' করেছিল। তখন কে একজন আমাকে মেডিকেলে 'ফার্স্ট-এইডে'র জন্য নিয়ে গেলো।

'ফার্স্ট-এইড' নিয়ে সুস্থির হলে দেখতে পেলাম এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশের আঘাতপ্রাপ্ত রক্তাক্ত অবস্থায় অনেককে ইমার্জেন্সীতে নিয়ে আসা হয়েছে। দু'একজন আহত অবস্থায়ও এমন বিক্ষুব্ধ ছিল যে, তাদেরকে বিছানায় চেপে রাখা যাচ্ছিল না।

আমি মেডিকেল থেকে বের হয়ে আবার মেয়েদের সংগঠিত করার চেষ্টা করলাম। মেয়েদের সংগঠিত করতে এসে দেখি বর্তমান শহীদ মিনারের পেছন হতে ছাত্ররা (অধিকাংশই স্কুলের ছাত্র) ইটের টুকরা নিক্ষেপ করে পুলিশের সাথে রীতিমত প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আমি এ দৃশ্য দেখে ভাবলাম, এভাবে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ থেকে ওদেরকে নিবৃত্ত করে সংগঠিতভাবে মিছিল করা প্রয়োজন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ফার্স্ট এইড নেয়ার কালে যে গুলি হয়ে গেছে এবং পরিস্থিতি যে খুবই সংগীন হয়ে পড়েছে তা আমি টের করতে পারিনি।

এ পরিস্থিতিতেও আমরা কিছু ছাত্রী সংগঠিত হলাম। সুফিয়া, রওশন আরা বাচ্চু এরা কখন যে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে খোঁজ করতে পারিনি। পরে শুনেছি, ওরা ছুটে গিয়ে ডঃ ওসমান গণির বাসার বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিল। বর্তমান সাইন্স এনেক্সের পাশে তখন ডঃ গণির বাসা ছিল। যাক সে কথা, তারপর আমরা কিছু মেয়ে সংগঠিত হয়ে মিছিল বের করি। বর্তমান সাইন্স এনেক্সের পাশ দিয়ে টি, এস, সি, ঘুরে রেসকোর্সের পাশ ঘেঁষে আমরা শ্লোগানমুখর মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাই।

প্রশ্ন ঃ পুলিশ বা সামরিক বাহিনী আপনাদের বাধা দেয় নি? মিছিল কোথায় এসে শেষ হয়?

উত্তর ঃ না, বাধা দেয় নি। শুধু আমাদের মিছিলের কিছু স্কুলের ছাত্রীকে পুলিশ ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে শুনেছি ওদের টঙ্গি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওরা রেল লাইন ধরে হেঁটে নিজ নিজ বাড়ী পৌঁছে।

স্কুলের ছাত্রীদের তুলে নিয়ে গেলেও আমাদের মিছিল বন্ধ হয় নি। সামনে এগিয়ে চলে। বাংলা একাডেমীর (সে সময় নুরুল আমিনের সরকারী বাসভবন) সামনে দিয়ে মিছিল আবার মেডিকেলের মেইন গেইটের পাশে এসে শেষ হয়।

আমরা এসে দেখি এ যেন একটা বিধ্বস্ত এলাকা। টিয়ার গ্যাসের অন্ধকার চারিদিক ছেয়ে আছে। এরপর আমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি এবং অবসন্ন অবস্থায় হলে প্রত্যাবর্তন করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
এপ্রিল, ১৯৭৮
জানুয়ারী, ১৯৮৭

ডক্টর সুফিয়া আহমদ

[ডঃ সুফিয়া আহমদ ১৯৫০ সাল এবং তৎপরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী মিছিলের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম্।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একজন অধ্যাপিকা। ছাত্রীজীবনে তিনি ছিলেন একজন কৃতীছাত্রী।

তাঁর গ্রামের বাড়ী ফরিদপুরে। পিতা বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম ঢাকা হাইকোর্টের একজন প্রখ্যাত বিচারক ছিলেন।

সুফিয়া আহমদ ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করেছেন। প্রথমে 'সেন্ট ফ্রান্সিস' এবং অতঃপর 'কার্সিং ডাওহিলস্ কনভেন্টের' ছাত্রী ছিলেন। তবে প্রাইভেটে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষা দিয়ে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে লেটার নম্বরসহ ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথম বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে বি.এ. অনার্স ও এম.এ. পাশ করেন। এম.এ-তে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এরপর ডঃ সুফিয়া আহমদ চলে যান গবেষণার জন্য। তাঁর থিসিস লেখার বিষয় ছিল 'মডার্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি'। ১৯৬১ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন।

ডঃ সুফিয়া আহমদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। স্বামী জনাব ইশতিয়াক আহমদ একজন নামকরা ব্যারিস্টার এবং সাবেক এটর্নী জেনারেল।]

প্রশ্ন ঃ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা উচিত—এ মানসিকতা আপনার মধ্যে কিভাবে গড়ে ওঠে?

উত্তর ঃ ছোটবেলা থেকে যদিও আমি ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করেছি তবে বাংলা ভাষার প্রতি আমার একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল। তবে সত্যি কথা হলো, আমার পিতার অপরিসীম উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমি বাংলা এবং সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হই।

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আগমন হতো হলে। তাঁদের সাথে আলোচনা হতো। কখনো 'উর্দু আরবী হরফে বাংলা প্রচলন' প্রসঙ্গ, কখনো 'উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' হিসাবে impose করার প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা প্রকার আলোচনা। এসব আলোচনা সমালোচনা ও বিতর্ক হয়তো অলক্ষ্যে মনের মধ্যে ছাপ রেখেছিল।

আমার পিতা ছিলেন খুবই liberal minded। বাংলা ভাষা ও 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারে'র প্রশ্নে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন এবং অনুভূতিপ্রবণ। সুতরাং মাতৃভাষার প্রতি সহজাত আকর্ষণ ছাড়াও পারিবারিক পরিবেশ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে আমার মানসিকতা গড়ে তুলেছিল।

প্রশ্ন ঃ বাংলা ভাষার প্রতি অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ এবং একটা সহজাত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আপনাকে ছোটবেলা থেকে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ানোর কারণ কি?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে peculiar মনে হতে পারে। কিন্তু বাংলার প্রতি কোন অনীহার দরুন নিশ্চয়ই আমাকে ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে দেয়া হয় নি। হয়তো বাংলা মাধ্যমে ভালো স্কুল ছিল না, নতুবা আমার পিতা ভেবেছিলেন ইংরেজী মাধ্যমে আমার পড়াশুনা ভালো হবে। অবশ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমার পিতা নিজের তত্ত্বাবধানে আমাকে বাংলা শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। বস্তুতঃ পিতার প্রচেষ্টা এবং উৎসাহের ফলেই বাংলায় আমার ত্রুটি বিচ্যুতি কাটিয়ে ওঠে, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হই।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তৎকালীন সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানী মনোভাব সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ সরকারী মনোভাব তো অযাচিতভাবে হঠকারী ছিলই। এ সম্পর্কে নতুন করে বিস্তারিত বলার তেমন কিছুই নেই। তবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনোভাব ছিল একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। কারণ তাদের ধারণা ছিল সারা পাকিস্তানে একটি ভাষা না হলে 'ইনটিগ্রিটি' বিপন্ন হবে। তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী চালাক, আর তাই তারা চেয়েছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে ধীরে ধীরে

আমাদের 'আইডেন্টিটি' ভুলিয়ে দিতে। কিন্তু আমরা আমাদের 'আইডেন্টিটি' ভুলতে যাবো কেন?

প্রশ্ন ঃ তবে কি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের 'ইনটিগ্রিটির' বিরুদ্ধে ছিল?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের নয় বরং পশ্চিম পাকিস্তানের domination এর বিরুদ্ধে ছিল। পাকিস্তানের জন্য বাঙ্গালী মুসলমানেরা কম sacrifice করেনি।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের সাথে আপনি কখন থেকে জড়িত হন?

উত্তর ঃ ১৯৫০ সালে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। তখন থেকেই ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ঃ আপনিতো হলে থাকতেন না। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ বা কর্মতৎপরতার প্রশ্নে কোন পারিবারিক বাধা আসতো না?

উত্তর ঃ আমি হলে (ইউনিভার্সিটি ওমেন্স রেসিডেন্ট) থাকতাম না। এবং একমাত্র আমিই সম্ভবতঃ হলের বাইরে থেকে আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। এ ব্যাপারে আমার পিতা কখনো আমাকে প্রশ্ন করেন নি। আমি একে নীরব সমর্থন মনে করতাম।

প্রশ্ন ঃ ডঃ শাফিয়া আপনাদের 'ওমেন স্টুডেন্টস ইউনিয়নে'র ভি.পি. ছিলেন তাই না? তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে কিছু বলুন না।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তিনি 'ওমেন স্টুডেন্টস ইউনিয়নে'র ভি.পি. ছিলেন। ছাত্রীদের সংগঠিত করার ব্যাপারে তিনিই পুরোভাগে থেকে সব কিছু করতেন। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে তিনি প্রথম দু'জন দু'জন করে মিছিল নিয়ে বের হন।

প্রশ্ন ঃ ডঃ শাফিয়া তো বললেন প্রথম ব্যাচে ছেলেরা বের হয়, তৃতীয় ব্যাচে তিনি মেয়েদের নিয়ে বের হন।

উত্তর ঃ (একটুখানি ভেবে) না, মেয়েরাই তো আগে বেরুলো। শাফিয়া আপাই তো আগে বের হলেন। আমার তাই স্পষ্ট মনে পড়ছে। রাখুন আমি শামসুনকে (শামসুন্নাহার আহসান) জিজ্ঞেস করি।

[এই বলে তিনি কার সাথে যেন টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। কিন্তু টেলিফোন এনগেজড থাকায় পুনরায় আলোচনায় রত হলেন।]

প্রশ্ন ঃ আপনি কাকে টেলিফোন করতে চাইলেন?

উত্তর ঃ শামসুন্নাহার আহসানকে। ও আমার ক্লাশ-মেট। ছোটবেলায় আমরা একত্রে

পড়েছি। আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সেও মিছিলের পুরোভাগে ছিল। সে বোরখা পরে মিছিলে অংশ নিয়েছিল এবং অন্যান্যদের সাথে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলো। বর্তমানে সিদ্ধেশ্বরী ওমেনস কলেজে অধ্যাপনা করছে।

[কথার মাঝেই ডঃ সুফিয়া আবার শামসুন্নাহারকে টেলিফোন করে এবার পেয়ে গেলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন, '..... আচ্ছা শামসুন্ ২১শে ফেব্রুয়ারী মিছিলে মেয়েরা আগে বেরিয়েছিল না? শাফিয়া আপা নাকি বলেছেন প্রথম দুই ব্যাচে ছেলেরা আগে বেরিয়েছে। তোর মনে আছে .... হ্যাঁ, তাই তো শাফিয়া আপারাই তো আগে বের হলো। তারপর আমরা... ।'★

কিছুক্ষণ টেলিফোনে কথা হলে ডঃ সুফিয়া, শামসুন্নাহার আহসানের নিকট ঢাকা ডাইজেস্টে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত সাক্ষাৎকারের কথা বললেন।]

প্রশ্ন ঃ মিসেস আহসান কি বললেন?

উত্তর ঃ আমি যা বলছি, শামসুনও তাই বলছে। ছেলেরা আগে যাবে কি করে; তাদেরকে তো বের হতেই দিচ্ছিল না। শাফিয়া আপারাই আগে মিছিল নিয়ে বের হয়েছিলেন। আপনি তার সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় বিস্তারিত জিজ্ঞেস করবেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি বটতলার মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কখন বের হলেন?

উত্তর ঃ মিটিং-এর পর দু'জন দু'জন করে বের হয়ে এসেম্বলি পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। শাফিয়া আপারা প্রথমে একরকম বিনা বাধায় এগিয়ে গেলেন। তারপর আমরা বের হলাম। আমরা বের হতেই দেখি ইউনিভার্সিটি গেটের সামনে পুলিশ কর্ডন করে দাঁড়িয়ে আছে। কর্ডনের পাশেই ঢাকার সিটি এস.পি. মাসুদ মাহমুদও দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

প্রশ্ন ঃ ইউনিভার্সিটি গেইটে তখন সিটি এস.পি. মাসুদ মাহমুদ দায়িত্বে ছিলেন—এ ব্যাপারে আপনি কি confirmed? আপনি কি তাঁকে চিনতেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি confirmed. মাসুদ মাহমুদকে আমি ভালোভাবে জানতাম। আমার পিতা যখন বরিশালের ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন তখন মাসুদ মাহমুদ লাকুটিয়ায়

★ ডঃ সুফিয়া ও শামসুন্নাহারের টেলিফোনের সংলাপ দু'জনের সঙ্গে আলাপের ভিত্তিতে উদ্ধৃত হয়েছে।

ট্রেনিং-এ গিয়েছিলেন। তখন থেকেই আমি মাসুদকে চিনি। কেনো যে অনেকে ইদ্রিস সাহেবের কথা বলে বুঝি না। আমার স্পষ্ট মনে আছে মাসুদ মাহমুদ তখন পুলিশ কর্ডনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ঢাকার ডি.সি. ছিলেন সম্ভবতঃ মিঃ কোরাইশী।

প্রশ্ন ঃ আপনারা তখন কিভাবে এগিয়ে গেলেন?

উত্তর ঃ প্রথমে কিছুটা সংকোচ ও দ্বিধা হচ্ছিল এই ভেবে যে মাসুদ মাহমুদ সহ পরিচিত পুলিশ অফিসারগণের মাধ্যমে আমার মিছিল করার খবরটি বাসায় পৌঁছে যাবে। যদিও এ ব্যাপারে আমার পিতা কখনো বিরূপ মন্তব্য করেন নি তবুও খানিকক্ষণ কেন জানি এমনি ধরনের অনুভূতি বিরাজ করছিল। মুহূর্তের মধ্যে আমরা (আমি, শামসুন্নাহার, সারা তাইফুর) কর্ডনের নীচ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেশ কয়েকজন সামনে এগিয়ে গেলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের সাথে আর কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ আরো অনেকে ছিলেন। সবার নাম স্মরণ করতে পারছি না। রওশন আরা বাচ্চু ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের সাথে ছিলেন না, শাফিয়া আপাদের সাথে ছিলেন ঠিক মনে নেই। তিনি লাঠির আঘাতে আহত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ সেদিন পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতা দেখে কিছু ঘটবে বলে আপনারা ধারণা করেন নি?

উত্তর ঃ পরিস্থিতি এমন হবে এ আমার ধারণা হয়নি। কেউ ভেবেছে কিনা জানি না, কিন্তু ভাষার প্রশ্নে দাবী জানাতে গেলে গুলি বর্ষিত হবে–এ ছিল আমাদের ধারণার বাইরে। আমি ভেবেছি বড়জোর আমাদের গ্রেপ্তার করতে পারে। কর্তৃপক্ষ এমন হঠকারী 'এ্যাকশন' নেবে এ আমরা ভাবতে পারি নি। ভাষার দাবীকে 'জেনুইন' দাবী মনে করতাম বলেই হয়তো আমাদের এমন ধারণা ছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনারা তো পুলিশের কর্ডন ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই না? তারপর কি ঘটলো?

উত্তর ঃ আমরা কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরই কাঁদানে গ্যাস ও পুলিশের লাঠি চার্জের ফলে পরিস্থিতি বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো। ঐ দিকে ছেলেরাও দেয়াল টপ্‌কে মিছিলে যোগ দিচ্ছিল। কেউ বা পুলিশের সাথে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছিল। আমরা ছুটে গেলাম ডঃ ওসমান গণির বাসার দিকে। বর্তমান সাইন্স বিল্ডিং-এর বাউণ্ডারীতে তাঁর বাসা ছিল, কাঁটা তারের বেড়া ফাঁক করে অনেক কষ্টে আমরা

সেখানে আশ্রয় নেই। ইতিমধ্যে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে যায়। ফরমান উল্লাহ★ তখন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। আপনি এসব কথা শামসুনের কাছে জানতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ মিছিল করে কোথায় যাওয়া আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল?

উত্তর ঃ পরিষদের সামনে গিয়ে অবস্থান ধর্মঘট করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান জগন্নাথ হল ছিল তখন পরিষদ ভবন। কিন্তু সেদিকে ছিল কঠোর পুলিশ রক্ষা ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ঃ কতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ডঃ গণির বাসায় অবস্থান করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমরা ডঃ গণির বাসার ভিতরে যাইনি। বাইরেই আমরা বসেছিলাম। পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত শান্ত এবং নিরাপদ হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানেই অবস্থান করি। পরে সারা তাইফুরের ফার্স্ট এইডের জন্য বের হয়ে আসি।

প্রশ্ন ঃ আমতলার মিটিং-এ বা অন্যান্য ছাত্রসভাতে বরকতের উপস্থিতি কখনো লক্ষ্য করেছেন কি?

উত্তর ঃ আমি বরকতকে চিনতাম না। তাই ছাত্রসভাগুলিতে তাঁর উপস্থিতি ছিল কিনা বলতে পারবো না।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে বলে আপনার মনে হয় কি?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তো যথেচ্ছ বিকৃত হচ্ছে। যাঁরা এ আন্দোলনের ধারে-কাছেও ছিলেন না, তাঁরা আজকাল এ সম্পর্কে রেডিও, টিভির সাক্ষাৎকারে অংশ নিচ্ছেন। যাঁরা সত্যিকারে জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেকের খোঁজও কেউ নিচ্ছে না। এই দেখুন, শামসুন্নাহারের কথা কেউ কোনদিন বলছে না।

[কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর] আমি বুঝি না ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে শেখ মুজিবকে অতো সন্দেহ করা হয় কেন?

প্রশ্ন ঃ আন্দোলনের ব্যাপারে শেখ মুজিবের সাথে আপনার পূর্ব পরিচিতি বা যোগাযোগ ছিল কি?

উত্তর ঃ [মৃদু হেসে] না, যদিও আমাদের বাসায় তাঁর আনাগোনা ছিল, তবু আমার সাথে কোন আলাপ হয়নি কখনো। একবার আবদুল হামিদ সাহেব (যিনি আমাদের

★ ফরমান উল্লাহ নয়, অন্য কেউ তখন সুফিয়া আহমদ, শামসুন্নাহার ও অন্যান্যদের কাঁটা তারের বেড়া পার হতে সাহায্য করেছিলেন। সুফিয়া আহমদ হয়তো তাঁকে ভালোভাবে মনে রাখতে পারেন নি। ফরমান উল্লাহ তখন ফেনী থেকে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন।

দেশের লোক এবং MLA) এসে বললেন শেখ মুজিব আমার সাথে দেখা করতে চান এবং আলাপ করতে চান। এর জন্য দিনও ঠিক হয়েছিল। শেখ মুজিব সেদিন ঠিকই এসেছিলেন, কিন্তু আমাকে হঠাৎ বাইরে বের হয়ে যেতে হয়েছিল বলে আর তাঁর সাথে দেখা হয় নি, আলাপও হয় নি। এ জন্য আবদুল হামিদ সাহেবের সাথেও ভুল বুঝাবুঝি হয়ে সম্পর্ক নষ্ট হয়। শেখ মুজিবও হয়তো মনঃক্ষুণ্ন হন। তাঁর সাথে আমার কোন দেখা বা আলাপ হয়নি। আর তাই তিনি কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন সে কথাও আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না। আমার মনে হয় আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম বলে রাজনৈতিক কিছু আলোচনার জন্যই হয়ত তিনি এসেছিলেন। আপনি আবদুল হামিদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
এপ্রিল, ১৯৭৮

শামসুন্নাহার আহসান

[মিসেস শামসুন্নাহার আহসান বর্তমানে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপিকা। '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী যাঁরা মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি বোরখা পরিধান করে সেদিনের মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩২ সালের ১১ই মে তিনি বরিশাল জেলার আলেকান্দায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব আবদুল ওহাব খান। পরিবারের ধর্মীয় এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন। ১৯৪৮ সালে বরিশাল সদর গার্লস স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫০ সালে বরিশাল বি.এম. কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। ১৯৫০ সালেই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ডঃ সুফিয়া আহমদের ছোটবেলার বন্ধু। তাঁরা পরস্পর ক্লাস-মেট। ছোটবেলার বন্ধুত্ব এখনও অটুট রয়েছে।

মিসেস শামসুন্নাহার আহসানের স্বামী 'প্রজেক্ট ইনফরমেশন ব্যুরো'র ডাইরেক্টর। তাঁদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করলেও এ যাবৎ কেউ তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেনি।]

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন সময় থেকে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত হন?

উত্তর ঃ ১৯৫০ সালে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরই আমি এর সাথে জড়িত

হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে আমতলায় যেসব সভা অনুষ্ঠিত হতো, সেগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অধিকাংশ সভাতেই আমরা মেয়েরা সংগঠিত হয়ে অংশগ্রহণ করতাম। তবে আমরা বেলকনীতে অবস্থান করেই সভায় অংশগ্রহণ বা বক্তব্য শ্রবণ করতাম। এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের মতো তখন এতো সহজ মেলামেশা ছিল না। তখন ছাত্রীদের সাথে কথা বলার জন্য প্রোক্টরের অনুমতি প্রয়োজন হতো।

প্রশ্ন ঃ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার মনোভাব আপনার কিভাবে গড়ে ওঠে?

উত্তর ঃ মাতৃভাষার প্রতি কারনা অনুরাগ থাকে বলুন? পারিবারিক পরিবেশও আমার এ অনুরাগ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। আমার পিতা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। এসব ব্যাপারে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। পিতার দরুনই আমি একটু সচেতন এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে উঠি।

প্রশ্ন ঃ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী কি উর্দু ভাষার প্রতি বিরূপ ভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ উর্দু ভাষার বিরোধিতা বা এর প্রতি বিরূপভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ওঠেনি। উর্দুর প্রতি বিরূপভাব সৃষ্টির জন্য তৎকালীন সরকার এবং বাংলাভাষা বিরোধীরাই দায়ী। প্রথমে তো উর্দুর প্রতি কোন বিরূপ ভাব ছিল না। আমরা তো ছোটবেলায় কিছু কিছু উর্দু শিখেছি পারিবারিক উৎসাহ পেয়ে। কিন্তু জবরদস্তি করে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার ফলেই উর্দুর প্রতি বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীকে সফল করে তোলার জন্য আপনারা ছাত্রীরা এর পূর্বে কোন তৎপরতা চালিয়েছিলেন কি?

উত্তর ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীকে সফল করে তোলার জন্য আমরা গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের স্কুলে গিয়ে একদিন আমতলায় মিটিং এ উপস্থিত হওয়ার জন্য ছাত্রীদের সংগঠিত করি। এসব তৎপরতার প্রতি উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ আমতলার মিটিং-এ কিভাবে মিছিল করার সিদ্ধান্ত হয়?

উত্তর ঃ দু'জন দু'জন করে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয় এবং কৌশল হিসাবে মেয়েদের পুরোভাগে দেয়ার কথা স্থির হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রথমে কারা মিছিল করে এগিয়ে যায়?

উত্তর ঃ শাফিয়া আপার (ডঃ শাফিয়া) নেতৃত্বে মেয়েরা প্রথম দু'জন দু'জন করে মিছিল করে এগিয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ডঃ শাফিয়ার খণ্ড মিছিলে আপনারা ছিলেন?

উত্তর ঃ না, শাফিয়া আপাদের সাথে আমরা ছিলাম না।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কখন বের হন?

উত্তর ঃ শাফিয়া আপারা বের হয়ে যাওয়ার পর ছাত্ররা এসে মেয়েদের অনুরোধ করে বলেছিল, 'মেয়েদের এগিয়ে যেতে বাধা দিচ্ছে না, please আপনারা বের হয়ে এগিয়ে যান।' শাফিয়া আপারা বের হয়ে যাওয়ার খানিক পরেই আমরা বের হয়ে যাই। আমরা মেইন গেইট দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পরই দেখি আমাদের ছাত্রদের মধ্যেই কে বা কারা ইউনিভার্সিটি গেইট বন্ধ করে দিয়েছে। সামনে দেখি পুলিশ কর্ডন করে দাঁড়িয়ে আছে। কর্ডনের এক পাশে সিটি এস.পি. মাসুদ মাহমুদ দাঁড়িয়ে আছে।

প্রশ্ন ঃ সামনে পুলিশের কর্ডনের পেছনে ইউনিভার্সিটি গেইট বন্ধ, তখন আপনারা কি করলেন?

উত্তর ঃ আমরা কর্ডন ভেদ করে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। সুফিয়া, মাসুদ মাহমুদ সহ কয়েকজন পরিচিত পুলিশ কর্মকর্তা দেখে কিছুটা সংকোচ বোধ করছিল। যাক আমি আর সুফিয়া এক জায়গায় কর্ডনের নীচ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক করে ফেললাম এবং ওরা (পুলিশেরা) বুঝবার পূর্বেই হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে সাথে বেশ কয়েকজন মেয়ে বেরিয়ে পড়লো। আমরা সংগঠিত হয়ে এগিয়ে যেতে থাকলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কারা কারা ছিলেন? অনুগ্রহ করে তাঁদের নাম বলুন?

উত্তর ঃ সুফিয়া, রওশন আরা, সারা তাইফুর ও আমি ছিলাম। সুরাইয়া নামে বোধ হয় আর একজন ছাত্রী ছিল। সবার নাম মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন ঃ পরে পুলিশ আপনাদের বাধা দেয়নি? তারপর ঘটনাপ্রবাহ কিভাবে এগোয়?

উত্তর ঃ আমরা তো এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ঐ দিকে ছেলেরা পেছনের দেয়ালের ওপর থেকে চীৎকার করে বলছে, 'দু'জন দু'জন করে এগিয়ে যান। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবেন না। এগিয়ে যান। এগিয়ে যান। পরিষদের সামনের দিকে এগিয়ে যান।' আমরা আরেকটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। বর্তমান শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে দেয়াল টপকে ছেলেরা রাস্তায় নামছে। আর সামনে ইট ছুঁড়ে পুলিশকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে।

ইতিমধ্যে টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ শুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে ছুটোছুটি। টিয়ার গ্যাসের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য সবাই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। আমাদের মধ্যে রওশন আরা সহ কয়েকজন লাঠির আঘাত পেয়েছে। আমরা ছুটে গেলাম ডঃ গণির বাসার দিকে আশ্রয় নেয়ার জন্য। বর্তমান সাইন্স এনেক্সের এরিয়াতে তখন তাঁর বাসা ছিল। বাউণ্ডারী এরিয়ায় কাঁটাতারের বেড়া। ভেতরে যাওয়া মুশকিল। ঐ দিকে ইট আসছে অবিরামভাবে। সারা তাইফুরের গায়ে ইটের আঘাত লাগলো মারাত্মকভাবে। এমন সময় ফরমান উল্লাহ কোথা থেকে যেন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি কাঁটাতারের বেড়া ফাঁক করে আমাদের ভেতরে যেতে সাহায্য করলেন। সেদিন তিনি না এলে বোধ হয় আমাদের আর ভেতরে আশ্রয় নেয়া সম্ভব হতো না। কাঁটাতারের আঁচড়ে কাপড় ছিঁড়ে আমরা সবাই কম-বেশী ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো বোরখা পরা ছিলেন, তাই না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি বোরখা পরেই অংশ নিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ গুলি বর্ষিত হলো কখন?

উত্তর ঃ আমরা ডঃ গণির বাসভবনের বাউণ্ডারীতে যাওয়ার পূর্বেই গুলি বর্ষণের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ডঃ গণির বাসভবনের দিকে গেলেও আমরা ভেতরে যাই নি। ভেতর থেকে ডাকলেও আমরা বিক্ষুব্ধ মনে বাইরেই অপেক্ষা করছিলাম।

প্রশ্ন ঃ সেখানে অবস্থানকালে আপনারা উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করেছেন?

উত্তর ঃ বেশ কিছু সময় পর দেখতে পেলাম ছেলেরা কোথা থেকে আইন পরিষদের সদস্যদের ধরে এনে আনন্দে নৃত্য করছে। কেউ কেউ সদস্যদের কাঁধে নিয়ে চুমু খাচ্ছে। ছেলেদের এই আনন্দের কারণ হলো সদস্যদের পরিষদে যোগদান থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হওয়া। এর ফলে সেদিন রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাংলা ভাষার বিপক্ষে কোন আইন পাশ করানো যায় নি।

প্রশ্ন ঃ সেখানে আপনারা কতক্ষণ অবস্থান করেছিলেন? তারপর কি করলেন?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ সাড়ে তিনটের দিকে আমরা সেখান থেকে বের হয়ে মেডিকেলে যাই। মেডিকেলে সারা তাইফুরসহ আমরা 'ফার্স্ট-এইড' গ্রহণ করি। তারপর কয়েকজন ছাত্রের সহায়তায় মেডিকেলের পেছন দিকে এস.এম. হলের পাশ দিয়ে আমাদের হলে ফিরে আসি। পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনীকে এড়ানোর জন্যই আমাদের অতদূর ঘুরে আসতে হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ এরপর আপনাদের কি তৎপরতা ছিল?

উত্তর ঃ এরপর আহত ছাত্র-ছাত্রীদের ঔষধ পথ্য প্রভৃতির জন্য চাঁদা তোলা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে তৎপর হই। গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে গিয়ে আমরা হাটখোলা টিকাটুলী প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকায় চাঁদা তুলি। জনগণের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অভাবিত সাড়া পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের এসব তৎপরতায় পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন বাধা সৃষ্টি করতো কি?

উত্তর ঃ গ্রেফতার ও ধরপাকড় তো শুরু হয়েছিলই। কিন্তু আমাদের কাজে কোন বাধা আসেনি। চাঁদা তোলায় কাজী আমিনাও তৎপর ছিল। সে একদিন বললো এস.বি-তে তার এক আত্মীয় আছে। তার কাছ থেকে সে নাকি শুনতে পেয়েছে যে, আন্দোলনের ব্যাপারে যারা তৎপর রয়েছে তাদের নাম তালিকাভুক্ত হচ্ছে। এজন্য কাজী আমিনা আমাদেরকে বেশী ঘোরাঘুরি করতে নিষেধ করেছিলো। আমরা এসব কিছুকে তেমন আমল দিতাম না।

প্রশ্ন ঃ পরবর্তী দিনগুলোতে আরো উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছে বলে এখন মনে পড়ছে কি?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ একুশে ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলায় আমাদের হল থেকেই মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ছাত্রদের মর্মস্পর্শী আহ্বান শুনতে পেলাম। মাইকে বলা হচ্ছিল, 'ভাইয়েরা, আপনারা আগামীকাল সকাল ন'টায় আসবেন। আমরা শহীদের লাশ মর্যাদার সাথে রক্ষা করছি। আমরা আপনাদের নিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শহীদদের দাফন করবো।' বেশ কিছু সময় পর আবার করুণ চীৎকার ধ্বনি ভেসে আসে, 'ভাইয়েরা পারলাম না, পারলাম না রাখতে, পুলিশ আমাদের শহীদের লাশ ছিনিয়ে নিয়ে গেল। পারলাম না আমাদের শহীদের লাশ মর্যাদার সাথে দাফন করতে।'– এসব মর্মস্পর্শী ঘোষণা এবং আর্তি মনভারাক্রান্ত করতো।

প্রশ্ন ঃ ইউনিভার্সিটি কবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়?

উত্তর ঃ পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী কর্তৃক এস.এম. হল রেইড হওয়ার পরদিন ২৪ তারিখ ইউনিভার্সিটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আমি ২৪ তারিখেই হল থেকে জিন্দাবাহার ফার্স্ট লেনে খালার বাসায় চলে যাই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
এপ্রিল, ১৯৭৮

ফরমান উল্লাহ

[জনাব ফরমান উল্লাহ বায়ান্ন-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ফেনী হতে গ্রেপ্তার হন। তিনি ফেনীতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ছিলেন। '৪৮ সাল হতেই তিনি তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত দাবীর পুস্তিকা নিয়ে এ দাবীর স্বপক্ষে জনমত সংগঠনে তৎপর হন। তিনি ফেনী তমদ্দুন মজলিসেরও সংগঠক ছিলেন। '৫৫ সালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার জন্য তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে গ্রেফতার হন।

ডঃ সুফিয়া আহমেদ এবং শামসুন্নাহার আহসান সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে বলেছেন, কাঁদানে গ্যাস ও ইটপাটকেলের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্তমান সাইন্স এনেক্সের পাশে ডঃ এম. ও. গণির তৎকালীন বাসভবনের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে তাঁরা যখন ছুটে যান তখন জনাব ফরমান উল্লাহ এসে তাঁদের সাহায্য করেন। কিন্তু পরে জনাব এ.আই.এম. তাহার সাক্ষাৎকারে জানা গেল, এ তথ্য ঠিক নয়। সম্ভবতঃ উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে স্মৃতি-বিভ্রমজনিত কারণে ডঃ সুফিয়া আহমদ এবং শামসুন্নাহার আহসানের সাক্ষাৎকারে এ তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

জনাব ফরমান উল্লাহ বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র এডভোকেট। নবগঠিত বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টির তিনি আহবায়ক। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে প্রদত্ত হলো। এতে আন্দোলন সম্পর্কিত একটি তথ্যগত বিভ্রান্তি দূর হবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ '৫২ সালে আপনি কোথায় ছিলেন? তখন আপনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ '৫২ সালে আমি ফেনী কলেজে অধ্যয়ন করি, তখন আমি ফেনীতেই ছিলাম। হ্যাঁ, তখন আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি ফেনী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ছিলাম। ফেনীতে আমরা রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়ে দুর্বার সংগ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করি। সম্ভবতঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারীর দিকে গ্রেপ্তার হই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কখন থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত হন।

উত্তর ঃ '৪৮ সালে তমদ্দুন মজলিসের 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকা পাওয়ার পর থেকেই আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করি। যদি তাকে আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় বলা হয়, তবে তখন থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনার সম্পর্কে ডঃ সুফিয়া আহমদ এবং শামসুন্নাহার আহসান সাক্ষাৎকারে যে তথ্য প্রদান করেছেন তা কি আপনি লক্ষ্য করেছেন? এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে '৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বেশ পুলিশী তৎপরতা চলে এবং ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার করা হয়। '৫৫ সালে আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রেপ্তার হই। পরবর্তীকালে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হই। হয়তো বা এসব কারণে ভুলক্রমে ডঃ সুফিয়া আহমদ এবং শামসুন্নাহার আহসানের সাক্ষাৎকারে ঢাকার ঘটনার সাথে জড়িত হয়েছি। এ ছাড়া তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত আমার নামে অন্য কেউ ছিলেন না। হয়তো বা যিনি তাঁদেরকে সে মুহূর্তে সাহায্য করেছেন তাঁর সঠিক নাম জানা ছিল না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
আগষ্ট, ১৯৭৯

এম. এ. আউয়াল

[এম.এ. আউয়াল অতি তরুণ বয়সেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনে তিনি কলেজ স্তরে খুবই জনপ্রিয় ছাত্রনেতা ছিলেন।

জনাব এম.এ. আউয়াল ১৯৩৩ সালের ১৪ই আগস্ট কুমিল্লা জেলার মতলব থানার রসুলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। শৈশবে চাঁদপুরের বি.এন.আই.ইউ. মিশনারী স্কুলে তাঁর পড়াশুনা শুরু হয়। চতুর্থ শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনা চলে। সেখান থেকে গিয়ে কোলকাতা 'সানজেভিয়া মিশনারীতে' পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনা করেন।

সে সময় তিনি এম.এন. রায়, মিসেস এলেন রায় ও কমরেড মোজাফ্‌ফরের সংস্পর্শে আসেন। তখন ডঃ মালেক ছিলেন আসাম-বাংলা সিম্যানস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। খিদিরপুরে ছিল তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন অফিস। এম.এ. আউয়াল ডঃ মালেকের সংস্পর্শে আসেন এবং খিদিরপুর যাওয়া শুরু করেন। এভাবে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তী পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নের অফিস সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে জনাব আউয়াল ঢাকায় ফিরে আসেন। প্রথমে তিনি ১৫০, মোগলটুলীতে ওঠেন। এটা ছিল তখন শামছুল হকের (আওয়ামী লীগের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা-সেক্রেটারী) নেতৃত্বে সংগঠিত তরুণ মুসলিম লীগ যুব কর্মীদের প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র। ঢাকায় এসে জনাব আউয়াল হাম্মাদিয়া হাই স্কুলে ভর্তি হন। তখন তিনি অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি টিউশনী শুরু করেন।

১৯৪৭ সালে তিনি সে তরুণ বয়সেই 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগের' দফতর সম্পাদক

নিযুক্ত হন। ১৯৪৭-এর অক্টোবরে টাঙ্গাইলে 'ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ' সংগঠিত করতে গেলে সরকারীভাবে টাঙ্গাইল থেকে বহিষ্কৃত হন। ঢাকায় ফিরে এলে তিনি গ্রেফতার হন। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম গ্রেফতার। কারাগার থেকেই তিনি মেট্রিক পরীক্ষা দেন। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন।

জনাব আউয়াল ১৯৪৯ সালে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ গঠন করেন। তিনিই ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদের প্রথম নির্বাচিত সহ-সভাপতি। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পর্যন্ত যতগুলি আন্দোলন হয়েছে– প্রতিটি আন্দোলনেই তিনি ছাত্রনেতা হিসেবে পুরোভাগে ছিলেন। '৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয় এবং তিনি গ্রেফতার হন।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি চারবার অব্যাহতভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বিশ্ব যুব ও ছাত্র সম্মেলনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৬ সালে ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মেলনে তাঁর ভূমিকা আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। দৈনিক ইত্তেফাকের "ভীমরুল" ছিলেন তিনিই। কিছুকাল দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যকরী সম্পাদকও ছিলেন।

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত জনাব আউয়াল সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে থাকেন। তাঁর এ সময়টা অতিবাহিত হয় এশিয়ার অন্যতম শিল্প প্রতিষ্ঠান আদমজী গ্রুপ অব ইণ্ডাস্ট্রিজে। সেখানে তিনি নিজেকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা বিশারদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে আদমজী গ্রুপ অব ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন তিনি সে পদ হতে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের ছয় মাস পর ২০শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত নির্দেশে তিনি গ্রেফতার হন।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের তৎপরতা শুরু হলে তিনি এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট তিনিই হবেন একথাও স্থির হয়। এ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সম্মেলনের তিনদিন পূর্বে রাতে তাঁর সাত মসজিদ রোডের বাসা ঘোরাও করে রেখে সকালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ঐতিহাসিক সিপাহী বিপ্লবের সময় তিনি মুক্তিলাভ করেন।

জনাব এম.এ. আউয়াল বর্তমানে সাপ্তাহিক জনমুক্তির সম্পাদক। পত্রিকা নিয়ে তিনি খুবই ব্যস্ত থাকেন। কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও ঢাকা ডাইজেস্টের জন্য রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিশেষ সাক্ষাৎকারটি দিয়েছেন। তৎকালীন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা হিসেবে ভাষা আন্দোলনে তাঁর কর্মতৎপরতার এবং তাঁর বিবৃত তথ্য ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রচুর উপকরণ জোগাবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ আপনি পড়াশুনা করেছেন কোথায়? রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় কি আপনি ঢাকায় ছিলেন?

উত্তর ঃ চাঁদপুর বি.এন.আর. ইউ. মিশনারী স্কুলে আমি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করি। এরপর কোলকাতা সানজেভিয়া মিশনারী স্কুলে ভর্তি হই। সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা চলে। তারপর ১৯৪৬ সালের জুলাইতে আমি ঢাকায় এসে হাম্মাদিয়া হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হই। হ্যাঁ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় আমি ঢাকাতেই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম। তবে গ্রেফতার হয়ে মাঝে মাঝে অন্য জেলায় স্থানান্তরিত হয়ে যেতাম।

প্রশ্ন ঃ স্কুলজীবন থেকেই কি আপনার গ্রেফতার হওয়া শুরু হয়? কি কারণে প্রথম গ্রেফতার হন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, স্কুলজীবন থেকেই আমার গ্রেফতার হওয়া শুরু হয়। কোলকাতা খিদিরপুরে ডঃ মালেকের (তৎকালীন আসাম-বাংলা সিম্যান্‌স এসোসিয়েশনের সভাপতি, পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গবর্ণর) সংস্পর্শে গিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত হয়ে পড়ি। সেখানে গ্রেফতারের আশংকা দেখা দিলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিশেষ সহযোগিতায় ঢাকায় চলে আসি। এখানে রিকুইজিশন বিরোধী আন্দোলন এবং ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগের সাথে জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতার হই। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র মাত্র।

প্রশ্ন ঃ এতো তরুণ বয়সে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকা, ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগের সাথে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকা, গ্রেফতার হওয়া, এসব শুনে অবাক হতে হয়।

উত্তর ঃ অবাক হওয়ার কথাই বটে। তবে এ সবই সত্যি। যখন ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগের দফতর সম্পাদক হই তখন আমি হাম্মাদিয়া স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। কিছুদিন পর টাঙ্গাইলে ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। সম্ভবতঃ ১৯৪৮ সালের অক্টোবরের কথা। টাঙ্গাইল থেকে ফিরে ঢাকায় এসে এপ্রিলের দিকে গ্রেফতার হই। কুমিল্লা জেল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই। এ সবই অবাক হওয়ার মতো শুনাতে পারে। কিন্তু সবই তো ঘটেছে। সবই সত্যি। এতো তরুণ বয়সে এতো কিছুতে জড়িত থাকা এটাই হয়তো আমার জীবনের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ঃ রিকুইজিশন বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার কথা বলেছেন। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর ঃ পাকিস্তান হওয়ার পর পরই সরকার অফিস আদালতের কাজ চালাবার জন্য অনেক স্কুল-কলেজ রিকুইজিশন করে নেয়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় অনেক ব্যাঘাত হচ্ছিল। রিকুইজিশন প্রত্যাহার করে সরকার যেন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছেড়ে দেয়, এই দাবী আদায়ের জন্যই রিকুইজিশন বিরোধী আন্দোলন হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর এটাই ছিল ছাত্রদের প্রথম সংগঠিত আন্দোলন।

প্রশ্ন ঃ "ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ" কিভাবে কোথায় গঠিত হয়? আপনি কি প্রথম থেকেই এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন?

উত্তর ঃ কিছু প্রগতিশীল যুব কর্মীর উদ্যোগে '৪৮-এর সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে ঢাকা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত সাহেবের বাসায় ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ সংগঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন শামসুল হক, সিলেটের তাসাদ্দুক আহমদ, অলি আহাদ, রাজশাহীর আতাউর রহমান, তাজ উদ্দীন এবং সম্ভবতঃ তোয়াহাও ছিলেন। হ্যাঁ, আমি প্রথম থেকেই জড়িত ছিলাম। আমি দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হই। ভাষা আন্দোলনে ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ঃ ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা কি ঢাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল? আপনি কি এসব তৎপরতায় জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ না, ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায়ও ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগের তৎপরতা বিস্তৃত ছিল। টাঙ্গাইলের সাংগঠনিক তৎপরতার কথা তো আপনাকে পূর্বেই বলেছি। '৪৮ সালের এপ্রিলের দিকে ঈশ্বরদীতে নর্থ বেঙ্গল জোনাল ডেমোক্রেটিক ইয়থ লীগের কনফারেন্সের আয়োজন হয়। আমাকেই সে কনফারেন্সে প্রিজাইড করার জন্য পাঠানো হয়। আমি সেখানে গিয়ে দেখি কনফারেন্সের স্থানটি পুলিশ কর্ডন দিয়ে রেখেছে। পরে রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে সে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ঃ সম্মেলনের নির্দ্ধারিত স্থানে পুলিশ কর্ডন দিয়ে রেখেছে, আবার আপনারা রেলওয়ের সরকারী স্থানে সম্মেলন করেছেন? এটা কি করে সম্ভব?

উত্তর ঃ পূর্বের কর্মসূচী অনুযায়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি বটে, তবে সম্মেলন সার্বিকভাবে সফল হয়েছিল। রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে সম্মেলন অনুষ্ঠানের নেপথ্য কারণ ছিল, রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী জসিম মণ্ডল ছিলেন কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন। তাঁর সহযোগিতায় এসব সম্ভব হয়েছে। রেলওয়ে ওয়ার্কার্সদের মিটিং-এর নামে আমরা সম্মেলন করি।

প্রশ্ন ঃ তমদ্দুন মজলিসকে ভাষা আন্দোলনের 'পাইওনিয়ার' বলা যায় কি?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই বলা যায়। তমদ্দুন মজলিসই প্রথম রাষ্ট্রভাষার দাবী উত্থাপন করে। তমদ্দুন মজলিসের এ ঐতিহাসিক তৎপরতাকে অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম সাহেবের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো '৪৬ সালে ঢাকায় এসেছেন। আপনি কি তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত তৎপরতাগুলোর সাথে কখনো যুক্ত হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ না, আমি তমদ্দুন মজলিসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। আর সে প্রশ্নও ওঠে না কারণ তখন আমি কলেজের ছাত্রও নই। তবে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত মজলিসের সেমিনার ও আলোচনা সভাগুলোতে মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন কোন সালে? আপনাকে কেন কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল?

উত্তর ঃ আমি '৪০ সালে ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। ঢাকা কলেজ ফুলবাড়িয়ার নিকটস্থ পুরনো স্থান হতে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরের দাবীতে আন্দোলন পরিচালনার জন্যই আমাকে দু'বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া রাষ্ট্রভাষাসহ অন্যান্য ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে থাকার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ আমাকে ঢাকা জেলা হতে বহিষ্কারের আদেশ দেয়। তখন আমি কুমিল্লা চলে যাই। কুমিল্লা থেকে নোয়াখালীর চৌমুহনীতে যাই। সেখান থেকে যাই চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে গিয়েও আমি বহিষ্কারাদেশ পাই। পরিশেষে সতর্কতার সাথে আই.বি-র চোখ এড়িয়ে ঢাকায় ফিরে আসি। ইতিমধ্যে আমার বহিষ্কার আদেশের বাকী এক বৎসরের মেয়াদ প্রত্যাহৃত হয়। অবশ্য এর পেছনে অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খানের অবদান রয়েছে। কুমিল্লা অবস্থানকালে এক ছাত্রসভায় আমার বক্তৃতা শুনে তিনি এতো মুগ্ধ হন যে, আমার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের চেষ্টা চালান। বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের পর আমি কায়েদে আযম কলেজে ভর্তি হই।

প্রশ্ন ঃ এরপর কি পূর্ণোদ্যমে তৎপরতা শুরু করেন?

উত্তর ঃ তৎপরতা তো সব সময়ই অব্যাহত ছিল। তবে সরকারী বিধিনিষেধ এবং গ্রেফতারজনিত পরিস্থিতি তার সাময়িক ছেদ ঘটাতো মাত্র। যেমন গ্রেফতারের কারণে আমি '৪৮ সালের ১১ই মার্চের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়ে আমি কায়েদে আযম কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বাংলা উর্দু এসোসিয়েশন নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে যে অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করাই ছিল এ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য। কায়েদে আযম কলেজের অধ্যক্ষ ফাতেমী ছিলেন এসোসিয়েশনের সভাপতি। আমি হয়েছিলাম সেক্রেটারী।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কলেজে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত মিটিং বা কর্মসূচীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্মসূচীর সংযোগ রক্ষা হতো কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমরা যোগাযোগ রক্ষা করতাম। এ ছাড়া আমরা নিজেদের উদ্যোগেও রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত মিটিং, প্রতিবাদ সভা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করতাম। নিজেদের সংগঠিত করার ব্যাপারে মতানৈক্য বা মতভেদের কিছুই ছিল না।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের তো আপনি প্রথম ভি.পি. নির্বাচিত হয়েছিলেন। কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরও কি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত আন্দোলনে ছাত্রদের সংগঠিত করার ব্যাপারে আপনার ভূমিকা কার্যকর ছিল?

উত্তর ঃ দেখুন, এ প্রশ্নের পুরোপুরি জবাব দিতে গেলে আত্মপ্রচারের মত শুনাবে। আমার সময়ের ঢাকা কলেজের যে কোন ছাত্রকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন আউয়াল নামটি তখন ছাত্রসমাজকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারতো।

একটা মজার কথা মনে পড়ে গেলো। আমার পেছনে তো সারাক্ষণ আই.বি. লেগে থাকতো। ভাবছি কলেজে যেতে হবে। তাই আমার চেহারার সাথে সাদৃশ্য আছে এমন ছাত্র খুঁজছি আই,বি-কে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে। আমিনুল হক নামক (সার্জেন্ট জহুরুল হকের ভাই) একজন ছাত্রকে বললাম, চল আমার সাথে, কলেজে যাবো। আমি শেরওয়ানী পরেই সাধারণতঃ কলেজে যেতাম। এ নিয়ে আমার সম্পর্কে সিনিয়র ছাত্র এবং শিক্ষক মহলে একটা রসালো মন্তব্য প্রচলিত ছিল। মন্তব্যটা হলো, 'এ হ্যাণ্ডসাম বয় উইথ শেরওয়ানী।' সেদিন কিন্তু শেরওয়ানী পরলাম না। পাছে ভয় পায়– সেজন্য আমিনুল হককেও বললাম না। আমরা দু'জনে রিক্সায় ওঠার পরই পেছনে আই.বি. লেগে যায়। কিছুদূর গিয়ে রিক্সা থামিয়ে আমি চুপিসারে নেমে পড়ি। আমিনুল হককেও তখন কথাটি বুঝিয়ে বলা হয়নি। আমি তো আই.বি. ওয়াচারদের চোখে ধূলা দিয়ে কেটে পড়ি। এদিকে রিক্সা থামিয়ে আই.বি. ওয়াচারগণ আমিনুল হককে আউয়াল ভেবে গ্রেফতার করতে তৎপর হয়। আমিনুল হক এবং সেখানে জড়ো হওয়া ছাত্ররা ব্যাপারটি বুঝালো যে, পাশের ছাত্রটিই ছিলেন আউয়াল সাহেব এবং তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে রিক্সা থেকে নেমে চলে গেছেন। তখন আই.বি. ওয়াচারগণ থ' খেয়ে যান। ঘটনার আকস্মিকতায় আমিনুল হককে কিছুটা বিব্রত হতে হয়। এজন্য সে আজো বোধ হয় আমার প্রতি বিরূপ হয়ে আছে।

প্রশ্ন ঃ '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে নবাবপুরে যে মিটিং হয় তাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি উপস্থিত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন?

উত্তর ঃ না, আমি সদস্য ছিলাম না।

প্রশ্ন ঃ তবে উপস্থিত ছিলেন কিভাবে?

উত্তর ঃ কর্মপরিষদের সদস্য ছিল না, এমন বহু ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল। ছাত্রদের মত ছিল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে। আর সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তও আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই এ মিটিং-এর প্রতি ছাত্রদের স্বাভাবিক উৎসুক্য ছিল। সে কারণে আমরা মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ মিটিং-এর সিদ্ধান্ত কি হয়েছিলো তা আপনার মনে পড়ে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। পরে ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্রদের মাঝে এ নিয়ে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। আমরা কায়েদে আযম কলেজ, জগন্নাথ কলেজ সহ আশেপাশের যেসব ছাত্র মিটিং-এ এসেছিলাম, তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল করে সদরঘাট পৌঁছি। সেখানে আমি ছোটখাট ছাত্রসভা করি।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বটতলার সভায় আপনি কখন পৌঁছেন? মিটিং এর যা কিছু আপনার মনে আছে অনুগ্রহ করে বলুন না?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ এগারোটার দিকে আমরা সংশ্লিষ্ট এলাকার ছাত্রদের সংগঠিত করে সভায় পৌঁছি। সভায় বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার কিছু মনে নেই। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা প্রশ্নে বিতর্ক এবং দ্বি-মত স্পষ্টভাবে হয়। পরবর্তী পর্যায়ে যাই কিছু ঘটেছে কিছুই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে হয়নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা শুরু হয়। এ ব্যাপারে কোন সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা ছিল না। আমরা যে গ্রুপটি মিছিল করে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করি, প্রথমটায় পুলিশ কর্ডনে বাধা পাই। পরে দেয়াল টপকে বিভিন্ন দিক থেকে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র আমাদের সাথে এসে মিলিত হয় এবং তখন একটি সংঘবদ্ধ মিছিলের রূপ নেয়।

প্রশ্ন ঃ পরে পুলিশ এসে আপনাদের মিছিলে বাধা প্রদান করে নি? তখনো কি গুলি বর্ষিত হয়নি?

উত্তর ঃ না, পরিষদ ভবনের সামনে কড়া পুলিশ কর্ডন থাকলেও সেখান থেকে পুলিশ এসে আমাদের কোন বাধা প্রদান করেনি। আমরা ইউনিভার্সিটি জিমন্যাসিয়ামের পাশ দিয়ে হাইকোর্টের দিকে এগিয়ে যাই। হাইকোর্টের মোড় অতিক্রম করে আমাদের মিছিল শ্লোগান দিয়ে ফজলুল হক হলের দিকে এগিয়ে যায়। এমন সময় হাইকোর্টের মোড়ে গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। গুলির আওয়াজে মিছিল থমকে

যায়। আমরা মিছিলের কিছু অংশ এসে দেখতে পাই একজন গুলিবিদ্ধ রিকশাওয়ালাকে কয়েকজন ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ রিকশা থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। রিকশার প্যাডেলে এবং বড়িতে রক্ত লেগে আছে। এরপর আবার আমরা বিক্ষুব্ধ শ্লোগান দিয়ে মিছিল নিয়ে রেলওয়ে হসপিটালের মোড়ের দিকে এগিয়ে আসি। মিছিল রেলওয়ে হসপিটালের মোড়ে এলে অপর দিক থেকে আকস্মিকভাবে একটা পুলিশের গাড়ী এসে থামে এবং আমাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারী দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে। তখন মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।। আমরা আত্মরক্ষার জন্য কিছু ছাত্র ফজলুল হক হলে প্রবেশ করি। এর পরের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। কোন লিডারশীপ নেই, লক্ষ্য নেই, বিক্ষিপ্ত অবস্থা। পরে আমরা অবশিষ্ট ছাত্ররা মেডিকেল কলেজে যাই। সেখানে আহতদের দেখতে পাই।

প্রশ্ন ঃ আহতদের মধ্যে আপনার পরিচিত কোন ছাত্র ছিল?

উত্তর ঃ না, কেউ আমার পরিচিত ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের মিছিলের বিবরণ শুনে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্রনেতাই তো প্রথম দিকে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিলের চেষ্টা করেন এবং পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলে নেয়। তাহলে আপনারা মিছিল করলেন কি করে?

উত্তর ঃ প্রথমে গ্রেফতার করে ট্রাকের তুলে নিচ্ছিল ঠিকই। আমাদের যে বাধা দেয় নি তা নয়। তবে আমাদের অত প্রবলভাবে বাধা দেয়নি। একদিকে বাধা দিয়ে আমাদের আটকাবার চেষ্টা করেছে, আমরা অন্যদিক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছি। প্রথমে বিক্ষিপ্ত থাকলেও দেয়াল টপকে বিভিন্ন দিক থেকে ছাত্ররা এসে আমাদের সাথে সংঘবদ্ধ হয়েছে। এরপর রেলওয়ে হস্‌পিটালের মোড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা কোন পুলিশের হামলা বা বাধার সম্মুখীন হইনি।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন তারিখে গ্রেফতার হন?

উত্তর ঃ আমিসহ নয়জনের নামে হুলিয়া জারি হয়। এঁদের মধ্যে অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব অন্যতম। সবার নাম এ মুহূর্তে আমার মনে নেই। আপনি '৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারীর আজাদ বা অন্য পত্রিকা খুঁজলে ৯ জনের নাম পাবেন। আমি ২২শে ফেব্রুয়ারী আলু বাজার থেকে গ্রেফতার হই।

প্রশ্ন ঃ গ্রেফতার করে আপনাকে কোথায় নেয়া হয়?

উত্তর ঃ গ্রেফতারের পর আমাকে সিম্‌সন রোডে আই,বি, অফিসে নেয়া হয়। সেখানে আমাকে ইন্টারোগেশন করা হয়। ৩দিন পর আমাকে কুমিল্লা জেলে

স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার ওপর কোন দৈহিক নির্যাতন হয়েছে কি?

উত্তর ঃ না, কোন দৈহিক নির্যাতন হয় নি?

প্রশ্ন ঃ ইন্টারোগেশনের সময় যে সব স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের অফিসার ছিলেন তাঁদের নাম বলতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ অনেকে ছিলেন। সবাইকে তো চিনি না, সাধারণতঃ স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের এস.পি. ইন্টারোগেট করতেন। অন্যান্যদের মধ্যে ইন্‌সপেক্টর ইউসুফ এবং ডি.এস.পি. আবদুল হাফিজ সাহেবকে (সাপ্তাহিক 'রোববারের' সম্পাদক) দেখেছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

আবদুল মালেক

[জনাব আবদুল মালেক ভাষা আন্দোলনের শহীদ আবুল বরকতের মামা। বরকত ১৯৪৮ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় আসার পর এই মামার বাসায় থেকেই পড়াশুনা করতেন। তখন মামা মালেক সাহেবের বাসা ছিল পুরানা পল্টন লেইনের 'বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে'। মালেক সাহেবের স্ত্রী, অর্থাৎ বরকতের মামী মোহসিনা খাতুন শান্তশিষ্ট স্বভাবের ভাগিনাটিকে খুবই স্নেহ করতেন। '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বরকত মালেক সাহেবের বাসাতেই ছিলেন।

জনাব আবদুল মালেক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। তিনি 'ইণ্ডিয়ান অডিট বিভাগে' চাকুরি করতেন। দেশ বিভাগের (পাকিস্তান-ভারত) পর ১৯৪৭ সালের আগষ্টে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানে' চলে আসেন এবং 'এজিপি'তে একাউন্টস অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। '৫২ সালে বরকত যখন শহীদ হন তখন তিনি একাউন্টস অফিসার। পরবর্তী সময়ে তিনি ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। এরপর দু'বছর ইপি ওয়াপদার ডাইরেক্টর অব অডিট পদে ডেপুটেশনে ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি 'ফুড, এগ্রিকাল্‌চার ট্রেড এবং কমার্সে' ফিনান্সিয়াল এডভাইজার নিয়োজিত হন। ১৯৬০ সালে তিনি ওয়াপদার ডাইরেক্টর অব একাউন্টস-এ যোগদান করেন, এবং এই পদ হতেই ১৯৬৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

মালেক সাহেব দুই ছেলে ও দুই মেয়ের পিতা। বড় ছেলে মহসিন রেজা* বাংলাদেশ আর্মিতে

---

* মহসিন রেজা সামরিক বাহিনীতে কর্তব্যরত অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি বাহিনীর' এক হামলায় নিহত হন।

মেজর। ছোট ছেলে ইউসুফ রেজা বেলজিয়ামে রয়েছেন। ছোট মেয়ে জিনাত আরা স্বামীর সঙ্গে চট্টগ্রামে থাকেন। জিনাত আরার স্বামী ইষ্টার্ণ রিফাইনারীতে কর্মরত। ছোট মেয়ে মাহমুদা ইয়াসমীন ঢাকায় থাকেন। তার স্বামী ষ্টীল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে ডেপুটি একাউন্টেন্ট।

আবদুল মালেক সাহেব বর্তমানে মগবাজার চৌরাস্তার নিকটে ওয়ান/বি আউটার সার্কুলার রোডে বসবাস করছেন। ৭৫ বছর বয়স্ক মালেক সাহেবের সাক্ষাৎকার নিতে গেলে অসুস্থ অবস্থায় বিছানা থেকে উঠে আসেন এবং শহীদ বরকত সম্পর্কে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি যেন সেই ঐতিহাসিক বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘনায়মান সন্ধ্যায় ফিরে যাচ্ছিলেন, যে সন্ধ্যায় তিনি শহীদ বরকতের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। স্ত্রী মোহসিনা খাতুনও আজ বেঁচে নেই। তাই একাই তিনি আজ এ সবের স্মৃতিচারণ করেন।

জনাব আবদুল মালেকের এ সাক্ষাৎকারে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ আবুল বরকতের জীবনের অনেক অজানা তথ্য ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে আমরা জানতে পারবো।]

প্রশ্ন ঃ বরকত কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পুরো নাম কি?

উত্তর ঃ বরকত ১৯২৮ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তার পুরো নাম আবুল বরকত।

প্রশ্ন ঃ বরকতের পিতা-মাতার নাম কি? বরকতের আর কি কোন ভাই-বোন ছিল? ওরা এখন কে কোথায় আছে?

উত্তর ঃ বরকতের পিতার নাম শামসুজ্জোহা এবং মাতার নাম হাসিনা খাতুন। বরকতের আরো এক ভাই ও তিন বোন ছিল। ওর ছোট ভাই-এর নাম ছিল আবুল হাসনাত। সে '৬৭ সালে ১৬/১৭ বৎসর বয়সে অসুখে পড়ে মারা যায়। তিন বোন–শামসুন্নাহার, নুরুন্নাহার ও নূর জাহান। শামসুন্নাহার ঢাকার জয়দেবপুরে থাকে। নূরুন্নাহার মুর্শিদাবাদ থাকে। নূর জাহান বায়ান্ন সালের দিকে জয়কালী মন্দির রোডে থাকতো। ওর স্বামী ঢাকা সিভিল সাপ্লাইতে চাকরি করতো। ওদের বাসায় বরকত প্রায়ই যেতো। নূর জাহান এবং ওর স্বামী এখন কেউ বেঁচে নেই।

প্রশ্ন ঃ বরকত প্রাথমিক পড়াশুনা কোথায় করেন? তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবন কোথায় কাটে?

উত্তর ঃ বরকত প্রথমে তার গ্রামের বাবলা প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা শুরু করে। পরে স্থানীয় তালিবপুর হাই স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে এবং বহরমপুর কৃষ্ণলাল কলেজ থেকে ১৯৪৮ সালে আই.এ. পাশ করে।

প্রশ্ন ঃ বরকত কখন ঢাকায় আসেন? তাঁকে কি আপনিই নিয়ে এসেছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালে বরকত ঢাকায় আসে। ভারতে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার পর ওর বাবা বরকতকে এখানে নিয়ে আসার

কথা বলে পত্র লেখেন। আমি তখন বরকতকে পাঠিয়ে দিতে বলি। ১৯৪৮ সালে বরকত এখানে আসার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি হয়। আমরা তখন পুরানা পল্টন লাইনের 'বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে' থাকি। বরকত আমাদের সাথে এ বাসায় থাকতো। এ বাসা থেকেই সে সাইকেলে ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াত করতো।

প্রশ্ন ঃ ছাত্র হিসেবে বরকত কেমন ছিলেন? স্বভাব প্রকৃতিতে তিনি কেমন ছিলেন?

উত্তর ঃ ছাত্র হিসেবে বরকত ভাল ছিল। পড়াশুনায় খুবই মনোযোগী ছিল। ১৯৫১ সালে সে অনার্স পরীক্ষায় 'সেকেণ্ড ক্লাস ফোর্থ' হয়। এম.এ-তে সে আরো ভালো করবে বলে আশা করতো। আমার ধারণা সে এম.এ-তে আরো ভালো করতো। কারণ, সে পড়াশুনা ছাড়া কোন সময় নষ্ট করতো না। ১৯৫২ সালে সে এম.এ. 'ফাইনাল ইয়ারের' ছাত্র ছিল।

স্বভাব প্রকৃতির দিক দিয়ে বরকত খুবই শান্ত, ভদ্র ও বিনয়ী ছিল। এমন ধীর স্থির ছেলে আর হয় না। কারো সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথাও বলতো না। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে বরকত প্রায়ই সেগুন বাগিচার মাঠে বেড়াতে যেতো এবং সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে পড়তে বসতো।

প্রশ্ন ঃ বরকত কোন ছাত্র সংগঠন বা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল কি?

উত্তর ঃ না, কোন ছাত্র সংগঠন বা রাজনীতির সাথে সে জড়িত ছিল না। রাজনীতি করার মতো ছেলেই সে নয়।

প্রশ্ন ঃ বরকত কোথাও আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বেড়াতে যেতো কি?

উত্তর ঃ আত্মীয়-স্বজন এখানে আর তেমন কেউ ছিল না। ওর বোন নূরজাহানের বাসা ছিল জয়কালী মন্দির রোডে। সে বাসায় যেতো মাঝে মাঝে। ইউনিভার্সিটিতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আবু নাসের ওয়াহিদ। আপনি তাঁর কাছে গেলে বরকত সম্বন্ধে আরো জানতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ ঘটনার দিন, অর্থাৎ '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী কয়টায় বরকত বাসা থেকে ইউনিভার্সিটিতে যান?

উত্তর ঃ ঐ দিন বরকত খুব সকাল সকাল গোসল করে। ওর মামীর সাথে আলাপ করতে গিয়ে বলে, "আজ ইউনিভার্সিটিতে বড় গোলমাল হতে পারে।" ওর মামী বলেন, তবে যাচ্ছো কেন? যেওনা বরকত বলে– "কিছু হবে না, বেশী গোলমাল হলে আমি লাইব্রেরীতে চলে যাবো।"

প্রশ্ন ঃ আপনারা বরকতের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পান কখন? কোথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিল বলে আপনারা শুনেছেন? আপনি কখন বরকতকে দেখতে যান?

উত্তর ঃ বিকেল চারটার দিকে বাসায় খবর আসে। আমি খবর পাই অফিস থেকে ফিরে– পাঁচটায়। শুনি পুলিশের গুলিতে বরকত গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় মেডিকেল হাসপাতালে পড়ে আছে। আমি তক্ষুণি মেডিকেলে ছুটে যাই। কিন্তু পুলিশ বাধা দিচ্ছে দেখে আমি ফিরে আসি এবং আমার পরিচিত স্বাস্থ্য দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারী ডাঃ আবুল কাসেমকে সঙ্গে নিয়ে মেডিকেলে যাই। সেখানে আমার পরিচিত ডাঃ কর্ণেল গিয়াস উদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বরকতকে অপারেশন করেছেন। তিনি আমাকে দেখেই কান্নার স্বরে বলে ওঠেন, 'খুবই দুঃখের বিষয়, অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারলাম না। আহত অবস্থায় ওর মুখে আপনার নাম শুনে আমি তাকে চিনতে পারি।'

আমি বরকতের লাশ নিয়ে আসতে চাইলে পুলিশ জানালো– 'লাশ আমাদের হাতে দেবে না'। এ ব্যাপারে ডাঃ আবুল কাসেম এবং মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী রশিদ সাহেবসহ চেষ্টা করেও বিফল হই। লাশের দায়িত্বে ছিলেন ওবায়দুল্লাহ নামক একজন উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ অফিসার। তিনি জানালেন, দাফনের সময় আত্মীয়-স্বজন সব থাকতে পারবে। আমি বললাম, দাফনের ব্যবস্থা আমরা নিজেরা করবো। 'খয়রাতি' কাফনে বরকতকে দাফন করবো না। পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবী মেনে নেয় এবং আমাদের কাছ থেকে কবরের জায়গা কেনার টাকা এবং কাফনের খরচের টাকা গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ কোন সময় লাশ দাফন করতে নেয়া হয়? দাফনের সময় আপনারা কারা' গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ রাত একটা থেকে দু'টোর মধ্যে লাশ দাফনের জন্য আজিমপুর গোরস্থানে নেয়া হয়। পরিবারের কয়েকজন সদস্য ছাড়া আমার সাথে ছিলেন ডাঃ কাসেম এবং মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ডাঃ হাবীব উদ্দিন। মেডিকেল কলেজ থেকে যাওয়ার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ জীপের ব্যবস্থা করেন।

বরকতের লাশ দাফনের পূর্বে প্রহরারত এক অবাঙ্গালী অফিসার বরকতের লাশ দেখে আমাকে বলেছিলেন, 'এ দুধের বাচ্চাকে মেরে এরা রাজত্ব রাখবে'।

বরকতকে যখন কবর দেয়া শেষ হয় তখন ফজরের আজান শোনা যায়।

প্রশ্ন ঃ বরকতের বাবা-মাকে খবর দেয়া হয়েছিল কি? তাঁরা কবে এসেছিলেন।

উত্তর ঃ তাঁদেরকে টেলিগ্রামে জানানো হয়েছিল। সম্ভবতঃ ২৪/২৫শে ফেব্রুয়ারীতে তাঁরা ঢাকা এসেছিলেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৮০

হাসিনা খাতুন
(শহীদ বরকতের মা)

[দুপুর নাগাদ আমরা জয়দেবপুরে "চন্দনা" গ্রামে শহীদ আবুল বরকতের বোনের বাড়ীতে পৌঁছি। এখানেই বড় মেয়ের বাড়ীতে থাকেন ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদ বরকতের মা হাসিনা খাতুন। ২৮ বছর পূর্বে পুত্র হারাবার সেই বেদনাময় স্মৃতি আজো তিনি ভুলতে পারেন নি। পরিচয়ের প্রথম আলাপে তাই মনে হলো আমরা যেন ইতিহাসের এক অব্যক্ত জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছি।

সঙ্গে ছিলেন বরকতের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঢাকা সিটি ল' কলেজের সহ-অধ্যক্ষ আবু নাছির মোঃ ওয়াহিদ এবং ফটোগ্রাফার সালাম। বিশেষ করে নাসির সাহেবকে দেখে যেন তাঁর সেই পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠেছে আকুল হয়ে। নাসির সাহেব আগে নিয়মিত খোঁজ রাখতেন এখন তেমন রাখতে পারেন না। এ নিয়ে কিছুটা অনুযোগ করলেন তিনি। বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়লেও এখনও শহীদ বরকতের মায়ের কথাগুলো স্পষ্ট রয়েছে।

১৯৭৭ সালে বর্তমান সরকারের পরামর্শক্রমে বরকতের মা হাসিনা খাতুনের নামে জমি বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছিল। '৭৭ সালেই সরকার জয়দেবপুরের দেওড়া মৌজার ১১৯ দাগে এক একর জমি বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু সে জমি বরকতের মা দখল করতে পারেন নি। কারণ, স্থানীয় সুরত আলী নামক জনৈক ব্যক্তি ও তার লোকজন সে জমি দখল করে রাখে। বরকতের জমির বরাদ্দ বুঝে নিতে গিয়ে পরিবারের লোকজনেরা হুমকির সম্মুখীন হন। এই ঘটনার কিছুকাল পর সুরত আলী জমিটির লীজ নেওয়ার পূর্ব সূত্র ধরে সিভিল কোর্টে মামলা করে সরকারী বরাদ্দের উপর ইনজাংশন জারি করায় অদূর ভবিষ্যতেও এই জমি পাওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই।

'৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে বরকত শহীদ হওয়ার পর এই পরিবারটির উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানার জন্য আমরা শহীদ বরকতের মায়ের সংগে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করি। সেই অন্তরঙ্গ আলাপের সংলাপ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।]

প্রশ্ন ঃ বরকতের মৃত্যুর খবর কখন জানতে পারেন?

উত্তর ঃ দু'দিন পর আমরা এ খবর পাই।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কবে ঢাকা এসেছিলেন? কে কে এসেছিলেন?

উত্তর ঃ এক বৃহস্পতিবারে মারা গেছে আরেক বৃহস্পতিবারে রাতে আমরা এসেছি। বরকতের বাবা, খালা কোবরাতুন্নেছা ও বড় মামী খায়রুন্নেসা এবং আমি ঢাকা এসেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ ঢাকায় কতদিন ছিলেন?

উত্তর ঃ দুই তিন মাস ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ এখন কি এখানেই থাকবেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যে কটা দিন বেঁচে আছি– এখানেই কাটিয়ে দেবো।

প্রশ্ন ঃ সরকার আপনাকে বাড়ীর জন্যে জমি দিয়েছিল বলে শুনেছি, সত্য নাকি?

উত্তর ঃ (আবেদা সুলতানার স্বামী জনাব আজহার আলীর দিকে তাকিয়ে) প্রেসিডেন্ট একবার কথা বলতে ডাকলো। ও নিয়ে গিয়েছিলো। জমির জন্যে দরখাস্ত করতে বলায় দরখাস্ত করলাম। কিন্তু যে জায়গা বরাদ্দ করল ও জায়গায় আর আমি যেতে পারলাম না।★

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০

★ '৮১ সালে পুনরায় শহীদ বরকতের মা হাসিনা খাতুনকে অন্য জায়গায় জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে শহীদ বরকতের পরিবার পরিজনদের 'মেসার্স বরকত রাইস এণ্ড ফ্লাওয়ার মিল' নামে একটি মিল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই বরাদ্দকৃত জমিতে বরকতের মায়ের কবর রয়েছে। তিনি '৮২ সালের ২০শে এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।

আবু নাসের মোঃ ওয়াহিদ

[জনাব আবু নাসের মোঃ ওয়াহিদ ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বরকত এবং তিনি একই ক্লাশে পড়াশোনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আবু নাসের ওয়াহিদকে বরকতের একমাত্র বন্ধু বললে অত্যুক্তি হবে না।

আবু নাসের ওয়াহিদ ১৯২৮ সালে কুমিল্লা জেলায় মতলব থানার ছেঙ্গার চরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোঃ আবদুর রহিম। গ্রামের মক্তব হ'তে প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করে তিনি ১৯৪৩ সালে স্থানীয় ইমামপুর পল্লীমঙ্গল হাইস্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

১৯৪৮ সালে তিনি ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ হ'তে আই.এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে তিনি অনার্স পাশ করেন। ১৯৫২-৫৩ সালে তিনি এম.এ. পাশ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ল'তে ভর্তি হন। ১৯৫৬ সালে তিনি ল' পাশ করেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে তিনি ৬ মাস দৈনিক সংবাদে সাংবাদিকতার কাজ করেন। ১৯৫৯ সালের আগষ্টে তিনি সিটি ল' কলেজে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সিটি ল' কলেজের সহ-অধ্যক্ষ।]

প্রশ্ন ঃ বরকতের মামা আবদুল মালেক সাহেবের সাক্ষাৎকারে জানতে পারলাম বরকত খুবই শান্ত ও বিনয়ী প্রকৃতির ছেলে ছিল। কারো সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাও বলতো না। আপনার সাথে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হলো কিভাবে?

উত্তর ঃ মামা ঠিকই বলেছেন, ও খুবই শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। আমার সাথে তার প্রথম আলাপ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে। ওকে একা একা পড়তে দেখে আমিই এগিয়ে বলি, এভাবে শুধু একা একা পড়লে চলবে না কিছু আলাপ-আলোচনারও প্রয়োজন আছে। এভাবে পরিচয়ের পালা শেষ হলে সেও পড়াশোনার ব্যাপারে একজন সহযোগী বন্ধু পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সে জানালো, এখানে কারো সাথে তার তেমন পরিচয় নেই। এসব কথাবার্তার পর সে আমার হলের রুম নাম্বার জানতে চাইলো। আমি তাকে ইকবাল হলের রুম নাম্বার দিলাম। আমি তখন ইকবাল হলের ব্যারাকে ৩/৪ নাম্বার রুমে থাকতাম।

প্রশ্ন ঃ বরকত সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ অধ্যাপক রাজ্জাকের পরিবেশিত তথ্য কাল্পনিক অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জাতীয় শহীদের নামে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আজগুবী তথ্য সৃষ্টি বড়ই নিন্দনীয় কাজ। বরকতকে যাঁরা জানেন তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন– বরকত সে প্রকৃতির ছেলেই নয়।

প্রশ্ন ঃ বরকত প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক বা ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল কি?

উত্তর ঃ না, প্রত্যক্ষভাবে সে কোন রাজনৈতিক বা ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল না। রাজনীতির সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও একজন সচেতন যুক্তিবাদী ছাত্র ছিল।

প্রশ্ন ঃ বরকত কোথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিল?

উত্তর ঃ কাঁদানে গ্যাস থেকে রক্ষা পেতে বরকত মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে ১ নম্বর শেডের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিশের নিক্ষিপ্ত গুলি এসে তার উরুতে লাগে। ছাত্ররা ধরাধরি করে তাকে ইমারজেন্সীতে নিয়ে যায়। ডাঃ কর্ণেল গিয়াস উদ্দিনের অপারেশন এবং অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অধিক রক্তক্ষরণের ফলে তার মৃত্যু ঘটে।

প্রশ্ন ঃ রাতে আপনি কি বরকতের দাফনে শরীক হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ না, তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এছাড়া লাশতো পূর্বাপর পুলিশের হেফাজতে ছিল। মামা আবদুল মালেকসহ পরিবারের সদস্য, ডাঃ কাশেম, ডাঃ হাবীব উদ্দিন ছাড়া আর বাইরের কেউ ছিলেন না বলে মামার কাছে শুনেছি।

প্রশ্ন ঃ এরপর আপনি 'বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে' গিয়েছিলেন কি?

উত্তর ঃ ২৪/২৫শে ফেব্রুয়ারী আমি 'বিষ্ণুপ্রিয়া ভবনে' যাই। শহীদ বরকতের মা

আসার পর প্রায় একমাস আমাকে নিয়মিত সেখানে যেতে হতো।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ঢাকা ডাইজেস্টের বিশেষ সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ ইতিহাসের স্বার্থে এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন রয়েছে। এতে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০

আবুল হোসেন মিয়া

[জনাব আবুল হোসেন মিয়া '৪৬–'৪৯ সালে ঢাকায় এবং '৫২ সালে রংপুরে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

'৪৯ সালে লিয়াকত আলী খানের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফরের প্রাক্কালে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ হ'তে সিরাজদ্দৌল্লাহ পার্কের মিটিং শেষে লিয়াকত আলী খানের নিকট যে ডেপুটেশান মিছিল যায় তিনি তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত ৯ সদস্য বিশিষ্ট আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম সদস্য (উত্তর বঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি)।

জনাব আবুল হোসেন মিয়া '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রংপুরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রংপুর সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভাপতি ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার কারণে অবশ্যই গ্রেপ্তার করার জন্য ঢাকা হ'তে ৭ জনের যে তালিকা সংশ্লিষ্ট পুলিশ বিভাগকে পাঠানো হয়– তিনি ছিলেন সে তালিকার পহেলা নম্বরে। কিন্তু তিনি গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করেন।

জনাব আবুল হোসেন মিয়া ১৯১৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর রংপুরে জগদীশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মনিরউদ্দিন মোক্তার। জনাব হোসেন স্থানীয় মমিনপুর এম,ই, স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। রংপুর জেলা স্কুল হ'তে তিনি ১৯৩৮ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৪২ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ হ'তে আই,এ, পাশ করেন। বি,এ, পরীক্ষার প্রস্তুতি সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে পরীক্ষা দেয়া হয়নি।

জনাব আবুল হোসেন মিয়া স্কুলজীবন থেকেই ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৬

শহীদ বরকত তারকা চিহ্নিত ছবিগুলো শহীদ বরকতের মামাতো বোন জিনাত আরার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা দাবী করিয়া ছাত্রবিক্ষোভ

ঢাকায় ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ্জ: হক সাহেবসহ ৫০ জন আহত

সরকারী অফিসসমূহে পিকেটিং ও কর্ম্মচারীদের অফিস ত্যাগ

ঢাকা, ১১ই মার্চ। অদ্য ঢাকায় বিভিন্ন সরকারী অফিসের সম্মুখে পুলিশের লাঠিচালনার ফলে বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক সহ প্রায় ৫০ ব্যক্তি আহত হইয়াছেন। পূর্ব-পাকিস্তান মোছলেম ছাত্রলীগের রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটির ঘোষিত সাধারণ ধর্মঘট হইতে পুলিশ লাঠি চালনা করিয়াছিল। মোছলেম ছাত্রলীগ বাংলা ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও সমগ্র পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য করার দাবী করিয়া ধর্মঘট ঘোষণা করিয়াছিল।

শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে আহত ব্যক্তিগণকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং জনাব এ. কে. ফজলুল হক ও অন্যান্য কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে অনেককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

মুসলমান ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া অতি প্রত্যুষে সেক্রেটারীয়েট, হাইকোর্ট, টেলিগ্রাফ অফিস, রেলওয়ে পোষ্ট অফিস, ইনকাম ট্যাক্স অফিস ও অন্যান্য সরকারী অফিসের সম্মুখে পিকেটিং করিতে থাকেন।

অফিস আর বসিবার সময় ... উপস্থিত হয় এবং সেক্রেটারীয়েট ভবনের সম্মুখে পিকেটারদের ...

১৯৪৮ সালের ১৩ই মার্চের আনন্দবাজার পত্রিকায় ১১ই মার্চের রিপোর্ট।

Regd No. D A. 62.

নওবেলাল

বিশেষ সংখ্যা

ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিবর্ষণ

রাজধানীর মাটিতে ছাত্র শিশু ও কিশোরের শোণিতপাত

শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ শহরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন

পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পদত্যাগ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

[illegible]

আজাদের কথা

[illegible]

—আজাদ

মর্নিং নিউজ প্রেস ভস্মীভূত

[illegible]

'নওবেলাল' পত্রিকার [illegible] ফেব্রুয়ারী সংখ্যা

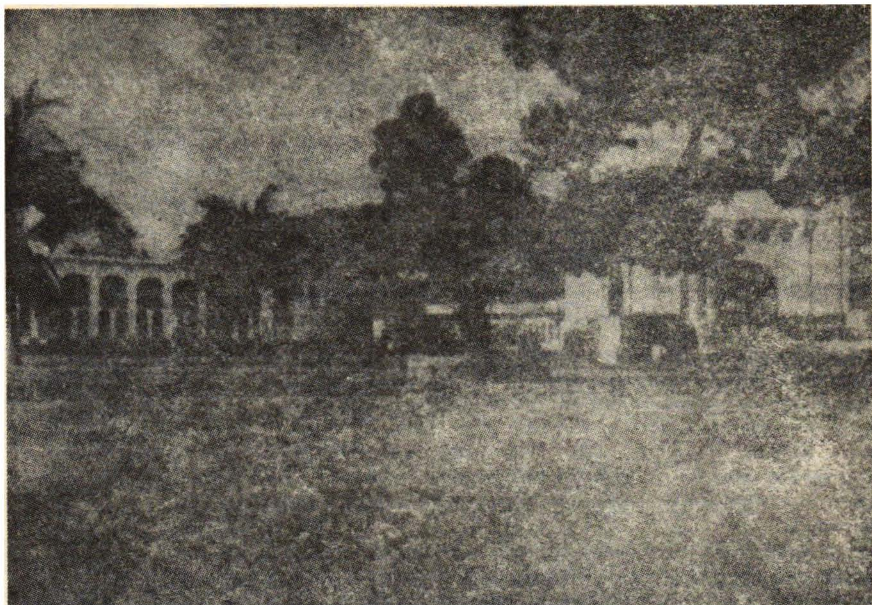

ঐতিহাসিক আমতলা। ছবি: রফিকুল ইসলাম খান

'৫৩ সালের একুশের মিছিল। ছবি: মোহাম্মদ সুলতানের বড় মেয়ে সুস্মিতা
সলতানার সৌজন্যে প্রা

শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত

রক্তাক্ত ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ণ বিবরণ

শহীদদের ডাকে প্রতিটি মানুষ সংগ্রামে আগাইয়া আসিয়াছে

ঢাকার অবস্থা

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে ঢাকায় হরতাল প্রত্যাহার করে। স্কুল, কলেজে ধর্মঘট অব্যাহত আছে। রাত্র ১০টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত কারফিউ বলবৎ আছে। প্রত্যহই ধরপাকড় চলিতেছে। ছাত্রাবাসগুলি বন্ধ করিয়া দিবার ফলে বহু ছাত্র ঢাকা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মফঃস্বলের অবস্থা

মফঃস্বলের প্রত্যেক জিলা, মহকুমা, শহর, হাট-বাজার, গ্রাম অঞ্চলে ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে হরতাল, শোভাযাত্রা, ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাস্তাঘাটে, হাটেমাঠে, চায়ের দোকানে, ষ্টীমার-রেলে সর্বত্রই এই শোচনীয় দুর্ঘটনা নিয়া সমালোচনা ও বিক্ষোভের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। রেলগুলি থামাইয়া বিক্ষুব্ধ জনতা নানা পোষ্টার লাগাইয়া দিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে।

বিভিন্ন ছাত্রাবাসে পুলিশের হামলা

সলিমুল্লা হল

ঢাকার সলিমুল্লা মুসলিম হলে বহু পুলিশ হলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকটি কামরা তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাশী করে। এই তল্লাশী প্রায় ৬ই ঘন্টাকাল চলে। পুলিশ ১৮ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। মুসলিম হলের হাউস টিউটর ডাঃ মফিজুদ্দিন আহমদকেও পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার, মুসলিম হলের প্রভোষ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে তল্লাশীর সময় হলে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মিঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও অধ্যাপক মুনির চৌধুরী ও ডাঃ পি. সি. চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে।

মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল

ঢাকার মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে পুলিশ তল্লাশী চালায়। হোষ্টেলের প্রত্যেকটি কামরাই তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাশী করে। এবং পুলিশ ১০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

জনাব আউয়াল গ্রেপ্তার

বিশিষ্ট ছাত্র ও যুব কর্মী জনাব আবদুল আউয়াল গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে গ্রেফতার হইয়াছেন। তিনি দেশের প্রত্যেকটি আন্দোলনেই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বেও তিনি কয়েকবার জেল বরণ করেন।

চট্টগ্রামে ধরপাকড়

চট্টগ্রামের এক খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি চট্টগ্রামের ভাষা আন্দোলনের ১২ জন বিশিষ্ট কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে এবং বহু গৃহে পুলিশ তল্লাশী চালাইয়াছে।

শেখ মজিবর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদের মুক্তিলাভ

পূর্ব-পাক আওয়ামী মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী শেখ মজিবর রহমান বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। জনাব রহমান ১৯৫০ সালে নিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। কয়েক মাস যাবত তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে কিন্তু সরকার ঢাকার অজুহাতে তাঁকে পুনরায় জেলে প্রেরণ করে। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে জীবন বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা আমরণ অনশন শ্রেয় মনে করিয়া মিঃ রহমান বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে অনশন শুরু করেন। দেশময় ইহার দারুণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া সরকার জনাব রহমানকে মুক্তি দিয়াছেন। বর্তমানে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। ফরিদপুর জেল গেটে ২ সহস্র ছাত্র তরুণ নেতা মজিবরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। মুক্তি পাইয়াই জনাব রহমান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিসে তারযোগে খবর পৌঁছান এবং ঢাকার শোচনীয় দুর্ঘটনায় জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি স্বাস্থ্যের কারণে বর্তমানে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

শেখ মজিবর

মহিউদ্দীন

পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী, পাকিস্তান সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা জনাব মহিউদ্দিন আহমদও ২৮শে ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি লীগ-শাহীর দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় কয়েক মাস পূর্বে 'নিরাপত্তা আইনে' গ্রেফতার হন। জেলে তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনিও শেখ মজিবর রহমানের সঙ্গে আমরণ অনশন শুরু করেন। মিঃ মহিউদ্দিনের অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ। জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই তিনি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ অফিসে এক তার বার্তা প্রেরণ করেন এবং ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনাবলীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে, শীঘ্রই চিকিৎসার জন্য তিনি ঢাকা আগমন করিতেছেন।

বাংলা ছা... বাদীতে বক্তা ... ও শোভাযাত্রা ... কর্তারা এই ... জনসাধারণের ... বিতরণ করে এ... জাতীয় ... ছাত্রা ... বিতাড়িত করে ... প্রত্যেক ... দোকান পাট ... পালন করে ... লীগ সভাপতি ... উদ্বুদ্ধ ক... উকিলের ... ছাত্র ও জনসাধ... বাড়ি বাড়ি ... এ বিরাট ... বাদীতে বিভি... সম্পাদক ... জনাব ... ঢাকার দুর্ঘট... পৌঁছায় শহরে...

ঢাকায় ... গুলি চালনা... সাধারণ ... এবং এক ...

... ... এক ... উপর ... কর...

চট্টগ্রাম ... সর্বাবস্থায় ... ছাত্রগণ ... সরকারের ... এবং ... সভাপতিত্বে ... অনুষ্ঠিত ...

ইয়ার মহাম্মদ খান কর্তৃক পাইওনিয়ার প্রেস লিঃ ৮, হাটখোলা রোড, ঢাকা হইতে মুদ্রিত ও ৯৪নং নবাবপুর রোড হইতে প্রকাশিত।

'৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী গুলি বর্ষণের সংবাদ নিয়ে ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত দৈনিক আজাদের [illegible] 'চিত্রালী'র সৌজন্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও বহু ছাত্র গ্রেফতার

মেডিকেল হোস্টেলে নির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের বিলোপ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) প্রায় বেলা আড়াই ঘটিকায় সলিমুল্লা মুসলিম হলে খানাতল্লাশী হয়। বহু পুলিশ হলের দরজায় প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকটি কামরা তল্লাশী করে। এই তল্লাশী প্রায় দুইঘণ্টা যাবৎ চলে। পরে অনুমান ৩০ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

প্রথম শহীদ বার্ষিকীতে রাজধানী ঢাকার বুকে ঐতিহাসিক গণজাগরণ

সৈনিক

বাংলা হরফের উপর কোন পশ্চাৎগামী হামলা বরদাশত করা হইবে না

আজাদ

...ংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব

মেডিক্যাল হোস্টেলে নির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের বিলোপ

পুলিশ কর্তৃক প্রথম শহীদ মিনার ভেঙে দেয়ার সংবাদ নিয়ে '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর আজাদ

বিষ্ণু প্রিয়া ভবন : শহীদ বরকত এ বাড়িতেই তাঁর মামার সঙ্গে থাকতেন। বায়ান্নর একুশের সকালে এ বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি আর ফিরে আসেননি।

ঢাকায় নিরীহ ও নিরস্ত্র ছাত্র এবং জনতার উপর অমানুষিক ভাবে গুলী চালনার প্রতিক্রিয়ায় দিকে দিকে গণ-দাবানল

নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী :: [illegible] শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী :: [illegible] শাস্তিদাবী :: [illegible] আটক বন্দীদের মুক্তির দাবী

[illegible]

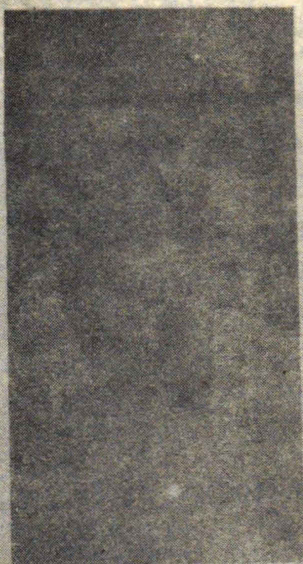

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

আনোয়ারা খাতুন।

ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী

এক মাসের জন্য সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গতকল্য (বুধবার) ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আদেশ জারীর কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে, একদল লোক শহরে

প্রথম ভাষা-আন্দোলনের দলিল

[illegible] সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে সংবাদ পত্রে প্রকা-
[illegible] হইয়াছিল। ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন :—

[illegible] এবং সংগ্রাম কমিটির কনভেনার ও [illegible]
তমদ্দুন মজলিস কর্মী)

[illegible] কাসেম (ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা)

[illegible] খাঁ (ঢাকা ইউনিভার্সিটি

[illegible] রহমান, কবির (ঐ)

[illegible]

[illegible] (ছাত্র [illegible] ইংরেজীর সঃ)

[illegible] (ছাত্র)

[illegible] (ছা[illegible] এখন এডভোকেট)

[illegible] (ছাত্র

এবং আরও কয়েকজন

বিজ্ঞপ্তির নকল :—

"আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা যেন বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য আগাইয়া আসেন। আমাদের মাতৃভাষাকে কোনঠাসা করার জন্য যে একটি দুষ্ট [illegible] চলিতেছে—তার [illegible] আমাদের এখন হইতে [illegible] পড়িয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় [illegible] এ ব্যাপারে যথাযথ [illegible] আমরা এ বিষয়ে [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। [illegible] উচিত বাংলা [illegible] আন্দোলন [illegible] বাংলা ভাষা যথাযোগ্য স্থান [illegible]।

[illegible] আমরা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার্থীদের সহানুভূতি [illegible]। সমস্ত প্রদেশ ব্যাপী আন্দোলন করিতে [illegible] অর্থের দরকার। বাংলা ভাষার প্রচার করিতে [illegible] অনেক আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে [illegible] একটি বাংলা ভাষা প্রচার [illegible]। এই কাজে [illegible]

প্রকাশক [illegible]

[illegible] "বাংলা [illegible]"

[illegible]

১৯৫৩ সালের দৈনিক পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত ভাষা আন্দোলনের একটি দলিল।

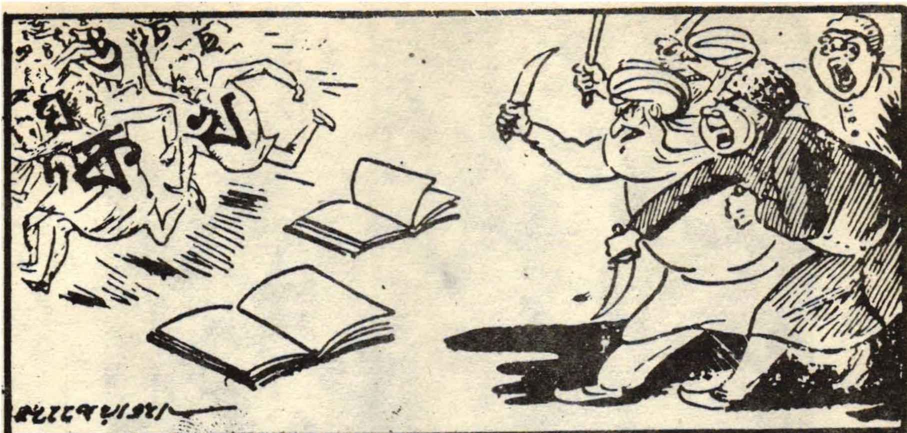

হরফ-খেদা অভিযান : শিল্পী কাজী আবুল কাসেমের অংকিত কার্টুন।
: 'নিরীক্ষা'র সৌজন্যে।

নও-বেলাল

৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, সিলেট, বৃহস্পতিবার, ২৪শে মাঘ, ১৩৫৮বাং ; 7th February 1952 বার্ষিক—৮৲

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ঢাকায় দশ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর শোভাযাত্রা

রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্ব্ব-দলীয় কর্ম্ম পরিষদ গঠিত

উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা এবং আরবী অক্ষরে বাংলা-ভাষা প্রচলন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ গত সোমবার ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং শহরের সকল স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণ ধর্মঘট করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে।

উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া পাক-উজিরে আজম খওয়াজা নাজেমউদ্দিন ঢাকা পল্টন ময়দানে যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদে সারা পূর্ব্ব পাকিস্তান ব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে এ সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক সর্ব্বদলীয় কর্মী সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মানিয়া লইবার জন্য সম্মেলনে জোর দাবী জানানো হইয়াছে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রায় ৪০ জনের উপর সদস্য লইয়া একটী শক্তিশালী কর্মপরিষদ গঠিত হইয়াছে।

খাওয়াজা নাজেমউদ্দিনের সাফা[i]

পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর উজি[রে] আজম জনাব খাওয়াজা নাজেমউদ্দীন [করাচী] ফেরত যাত্রা ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মে[লনে] বলেন যে, তিনি পল্টন ময়দানের বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব কো[ন] মতামত প্রকাশ করেন নাই। তিনি শুধু কায়েদে আজমের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পা[কিস্তান গণপরিষদ]ই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার অ[ধিকারী]

—০—

যুবলীগ কর্তৃক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন

(নিজ সংবাদদাতা)

ঐতিহাসিক আমতলায় দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করছেন
জনাব গাজীউল হক (ডানে)

সালে তিনি অল বেঙ্গল মুসলিম ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৮ সালে সর্ব ভারতে প্রথম গঠিত মুসলিম ছাত্র সংগঠন অল ইণ্ডিয়া মুসলিম ষ্টুডেন্টস ফেডারেশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি উক্ত সংগঠনের রংপুর জেলার সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯৪১ সালে তিনি রংপুর মহকুমা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে উত্তর বঙ্গের মুসলিম লীগের অর্গানাইজার নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচনের সময় তিনি উত্তর বঙ্গের 'নির্বাচনী ক্যাম্পের' ওয়ার্ক-ইন-চার্জ ছিলেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৪৯ থেকে '৫৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের রংপুর জেলার সেক্রেটারী ছিলেন। '৫৪ সালে তিনি যুক্ত ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রংপুর থেকে এম,পি, এ, নির্বাচিত হন। তিনি যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক সরকারের পলিটিক্যাল সেক্রেটারী ছিলেন।]

প্রশ্ন ঃ আপনি '৪৮ সালে তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা কর্ম তৎপরতার সাথে জড়িত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ তমদ্দুন মজলিসের সাথে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। তবে রাষ্ট্রভাষার দাবী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমি বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলাম। বিশেষভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের প্রারম্ভ থেকে আমরা সাংগঠনিকভাবে রাষ্ট্র ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে জড়িত ছিলাম। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের জন্য যে সব প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় তার সব ক'টিতে আমি প্রস্তুতি কমিটির সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। উক্ত প্রস্তুতি সভাগুলিতে আমিই ছিলাম উত্তর বঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ঃ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে এই প্রস্তুতি সভার সদস্য হিসেবে আর কারা উপস্থিত থাকতেন?

উত্তর ঃ মোট নয় জন এই প্রস্তুতি সভার সদস্য ছিলেন– (১) মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, (২) জনাব আতাউর রহমান খান, (৩) শামসুল হক, (৪) মরহুম আজিজ আহমদ, (৫) আলমাস আলী, (৬) শওকত আলী, (৭) ইয়ার মোহাম্মদ খান, (৮) শামসুল হুদা এবং (৯) আমি।

প্রশ্ন ঃ আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়ে উল্লেখযোগ্য তৎপরতাগুলি কি ছিল?

উত্তর ঃ '৪৯ সালের একটি উল্লেখযোগ্য তৎপরতার কথা মনে পড়ছে। তখন লিয়াকত আলী খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সফর করছিলেন। সিরাজদ্দৌল্লা

পার্কে আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রথম রাষ্ট্রভাষার দাবীসহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দাবী নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল লিয়াকত আলী খানের নিকট যাওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। পরে শেখ মুজিব সহ অন্যান্যদের মতের চাপে প্রতিনিধি দলের পরিবর্তে জনসভা শেষে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল রাষ্ট্র ভাষার দাবী সহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দাবী নিয়ে লিয়াকত আলী খানের নিকট রওয়ানা হয়। রাষ্ট্রভাষা সহ অন্যান্য দাবীর সমর্থনে শ্লোগান দিয়ে মিছিল এগিয়ে যায়। ফুলবাড়িয়া স্টেশনের নিকট পৌঁছলে পুলিশ মিছিলকে প্রতিরোধ করে, পুলিশ মিছিলে টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ করে। মিছিল হ'তে মাওলানা ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিবসহ অনেকে গ্রেপ্তার হন। পরে আর কোন প্রতিনিধি দল লিয়াকত আলী খানের নিকট যেতে পারেনি।

প্রশ্ন ঃ এ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি ছিল?

উত্তর ঃ আমাদের মতে একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়ে গেলে ভাল হতো। সন্ধ্যার পর ১৫০, মোগলটুলীতে পার্টির মিটিং বসে। মিটিং-এ সমালোচনা করে সবাই বলে এভাবে সিদ্ধান্তহীনভাবে মিছিল নিয়ে ব্যর্থ হওয়ার কোন মানে হয় না। অনেকে শেখ মুজিবসহ ব্যর্থ মিছিলকারীদের উদ্দেশ্যহীন 'গোঁয়ার্তুমী'র সমালোচনা করে। অবশ্য পরবর্তী সময় আমরা আওয়ামী মুসলিম লীগের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষার দাবী প্রতিষ্ঠার সব প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ বায়ান্নের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আপনি কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি তখন রংপুর আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারী এবং সাংগঠনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। এ ছাড়া সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের রংপুর জেলার সভাপতির দায়িত্বও আমার ওপর অর্পিত ছিল।

প্রশ্ন ঃ ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা রংপুরে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে?

উত্তর ঃ রংপুরে আমরা পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রভাষার দাবীতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে তৎপর ছিলাম। ঢাকায় ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ, ছাত্রহত্যা এবং গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২২ কি ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিক্ষুব্ধ জনতার এক বিশাল প্রতিবাদ সভা রংপুর টাউন হলের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। আমি উক্ত সভার সভাপতিত্ব করি। রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়ে গণ আন্দোলন গড়ে উঠলেও কেউ কেউ দলীয় স্বার্থে এ আন্দোলনকে ব্যবহার করতে লিপ্ত হয়। তাদের কেউ অস্ত্রের মাধ্যমে নূরুল আমিন সরকারকে উৎখাতের হুমকি দেয়। আমি সুস্পষ্টভাবে বলি, জনতাই আমাদের অস্ত্র-স্বৈরাচারী সরকারকে ব্যালেটের মাধ্যমে কবর দিবে। যে গণ

আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে তাকে দাবিয়ে রাখা কোন স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ঢাকা থেকে গ্রেপ্তারের যে ৭ জনের তালিকা পাঠানো হয়েছিল তাতে পহেলা নম্বরে আমার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসন তৈরী করেছিল আরো ২১ জনের তালিকা। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে আমি আত্মগোপন করে গ্রেপ্তার এড়াই। এই আত্মগোপনের সময় রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ায় আমার সাংগঠনিক তৎপরতা চলতে থাকে। পরিশেষে আমি ঢাকা আসি।

প্রশ্ন ঃ ঢাকায় কি উদ্দেশ্যে এলেন?

উত্তর ঃ ঢাকার ৯৭, নবাবপুর দলীয় অফিসে আসি দলীয় সিদ্ধান্ত জানার জন্য। ইতিপূর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের সব নেতাই গ্রেপ্তার হন। তখন অধ্যাপক কামরুজ্জামানকে অফিস ইন-চার্জের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু পরে অধ্যাপক কামরুজ্জামানের সাথে আই.বি-র যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। তাই আওয়ামী মুসলিম লীগের একজন অফিসিয়েটিং সেক্রেটারীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ সম্পর্কে সম্ভবতঃ ২৭/২৮শে মার্চের দিকে দলের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ঃ তখন কি আওয়ামী মুসলিম লীগের কোন নেতাই বাইরে ছিলেন না?

উত্তর ঃ কিছু নেতৃবৃন্দ বাইরে ছিলেন। যেমন– মরহুম সালাম খান, আতাউর রহমান খান, শামসুদ্দীন আহমদ (কোলকাতা সোহরাওয়ার্দী ক্যাবিনেটের মন্ত্রী ছিলেন) এবং আলী আহমদ (কুমিল্লা হ'তে নির্বাচিত এম.এল.এ) প্রমুখ। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ আমাকে অফিসিয়েটিং সেক্রেটারীর দায়িত্ব নেয়ার কথা বলা হয়। আমি একটু ভেবে শেখ মুজিবের নাম করি। কিন্তু শেখ মুজিবকে অফিসিয়েটিং সেক্রেটারীর দায়িত্ব দিতে কেউ রাজী হল না।

প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিব কি তখন জেলের বাইরে? তিনি তো দলের জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁকে অফিসিয়েটিং সেক্রেটারীর দায়িত্ব দিতে কি আপত্তি ছিল? আর আপনি বা কেনো ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিজে গ্রহণ না করে শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব করলেন? শেখ মুজিবের সাথে আপনার সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ এক সংগে অনেকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। হ্যাঁ, শেখ মুজিব তখন সবেমাত্র জেল থেকে বেরিয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি মার্চের ১৫/২০ তারিখের দিকে মুক্তি পান।

প্রশ্ন ঃ আপনার কথার মধ্যে আরেকটি প্রশ্ন করতে হচ্ছে– তিনি গ্রেপ্তার হন কবে?

উত্তর ঃ তিনি বায়ান্নর আন্দোলনের অনেক আগে গ্রেপ্তার হন। বায়ান্নর আন্দোলনের সাথে তাঁর গ্রেপ্তারের কোন সম্পর্ক নেই। যখন বায়ান্নর আন্দোলনের জন্যে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কাউকে বা হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে– তখন শেখ মুজিব জেল থেকে ছাড়া পান।

এবার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক– যেহেতু শেখ মুজিব জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন সুতরাং তাঁরই অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী হওয়ার কথা। কিন্তু কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন সাহেব বললেন, "ও জেল থেকে বেরিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় ওর দ্বারা দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।"

সালাম খান বললেন, "ও যে হামবাগ, ওর দ্বারা চলবে না। ও শুধু ভায়োলেন্স করবে।" আতাউর রহমান সাহেব আমাকে বললেন, "তুমিই চার্জ নাও।" আলী আহমদ সাহেবও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি এত সমালোচনা শুনে শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব করলেন কেন? তাঁর সাথে আপনার কোন বিশেষ সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা ছিল কি?

উত্তর ঃ বিশেষ সম্পর্ক আর ঘনিষ্ঠতা যাই কিছু বলুন, কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় থেকে মুজিবের সাথে পরিচয়। সে অনেক পুরনো কাহিনী। কুষ্টিয়াতে তখন নাজিমুদ্দীনের সমর্থক ছাত্র সংগঠন শাহ আজিজ (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী) গ্রুপের নিকট 'অল বেঙ্গল মুসলিম ষ্টুডেন্টস লীগে'র নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ ছাত্র সংগঠন পরাজিত হয়। সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের ছাত্রনেতা ছিলেন নূরুদ্দীন (গ্রীন এণ্ড হোয়াইট কোম্পানীর মালিক)।

কোলকাতায়ও এই গ্রুপের ছাত্রদের মধ্যে শক্রতা চলতে থাকে। কোলকাতায় শাহ আজিজ গ্রুপের ছাত্ররা নূরুদ্দীন গ্রুপের ওপর প্রায়ই হামলা চালাতো। শাহ আজিজ গ্রুপে হামলাবাজ ছাত্র বেশী ছিল বলে নূরুদ্দীন গ্রুপ পেরে উঠত না। এদের দলে শুধু কিউ.জি. আজমিরী ছিল একটু সাহসী। তাই দুর্বল সোহরাওয়ার্দী সমর্থক নূরুদ্দিন ছাত্র গ্রুপকে শক্তিশালী করার জন্য আবুল হাশিম সাহেবের পরামর্শক্রমে গোপালগঞ্জ হ'তে শেখ মুজিবকে এনে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি করে দেয়া হয়। এতে সোহরাওয়ার্দী সমর্থক নূরুদ্দীন ছাত্র গ্রুপ বেশ শক্তিশালী হয়।

তখন থেকে শেখ মুজিবের সাথে আমার পরিচয়। আমি ভেবেছিলাম বিভিন্ন কারণে মুজিব জেল খেটে তখন একটু নাম করেছে। তখন সরকারের জেল-জুলুম যার ওপর পতিত হতো জনগণ তার ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে পড়তেন। আমরাই

দলীয়ভাবে শেখ মুজিবকে অন্যায়ভাবে জেলে আটকে রাখার জন্য প্রতিবাদ সভা করেছি, ফলে ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তুলনামূলকভাবে আমরা আরো অপরিচিত ছিলাম। দলকে সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ ধরনের পরিচিতির প্রয়োজন। এসব কথা ভেবেই আমি শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব করি এবং আমাকে ভাববার সময় দেওয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক কয়েকদিনের জন্য মুলতবী রাখার অনুরোধ করি। আমার অনুরোধ রক্ষিত হয়। এদিকে আমি গোপালগঞ্জে মুজিবের কাছে তাড়াতাড়ি ঢাকায় আসার জন্যে চিঠি লিখে দিই। পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী হিসেবে শেখ মুজিবের নাম আমিই প্রস্তাব করি। আমার প্রস্তাবের পর সামনাসামনি আর কেউ বিরোধিতা না করায় শেখ মুজিবই আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৮০

ডাঃ সাঈদ হায়দার

[ডাঃ সাঈদ হায়দার ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বভাবতঃই ডাঃ হায়দার আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় ডাঃ সাঈদ হায়দার বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল্‌স কর্পোরেশনের চীফ মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী সদরউদ্দিন আহমদ তদানীন্তন বেঙ্গল সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ও কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হতে এম-বি,বি-এস, ডিপ্লোমা লাভ করেন। পরে ১৯৫৮ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক হেল্‌থে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন। অতঃপর তিনি পি, আই, ডি, সি-তে মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। প্রমোশন পেয়ে ক্রমে তিনি ই, পি, আই, ডি, সি-র চীফ মেডিকেল অফিসার পদে উন্নীত হন। পরবর্তী ১৯৮৩ সালে বি, টি, এম, সি'র চাকুরী থেকে অবসর নেন।

তিনি 'রোগ নিরাময়–সুস্থ জীবন' এবং 'সুন্দরী হতে হলে'–নামে বহুল প্রশংসিত দু'টি গ্রন্থের রচয়িতা। সম্প্রতি বাংলা একাডেমী তাঁর লেখা 'লোকসমাজ চিকিৎসা বিজ্ঞান' বৃহদাকার বইটি তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছে। ডেভিডসনের চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠ্য পুস্তকের তিন খণ্ড অনুবাদ গ্রন্থের সম্পাদকদের মধ্যে তিনিও অন্যতম। এ ছাড়া 'পপুলার সাইন্সের' ওপর তাঁর অনেক লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বার্ষিক 'প্রেসক্রাইবার্স গাইড'–নামে একটি চিকিৎসা ম্যাগাজিন তিনি দীর্ঘদিন থেকে সম্পাদনা করে আসছেন।

ডাঃ সাঈদ হায়দারের এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের কিছু তথ্য জোগাবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় আপনি কি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তখন আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে শেষ বর্ষের ছাত্র।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন? তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংখ্যা কত ছিল? আপনি কি মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলেই থাকতেন?

উত্তর ঃ ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় কোলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এসে ভর্তি হই। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে এই কলেজে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পড়াশোনা চলছিল। তাই কলকাতা থেকে সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এখানে আসা সম্ভব হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের জন পঞ্চাশেক ছাত্র যারা বিপুল আশায় বুক বেঁধে কোলকাতা থেকে চলে এলাম, তাদেরও বাসস্থানের সমস্যা দেখা দিল। আমরা বাইশজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রী এলাম, যাদের প্রথম এম-বি,বি-এস, পরীক্ষা অত্যাসন্ন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের তখন কোন নিজস্ব হোষ্টেল ছিল না। সলিমুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল, ঢাকা হল প্রভৃতি ছাত্রাবাসে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো। কোলকাতা ও পশ্চিম বাংলা থেকে আগত হাজার হাজার সরকারী কর্মচারীর মত, সরকার সদ্য আগত মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের থাকার জন্য পুরাতন পলাশী ব্যারাকে একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দেন। আহসানুল্লাহ কারিগরী স্কুল ও কলেজের সুদৃশ্য পুরাতন হোষ্টেলের দক্ষিণের রেলক্রসিং এর ওপারে সেই বাঁশের ব্যারাকটির অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু ৪৭ সালের শেষের দিকে সেই উত্তেজনার দিনগুলোতে এই বাঁশের ব্যারাকটি ছাত্রদের রাতদিন পড়াশোনা আর সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের আলোচনায় মুখর থাকতো। আমি অবশ্য হোষ্টেলে স্থান নেইনি।

প্রশ্ন ঃ কোথায় থাকতেন? তাহলে কি ছাত্র হোষ্টেলের সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে আপনি পুরোপুরি অবহিত ছিলেন না?

উত্তর ঃ মগবাজারে আজ যেখানে ইস্পাহানী কলোনী গড়ে উঠেছে তার আম বাগানের পেছনে 'সিসেম হাউজে' এক কোণের বাসায় থাকতাম আমি। তাই বলে ছাত্র হোষ্টেলের সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের কোনটিই অজ্ঞাত ছিল না। কারণ বেশীরভাগ সময় সেখানেই কাটাতে হতো। প্রত্যহ পড়াশোনার তাগিদে ব্যারাকে

যেতে হতো পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য। রাতেও থাকতে হতো মাঝে মাঝে। কারণ সে সময় সঙ্গীহীন পায়ে হেঁটে বাসায় ফেরা সম্ভব হতো না। সন্ধ্যার পর জনমানবশূন্য রমনার পথে হাঁটতে গা ছম্‌ছম্‌ করতো। সেদিনের ঢাকায় এ অঞ্চলে বাস চলতো না, স্কুটার, বেবী ট্যাক্সী তো ছিলই না, রিক্সার সংখ্যাও ছিল নগণ্য।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের ছাত্রদের মাঝে সমসাময়িক আলোচনায় কি কি বিষয় স্থান পেতো?

উত্তর ঃ ছাত্রদের শিক্ষা ও আবাসিক সমস্যা ছাড়াও রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি আলোচনার অন্যতম বিষয়ে পরিণত হতো।

প্রশ্ন ঃ এ সময়ে সংঘটিত রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা মনে পড়ে কি?

উত্তর ঃ ১৯৪৭ সালের শেষের দিকের ঘটনা, সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের দিকে। দিনক্ষণ সঠিক মনে করতে পারছি না। আমাদের পলাশী ব্যারাকের ছাত্রাবাসের সামনের রাস্তায় ভাষা প্রশ্নে প্রথম প্রতিরোধ দ্বন্দ্ব সংঘটিত হলো। ছাত্রাবাসের সামনের সেই রাস্তাটি লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে সোজা সলিমুল্লাহ হলের সামনে এসে মিশেছিলো। ইদানীং অবশ্য সলিমুল্লাহ হলের সামনে রাস্তার মুখটি উঁচু দেয়াল তুলে বন্ধ করে দিয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রাস্তাটিকে তাদের ক্যাম্পাসের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। সেদিন এ রাস্তা দিয়ে জন পঞ্চাশেক লোকের এক মিছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে শ্লোগান দিতে দিতে নাজিরাবাজার ও মৌলভীবাজারের দিক থেকে এসে হাজির হয়। এদের অধিকাংশই ছিল পুরোনো ঢাকার স্থানীয় অধিবাসী এবং নবাবদের সমর্থক। প্রতিরোধ এলো, তাদের অগ্রগতিকে বাধা দিতে বেরিয়ে এলো মেডিকেল ছাত্রাবাসের ছাত্ররা, বেরিয়ে এলো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোষ্টেলের ছাত্ররা। সে এক খণ্ড যুদ্ধ। মিছিলের সাথে যে ভগ্নপ্রায় বাসটি ছিল, তার ভেতর লুকিয়ে রাখা লাঠি ও রড নিয়ে ওরা আক্রমণ করলো ছাত্রদের ওপর। আমরা রেল লাইনের পাশে রক্ষিত প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করে পাল্টা আক্রমণ করলাম ওদের। স্বল্প সময়ের এ খণ্ড যুদ্ধ সম্ভবতঃ ভাষা প্রশ্নে ঢাকার রাজপথে প্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের গোড়ার দিক থেকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সচেতন ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ভাষা আন্দোলনের প্রথম থেকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সচেতন ছিল। মহান ভাষা আন্দোলনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৮-এর গোড়ার কথা। মেডিকেল কলেজের অস্থায়ী ছাত্রাবাস উঠে গেছে। তাদের জোর দাবীর মুখে সরকার নতুন ছাত্রাবাস গড়ে দিতে বাধ্য হন। আজ

যেখানে শহীদ মিনার দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই ছিল নতুন মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের প্রধান ফটক। আধুনিক ছাত্রাবাসের মতো সুরম্য অট্টালিকা নয়, গজারী কাঠের ফ্রেমের ওপর তরজার বেড়া দিয়ে তৈরী হয়েছিল দুই সারি ব্যারাক। সৈন্যদের ছাউনির মত মনে হতো অনেকটা। ফুলার রোডের ফটক দিয়ে শুরু বাঁয়ে এগারটি এবং ডানে ছয়টি ব্যারাকের মাঝ দিয়ে আধাপাকা রাস্তাটি তির্যকভাবে এসে মিলেছিল বক্সিবাজারের রাস্তায়। পরে আরো তিনটি ব্যারাক তৈরী হয়েছিল পুরোনো জগন্নাথ হল বা এসেম্বেলী বিল্ডিং-এর বিপরীত কোণে। এ সকল স্থানের বর্ণনা দিচ্ছি কারণ অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এ ব্যারাক। এগুলির অস্তিত্ব আজ আর নেই, কিন্তু একদিন এইগুলিই মুখর থাকতো ভাষা আন্দোলনে সংগ্রামের দিনগুলোতে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের এ স্থান ছিল বামপন্থী, ডানপন্থী, উদারপন্থী– সব মতবাদের ছাত্রদের মিলনকেন্দ্র। বিভাগ-পূর্বকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল বা উপদলের সমর্থক বা অনুসারীদের নিয়েই ছিল এক একটি ছাত্র সংগঠন বা উপসংগঠন। কিন্তু ১৯৫২ সালের পূর্ব পর্যন্ত মেডিকেল কলেজ এর ব্যতিক্রম ছিল। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সচেতন ছিল যেন দলগত রাজনৈতিক অন্তর্বিরোধ তাদের শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত না করে। সেজন্য সংগ্রামের চরম মূহুর্তগুলোতে তারা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং ভাষা আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষার দাবী উত্থাপিত হওয়ার পর, প্রথম দিকে আপনাদের মাঝে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মেছিল আমাদের ভেতর। আর তাই রাষ্ট্রভাষার দাবী উত্থাপিত হওয়ার পর আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি।

মনে পড়ে সেদিনের শল্যবিদ্যার অধ্যাপক স্কটল্যাণ্ডের অ্যালিনসন আর হাঙ্গেরীর লোভাক সাহেব যখন বিকৃত উচ্চারণে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন তখন তাঁদের বক্তৃতার অংশ বিশেষ বাংলায় টুকে নেবার চেষ্টা করতাম খাতায়। এটা পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হয়তো বা এ অভ্যাসই পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই "রোগ নিরাময়– সুস্থ জীবন" লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনের গোড়ার দিকে ফজলুল হক হলে ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যে সব আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো তাতে আপনারা যেতেন কি?

উত্তর ঃ আমাদের মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। আমার সহপাঠী গোলাম মাওলা এবং আহমদ রফিক এসব দায়িত্ব নিয়ে সক্রিয় থাকতেন।

প্রশ্ন ঃ '৪৮ সালের ১১ই মার্চ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কি?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষার দাবীতে সার্বিক হরতাল ডাকা হয়। ঢাকার ছাত্রসমাজ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর শুধুমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার উক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সে ভাষার দাবীতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বহু ছাত্রকর্মী ও নেতা আহত এবং গ্রেফতার হয়।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের রেসকোর্সের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য কি ছিল? বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সে জনসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। '৪৮ সালের ২১শে মার্চ। মধ্যাহ্ন সূর্য তখনো মাথার ওপরে ওঠেনি। জনতার সাথে এগিয়ে চলেছি রমনার পথ বেয়ে রেসকোর্সের মাঠে। পাকিস্তান সংগ্রামের অগ্রনায়ক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণ শোনার জন্য জনতার মাঝে সে কি উন্মাদনা। ভারত বিভাগের পর পূর্বাঞ্চলের জনগণের সামনে এই তাঁর প্রথম উপস্থিতি। বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে রমনার কালী মন্দিরের উত্তর দিক ঘেঁষে উদগ্রীব হয়ে বসলাম ভাষণ শোনার জন্য। ভাষণের এক অংশে তিনি বললেন, "আমি আপনাদের বলতে চাই যে, আপনাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বিদেশের অর্থে পুষ্ট হচ্ছে এবং আপনাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। আপনারা এদের আকর্ষণীয় শ্লোগান ও চটকদার বুলি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য সজাগ থাকুন। এরা বলে বেড়াচ্ছে যে, পাকিস্তান সরকার এবং পূর্ব বাংলার সরকার আপনাদের ভাষাকে ধ্বংস করতে চায়। এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা কেউ কখনো বলেনি।... আমাকে জানানো হয়েছে যে, প্রদেশের কোন কোন অংশে অবাঙ্গালী মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা হচ্ছে। কিছুসংখ্যক কম্যুনিষ্ট এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদী ভাষার প্রশ্নকে সামনে তুলে প্রাদেশিক প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চাইছে এবং এ কাজে ছাত্রসমাজকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।" তিনি আরো বলেন, "আপনারা ভুলে যান যে আপনারা বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী বা বেলুচী। আপনারা তেরশ' বছর আগে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, সে পাঠ কি ভুলে গেছেন? আমি যদি বলি এখানে আপনারা সবাই বহিরাগত, তবে কি ভুল বলা হবে? এই প্রদেশের আদি অধিবাসী কারা ছিল? যারা আজ এখানে বাস করছে, নিশ্চয়ই তারা নয়।"

এরপর তিনি আবার ভাষা প্রশ্নে ফিরে এলেন, "ভাষা নিয়ে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হচ্ছে

মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আমার সরকার এই অন্তর্ঘাতকদের হাত থেকে প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। আমি আপনাদের বলতে চাই যে, ভাষার বিষয়টি আপনাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করবে না। প্রদেশের সরকারী ভাষা কি হবে তা প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই যথাসময়ে স্থির করবেন। তবে আমি আরো পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা– অন্য কোন ভাষা নয়। শুধু একটি মাত্র ভাষাই জাতিকে সংঘবদ্ধ রাখতে পারে। উর্দুই হবে পাকিস্তানের সে রাষ্ট্রভাষা।"

শ্রোতাদের মধ্যে একাংশে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। বক্তৃতা শ্রবণ অসমাপ্ত রেখে আমরা ফিরে এলাম ছাত্রাবাসে।

প্রশ্ন ঃ বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বে এর প্রস্তুতি পর্বে গুরুত্বপূর্ণ আর কি কি ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী উর্দুর স্বপক্ষে খাজা নাজিমুদ্দীনের ঘোষণার পর আবার শুরু হল প্রতিরোধ আন্দোলন। ৩০শে জানুয়ারী বিকেলে বার লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় সম্মেলনে আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ নামে এক বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিই ২১শে ফেব্রুয়ারীকে প্রদেশব্যাপী 'বাংলাভাষা দিবস' রূপে পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করে আন্দোলনের ডাক দেয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে ঢাকার সব স্কুল-কলেজে প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয়। মাওলানা ভাসানী এক জনসভায় বক্তৃতা দেন। যথাযথ মর্যাদার সাথে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছিল। জনসভা, শোভাযাত্রা, সার্বিক হরতালের মাধ্যমে এ দিবসকে সফল করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল।

ভাষা দিবস পালনের প্রস্তুতি-পর্বের শেষ পর্যায়ে ২০শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী হলো। মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে এসে দেখলাম একটা থমথমে ভাব। হাসপাতালে গিয়ে দেখি রোগীদের ডিসচার্জ করে দেয়া হচ্ছে। রাতে খবর এল সর্বদলীয় কর্মপরিষদের মিটিং-এ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলে ও অন্যান্য ছাত্রাবাসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বলিষ্ঠ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। গভীর রাতে এক মিটিং-এ ছাত্র নেতারা ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রশ্ন ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারীর পরিস্থিতি সম্পর্কে বলুন না।

উত্তর ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার সকল স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় সমবেত হয়। ছাত্রনেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হয়। সর্বদলীয় কর্মপরিষদের প্রতিনিধি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিপক্ষে বক্তব্য

রাখলেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করলেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে সে সুযোগে সরকার দেশব্যাপী আসন্ন নির্বাচন বন্ধ করে দেবে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ এ যুক্তি মেনে নিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে সজ্জিত পুলিশ বাহিনীর ভীতিকে উপেক্ষা করে সভা শেষ হতে না হতেই তারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য রাজপথে বেরিয়ে পড়লো। পুলিশ গ্রেফতার করতে লাগলো। তারপর চালালো কাঁদানে গ্যাস আর লাঠিচার্জের উপর্যুপরি আক্রমণ । সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এমনকি মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণও কাঁদানে গ্যাসে ছেয়ে গেল। প্রতিরোধ সংগ্রামে ছাত্ররাও হাতের কাছে পাওয়া ইটপাটকেল ছুঁড়ে পুলিশের সাথে খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হল। পুলিশ ও ছাত্রদের এ খণ্ড যুদ্ধ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ রইলো না। ছড়িয়ে পড়লো ফুলার রোড, মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রাবাস সহ সন্নিহিত সব এলাকায়। পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চালনায় আহত হল অনেক ছাত্র–মেডিকেল কলেজের শূন্য বেডগুলি আবার ভরে উঠলো রক্তাপ্লুত আহত ছাত্রদের দ্বারা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, সংঘর্ষের তীব্রতা কমলো না। প্রতিবাদমুখর ছাত্র-জনতাকে পুলিশ লাঠি চালিয়ে শান্ত করতে পারলো না। তারা গুলি চালালো মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের সামনের রাস্তায়। জব্বার আর রফিক প্রাণ হারালো। আমাদের ছাত্রাবাসের ভেতর প্রবেশ করে অনেকেই আশ্রয় নেয় হাসপাতালের অঙ্গনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র বরকত দাঁড়িয়েছিল বারো নম্বর ব্যারাকের বারান্দায়। নির্বিচারে আবার গুলি চালায় পুলিশ। একটা গুলি এসে লাগে বরকতের উরুতে। আহত বরকতকে দ্রুত অপসারণ করা হয় হাসপাতালে। কিন্তু সব চেষ্টা বৃথা। শল্যবিদদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো গেলো না।

ইতিমধ্যে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ফলে পট পরিবর্তন হয়ে পড়ে। পুলিশী ধরপাকড় আর নির্যাতনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদের সদস্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন থেকে আন্দোলনের কেন্দ্র তখন মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে এসে পড়লো। এ পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার ভার স্বভাবতঃই আমাদের হাতে এসে পড়ে। মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের কর্মকর্তারা সক্রিয় হয়ে উঠলো, গোলাম মাওলা তখন সংসদের ভি, পি, । বিশ নম্বর ব্যারাকে সংসদের নিজস্ব মাইক লাগানো হলো। কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হলো সেখানে।

পূর্বেই বলেছি বিশ নম্বর ব্যারাক ছিল ছাত্রাবাসের উত্তর পূর্ব কোণে, পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের বিপরীতে। পরিষদকে লক্ষ্য করে লাউড স্পীকার লাগানো হয়েছিল। আবুল হাশিম (বর্তমানে সৌদী আরবে কর্মরত একজন জনপ্রিয়

চিকিৎসক) শরফুল (বর্তমানে ভয়েস অব আমেরিকায় কর্মরত) আরো অনেকে উচ্চকণ্ঠে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদ সদস্যদের পরিষদ কক্ষ ত্যাগের আকুল আহ্বান জানাচ্ছিলো। বক্তব্যের স্ক্রিপ্ট তৈরী করছিল জিয়া, আহমদ রফিক, কাদের আরো অনেকে। (ডাঃ জিয়া হাসান বর্তমানে নিউ মার্কেটের সন্নিকটে এক্সরে ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করছেন, ডাঃ আহমদ রফিক ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনে প্ল্যানিং একজিকিউটিভ থেকে অবসর নিয়েছেন। ডাঃ কাদের এখন খুলনায় প্র্যাকটিস্ করছেন)। ওদিকে পরিষদ ভবনে গমনেচ্ছু সদস্যদের দেখা পেলেই ধরে নিয়ে আসা হচ্ছিল ব্যারাকে, বুঝানো হচ্ছিল পরিস্থিতির গুরুত্ব। জাহেদ, মাওলা, আহমদ রফিক সবাইকে দেখছি সক্রিয় ব্যস্ততায় ছুটাছুটি করতে। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা যেমন একদিকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল, অপর দিকে আহত ছাত্র ও জনতার চিকিৎসা ও সেবাকার্যের তত্ত্বাবধান করছিল।

পরিষদের অভ্যন্তরে ভীষণ উত্তেজনা। আজ একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মাইকে বলিষ্ঠ প্রচার ও সংযোগের প্রভাবেই পরিষদ কক্ষের উত্তেজনা চরমে পৌছে। এই পরিস্থিতি নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর পুলিশী জুলুমের বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপনের সহায়ক হয়। এ সম্পর্কিত মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। বাংলা ভাষা আন্দোলনে সম্প্রতি পরলোকগত এই নেতার অবদান অবিস্মরণীয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কার্যতঃ ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কেন্দ্রস্থল ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস। আমাদের কন্ট্রোল রুম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলগুলির কর্মীদের সাথে যতদূর সম্ভব সংযোগ রক্ষা করে আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ করার প্রয়াস পায়। গাজীউল হক, শহীদুল্লাহ কায়সার, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব এঁরা আসতেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য।

প্রশ্ন ঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী কোথাও গুলি হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ ২১ ফেব্রুয়ারী বিকেল থেকেই ১৪৪ ধারার তোয়াক্কা না করে ঢাকার শোকাহত ছাত্র-জনতা বেরিয়ে পড়ে। বাইশে ফেব্রুয়ারী শহীদের জন্য গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে শোভাযাত্রা বেরুলো। পুলিশ তাকে বাধা দিল। আবার গুলি চলল। হাইকোর্টের সামনে মৃত্যুবরণ করলো শফিকুর রহমান। ঐদিনেই ছাত্রাবাসে আমাদের আলোচনায় স্থির করা হলো, শহীদদের স্মৃতিতে মিনার নির্মাণের। সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে সাথে কাজ শুরু হলো। ভাষা আন্দোলনের সেই প্রথম শহীদ মিনারের নক্শা তৈরী করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সারারাত ধরে মিনার নির্মাণের কাজ চললো। হাসপাতালের সম্প্রসারণ কাজের জন্য ইট-

সিমেন্টের ষ্টক ছিল প্রচুর। যতদূর মনে পড়ে ছাত্রাবাসের তিন শতাধিক ছাত্রের এমন কেউ ছিল না, যে নির্মাণ কাজে অংশ নেয় নি। শরফুদ্দীন, ইঞ্জিনিয়ার নামেই যাকে আমরা চিনতাম, বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন শহীদ মিনার নির্মাণে। সারারাত পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠলো বারো ফুট উঁচু শহীদ মিনার। ২৩শে ফেব্রুয়ারী শহীদ শফিকুর রহমানের পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। প্রথম শহীদ মিনার ছিল দলমত নির্বিশেষে মেডিকেল কলেজের সকল ছাত্রের সমবেত প্রচেষ্টার ফল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী জনাব আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ পূনর্গঠন করা হয়। মেডিকেল কলেজের পক্ষ হতে গোলাম মাওলা এবং আহমদ রফিক এই পরিষদের সাথে যুক্ত ছিল।

২৬শে-র সকালে স্থির হল শহীদ মিনারে সিমেন্টের আস্তর ভেজা থাকতেই মোজাইক করতে হবে। মোজাইক করার খরচ কত লাগে জানার জন্য বেরিয়ে পড়লাম, যতদূর মনে পড়ে, রশিদকে নিয়ে। মোজাইক চিপ্সের সন্ধানে অনেক ঘোরাঘুরি করার পর লক্ষ্মীবাজারে এক বাঙ্গালী হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছে চিপ্স পেলাম, হিসেব করে ছাত্রাবাসে ফিরে এলাম। মনে পড়ছে মাপজোকের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় মনিরুজ্জামানের বিছানায় বসে হিসেব করছিলাম, এমন সময় খবর এল পুলিশ এসেছে। ইতিমধ্যে ছাত্রাবাসগুলিতে নতুন করে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও রয়েছেন তাদের সাথে। প্রতিবাদের কোন সুযোগ নেই। গাঁইতি চলল শহীদ মিনারের উপর, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এত সাধের গড়া শহীদ মিনার।

সাক্ষাৎকার ঃ
ডিসেম্বর ১৯৭৮
জানুয়ারী, ১৯৮৭

ডাঃ আহমদ রফিক

[ডাঃ আহমদ রফিক ১৯৫২ সালে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বায়ান্ন সালে তিনি মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। খুবই কাছে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করেছেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলার শাহবাজপুর গ্রামে জনাব আহমদ রফিকের জন্ম। ছাত্রজীবনের প্রায় সবটাই জেলাগত বিচারে কেটেছে পরবাসে। অর্থাৎ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭-এর জুন পর্যন্ত যশোর জেলার নড়াইল মহকুমা শহরে পড়াশুনা, ১৯৪৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ। দেশ বিভাগের পর কোলকাতার বদলে ধলেশ্বরীর তীরে মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজে পড়াশুনা ও ১৯৪৯ সালে আই, এস-সি, পাশ। সে বছরই ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি। রাজনৈতিক কারণে যথাসময়ে ১৯৫৪ সালে ফাইনাল পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। পরে ১৯৫৭ সালে আবার ভর্তি হন এবং ১৯৫৮ সালে এম-বি, বি-এস পাশ করেন। একই কারণে সরকারী বৃত্তের বাইরে প্রথমে প্রাইভেট প্র্যাকটিস পরে ১৯৬০ সালে আধা-বিদেশী ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানী এলবার্ট ডেভিড-এ 'একজিকিউটিভ'-এর চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সাল থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত ক্যামিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পদে আসীন ছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকে তাঁর মধ্যে দুটি আকর্ষণ ছিল প্রবল ঃ লেখা ও রাজনীতি। স্কুলজীবন থেকেই কবিতা ও মননশীল গদ্য রচনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল গভীর। নড়াইল ছিল অত্যন্ত রাজনীতিসচেতন শহর। স্কুলে পড়তেই ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী রাজনীতির সাথে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা গড়ে ওঠে। তখনই ছাত্র সংগঠনের পক্ষে গরম ইশতেহার লিখে হাত পাকে। প্রকাশিত তালিকায় রয়েছে দুটো কবিতার, চারটে প্রবন্ধের, একটি ছোট গল্পের ও কয়েকটি

বিজ্ঞানের গ্রন্থ। প্রকাশের অপেক্ষায় গত দুই দশকে পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো রয়েছে অজস্র প্রবন্ধ ও কিছু কবিতা।

সাংস্কৃতিক জীবনের আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ নৃতত্ত্বের তত্ত্বগত চর্চা।

ডাঃ আহমদ রফিকের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সেই স্কুলজীবন থেকে। স্কুলের শেষ পর্যায়ে ছাত্র ফেডারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। তখন নড়াইল এলাকায় অমল সেন, নূর জালাল প্রমুখ নেতা কৃষক আন্দোলনের পটভূমি তৈরী করেছেন। আটচল্লিশ সালে তিনি হরগঙ্গা কলেজ ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখন থেকেই প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি বামপন্থী রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। এবং সেই সূত্রে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে মেডিকেল কলেজ থেকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ। পরবর্তী দুই বৎসর একুশের আন্দোলনে অধিকতর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এসবের ফলে ১৯৫৪ সালের মে মাসে ৯২ক ধারার সময় তাঁর নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি হয়। তিনি হোষ্টেল ছেড়ে আত্মগোপন করেন। এ সময় অনেক ছাত্র, কর্মী ও নেতা গ্রেফতার হন। ব্যক্তিগত চেষ্টায় গ্রেফতার এড়িয়ে থাকার ফলে এক মাসের মধ্যে আত্মসমর্পনের নির্দেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। তাই নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশের ঢাকায় আত্মগোপন করে থাকতে হয়। ১৯৫৮ সাল থেকে ব্যক্তিগত কারণে সক্রিয় রাজনীতিতে আর অংশগ্রহণ করেন নি। সার্বিক হিসেব অনুসারে বামপন্থী রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা এক যুগের অধিক। রাজনীতি সচেতন জনাব আহমদ রফিকের এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ আপনি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, তখন সেখানে ছাত্র আন্দোলনের পরিস্থিতি কেমন ছিল? আপনি প্রথমে কিভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন?

উত্তর ঃ আমি ১৯৪৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই। তখন মেডিকেল কলেজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং ছাত্রদের দাবী-দাওয়া নিয়েই ছাত্র আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জনাব টি, আহমদ (বিখ্যাত আই স্পেশালিষ্ট)। তিনি একটু রক্ষণশীল প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্র রাজনীতি তিনি পছন্দ করতেন না। বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে ছাত্রদের বেশ রেষারেষি চলছিল। এ সব আন্দোলনে প্রথম থেকেই আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম।

এ সময় (অর্থাৎ '৪৯-এর আগষ্টের দিকে) ৪র্থ বর্ষের ছাত্র শাসুল হুদা চৌধুরীর বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মাঝে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এর সাথে যোগ হয় সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র আবদুল হাইকে (প্রাক্তন আই,জি, পি, মহিউদ্দীন সাহেবের শ্যালক) হোষ্টেল হতে বহিষ্কারের ঘটনা। তখনকার দিনে মেডিকেল কলেজ থেকে বহিষ্কারের অর্থ হচ্ছে পড়াশুনা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া।

রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে হোস্টেল সুপার অধ্যাপক সুরত আলী সাহেব (মেডিকেল কলেজের কেমিষ্ট্রির পার্টটাইম এবং ঢাকা কলেজের ফুলটাইম অধ্যাপক ছিলেন) আবদুল হাইকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। প্রগতিশীল এবং বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন তখন মেডিকেল কলেজে বেশ দানা বেঁধে ওঠে। এ সব আন্দোলনে প্রকৃতিগতভাবেই আমাকে সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়।

প্রশ্ন ঃ তখন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল কি?

উত্তর ঃ কেন থাকবে না। মেডিকেল কলেজের প্রথম ক্যাবিনেটই তো বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ছিল। এই ক্যাবিনেটে (১৯৪৯-৫০) ভি, পি, ছিলেন নাজির আহমদ এবং জি, এস, ছিলেন আবু সিদ্দিক। এই ইউনিয়নেরই প্রথম ম্যাগাজিন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারের কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মেডিকেল কলেজ জীবনে আমার প্রথম কবিতা সে ম্যাগাজিনেই ছাপা হয়।

মেডিকেল কলেজের এর পরের ছাত্র ইউনিয়ন ছিল মিশ্র। এই ইউনিয়নে (ডাঃ) মাওলা ছিলেন ভি, পি, এবং শরফুদ্দীন ছিলেন জি, এস, । ডাঃ মাওলা অবশ্য কিছুটা নন পলিটিক্যাল প্রকৃতির ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ যে আবদুল হাই সাহেবের বহিষ্কারের কথা বললেন, তিনি কি বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন? তাঁর বহিষ্কারাদেশ পরে প্রত্যাহৃত হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এ বহিষ্কারাদেশকে নিয়ে এক কাণ্ড ঘটে। একদিন অধ্যাপক সুরত আলী ক্লাশ থেকে বের হলে আবদুল হাই তাঁর মাথায় সজোরে লাঠির আঘাত করে বসে। অন্যায় বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যই এমনটি করা হয়েছিল। এটা পূর্বপরিকল্পিত ছিল। আবদুল হাই অধ্যাপককে আঘাত করার পর দু'জন তাকে 'এস্কট' করে নিরাপদে নিয়ে আসার পরিকল্পনা ছিল। সময় মত উপস্থিত না থাকায় আবদুল হাই ধরা পড়ে যায়। সেখানেই তার লেখাপড়ার ইতি ঘটে। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তার জেলে কাটাতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি তো কলেজ জীবনের শুরু থেকেই মোটামুটি রাজনীতি সচেতন ছিলেন। এ সময় কলেজের বাইরে কোন রাজনৈতিক মিটিং বা কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন কি?

উত্তর ঃ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্বে থেকে মোটামুটি সচেতন ছিলাম। আমার কলেজে ভর্তির সময় থেকে শুরু করে সব গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথেই নিজেকে জড়িত রাখতে যথাসাধ্য সচেষ্ট ছিলাম। এ সময় (অর্থাৎ ১৯৫০

সালের ৪ঠা নভেম্বর) জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত Grand National Convention-এ মেডিকেল কলেজের রাজনৈতিক সচেতন পুরোভাগের ছাত্রদের নিয়ে অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্ন ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বার লাইব্রেরীর মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন কি? ছাত্র প্রতিনিধিদের যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কিছু নাম স্মরণ আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত তো অনেকেই ছিলেন। তবে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সবার নাম বলতে পারবো না। আমাদের মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডাঃ মাওলা, এস, এম, হলের ভি, পি, ঢাকা হলের ভি, পি, আর্ট স্কুলের (বর্তমান আর্ট কলেজ) প্রতিনিধি এমদাদ হোসেন, আবদুল জলিল (তিনি সম্ভবতঃ যুবলীগ প্রতিনিধি ছিলেন) প্রমুখ ছাত্রনেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়?

উত্তর ঃ ২৬শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীনের একতরফা উর্দুর পক্ষে মন্তব্য করার প্রেক্ষিতে ৩১শে জানুয়ারী বার লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠন করা হয়। ইতিপূর্বে ৩০শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীনের উক্তির প্রতিবাদে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

প্রশ্ন ঃ পরবর্তী কর্মতৎপরতা কি ছিল?

উত্তর ঃ ৩১শে জানুয়ারীর মিটিং-এ পরবর্তী মিটিং-এর তারিখ ২১শে ফেব্রুয়ারী নির্ধারিত করা হয়। এই দিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এবং একুশে ফেব্রুয়ারীকে সফল করার জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ফ্ল্যাগ-ডে, চাঁদা তোলা, ঢাকা শিক্ষায়তনের ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মসূচী নেয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের মিটিং-এর সিদ্ধান্ত আপনারা কখন জানতে পারেন? ক্যাম্পাসে তখন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে কি মনোভাব পরিলক্ষিত হয়?

উত্তর ঃ মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডাঃ মাওলাকে পূর্বেই আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে 'কনভিন্সড' করেছিলাম। তিনি আমাদের মতের বাইরে যাবেন না বলেই মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। আমরা রাতে নবাবপুরের মিটিং-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পারি। নবাবপুরের মিটিং-এ অলি আহাদ সাহেবই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সবচেয়ে 'ভোকাল' ছিলেন।

ঐ দিন শেষ বিকেলের দিকে আমি এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য ঢাকা হলে যাই। সেখানে ঢাকা হলের জি, এস, আনোয়ারুল হক খানের সঙ্গে দেখা। তিনি

বললেন, 'যে কোন মূল্যে ১৪৪ ধারা ব্রেক করতে হবে।' ক্যাম্পাসে ছাত্রদের মনোভাব তখন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

সন্ধ্যায় রুমে ফিরে দেখি শহীদুল্লাহ কায়সার সাহেব পায়চারী করছেন।

প্রশ্ন ঃ শহীদুল্লাহ কায়সার এমন সময় আপনার রুমে? তিনি আপনার রুমে পূর্ব থেকেই আসা-যাওয়া করতেন নাকি?

উত্তর ঃ সত্যিকারে বলতে কি, সে সময় মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে আমার ২০/৬ নং রুমটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। শহীদুল্লাহ কায়সার সাহেব সে সময় পার্টির (কমিউনিষ্ট পার্টি) পক্ষ থেকে ছাত্রমহলের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করতেন। তাই প্রায়ই কর্তব্যের খাতিরে তিনি খবর দেয়া নেয়ার জন্য আমার কক্ষে আসতেন। আমি রুমে গিয়ে তাঁকে পায়চারী করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ব্যাপারে পার্টির কি অভিমত? আপনাদের সিদ্ধান্ত কি? তিনি বললেন, 'তোমাদের ডিসিশনই আমাদের ডিসিশন।' এরপর তিনি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে ছাত্রদের মনোভাব এবং ক্যাম্পাসের খবরাখবর জানতে চাইলেন। কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ হলো। তারপর তিনি চলে যান।

প্রশ্ন ঃ তিনি কি মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে অবাধেই আসা-যাওয়া করতেন?

উত্তর ঃ অবাধেই আসা-যাওয়া করতেন বলা যায়। কারণ তিনি যে এখানে আসা-যাওয়া করেন তা পুলিশও জানতো। তাঁর পার্টির কর্মতৎপরতা সম্পর্কেও পুলিশ অজ্ঞাত ছিল না। অবশ্য তখনকার পরিবেশে আই, বি-র লোকেরা মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে প্রবেশ করার সাহস পেতো না।

প্রশ্ন ঃ শহীদুল্লাহ কায়সার সাহেব বললেন আপনাদের অর্থাৎ ছাত্রদের ডিসিশনই পার্টির ডিসিশন। কিন্তু তোয়াহা সাহেব ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট না দিয়ে বিরত থাকলেন কেন? তিনি তো কমিউনিষ্ট পার্টির ডিসিশনের বাইরে কাজ করতে পারেন না। তার মানে কি এ বুঝায় না– কমিউনিষ্ট পার্টি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছিল না বা ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এদের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না?

উত্তর ঃ তোয়াহা সাহেব ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট না দিয়ে বিরত থাকার কারণ হলো, তিনি তখন পর্যন্ত পার্টির কোন সিদ্ধান্ত পান নি। তাই নিজে থেকে তিনি কোন সিদ্ধান্ত দিতে চান নি। আমি তোয়াহা ভাইকে যতদূর জানি তিান চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন। তাই ভোট দানে বিরত থাকাই হয়তো তখন তাঁর কাছে

সঙ্গত মনে হয়েছে। আর কমিউনিষ্ট পার্টিও তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পায় নি। আর একটা নাজুক এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কমিউনিষ্ট পার্টি তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ ছাড়া তৎকালীন পাকিস্তানে অনেক বাধা এবং অসুবিধার মুখে কমিউনিষ্ট পার্টিকে কাজ করতে হতো। সে সময় যে কোন অঘটনকে সরকার কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ বলে চালিয়ে দিত। স্বাভাবিকভাবেই পার্টিকে খুব সতর্ক হয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে চলতে হতো।

প্রশ্ন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বলুন না। আপনি কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় যান?

উত্তর ঃ ভোরবেলা থেকে আমাদের মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে। নবকুমার ইনষ্টিটিউটের ছাত্ররাও এসে পিকেটিং-এ যোগ দেয়। বর্তমান মেডিকেল কলেজের মেইন গেইট এবং পুরোনো পরিষদ ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হল) সংলগ্ন রাস্তার সংযোগ স্থলই পিকেটিং-এর প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল। আমি আটটা-সাড়ে আটটার দিকে আমতলায় যাই। আমতলার সভার পূর্বে এবং পরে পিকেটিং চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পরিষদে আসার প্রাক্কালে মন্ত্রী হাসান আলীর গাড়ীর ওপর হামলা হয়। আওলাদ হোসেন M. L. A. কে (মানিকগঞ্জ) পরিষদে বাংলা ভাষার পক্ষে বলার জন্য ছাত্ররা পাকড়াও করে মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের ৬ নম্বর রুমে নিয়ে আসে। আমতলার সভাশেষে ইউনিভার্সিটি মেইন গেইট দিয়ে ১০ জন করে ব্যাচ হয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা শুরু হয়। যারাই বের হচ্ছিল তাদেরকেই পুলিশ গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলছিল। এক পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের মেইন গেইট ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ স্থানটিতে কাঁদানে গ্যাসের শেল বর্ষণের ফলে অন্ধকারে পরিণত হয়। আমরা তখন কাঁদানে গ্যাস থেকে রক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে 'লিকুয়েড প্যারাফিন' ভিজানো তুলা ছাত্রদের বিতরণ করছি। মেডিকেল কলেজ গেইটের একটু ভেতরে সম্ভবতঃ ব্যারাকের বারান্দায়ই বরকত গুলিবিদ্ধ হয়। বরকতের উরুতে গুলি লাগে। অধিক রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

প্রশ্ন ঃ সে দিন আর কারা গুলিবিদ্ধ হয়?

উত্তর ঃ রফিকউদ্দীন (মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র এবং কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে), জব্বার, নাম না জানা এক কিশোর সহ আরো অনেকে সেদিন গুলিবিদ্ধ হয়। রফিকের কপালে গুলি লেগে মগজ বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এইযে, গুলিবর্ষণের পূর্বে পুলিশ একবারও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেনি।

প্রশ্ন ঃ কখন গুলি বর্ষিত হয়?

উত্তর ঃ যতদূর মনে পড়ে তখন দুটো-আড়াইটা হবে। ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজ এবং পরিষদ ভবন সংলগ্ন এলাকা তখন ধোঁয়াচ্ছন্ন রণক্ষেত্র। মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের ১নং রুম কন্ট্রোল রুমে পরিণত হয়। মাওলানা তর্কবাগীশ, ধীরেন দত্ত সে রুমে এসে মাইকে বক্তৃতা করেন। পরিষদ অধিবেশনের এক পর্যায়ে মাওলানা তর্কবাগীশ, ধীরেন দত্ত, শামসুদ্দীন ও কংগ্রেস পার্টির সদস্যরা পরিষদ বয়কট করে বেরিয়ে আসেন।

প্রশ্ন ঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণ হয় কি? সে দিনের পরিস্থিতি কেমন ছিল?

উত্তর ঃ ২২ তারিখই বেশী গুলিবর্ষিত হয় এবং এই দিনের মৃত্যুর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। হাইকোর্ট ও নবাবপুর ষ্টুডিও এইচ, খোশমহল সিনেমা হল প্রভৃতির সামনে গুলি বর্ষিত হয়। ঐ দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে সফিকুর রহমান মারা যায়।

এইদিন (শুক্রবার) মেডিকেল হোস্টেলে গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ভাসানীর এই জানাজা পড়াবার কথা ছিল কিন্তু তিনি আসেননি। শেরেবাংলা ফজলুল হক সাহেব এসেছিলেন। আমার মনে পড়ে জানাজা শেষে তিনি হোষ্টেলের একটি খুঁটি ধরে অঝোর ধারায় কেঁদে ফেলেছিলেন।

এইদিনই জেলগেইটের নিকট এক প্রেস থেকে ছাপানো গুলিবর্ষণের নিন্দা করে এক লিফলেট ছাড়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই লিফলেটে স্বাক্ষর করার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কোন নেতাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শেষে আবদুল মতিন সাহেবই স্বাক্ষর দিয়ে সে লিফলেট বের করেন। এই উত্তেজনা এমন পর্যায়ে ওঠে যে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা জুবিলি প্রেস পুড়িয়ে দেয়। এই প্রেস হতে মর্নিং নিউজ ছাপা হতো। ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায় ২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল মূলতঃ ছাত্র আন্দোলন। আর ২২শে ফেব্রুয়ারী পরিণত হয় দুর্বার গণ আন্দোলন। এর পর স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট চলতে থাকে। পুরনো ঢাকার অধিবাসী যারা পূর্বে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল তারাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। অব্যাহত ধর্মঘটের ফলে শহরে সবকিছু আসা বন্ধ হয়ে পড়ে। তাই মতি সরদার প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির কাছে এসে বলেন, 'আপনারা যতদিন খুশী ষ্ট্রাইক করেন আমাগো আপত্তি নাই, কিন্তু আমাগো বাচ্চাগো দুধটা আনা বন্ধ করবেন না।'

প্রশ্ন ঃ আপনার রুমে এবং সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোল রুমে কি তখনও আন্দোলনের তৎপরতা অব্যাহত ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তখনও পুরোদমে তৎপরতা অব্যাহত ছিল। অলি আহাদ সাহেব ও মতিন সাহেব সহ অধিকাংশ ছাত্র নেতারা এসব রুমে গিয়ে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

পুলিশের গুলিবর্ষণ সম্পর্কিত কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক ছাপানো লিফলেট সে পরিস্থিতিতেও বিলি করার পূর্বে আমার রুমে এনে রাখা হয়। সম্ভবতঃ ২৩ কি ২৪শে ফেব্রুয়ারী দুপুরবেলা রুমে গিয়ে দেখি আমার রুমের ভিতরে শহীদুল্লাহ সাহেব নিশ্চুপ হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর পাশে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে অলি আহাদ সাহেব লিফলেট ছাপানোর জন্য শহীদুল্লাহকে বলে চলছেন, "আপনারা কমিউনিষ্টরাই আন্দোলনের বারোটা বাজাবেন। এ সময় পার্টি থেকে এই লিফলেট (আমার রুমে গাদা করা লিফলেটগুলি দেখিয়ে) বের করার কি দরকার ছিল। জানেন এই লিফলেট ছাড়া হলে পরিস্থিতি কি হবে? কি আশ্চর্য, শহীদুল্লাহ কায়সার অলি আহাদের একটা কথারও প্রত্যুত্তর করলেন না। বয়সে তরুণ অলি আহাদ নিজেও কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে যুক্ত। শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো পার্টির সিনিয়র নেতাকে অভিযুক্ত করে এমনভাবে বলার পরও তিনি টুঁশব্দটি পর্যন্ত করলেন না। বরং সেখান থেকে লিফলেটগুলো সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এ লিফলেট আর ছাড়া হয়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের হোস্টেলে কর্মতৎপরতা আর কতদিন চলেছিল?

উত্তর ঃ ২৬ তারিখ প্রথম তৈরী করা শহীদ মিনার ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এরপর ২৭ তারিখ সমস্ত ছাত্রাবাস ভেকেন্ট করতে বলা হয়। অবশ্য এরপরও কিছুদিন হোস্টেলে আমাদের আনাগোনা বন্ধ হয়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনি গ্রেফতার হননি?

উত্তর ঃ না, আমি গ্রেফতার এড়িয়ে ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ অলি আহাদ সাহেব কবে গ্রেফতার হন?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ ৯ই মার্চ পুরনো পল্টনে এক মিটিং করার প্রাক্কালে অলি আহাদ সাহেব, তোয়াহা সাহেব, সাদেক খান, লতিফ, কাজী গোলাম মাহবুব এঁরা গ্রেফতার হন। দলমত পথের বিভিন্নতা যাই হোক আপনি একটা কথা লিখবেন– আমি যতটুকু প্রত্যক্ষ করেছি অলি আহাদ এবং মতিন সাহেবকে আমি আন্দোলনের প্রাক্কালে অধিকাংশ সময় তৎপর দেখেছি। তাদেরই বেশী আন্দোলনের স্বার্থে ছুটোছুটি করতে দেখেছি।

প্রশ্ন ঃ আন্দোলনের প্রকৃতি দেখে আপনার কি মনে হয় এ আন্দোলন প্রথম থেকে সুশৃঙ্খল ছিল? বা এর নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল?

উত্তর ঃ না, সত্যিকারে আন্দোলনের গতিধারা সম্পর্কে কারো কোন ধারণা ছিল না। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এর ওপর কারো সঠিক নিয়ন্ত্রণও ছিল না। আন্দোলন

তার নিজের ধারাতেই এগিয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ ঢাকা ডাইজেস্টের এ সাক্ষাৎকারে ভাষা আন্দোলনের সত্যিকার ইতিহাস বের হয়ে আসবে বলে আপনি মনে করেন কি?

উত্তর ঃ যাঁরা সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তাঁরা দলমত এবং স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা না করে শুধু সংঘটিত ঘটনার সত্যিকার বর্ণনা দিলে নিশ্চয়ই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বের হয়ে আসবে।

প্রশ্ন ঃ শুনেছি শহীদ মিনার নির্মাণে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এ সম্পর্কে কিছু বলুন না।

উত্তর ঃ শহীদ মিনার তৈরির সম্পূর্ণ চিন্তাভাবনা ও শ্রম কিন্তু একান্তভাবেই মেডিকেল ব্যারাকের ছাত্রদের। এর সংগে সংগ্রাম পরিষদ বা ভার্সিটির কোন সম্পর্ক ছিল না। তেইশে ফেব্রুয়ারী রাতে অনেকটা তাৎক্ষণিক চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে সচেতন ছাত্রদের এই সিদ্ধান্তের ফলে এক রাতের শ্রমে মিনারটি গড়ে উঠে। দশ ফুট বাই ছয় ফুট আকারের এই মিনার গড়ার কাজে প্রয়োজনীয় ইট-বালি এমনকি সিমেন্ট পর্যন্ত যোগাড় করা হয়েছিল কলেজ সম্প্রসারণের জন্য সংরক্ষিত মাল মসলা থেকে। এতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারও সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। ধরে আনা হয়েছিল একজন ওস্তাগার। তারপর সারারাত সেই ইট-বালি টানা, সিমেন্টের বস্তা টানা। হোস্টেলের সচেতন ছাত্রদের প্রায় সবই এই মিনার গড়ার কাজে অংশ নেয়। মিনারের গায়ে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা ফলকটি ছিল ডাঃ বদরুল আলমের হাতের।

পরদিন সবাই অবাক হয়ে দেখে রক্ত ঝরার প্রতীক, আন্দোলনের প্রতীক শহীদ মিনার। ঢাকার লোকজন ভেঙ্গে পড়ে এই শহীদ মিনারের পাদদেশে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেদিন অবাক চোখে তাকিয়েছিল শহীদ মিনারের দিকে। ঢাকার ছাত্রজনতার এই আবেগাপ্লুত অবস্থা দেখেই সম্ভবতঃ প্রশাসন এই শহীদ মিনারকে সহ্য করতে পারেনি। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের (২৬শে ফেব্রুয়ারী) দিনই সন্ধ্যায় গোটা ব্যারাক ঘেরাও করে পুলিশ ওটা ভেঙ্গে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ
মে, ১৯৭৯
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

★ শহীদ জব্বারকে অনেকে ছাত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ডাঃ আহমদ রফিক জানিয়েছেন, জব্বার প্রকৃত পক্ষে গফর গাঁয়ের এক কৃষকের সন্তান ছিলেন। শাশুড়ীর চিকিৎসা করতে এসে তিনি মেডিকেল হোস্টেলের ২০/৮নং কক্ষে উঠেছিলেন।

ডাঃ ওবায়দুর রহমান

[ডাঃ ওবায়দুর রহমান বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত প্রথম ১০ জনের অন্যতম ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারীতে তিনি এবং জহির রায়হান একসঙ্গে বটতলার সভায় অংশগ্রহণ করেন। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ছাত্রসভাতেই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার কথা ঘোষিত হয়।

মরহুম জহির রায়হান এবং ওবায়দুর রহমান ছিলেন পরস্পর ঘনিষ্ঠ সহপাঠী। আলীয়া মাদ্রাসার মোগলটুলীর হোষ্টেলের হোষ্টেল সুপারের পাশের রুমে তাঁরা দীর্ঘদিন একসাথে থেকে পড়াশুনা করেছেন। সেখান থেকে তাঁরা ঢাকা কলেজে যেয়ে ক্লাস করতেন। উভয়ের অন্তরঙ্গতা তাই ঘনিষ্ঠ হয়। এক পর্যায়ে জনাব ওবায়দুর রহমান সহপাঠী জহির রায়হানের প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিষ্ট আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ডাঃ ওবায়দুর রহমান নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত রহমতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব পণ্ডিত খলিলুর রহমান ছিলেন একজন শিক্ষক। পিতার লালিত স্বপ্ন অনুযায়ী জনাব ওবায়দুর রহমান জীবনে ডাক্তারী পেশাকেই বেছে নেন। তিনি এখনো এই পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন।

ডাঃ ওবায়দুর রহমান ছাত্রজীবনে প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। কোন রাজনৈতিক অভিলাষে নয়, শুধু মাতৃভাষার প্রতি একান্ত আকর্ষণই তাঁকে ভাষা আন্দোলনের পথে টেনে নিয়ে আসে। বাংলাভাষার প্রতি এই সহজাত আকর্ষণের ফলে এই নির্লিপ্ত মানুষটি দ্বিধাহীন চিত্তে কারাবরণ করেন।

তাঁর গ্রেফতারের পূর্বের এবং পরের কিছু খণ্ডিত চিত্র এখানে উদ্ধৃত হলো।]

প্রশ্ন ঃ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে আপনি কিভাবে জড়িত হন?

উত্তর ঃ বায়ান্ন সালে আমি ঢাকা কলেজের আই,এস-সি, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। সত্যিকারে আমি কোন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে কখনো জড়িত ছিলাম না। পড়াশোনায় নিবিষ্ট একজন নিরীহ প্রকৃতির ছাত্র বলতে যা বুঝায় আমি তাই ছিলাম। মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণই আমাকে এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে। নইলে আমার মতো নিরীহ প্রকৃতির ছাত্র ভাষা আন্দোলনে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রেফতার হয় কি করে। কোন রাজনৈতিক প্রভাব নয় বরং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এনভেলাপ, ডাকটিকেট, মানি অর্ডার ফরম প্রভৃতিতে উর্দু, ইংরেজী লেখা এবং বাংলা ভাষাকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখার তৎপরতাগুলি মনে আঘাত হানতো, প্রশ্ন জাগতো। এ সব কারণগুলিই আমাকে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ঢাকা কলেজের হোস্টেলে থাকতেন? সেখানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কোন আলোচনা উঠতো কি?

উত্তর ঃ না, আমি এবং জহির রায়হান মোগলটুলিতে অবস্থিত আলীয়া মাদ্রাসার হোস্টেলে থাকতাম। সেখান থেকেই ঢাকা কলেজে ক্লাস করতে যেতাম।

প্রশ্ন ঃ জহির রায়হান আর আপনি একত্র হলেন কি করে? তিনি কি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন?

উত্তর ঃ জহির রায়হানের পিতা মাওলানা হাবিবুল্লাহ ছিলেন মোগলটুলিতে অবস্থিত আলীয়া মাদ্রাসার হোস্টেল সুপার। আমার জ্যাঠা মাওলানা হাবিবুর রহমান (বি, বি, সি-র প্রখ্যাত অনুষ্ঠান উপস্থাপক সিরাজুর রহমানের পিতা) ছিলেন প্রাক্তন হোস্টেল সুপার। আমি তাঁর স্লিপ নিয়ে মাওলানা হাবিবুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি উক্ত হোস্টেলে তাঁর পাশের কক্ষে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেন। তখন থেকেই আমি আর জহির রায়হান ঐ কক্ষে থেকে পড়াশুনা করি। আমার ভর্তি হওয়ার আগের বছর জহির রায়হান আই, এস-সি, ফেল করে। কোথাও লেখা ছাপা না হলেও তখন থেকেই জহির রায়হান দিনরাত শুধু লিখতো এবং আমাকে শোনাতো। উদয়ন পত্রিকায় লেখা পাঠাতো। আমিই ছিলাম তার এ লেখার একমাত্র শ্রোতা। তার এ লেখার কাহিনী একদিন সিনেমা হবে এসব কথা সে প্রায়ই বলতো।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের মধ্যে আর কি বিষয়ে আলোচনা হতো।

উত্তর ঃ জহির রায়হানের বড় ভাই জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন বলে জহির রায়হানও সে আদর্শে দীক্ষা লাভের অনুকূল পরিবেশ পায়। তখন থেকেই সে মার্কসের বই পুস্তক এনে হোস্টেলে পড়তো। আমাকেও

এসব বই পড়তে দিতো। এসব নিয়ে আমাদের মাঝে অনেক আলোচনা হতো। জহির রায়হান কমিউনিষ্ট আদর্শের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমাকে বুঝাতো। তরুণ মনে তার এসব কথা কিছু রেখাপাত করতো। আমিও অল্প সময়ে মার্কস, লেনিন ও গোর্কির অনেক পুস্তক পড়ে ফেলি। এক সময় নিজের অজান্তে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট আদর্শে কিছুটা প্রভাবিত হই।

জহির রায়হানের সাথে রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়েও বেশ আলোচনা হতো। রাষ্ট্রভাষার দাবীর প্রতি যদিও স্বভাবতঃই আমি পূর্ব থেকেই অনুরক্ত ছিলাম, তবুও একথা সত্যি যে, জহির রায়হানই আমাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আর শেষ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনই জহির রায়হান থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে।

প্রশ্ন ঃ মাদ্রাসা হোষ্টেলে মার্কস্-লেনিনের বই-পুস্তিকা নিয়ে আপনারা আলোচনা করতেন এতে বাধা আসতো না কি? জহির রায়হানের পিতা মাওলানা হাবিবুল্লাহ পুত্রের এসব পড়াশুনায় কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না কি?

উত্তর ঃ আমাদের কক্ষে অন্য কেউ আসতো না। জহির রায়হানের পিতাও পুত্রের এসব ব্যাপারে খোঁজ রাখতেন বলে মনে হয় না। সুতরাং জহির রায়হান নির্বিঘ্নে এসব চর্চা করতে পারতো।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন ভাষা আন্দোলনই আপনাকে জহির রায়হান থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সে কেমন কথা? '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারী আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার সভায় উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ বলছি সে কথা। একুশে ফেব্রুয়ারী জহির রায়হান এবং আমি একই সঙ্গে বটতলার সভায় আসি। সভায় ১৪৪ ধারা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির পর শামসুল হক (আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সেক্রেটারী) সাহেবকে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে দেখি। এদিকে ছাত্রনেতা গাজীউল হক সাহেব টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার আহ্বান জানান। শুরু হয় এক অভাবনীয় প্রতিযোগিতা—কে কার আগে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় নামবে। এমনি প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম দিকেই আমরা এক গ্রুপ গ্রেফতার হলাম। গ্রেফতারের সময়ে লক্ষ্য করলাম বাঙ্গালী পুলিশেরা আমাদের শ্লোগানকে উৎসাহিত করছে। অপরদিকে অবাঙ্গালী পুলিশেরা ধমকিয়ে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের গ্রুপের যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম স্মরণ আছে কি?

উত্তর ঃ প্রাক্তন পাটমন্ত্রী শামসুল হক, আব্দুস সামাদ আজাদ, ইকবাল আনসারী (হেনরী) এদের কথা মনে আছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য তখন কোথাও জহির

রায়হানের দেখা মিললো না।

প্রশ্ন ঃ তিনি হয়তো পরে গ্রেফতার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ পরে কখনো অন্য কারণে গ্রেফতার হয়েছে কিনা জানি না। তবে জেলখানায় ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রেফতারকৃত ৪০০ জনের মধ্যে সে ছিলো না। শুধু তাই নয়, আমি গ্রেফতার হওয়ার পর সে আমার খোঁজটি নেয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি। অথচ গ্রেফতারের পূর্বে সে এবং আমি ছিলাম নিত্য সহচর। তাই বলছিলাম ভাষা আন্দোলনই আমাকে জহির রায়হান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের গ্রেফতার করে কোথায় নেয়া হয়? পুলিশ আপনাদের ওপর থানায় কোন নির্যাতন চালিয়েছিল কি?

উত্তর ঃ প্রথমে আমাদের লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় ওসি সাহেব আমাদের সাথে খুবই সুন্দর ব্যবহার করেন। আমাদের বসার জন্য থানার অফিস কক্ষের টেবিল ছেড়ে দেন। এমনকি ডিম-পরোটা দিয়ে আমাদের সবাইকে নাস্তা করান।

বিকেল ৪টার দিকে আমাদের সেন্ট্রাল জেলে নেয়া হয়।

প্রশ্ন ঃ জেলে আপনাদের কেমন জায়গায় রাখা হয়? সেখানে আপনারা মোট কতজন ছিলেন?

উত্তর ঃ ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের ৪০০ জনকে রাখা হয়। ৪০ নম্বর ওয়ার্ডটি ছিল একটি একতলা আইসোলেটেড বিল্ডিং। এর আশেপাশে বেশ চাষযোগ্য জমি ছিল। পাশে একটা গো-শালা এবং পাগলা গারদ ছিল। গো-শালাতে কিছু দুধের গাভী ছিল। মনে পড়ে একদিন সেখান থেকে দুধ নিয়ে যাওয়ার সময় আমরা সবাই মিলে সব দুধ কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলি। আমাদের বঞ্চিত করে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হতো বলেই আমরা এমন করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ জেলের খাবার খুবই নিম্নমানের ছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, খুবই নিম্নমানের ছিল। প্রথমে হলগুলো থেকে প্রচুর খাবার আসতো— তাই আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি। হলগুলো থেকে বিরানী পর্যন্ত পাঠানো হতো। বিশেষ করে মেয়ে হলগুলো হতে প্রচুর খাবার যেতো। পরে অবশ্য খাবারের অভাব হেতু আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ভীষণ অসুবিধা হতো।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কতদিন জেলে ছিলেন?

উত্তর ঃ ২১ দিন। এরপর জেলের ভিতরেই ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করে আমাদের ছেড়ে দেয়া হয়। অবশ্য এর জন্য কোন মুচলেকা দিতে হয়নি। আমাদেরকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে নেয়ার সময় শামসুল হক (প্রাক্তন পাটমন্ত্রী)

সাহেব বলে দেন যে, আমরা যেন বলি, '১৪৪ ধারা ভাঙ্গা না ভাঙ্গা সম্পর্কে আমরা কিছুই বুঝি না।'।

প্রশ্ন ঃ জেলে আপনারা কোন পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেতেন কি?

উত্তর ঃ আমাদের কোন পত্রিকা দেয়া হতো না। তবে পশ্চিম দিকে দেয়ালের বাইরের দালানের ছাদ হতে ইট মুড়িয়ে ছাত্ররা আমাদের ওয়ার্ডের দিকে পত্রিকা ছুঁড়ে দিত। বিশেষ করে ইত্তেফাক পত্রিকা আমরা পেতাম।

শামসুল হক সাহেব এবং কখনো আবদুস সামাদ আজাদ পত্রিকা পড়তেন– আমরা সবাই মিলে শুনতাম এবং নতুন করে উৎসাহ পেতাম।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের এসব কাজে কর্তৃপক্ষ বাধা দিতো না?

উত্তর ঃ না, ওয়ার্ডের ভেতর রীতিমত আমাদের রাজত্ব ছিল। কর্তৃপক্ষের কেউ এলে আমরা হুঁশিয়ার থাকতাম। পাহারাদার মেটদেরকে আমরা সরকারের চর মনে করতাম, তাই তাদের সামনে আমাদের কোন পরিকল্পনার কথা বলতাম না। আমাদের গ্রেফতারের কয়েক দিন পর নজরুল ইসলাম নামে একজন গ্রেফতার হয়ে জেলে গেলে সরকারের চর সন্দেহে আমরা ৭ দিন তার সাথে কথা বলিনি।

এমনিভাবে একবার আমাদের পাশের পাগলা গারদে একজন নতুন পাগলের আগমন ঘটলো, যার জন্য একটি কক্ষ এবং দু'জন কয়েদী নির্দিষ্ট ছিল। এতে আমাদের সন্দেহ হলো। পাগলের জন্য এতো আয়োজন কেন? নিশ্চয়ই সরকারের গুপ্তচর। কয়েকদিন পর অনেক পীড়াপীড়ির পর সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, সে সরকারের গুপ্তচর। এমন কি সে হামিদুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত এক কেসের কাগজপত্র দেখিয়ে বললো যে, সে কেইসের দায়িত্বভার তার ওপরই অর্পিত ছিল। সে খালি পিঠ দেখিয়ে অনেক মার এবং ক্ষত চিহ্ন দেখালো এবং জানিয়ে দিলো, এ সব কাজে সে খুবই সিদ্ধহস্ত এবং সাহসী, সুতরাং আমাদের মারকে সে পরোয়া করে না।

প্রশ্ন ঃ ছাড়া পাওয়ার পর জহির রায়হান বা অন্যান্যদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ না, কারো সঙ্গে দেখা মেলার সুযোগ হয়নি। আমি জেল গেইট থেকে বের হওয়ার পরই দেখি আমার পিতা আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কোন সুযোগ না দিয়ে তিনি আমাকে নিয়ে আসেন এবং পরদিন বাড়ী নিয়ে যান।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
মার্চ/এপ্রিল, ১৯৭৯

এমদাদ হোসেন

[জনাব এমদাদ হোসেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে তিনি আর্ট স্কুল-এর (বর্তমান আর্ট কলেজ) প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি জানান ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় নবাবপুরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মিটিং-এ যে ক'জন সদস্য ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। অথচ এ সম্পর্কে তাঁর নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি।

জনাব এমদাদ হোসেন বর্তমানে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার চীফ ডিজাইনার (প্রধান নক্‌শাবিদ) হিসেবে কর্মরত। জনাব হোসেন ১৯২৯ সনে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানার রুহিতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৪৯ সালে তিনি তদানীন্তন আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে আর্ট কলেজ থেকে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৪-৫৫ সালে 'ভিফজিওর' নামে শিল্পী কামরুল হাসানের সঙ্গে একটি শিল্পকর্ম সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৫ সালের শেষভাগে তৎকালীন আমেরিকান পাঠ্যপুস্তক সংস্থা সিলভার বার্ডেট কোম্পানীর অধীনে চাকুরি করেন। ১৯৫৫-৬০ সালে আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিসের এক্সিবিট বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬০-৬১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার ডিজাইন সেন্টারে (নকশা কেন্দ্র) কিছুকাল কার্যরত ছিলেন। ১৯৬১-৬৩ সালে আমেরিকান কনস্যুলেটের অধীন কম্যুনিকেশন মিডিয়া সেন্টারে আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেন।

১৯৬৬-৭৬ সালে (তৎকালীন পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশন) বাংলাদেশ টেলিভিশনে মুখ্য শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন।

যেহেতু রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে জনাব এমদাদ হোসেন আর্ট কলেজের (তৎকালীন আর্ট স্কুল) প্রতিনিধি ছিলেন, সেহেতু তাঁর এ সাক্ষাৎকার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে কিছু নতুন তথ্য এবং উপকরণ জোগাবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নটি আপনার মনে কখন থেকে রেখাপাত করে?

উত্তর ঃ ভাষা প্রশ্নটি যখন থেকে ছাত্রমহলে আলোচনা শুরু হয় তখন থেকেই এ দাবীটি আমার তরুণ মনে রেখাপাত করে। তবে রেসকোর্সে জিন্নাহ সাহেবের ভাষণের পর এ ব্যাপারে আন্দোলনের কথা মনে দানা বেঁধে ওঠে। রেসকোর্সের 'নো' 'নো' প্রতিবাদ ধ্বনিই আন্দোলনের আভাস দেয়।

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলেছেন রেসকোর্সের জিন্নাহ সাহেবের জনসভায় কোন প্রতিবাদ হয়নি। আপনি কি সে জনসভায় উপস্থিত ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উপস্থিত ছিলাম। খুব ক্ষীণ প্রতিবাদ হয়েছিল, তাই হয়তো সবার দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমি শুনেছি একমাত্র উর্দুর স্বপক্ষে জিন্নাহ সাহেবের মন্তব্যের পর কয়েকজন 'নো' 'নো' করে ওঠে। দু'একজনকে আবার সাধারণ শ্রোতারা হাত টেনে বসিয়ে দিয়ে বলে, 'আরে কি বলছেন, আগে শোনেন না।' জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নটি স্থান না পাওয়ায় ভাষা প্রশ্নে আন্দোলন শুরু হয়।

প্রশ্ন ঃ এরপর '৫২ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভাষা প্রশ্নে কোন ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে কি?

উত্তর ঃ না, '৫২ সালের পূর্বে ভাষা প্রশ্নে কোন ব্যাপক আন্দোলন হয়নি। '৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী নাজিমুদ্দীন সাহেবের উর্দুর স্বপক্ষে ভাষণের পরই সত্যিকারে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।

প্রশ্ন ঃ ভাষা প্রশ্নে পল্টনের জনসভায় নাজিমুদ্দীন সাহেবের মন্তব্যের পর ছাত্রমহলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ সময় ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে কোন প্রতিবাদ সভা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন কি?

উত্তর ঃ নাজিমুদ্দীন সাহেবের ভাষণের পর ছাত্রমহলে সাংঘাতিক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বলতে কি নাজিমুদ্দীন সাহেবের মন্তব্যের ফলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ সম্পর্কিত একটি ছাত্রসভার কথা আমার মনে পড়ছে। ঠিক প্রতিবাদ সভা নয়। সম্ভবতঃ তা ছিল ফজলুল হক হলের ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদায়ী G.S. রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে নাজিমুদ্দীন সাহবের ভাষণের কঠোর সমালোচনা করেন। এবং তা ছাত্রদের

মাঝে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার করে। বিদায়ী G.S. -এর নামটি এখন আমার মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদকে কি সংগ্রাম পরিষদ বলা হতো?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমরা তো একে সংগ্রাম পরিষদই বলতাম। All party Language Committee of Action-এর বাংলা করলে তো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদই হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কিভাবে এর সদস্য হলেন?

উত্তর ঃ (মৃদু হেসে) সদস্য হওয়ার কথা আমি পরে জানতে পারি। সম্ভবতঃ আর্ট স্কুলের আমার কিছু সহপাঠী সংগ্রাম পরিষদে আমার নাম দিয়েছিল। আর্ট স্কুলের (বর্তমান আর্ট কলেজ) প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হই।

প্রশ্ন ঃ আপনার ওপর কি দায়িত্ব ছিল?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সম্বলিত পোষ্টার লেখা এবং সে সব পোষ্টার বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো আমার দায়িত্ব ছিল।

প্রশ্ন ঃ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নবাবপুরের সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? সভার আলোচ্যসূচী কি ছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উপস্থিত ছিলাম। সে ছিল এক মারাত্মক সভা। এ সভা শেষ বিকেলে আরম্ভ হয়ে অধিক রাত পর্যন্ত চলে। একুশে ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিতব্য পরিষদের অধিবেশন চলাকালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে কিভাবে চাপ সৃষ্টি করা যায়, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়াই ছিল সভার আলোচ্যসূচী।

প্রশ্ন ঃ তাহলে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কি এ সভা ডাকা হয় নি?

উত্তর ঃ না, ভাষা প্রশ্নটি আলোচনার জন্য এটা ছিল সংগ্রাম পরিষদের পূর্ব নির্ধারিত সভা। প্রসেশন করে পরিষদ ভবনে গিয়ে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে চাপ সৃষ্টি করাই ছিল মূল কর্মসূচী। কিন্তু আকস্মিকভাবে ১৪৪ ধারা জারির পরিপ্রেক্ষিতে এটাই আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। দীর্ঘক্ষণ এ সম্পর্কে আলোচনা এবং বিতর্ক চলে। আমি মিটিং-এ যাওয়ার পথেই ঢেরা পিটিয়ে ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা চলছে শুনতে পাই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষে ছিলেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমরা এ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষে ছিলাম। তাই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষেই ভোট দিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আমরা এ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার স্বপক্ষে ভোটদানকারী ৪ জনের নাম শুনে আসছি।

উত্তর ঃ তা, ঠিক নয়। এ সংখ্যা আরেকটু বেশী হবে। জনাব অলি আহাদ, আবদুল মতিন, মরহুম ডঃ গোলাম মাওলা, আবদুল জলিল এবং আমি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি এবং জনাব আবদুল জলিল যে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, এ তথ্য সম্ভবতঃ ঢাকা ডাইজেস্টেই প্রথম পরিবেশিত হচ্ছে। এতোদিন কেন আপনাদের দু'জনের নাম উচ্চারিত হয়নি?

উত্তর ঃ হতে পারে। কেন হয়নি তা বলতে পারবো না। জলিল তো সভায় মুখর ছিল। অলি আহাদ সাহেব ছিলেন সভায় সবচেয়ে বেশি মুখর।

প্রশ্ন ঃ সংগ্রাম পরিষদের মিটিং-এ সদস্য নয় এমন উল্লেখযোগ্য কারো কথা মনে পড়ে কি।

উত্তর ঃ সদস্য নয় এমন অনেকে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে খয়রাত হোসেনের নাম মনে পড়ছে। কারণ তিনি মুসলিম লীগের এম, এল, এ, হয়েও নবাবপুরে সংগ্রাম পরিষদের মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ পরদিন (অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারী) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমতলার মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন কি?

উত্তর ঃ আমি যখন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যাই তখন যতদূর মনে পড়ে মিটিং শেষ হয়ে গেছে। কারণ ইউনিভার্সিটি গেইটে গিয়ে দেখি চারজন পাঁচজন করে যারাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে বের হচ্ছে পুলিশ তাদেরকেই গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলছে।

প্রশ্ন ঃ ক্যাম্পাসে কি আপনি ইচ্ছে করেই দেরীতে এসেছেন? আপনি গ্রেফতার হয়েছিলেন কি?

উত্তর ঃ না, ইচ্ছে করে নয়। সেদিন (অর্থাৎ) একুশে ফেব্রুয়ারী সকালে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপের' উদ্যোগে ঢাকা যাদুঘরে আমাদের ক'জনের চিত্রের একটি প্রেস শো হওয়ার কথা ছিল। সে ব্যাপারে যোগাযোগ করতেই আমি সকালে ঢাকা যাদুঘরে যাই। মিউজিয়ামে গিয়ে ডঃ দানী (মিউজিয়ামের ডিরেক্টর), ডঃ জুবেরী, কামরুল হাসান

এবং অজিত গুহকে উপস্থিত দেখতে পাই। পরে অবশ্য আমাদের দাবীতে প্রদর্শনী বন্ধ থাকে। ফেরার পথে যাদুঘরের কাছেই অলি আহাদ সাহেবের সাথে দেখা। তিনি সাইকেল থেকে নেমেই বললেন, তাড়াতাড়ি ইউনিভার্সিটিতে যান, সম্ভবতঃ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। আমি তখনই ইউনিভার্সিটিতে ফিরে আসি। না, আমি গ্রেফতার হইনি। সে মুহূর্তে গ্রেফতার হওয়ার চেষ্টাকে নিরর্থক মনে হয়েছিল। কারণ পুলিশ ট্রাক ভর্তি করে গ্রেফতার করে ছাত্রদের সংঘবদ্ধ শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনি পুলিশের গ্রেফতারী অভিযানের মুখে ইউনিভার্সিটি গেইট দিয়ে প্রবেশ করলেন অথচ পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করলো না কেন?

উত্তর ঃ দু' একজন করে যারা আসা যাওয়া করছিল পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেনি।

প্রশ্ন ঃ গুলির সময় কোথায় ছিলেন?

উত্তর ঃ বর্তমানে মেডিকেল কলেজের মেইন গেইটের খানিক ভেতরে ছাত্র ব্যারাকের উল্টো দিকে এম্বুলেন্সের গাড়ীর গ্যারেজের আড়ালেই আমরা জটলা করে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন হঠাৎ গুলির শব্দ শুনতে পাই।

প্রশ্ন ঃ আপনি আহত বরকতকে দেখেছিলেন কি?

উত্তর ঃ মুর্তজা বশীর এবং আরো ক'জন মিলে ধরাধরি করে যখন আহত বরকতকে নিয়ে আসছিল তখনই দেখেছিলাম। তখন তার পিঠ চুঁইয়ে রক্ত পড়ছিল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার আগে সম্ভবতঃ বরকত ব্যারাকের বারান্দায় দাঁড়ানো ছিল।

প্রশ্ন ঃ ঐ দিন আপনাদের আর্ট স্কুলের আর কেউ গ্রেফতার হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ সবার কথা বলতে পারবো না। আমি প্রথম মোশতাক রসুল সিরাজীর গ্রেফতারের কথা শুনতে পাই।

প্রশ্ন ঃ আপনার ওপর তো পোষ্টার লেখার দায়িত্ব ছিল। পোষ্টারের ভাষা কি ছিল?

উত্তর ঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'কথা বলার অধিকার– দিতে হবে'। গুলিবর্ষণ হওয়ার পর পোষ্টারের ভাষা আরো চরম হয়। 'খুনী নুরুল আমিনের কল্লা চাই' 'রাষ্ট্রভাষা–বাংলা চাই' ইত্যাদি ইলাষ্ট্রেশন করা পোষ্টারও লিখেছি।

প্রশ্ন ঃ আন্দোলন সম্পর্কিত এসব কার্যকলাপের জন্য আপনি আই, বি, বা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের চোখে পড়েন নি?

উত্তর ঃ একবার আর্ট স্কুলে একজন সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশ অফিসার গিয়েছিলেন আমার ঠিকানা সংগ্রহ করতে। কিন্তু তৎকালীন আর্ট স্কুলের অধ্যাপক

তা দিতে রাজী হননি। একবার আমি বাড়ী গেলে কেরানীগঞ্জ থানার ও, সি, আমাকে জানালেন আমার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালানোর কিছু নির্দেশ রয়েছে। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন কিছু ঘটার পূর্বেই আপনি খবর পেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন ঃ এরপর আপনি ঢাকায় অবস্থান করছিলেন কি?

উত্তর ঃ সম্ভবতঃ ২২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করি, তারপর নারায়ণগঞ্জে চলে যাই। নারায়ণগঞ্জে গিয়েও ছাত্রদের উদ্যোগে অনেক পোষ্টারিং করতে হয়। নারায়ণগঞ্জে রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্পর্কিত ইলাষ্ট্রেশন করা বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর পোষ্টার দৃষ্টিগোচর হয়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এ সব পোষ্টার মোস্তফা মনোয়ারের (বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মহাপরিচালক) লেখা। তিনি তখন স্কুলের ছাত্র। নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত তৎপরতা দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
মে, ১৯৭৯

অলি আহাদ

[জনাব অলি আহাদ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের একজন নির্ভীক সৈনিক। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তাঁর প্রতিবাদী ও দুঃসাহসিক সংগ্রামী ভূমিকা আমাদের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' সভায় তিনি অনমনীয় সংগ্রামী বক্তব্য রাখেন এবং ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দেন। পরবর্তী পর্যায়ে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নিপীড়নের মুখেও তাঁর এ সংগ্রামী ভূমিকা অব্যাহত ছিল। বস্তুতঃ '৪৮ সাল থেকে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে।

জনাব অলি আহাদ ১৯২৯ সালে কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মৌলভী আবদুল ওয়াহাব একজন বিশিষ্ট সমাজ সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন তথা মুসলিম সমাজের অভূতপূর্ব পুনর্জাগরণ তরুণ অলি আহাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। পিতা দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী ও মাসিক সওগাতের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এসব পত্র পত্রিকায় সংবাদ ও সচিত্র খেলার বিবরণ বিশেষ করে ফুটবল খেলার মাঠে কোলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিজয় সংবাদ তাঁর কিশোর মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতো। ফলে ভারতের বুকে 'স্বীয় ও স্বতন্ত্র আবাসভূমি'র দাবী তাঁর তরুণ মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। তাই স্কুল জীবনেই তিনি প্রস্তাবিত মুসলিম আবাসভূমি পাকিস্তান দাবীর সক্রিয় ছাত্রকর্মীতে পরিণত হন।

জনাব অলি আহাদ ১৯৪৪ সালে যথারীতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন এবং কলেজে আগমনের পর পরই 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের' ঢাকা কলেজ শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

ঢাকা কলেজ থেকে আই, এস-সি, পাশ করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, কম-এ ভর্তি হন এবং ১ম স্থান অধিকার করে বি, কম, পাশ করেন। কিন্তু আন্দোলন করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজিরবিহীন ন্যাক্কারজনক ঘটনার সৃষ্টি করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে সে দিন প্রতিটি বিবেকবান মানুষ ও সংবাদপত্র সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সে দিনের সংবাদপত্রে এ খবর পরিবেশন করে সম্পাদকীয় লেখে। এ ঘটনার পূর্বে ১৯৪৯ সালে তাঁকে ৪ বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।

অন্যায়, অত্যাচার ও রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সর্বদা আপোষহীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অলি আহাদকে জীবনের সবুজ অধ্যায়ের অনেকটা সময়ই কারাগারের অন্তরালে কাটাতে হয়েছে। পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত ৬ বার তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে। সর্বশেষে বিনা বিচারে ৬ মাস জেল ভোগের পর গণ আন্দোলনের ফলে ৮৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী তিনি মুক্তি লাভ করেন।

রাজনৈতিক কারণে কারাভোগের এ ভাগ্যলিপি জনাব অলি আহাদের জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে, ১৯৬৪ সালে যখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয় তখনও তিনি জেলে। তাই মৃত্যুকালে পিতা ছেলেকে, ছেলে পিতাকে এক নজর দেখতে পারেন নি। ১৯৮৪ সালে মায়ের মৃত্যুর সময়ও তিনি জেলখানায়– তাই প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মৃত মায়ের মুখ দেখতে হয়েছিল তাঁকে।

আজীবন সংগ্রামী জনাব অলি আহাদের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত এ সাক্ষাৎকার জাতীয় ইতিহাসকে মূল্যবান তথ্য উপকরণে সমৃদ্ধ করবে বলে আমরা আশা করি।]

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা আন্দোলন সৃষ্টির রাজনৈতিক পটভূমি কি ছিল? কিভাবে এ ঐতিহাসিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়?

উত্তর ঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের স্থবির ও পশ্চাদমুখী নেতৃত্বের ফলে পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তান) এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। পূর্ববঙ্গের মতো বঞ্চিত স্পর্শকাতর এলাকার শাসনভার চালাবার মানসিক গড়ন তাঁর ছিল না। তিনি নিজে উর্দুভাষী পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং বাংলা ভাষায় তাঁর কোন দখল ছিল না। চিন্তা ও চেতনায় তিনি তাঁর এই রক্ষণশীল ও পশ্চাদমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সীমা অতিক্রম করতে পারেন নি।

তাই তাঁর শাসন আমলের সূচনাতেই উচ্চপদস্থ উর্দুভাষী সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ প্রভুসুলভ আচরণ শুরু করেন। তাঁদের মুখের ভাষাকে বাংলাভাষী সমগ্র অধিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াসে রেডিও প্রোগ্রামে ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলা শব্দের পরিবর্তে অপ্রচলিত উর্দু শব্দ যথা–রাষ্ট্র প্রধানের স্থলে 'সদরে রিয়াসাত্', স্থিরীকৃত-এর স্থলে 'মোকরার', প্রধানমন্ত্রীর স্থলে 'উজিরে আজম', মুখ্যমন্ত্রীর স্থলে

'উজিরে আলা', মন্ত্রীর স্থলে 'উজির', প্রতিনিধির স্থলে 'নোমায়েন্দা', ঘোষণার স্থলে 'এলান', ছবির স্থলে 'তসবির' ইত্যাদি যথেচ্ছা ব্যবহার করতে শুরু করে। এমন কি মনি অর্ডার, টেলিগ্রাম ফরম, ডাকটিকেট ও মুদ্রায় উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। এসব চরম বৈষম্যমূলক কার্যকলাপের ফলে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের আবাসস্থল পূর্ববঙ্গের জনমনে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে।

এই বঞ্চনার প্রেক্ষিতে জনমনের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে সাংগঠনিক রূপদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের উদ্যোগে এবং রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া সহ কয়েকজন ছাত্রের সহযোগিতায় ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর "পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস" গঠন করেন। এই নব গঠিত তমদ্দুন মজলিসই মহান ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে। অধ্যাপক আবুল কাসেন ছিলেন এ ঐতিহাসিক আন্দোলনের মূল স্থপতি। '৪৭-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি মজলিসের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?' প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সুস্পষ্টভাবে পেশ করা হয়।

৪৭-এর নভেম্বর তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ফজলুল হক হলে পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লা বাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভাতেই প্রথম বারের মত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের প্রকাশ্য দাবী উত্থাপিত হয়। এই দাবীর স্বপক্ষে ঢাকার রাজপথে শ্লোগান উচ্চারিত হতে শুরু হলো— 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'উর্দু বাংলার বিরোধ নাই' 'উর্দু বাংলা ভাই ভাই, উর্দুর পাশে বাংলা চাই।' এভাবে সব প্রতিকূলতা ও সরকারী হামলা প্রতিরোধ করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাহিত্যসেবী ও সংস্কৃতিসেবীদের গণ্ডি অতিক্রম করে এ আন্দোলনকে সফল করার মূল দায়িত্ব এসে পড়ে সর্বত্যাগী নির্ভয় তরুণ ছাত্রসমাজের উপর। সে দাবী পূরণের স্বার্থেই পর্যায়ক্রমিক ধারায় ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে ও নেতৃত্বে ছাত্রসমাজের আবির্ভাব এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত এ ধারাই অব্যাহত ছিল।

প্রশ্ন ঃ '৪৭ সালের ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বা লিংগুয়া ফ্রাংকা করার সুপারিশ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

উত্তর ঃ করাচীতে অনুষ্ঠিত সরকারী শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা অথবা লিংগুয়া ফ্রাংকা করার সুপারিশের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে এখানকার ছাত্র ও

বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সম্মেলনের প্রস্তাবের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় প্রাঙ্গণে ৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের সেক্রেটারী অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ছাত্রসভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী গৃহীত হয়। সভাশেষে এক বিরাট মিছিল পূর্ববঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মোহাম্মদ আফজাল এবং মন্ত্রী নুরুল আমিনের বাসভবনে গমন করে। উভয় মন্ত্রীর পক্ষ হতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আশ্বাস দেওয়া হয়। এরপর এ মিছিলযোগে আমরা অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর বাসভবনে উপস্থিত হই। মন্ত্রী মহোদয় আমাদের দাবী সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানান। সেখান থেকে আমরা মিছিলসহ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবন বর্ধমান হাউসে উপস্থিত হই। কিন্তু অসুস্থতার অজুহাতে খাজা সাহেব আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি।

এমনি বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে বাস-ট্রাক ভর্তি একদল বিশৃঙ্খল মুসলিম লীগ সমর্থক ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের ও পলাশী ব্যারাক নিবাসী সরকারী কর্মচারীদের উপর হামলা চালায়। এই হামলার প্রতিবাদে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে সভা অনুষ্ঠানের পর মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল আনুমানিক বিকেল সাড়ে তিনটার সময় শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের আবদুল গনি রোডস্থ বাসভবনে গমন করে। শিক্ষামন্ত্রী লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় উপরতলা হতে নেমে মিছিলকারীদের নিকট আসেন। তিনি মিছিলকারীদের দাবীর সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং একটি কাগজে তা লিখেও দেন। এই বিরাট বিক্ষোভ মিছিলটি এরপর মন্ত্রী মহোদয়সহ সেক্রেটারিয়েট ভবন অভিমুখে অগ্রসর হয়। সেক্রেটারিয়েটের প্রধান ফটক বন্ধ থাকার দরুন মিছিলের অগ্রভাগে অবস্থানরত আমরা কয়েকজন দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করি এবং ফটক খুলে দিই। মিছিলের গগণবিদারী আওয়াজে মন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল স্বীয় দফতর হতে বের হয়ে মিছিলকারীদের মাঝখানে আগমন করেন। তিনিও আমাদের দাবী লিখিতভাবে স্বীকার করেন। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও অন্যান্য মন্ত্রী ১৫ই ও ১৬ই ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় যোগ দিতে ইতিমধ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন। অকপটে স্বীকার করতে হয় যে, মিছিলকারীদের কেউ কেউ মন্ত্রী মহোদয়দের প্রতি উগ্র আচরণ করতে ছাড়ে নি। তবুও, এমনকি অশোভন দৈহিক হামলা পরিচালনা সত্ত্বেও মন্ত্রীদ্বয় নেতাসুলভ ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্রোচিত ব্যবহার করেন। আমাদের কারো কারো অভদ্রজনিত ব্যবহারকে উপেক্ষা করে কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল মিছিলকারীদের দাবী অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে গমন করেন। সেখানে গুণ্ডামির চিহ্ন স্বচক্ষে দেখার পর মিছিল সহ সরকারী কর্মচারীদের আবাসস্থল

পলাশী ব্যারাকেও যান এবং সেখানে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর তিনি সেখানে উপস্থিত জেলা প্রশাসক এস, রহমতুল্লাহ ও পুলিশের ডি. আই. জি. সৈয়দ ওবায়েদুল্লাহকে প্রতিকার গ্রহণের নির্দেশ দেন। কৃষিমন্ত্রীর সহনশীল আচরণ এবং তাৎক্ষণিক নির্দেশ কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জনপ্রতিনিধিদের কাছেই আশা করা যেতে পারে, কোন মিলিটারী ক্যু-র মাধ্যমে গঠিত সরকার বা টোটেলিটারিয়ান ডিকটেটর-এর কাছে এ ধরনের আচরণ অকল্পনীয়।

কিন্তু শহরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি অব্যাহত হামলার কারণে উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলো। একই দিন বিকেলে কোর্টের উল্টোদিকে অবস্থিত ও, কে, রেষ্টুরেন্ট (বর্তমানে মাইরেণ্ডার) হতে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের (১৫০, মোগলটুলী) অন্যতম নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নঈমুদ্দিন আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা-আহ্বায়াক ও পরবর্তীকালে ঢাকা হাইকোর্ট বারের সেক্রেটারী) গুণ্ডা বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত ও প্রহৃত হন। মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের একটি মিছিল রায়সাহেব বাজারে গুণ্ডা কবলিত হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত ঘটনাবলীকে খুব সহজভাবে নিতে পারেন নি। এই সব ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ই ডিসেম্বর সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করেন। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে ১৫ দিনের জন্য সভা, মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন ঃ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা এবং ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আপনার নিকট থেকে একটু বিস্তারিত জানা প্রয়োজন, এ সম্পর্কে বলুন না।

উত্তর ঃ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কায়েমের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা যতই তীব্র হতে লাগল, অর্থপূর্ণ ও সাংগঠনিক শক্তিতে বলীয়ান ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের অপরিহার্যতা ততই আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া বৃহত্তর জাতীয় পর্যায়ে ছাত্র আন্দোলন কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়। সরকার বিরোধী ছাত্রশক্তিকে সংগঠিত করার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনই ছিল তখনকার দিনে একমাত্র সক্রিয় ছাত্র প্রতিষ্ঠান। মুসলমান ছাত্রসমাজের একটি অংশ উক্ত সংগঠনকে বিদেশী শক্তির তল্পীবাহক বলে সন্দেহের চোখে দেখত। এ সাংগঠনিক শূন্যতা নিরসনের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করি। এবং সর্বজনাব আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, আবদুল হামিদ চৌধুরী ও মোল্লা জালাল উদ্দিনের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাতে

থাকি। আমি তাদের ঢাকা নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ কাউন্সিলের তলবী সভা আহ্বান করার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাই। আমার যুক্তি ছিল এই যে, এই পদ্ধতিতেই মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সরকারের সমর্থক শাহ্ আজিজুর রহমানকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অপসারিত করা যাবে ও কাউন্সিলের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নতুন কমিটি নির্বাচন করে ছাত্র আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাঁরা আমার প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নি। বোধহয় কাউন্সিলে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবর রহমান তখনও স্থায়ীভাবে ঢাকায় বাস করতেন না। তখন পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না।

মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রীসভা ঢাকার ছাত্রমহল হতে যত বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সমর্থকবৃন্দের মর্যাদা ছাত্রমহলে ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ সময়ে আমি জাতীয় ও ছাত্র সমস্যা নিরসনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই নূতন ছাত্র সংগঠন গঠন করার তাগিদ তীব্রভাবে বোধ করছিলাম। তাই একমনা ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহিত প্রাথমিক আলোচনা করে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী অপরাহ্নে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে এক ছাত্র কর্মীসভা আহ্বান করি। সে সময় ঘটনাক্রমে ফেনী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক নাজমুল করিম উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁকেই সভাপতি করে সভার কাজ আরম্ভ করি। সভায় নতুন ছাত্র সংগঠন সাম্প্রদায়িক না অসাম্প্রদায়িক হবে এই প্রশ্নে উপস্থিত অনেকের সাথে আমার মতানৈক্য দেখা দেয়। আমি সংগঠনের অসাম্প্রদায়িক নামের পক্ষে ছিলাম। যা হোক অধিকাংশের মতের পক্ষে স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করে অবশেষে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করি। জনাব নঈমুদ্দিন আহমদকে ও আমাকে আহ্বায়ক করে যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ও ঢাকা শহর কমিটি গঠন করা হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সদস্য করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

১. নঈমুদ্দিন আহমদ (রাজশাহী) আহ্বায়ক, ২. আবদুর রহমান চৌধুরী (বরিশাল), ৩. শেখ মুজিবর রহমান (ফরিদপুর), ৪. অলি আহাদ (কুমিল্লা), ৫. আজিজ আহমদ (নোয়াখালী), ৬. আবদুল মতিন (পাবনা), ৭. দবিরুল ইসলাম (দিনাজপুর), ৮. মফিজুর রহমান (রংপুর), ৯. শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা), ১০. নওয়াব আলী (ঢাকা), ১১. নুরুল কবির (ঢাকা সিটি), ১২. আবদুল আজিজ (কুষ্টিয়া), ১৩. সৈয়দ নুরুল আলম (ময়মনসিংহ), ১৪. আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।

শেখ মুজিবর রহমান তখন ঢাকায় ছিলেন না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, সাংগঠনিক কমিটিতে তাঁর অন্তর্ভুক্তি তিনি সানন্দেই গ্রহণ করবেন এবং তিনি সত্যিই কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা অনীহা প্রকাশ না করে বরং সংগঠনকে দৃঢ় ও মজবুত করার প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি অনেকেই শেখ মুজিবর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রচার করছেন। কিন্তু এটা ইতিহাসের বিকৃতিমাত্র।

জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা ছাত্র ফেডারেশনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আত্মপ্রকাশ খুব একটা উৎসাহের চোখে দেখেননি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে অতীত সাহচর্যের দুর্বলতার জন্যই সংগঠনের অগ্রগতিতে কোন বাধাও দেননি।

ছাত্রমহলে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে'র অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তাই 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে ছাত্রলীগ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক দাবীদার এ ছাত্র সংগঠন। ভাবীকালে এ সংগঠন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপায়ন ও পরিবর্তনে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের' প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনেই জনাব দবিরুল ইসলামকে সভাপতি ও জনাব খালেক নেওয়াজ খানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। জনাব দবিরুল ইসলামের পর জনাব শামসুল হক চৌধুরী ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নাম রাখে। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলামের (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্গানাইজিং কমিটির সভায় আমি পুনরায় এই সংগঠনের অসাম্প্রদায়িক নামকরণের প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ার প্রতিবাদে আমি পদত্যাগ করি। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সময়ে এ সংগঠনের যাঁরা

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ

১৯৪৮	ঃ জনাব নঈমুদ্দিন আহমদ		আহ্বায়ক
১৯৪৯-৫৩	ঃ	" দবিরুল ইসলাম	সভাপতি
	ঃ	" খালেক নেওয়াজ খান	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৩-৫৪	ঃ	" কামরুজ্জামান	সভাপতি
	ঃ	" এম, আবদুল ওয়াদুদ	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৪-৫৫	ঃ	" আবদুল মমিন তালুকদার	সভাপতি
১৯৫৩-৫৫	ঃ	" এম, আবদুল ওয়াদুদ	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৫-৫৭	ঃ	" আবদুল মমিন তালুকদার	সভাপতি
	ঃ	" আবদুল আওয়াল	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৭-৬০	ঃ	" রফিকুল্লাহ চৌধুরী	সভাপতি
১৯৫৭-৫৮	ঃ	" কাজী আজহারুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৮-৬০	ঃ	" শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬০-৬৩	ঃ	" শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	সভাপতি
	ঃ	" শেখ ফজলুল হক মনি	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৩-৬৫	ঃ	" কে, এম, ওবায়দুর রহমান	সভাপতি
	ঃ	" সিরাজুল আলম খান	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৫-৬৭	ঃ	" মজহারুল হক বাকী	সভাপতি
	ঃ	" আবদুর রাজ্জাক	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৭-৬৮	ঃ	" ফেরদৌস কোরেশী	সভাপতি
	ঃ	" আবদুর রাজ্জাক	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৮-৬৯	ঃ	" আবদুর রউফ	সভাপতি
	ঃ	" খালেদ মোহাম্মদ আলী	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৯-৭০	ঃ	" তোফায়েল আহমদ	সভাপতি
	ঃ	" আ, স, ম, আবদুর রব	সাধারণ সম্পাদক
১৯৭০-৭২	ঃ	" নূরে আলম সিদ্দিকী	সভাপতি
	ঃ	" শাহজাহান সিরাজ	সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের অব্যবহিত পরই ৮ই জানুয়ারী (১৯৪৮) সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের সহ-সভাপতি শফিউল আজম, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মতিন চৌধুরী, মোঃ তোয়াহা ও আমি ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা, মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর

বাসভবন বর্ধমান হাউজে সাক্ষাৎ করি। এই বৈঠকে পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সচিব এফ.এ. করিম উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সাথে বাংলা ভাষার ইতিহাস ও তত্ত্ব নিয়ে তর্ক-বিতর্কে শফিউল আজম সাহেব বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ছাড়েন। উল্লেখ্য যে, ভারত বিভাগের পর পরই ঢাকায় আসার পর হতেই জনাব ফজলে করিম (শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী) সলিমুল্লাহ হল মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য আসতেন এবং মোনাজাতের পর ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন বিষয়ে উর্দু ভাষায় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতেন। এ ধরনের এক শ্রেণীর অবাঙ্গালী উর্দু ভাষী বাঙ্গালী মুসলমানদের ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন শিক্ষা দেবার ব্যাপারে অত্যুৎসাহ প্রদর্শন করতেন। তাদের প্রভুসুলভ আচরণ ও নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার অতিগরজী মানসিকতা বাংলা ভাষা-ভাষী মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অসন্তুষ্টি ও বিরাগের কারণ হয়েছিল। যাহা হোক, সেদিন আমাদের প্রতিনিধিদলকে খাজা নাজিমুদ্দীন এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম ও কেন্দ্রে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ডাক টিকিট, মনিঅর্ডার ফরম, মুদ্রা এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সেনা বিভাগ, নৌ বিভাগ ও বিমান বিভাগের পরীক্ষায় উর্দুর যথেচ্ছা ব্যবহার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ অনুল্লেখ ছাত্র সমাজকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এ উত্তপ্ত হাওয়ায় অনুষ্ঠিত সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমরা সরকার বিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমেই সরকার সমর্থক 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' (নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের পরিবর্তিত নাম) প্রার্থী রেজাউর রহমানকে পরাজিত করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বিপুল ভোটে হল সংসদ সহ-সভাপতি পদে জয়যুক্ত করি। পরিতাপের বিষয়, নির্বাচিত হওয়ার পরেও সরকারী রক্তচক্ষু ও সরকারী কোপানলে পড়ার ভয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সক্রিয়ভাবে কোন আন্দোলনে আমাদেরকে সাহায্য সহায়তা করেন নি; উপরন্তু তিনি পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করে সরকারের আয়কর অফিসার (Income Tax Officer) পদে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে চাকুরী ত্যাগ করে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং উত্তরকালে বাংলাদেশ সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নব নির্বাচিত ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) ভাষণ দানকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দুভাষী ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হাসান বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর উক্ত অভিনন্দনযোগ্য মন্তব্যে আমাদের মনোবল দ্বিগুণ হয়।

ফজলুল হক হল ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে সরকার বিরোধী প্রগতিশীল নেতা মোঃ

তোয়াহা তাঁর মনোনীত কেবিনেটসহ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে যথাক্রমে বাবু অরবিন্দ ঘোষ ও জনাব গোলাম আযম নির্বাচিত হন।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হবার পর হতে সংগঠনটিকে নেতৃস্থানীয় সংগঠনে পরিণত করবার মানসে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। তাই ২৬শে ফেব্রুয়ারী হতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত কলিকাতায় আহূত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুব সম্মেলনে নিম্ন-শর্তাধীনে প্রাথমিকভাবে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

প্রথমতঃ খাজা নাজিমুদ্দীন সরকার সমর্থক শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ (উত্তরকালে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ) সম্মেলনে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ পেলে, পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন না; দ্বিতীয়তঃ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ মনোনীত প্রতিনিধিই সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা হবেন। শর্ত পূরণ হল। সে অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কমিটির সদস্য আবদুর রহমান চৌধুরীই পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দান করেন। এর ফলে আমাদের সংগঠনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং এটাই ছিল আমাদের কাম্য। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন জনাব শামসুল হক (পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ), শহীদুল্লাহ কায়সার (পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন), মিসেস লিলি খান ও মিস্ বিলকিস বানু (মহিলা অবজার্ভার), এবং মিস লায়লা আরজুমান্দ বানু (আমন্ত্রিত)।

প্রশ্ন ঃ '৪৮ সালের ১১ই মার্চের আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সম্পর্কে আপনার নিকট থেকে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী। এ সম্পর্কে বলুন না।

উত্তর ঃ গণ পরিষদের অধিবেশনে ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী উর্দু ও ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকে গণ পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের স্বপক্ষে দাবী উত্থাপন করেন বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। এই অপরাধে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ও অন্যান্য বক্তা অসৌজন্যমূলক ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করেন। ঢাকায় পুনঃ পুনঃ দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পূর্ববঙ্গের উজীরে আলা খাজা নাজিমুদ্দীন গণ পরিষদ অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ওকালতি করেন। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ৪ কোটি ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ তরুণ ছাত্রসমাজ বিভিন্ন শিক্ষায়তন হতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং

অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে অভিনন্দন জানায়। শুধু তাই নয়, খাজা নাজিমুদ্দীনের এই উক্তির প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদান করার প্রয়োজনে ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) তমদ্দুন মজলিশের রশিদ বিল্ডিংস্থ অফিসে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র জনাব শামসুল আলমকে আহ্বায়ক নিয়োগ করে আমরা Committee of Action for Language অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। একই বৈঠকে ১১ই মার্চ হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য ২রা মার্চ (১৯৪৮) ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত সভায় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, গণ আজাদী লীগ, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ছাত্র সংসদ এবং কলেজ প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বশীল কমিটি গঠন করা হয়। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে সোহরাওয়ার্দী সমর্থক মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের তরফ হতে জনাব তোফাজ্জল আলী, জনাব আলী আহমদ খান ও মিসেস আনোয়ারা খাতুন কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তবে, একমাত্র মিসেস আনোয়ারা খাতুনই ১১ই মার্চের হরতাল সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। ১১ই মার্চ আয়োজিত সাধারণ ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানিয়ে ৩রা মার্চ ঢাকা হতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এক বিবৃতি দেন। বিবৃতি কোলকাতার ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজারে প্রকাশিত হয়। এ বিবৃতি দানকারীরা হলেন জনাব শামসুল আলম, আহ্বায়ক, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ; অধ্যাপক এম.এ. কাসেম, সেক্রেটারী, তমদ্দুন মজলিস; জনাব তফাজ্জল আলী এম.এল.এ; মিসেস আনোয়ারা খাতুন এম.এল.এ, সম্পাদিকা, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি; জনাব আলী আহমদ খান এম.এল.এ; জনাব কামরুদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন অফিস সম্পাদক, ঢাকা জিলা মুসলিম লীগ; জনাব শামসুল হক, সংগঠক, মুসলিম লীগ (পূর্ববঙ্গ); জনাব এ, সালাম, সম্পাদক, দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান; জনাব এস.এম. বজলুল হক, সম্পাদক, কাফেলা; জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল; জনাব মোঃ তোয়াহা, সহ-সভাপতি ফজলুল হক মুসলিম হল; জনাব অলি আহাদ, আহ্বায়ক, ঢাকা নগর মুসলিম ছাত্রলীগ; জনাব আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, সম্পাদক, ইনসান। বিবৃতির কিয়দংশ নিম্নে দেয়া হল ঃ

"For some time past considerable agitation is going on to make Bengali as the (i) official language of East Pakistan, (ii) as one of the State Languages of Central Pakistan, (iii) as one of the language of Pakistan Assembly."

"Bengali is the mother tongue of the two third population of the whole of Pakistan. It is a matter of shame that agitation has become necessary to establish this language in the life of the state .... To record a protest against these, the East Pakistan Muslim Students League & the Tamaddun Majlish have declared a general strike on Thursday, March 11. We appeal to all political, cultural and educational institutions & all students & citizens irrespective of cast & creed of East Pakistan to observe this strike according to the programme of this joint State Language sub-committee peacefully & with discipline .... Our agitation should not be mistaken in Central Pakistan & in the Assembly. We believe that if instead of treading down this democratic demand, the Bengali Language is conceded, it will be the basis of Unity of East & West Pakistan".

বঙ্গানুবাদ ঃ "(১) বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক ভাষা, (২) কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও (৩) পাকিস্তান গণ পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবীতে কিছুকাল যাবত ব্যাপক আন্দোলন চলছে।

"বাংলা সমগ্র পাকিস্তানের দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা। লজ্জার বিষয় যে, এই ভাষাকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে আন্দোলনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস ১১ই মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার সাধারণ হরতাল ঘোষণা করেছে। সংযুক্ত রাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটির কর্মসূচী অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে ও শৃঙ্খলার সাথে ধর্মঘট পালন করার জন্য আমরা সকল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষায়তন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্র ও নাগরিকদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি... কেন্দ্রীয় পাকিস্তান ও গণপরিষদে আমাদের আন্দোলনকে ভুল বোঝা

উচিত হবে না। এ গণতান্ত্রিক দাবীকে দমন না করে বাংলাভাষাকে মেনে নিলে আমরা বিশ্বাস করি, তা হবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একতার ভিত্তি।"

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ৪ঠা ও ৫ই মার্চের সভায় ১১ই মার্চের সাধারণ হরতালকে সফল করার জন্য বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১০ই মার্চের সভায় সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারী করা হলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি হবে না তা নিয়ে বিতর্ক উঠলে, আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, "আমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবই, সরকারী কোন বিধিনিষেধের নিকট আত্মসমর্পণ করে আন্দোলন প্রত্যাহার করব না।" সেই সভায় আমি এও বলেছিলাম যে, "যাঁরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি বা আন্দোলনের দোহাই পাড়েন, তাঁদেরকে পুনর্বিবেচনা করতে আমি অনুরোধ জানাই।" এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসে (হলে) দেয়ালে দেয়ালে স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা টাঙ্গিয়ে দেয়া হল। ১১ই মার্চ সাধারণ হরতাল আহ্বানের সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য শেখ মুজিবর রহমান গোপালগঞ্জ হতে ১০ই মার্চ রাত্রে ঢাকায় আসেন।

সকাল ন'টা বাজবার সংগে সংগে শেখ মুজিবর রহমান, আবদুল ওয়াদুদ এবং আমি সেক্রেটারিয়েট ভবনের প্রথম গেইটে উপস্থিত হই। তখনও সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীবৃন্দ আসেন নি। ইতিমধ্যে তরুণ জননেতা জনাব শামসুল হক কয়েকজন কর্মীসহ আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, তিন হতে পাঁচজন সেক্রেটারিয়েটের গেইটগুলির প্রত্যেকটিতে পিকেটিং করব এবং এক গ্রুপ ধরা পড়লে পরবর্তী গ্রুপ পিকেটিং করবে। পূর্বাহ্ন বেলা ৯-৩০ মিনিট হতে ১০ টার মধ্যে সেক্রেটারিয়েটগামী কর্মচারীদেরকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বাধা দিতে শুরু করলাম। সিটি এস.পি. আবদুল গফুরের হুকুমে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল। ইংরেজ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিঃ চ্যাথাম লাঠি চালনার আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শামসুল হক ও তাঁর গ্রুপের কতিপয় কর্মী গ্রেপ্তার হলেন। এর পর শেখ মুজিবর রহমান আর এক গ্রুপসহ গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ বাহিনী অধৈর্য হয়ে উঠল এবং বেপরোয়া লাঠি চালনা আরম্ভ করল। জনাব আবদুল ওয়াদুদ ও আমি পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হই। পুলিশ আমাদের আহত অবস্থায়ই জীপে বস্তাবন্দী করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিশের আঘাত ও ধস্তাধস্তির সময় আমার হাত ঘড়িটি উধাও হয়ে গিয়েছিল। পুলিশের লাঠিপেটায় প্রায় জ্ঞানহারা অবস্থায় উত্তেজিত কণ্ঠে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্জেন্টকে লক্ষ্য করে শাসিয়ে বলেছিলাম, "ক্ষমতায় আসলে তোমাকে দেখিয়ে দেব।" প্রত্যুত্তরে সার্জেন্টটি বলল, "Whats of that to me whether Nazimuddin stays or Suhrawardy comes. What-

ever the Govt. I shall carry on." সন্ধ্যা নাগাদ ৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করে সরকার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক করল।

কারাগার একটি ভিন্ন জগত। যত অসৎচরিত্র ব্যক্তিরাই কারাগারবাসী। আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য। কারাগারে আগন্তুকদের প্রথমে 'ফাইল-গাইল-ডাইল' সমস্যার ধাক্কায় মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হতে হয়। ১৩ই মার্চ সন্ধ্যায় আমাদের ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ করার পূর্বে বন্দীসংখ্যা গুণবার বিধি অনুযায়ী জমাদার আমাদেরকে শৃঙ্খলার সঙ্গে ফাইলে বসতে অনুরোধ জানায়। তরুণ ছাত্র বন্দীদের অত ঝামেলা পোহাবার মত মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। জমাদার তিন তিনবার গুণে তিনটি ভিন্ন সংখ্যা পায়। সে স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হয়ে মেজাজ দেখায়। এতে উত্তেজিত ছাত্রবন্দীগণ তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলে জমাদার এক লাফে ওয়ার্ডের বাইরে গিয়ে সংকেত বাঁশী বাজাতেই সমগ্র জেলে পাগলা ঘন্টি পড়ে। পাগলা ঘন্টিটা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাধারণতঃ পাগলা ঘন্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গে কারাগার রক্ষী বাহিনী ও বাহির হতে আগত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কারাগার অভ্যন্তরের সংক্ষুব্ধ এলাকায় বন্দীদের যথেচ্ছা অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। কোন কোন সময় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলি চালনা করা হয়। পাগলা ঘন্টি পড়বার সাথে সাথে তাই দরদী ও বুদ্ধিমান কার্যরত টহলদার সিপাহীটি আমাদের দ্বিতলস্থ ওয়ার্ডটি ত্বরিৎ তালাবদ্ধ করে অকুস্থল হতে অন্যত্র সরে পড়েছিল। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কারাগারে সুপারিন্টেনডেন্ট ইংরেজ সন্তান মিঃ বিল আগত উন্মত্ত বাহিনীকে স্ব স্ব স্থানে ফেরার আদেশ দান করে আমাদের কামরায় প্রবেশ করলেন। মিঃ বিল বন্দীসংখ্যা গণনার প্রয়োজনীয়তা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে কারাগার আইন কানুন পালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিনয়ের সঙ্গে অবহিত করলেন। কারাধ্যক্ষ মিঃ বিল যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন না করতেন, তাহা হলে আমাদের বন্দীশালায় সেদিন লঙ্কাকাণ্ড ঘটত এবং ছাত্র বন্দীদের উপর নির্যাতনের কোন ইয়ত্তা থাকত না।

১২ই মার্চের পত্রিকা পাঠে অবগত হলাম যে, শেরেবাংলা এ,কে, ফজলুল হক ১১ই মার্চ পুলিশী হামলার প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ হতে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু কৌতুকের বিষয় ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া অবধি তিনি নিজেই পদত্যাগ করেন নি। এ ধরনের বহু ঘটনা জীবনে বহু জনের ব্যাপারে বহুবারই প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি একশ্রেণীর নেতা গদীর অন্বেষণে বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসীকে প্রতারিত করেন এবং স্থির উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াস পান।

১১ই মার্চ পুলিশী নির্যাতন ও আমাদের কারান্তরালে নিক্ষেপের ফলে সমগ্র ঢাকা নগরীর রাজপথ মিছিলে মিছিলে, বিভিন্ন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ১৫ই মার্চ পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন চলাকালে ভীতসন্ত্রস্ত খাজা নাজিমুদ্দীন সরকার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। উভয় পক্ষ এক খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেন। চুক্তিপত্রটি ১২ই মার্চে গ্রেপ্তারকৃত বন্দীগণ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য অধ্যাপক আবুল কাসেম ও জনাব কামরুদ্দীন আহমদ কারান্তরালে তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হলেন। জনাব শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান ও আমি বন্দীগণের পক্ষ হতে খসড়া চুক্তির শর্তাবলী নিরীক্ষার পর অনুমোদন করলাম। খসড়া চুক্তিনামাটি সরকারের পক্ষ হতে উজিরে আলা খাজা নাজিমুদ্দীন ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে জনাব কামরুদ্দীন আহমদ স্বাক্ষর করেন। নিম্নে চুক্তিনামাটি দেয়া হল ঃ

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) হতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হবে।

২। পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে উজিরে আলা স্বয়ং তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে বিবৃতি দেবেন।

৩। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে বেসরকারী আলোচনার জন্য নির্ধারিত তারিখে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং একে পাকিস্তান গণ পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় চাকুরীতে পরীক্ষা দিতে (Central Services Examination) উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

৪। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের এপ্রিল মাসে একটি প্রস্তাব তোলা হবে যে, প্রদেশের অফিস আদালতের ভাষা ইংরেজীর স্থলে বাংলা হবে।

৫। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৬। সংবাদপত্রের ওপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

৭। ২৯শে ফেব্রুয়ারী হতে পূর্ববঙ্গের যে সকল অংশে ভাষা আন্দোলনের কারণে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করা হবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, এ আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়।

চুক্তি মোতাবেক ঐদিন (১৫ই মার্চ) অপরাহ্নেই আমাদের মুক্তির আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট মামলার অজুহাতে জনাব শওকত আলী ও কাজী গোলাম মাহবুব এবং

কম্যুনিষ্ট পার্টি সদস্যভুক্ত অজুহাতে বাবু রণেশ দাস গুপ্তকে কারামুক্তির আদেশ দেয়া হয়নি। আমরা উপরোক্ত বন্দীগণ ব্যতীত কারামুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানালে, সরকার কালবিলম্ব না করে তাদেরকেও আমাদের সঙ্গে মুক্তিদানের আদেশ জেল গেইটে পাঠিয়ে দেন। মুক্তির পর ফজলুল হক হলে আমাদেরকে সম্বর্ধনা দানকালে কতিপয় ছাত্রের মধ্যে এক চাপা অসন্তোষ লক্ষ্য করলাম। তাঁরা ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী– আত্মগোপনকারী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য কর্মী। তাঁদের পার্টির দায়িত্বই ছিল আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ভুল বুঝাবুঝি ও কলহের বীজ বপন করা। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে বা বিরুদ্ধে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারলেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সাধারণ জনতাকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচিত করা সহজ হয়। আন্দোলনে যাতে ফাটল বা অনৈক্য সৃষ্টি হতে না পারে, সে জন্য আমরা ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেলতলায় এক সাধারণ ছাত্রসভা আহ্বান করি। সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। পূর্ববঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম ও কম্যুনিষ্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীবৃন্দ এ সাধারণ ছাত্র সভাকে বানচাল করতে নানাভাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু সাধারণ ছাত্রের সচেতন সংগ্রামী চেতনা উপরোক্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়। যাহোক উক্ত সভায় পুলিশী জুলুম তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন, চুক্তিনামার ৩ ও ৪ ধারা কার্যকর করার জন্য আইন পরিষদ অধিবেশনে নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য ও পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্যবর্গের ও পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের হাতে দাখিল করার জন্য সভার অপর এক প্রস্তাবে আমার উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। সে মর্মে আমি উক্ত প্রস্তাবগুলি যথাসময়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাখিল করি।

উল্লেখ্য যে, এ সভা হতে এক বিক্ষোভ মিছিলসহ আমরা পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদ ভবন (জগন্নাথ হল মিলনায়তন) অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম। মিছিলের ধ্বনি ছিল "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" "উর্দু-বাংলা ভাই ভাই" "বাংলার সাথে উর্দুর বিরোধ নাই।" যা হোক পরিষদ ভবন গেইটে আমরা মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাক্ষাতপ্রার্থী হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্থান পরিত্যাগ করতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে পুলিশ বাহিনী হিংস্র মূর্তি ধারণ করে ও আমাদের উপর লাঠি চার্জ আরম্ভ করে দেয়। লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করার অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল ঘেরাওকৃত আইন পরিষদ সদস্যদের মুক্ত করা ও মন্ত্রীদের বাড়ী যাবার পথ সুগম করা। মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে কিছু অংশ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং কিছু অংশ সলিমুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হলের মধ্যবর্তী মাঠে

জমায়েত হয়। সন্ধ্যার পর পুনরায় কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করলে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি ও পূর্ববঙ্গের তদানীন্তন জি.ও.সি. আইয়ুব খানের (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট) জবানীতে জানতে পারি, উজিরে আলা পরিষদ ভবন ত্যাগ করে চলে গেছেন। অর্থাৎ সেদিনের সে অবস্থা হতে পরিত্রাণের নিমিত্ত ভীত মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সৈন্য বাহিনীও তলব করেছিলেন।

নাজিমুদ্দীন সরকারকে সমালোচনা করার কারণে সোহরাওয়ার্দী প্রতিষ্ঠিত ও কলিকাতা হতে প্রকাশিত জনপ্রিয় দৈনিক ইত্তেহাদের পূর্ববঙ্গে প্রবেশ ১৯৪৭ সালেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে দৈনিক ইত্তেহাদের অনন্য অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ প্রসঙ্গে কলিকাতা হতে প্রকাশিত দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক স্বাধীনতার বলিষ্ঠ ভূমিকাও পূর্ববঙ্গ সরকারের রোষের কারণ হয় এবং ১৩ই মার্চ দৈনিক অমৃতবাজার, দৈনিক আনন্দ বাজার ও দৈনিক স্বাধীনতার পূর্ববঙ্গে প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। যুগান্তর ইতিপূর্বেই সরকারী কোপানলে পতিত হয়েছিল।

১৬ই মার্চ পরিষদ ভবনে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ১৭ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বেলতলায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহ্‌মদের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রারম্ভেই পূর্ববঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য নেতা অধ্যাপক ফজলুল করিম কতিপয় সমর্থকের সহায়তায় গোলযোগ সৃষ্টির প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ইহা নাকি তাঁদের বিপ্লবের স্বার্থে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কর্মসূচীভুক্ত। তাঁরা সংগ্রাম পরিষদে প্রতিনিধিত্ব দাবী করছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবের নেশার ঘোরে গণবিপ্লব দ্বারা সরকারের উৎখাতের প্রয়োজনে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী দাবী করছিলেন। তরুণ নেতা শামসুল হক ও কাজী গোলাম মাহবুবের বক্তৃতার পর শেখ মুজিবর রহমান ও আবদুর রহমান চৌধুরীর পীড়াপীড়িতে আমাকে সভাপতির আহ্বানে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। সেদিনের সে সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াসকে শক্ত ভাষায় আক্রমণ করে বলেছিলাম, "যাঁরা কলিকাতার সদ্য অনুষ্ঠিত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করে বিপ্লবের অলীক স্বপ্নের বার্তা বহন করে এনেছেন এবং 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে প্রকাশ্যে গগণবিদারী আওয়াজ তুলেছেন, তাঁরা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। সুতরাং 'কমিটি অব এ্যাকশন' বা কর্মপরিষদে তাঁদের কাউকেও গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। আমরা মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার আলোচনা করি, ছাত্র সমস্যা সমাধানের আন্দোলন করি, সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, কিন্তু দেশের আজাদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি না।"

আমার বক্তৃতার সমর্থনে সাধারণ ছাত্রদের একাত্মতা লক্ষ্য করে গোলযোগপ্রিয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থকগণ সভা হতে বিষণ্ন বদনে পিছটান দিলেন। সভায় ১৬ই তারিখ অপরাহ্নে পরিষদ ভবনের সামনে পুলিশী জুলুমে আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে পুলিশী জুলুমকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়। জাতির জনক কায়েদে আযমের আসন্ন পূর্ববঙ্গ সফরকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে যথাযথ সম্বর্ধনা দানের আহ্বানের মধ্য দিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে পরলোকগত সাংবাদিক সাপ্তাহিক 'ইনসানের" সম্পাদক মরহুম আবদুল ওয়াহেদের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা আমার পবিত্র দায়িত্ব বলেও আমি মনে করি। কারণ অনেকেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেও অধুনা নানাভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকার লোভে নানা বন্ধু-বান্ধবের কলমের আঁচড়ে আনুকূল্য কুড়াচ্ছেন। করাচীর কুচক্রী ও তাদের দোসর বঙ্গসন্তানদের ন্যাক্কারজনক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার মরণপণ সংগ্রামে শাসকচক্রের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, সর্বপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতনকে তুচ্ছজ্ঞান করে তরুণ সমাজকে ঝাঁপিয়ে পড়তে জনাব ওয়াহেদ বলিষ্ঠ তেজোদ্দীপক সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে উদাত্ত আহ্বান জানাতেন। তাঁর সম্পাদকীয় সংগ্রামী ও সচেতন তরুণ ছাত্রসমাজকে আত্মত্যাগের মন্ত্রে দারুণভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান দিবস ৮ই মার্চে খেলাধূলা প্রতিযোগিতার ফাঁকে ফাঁকে সমবেত ছাত্র, শিক্ষক ও দর্শকদেরকে ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দিবসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করার মানসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠে মাইকের মাধ্যমে জনাব ওয়াহিদ কর্তৃক লিখিত সম্পাদকীয় পুনঃ পুনঃ পাঠ করে শুনিয়েছিলাম। সম্পাদক ওয়াহেদ সাহেব স্বয়ং জিমনেসিয়াম খেলার মাঠে আমাদের সাথে ছিলেন। অতি তরুণ বয়সেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আজও ব্যথাবিধুর হৃদয়ে তাঁকে স্মরণ করি।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে পুরোনো ঢাকা অধিবাসীদের মনোভাব সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কি?

উত্তর ঃ ঢাকা শহরের আদিবাসীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিল। তাদের দৃষ্টিতে আমাদের আন্দোলন ছিল মুসলিম ঐক্য বিনষ্টকারী ও হিন্দুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। পাকিস্তান শিশুরাষ্ট্র ও পাকিস্তানকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ছলছুতার সুযোগে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সদা সচেষ্ট। আমরা অসতর্ক মুহূর্তে ভাবাবেগবশতঃ খপ্পরে পতিত হয়েছি। তাই আমাদের ছাত্রাবাসের বাবুর্চি মৌলভী বাজার, বেগম

বাজার ও চক বাজারে কেনাকাটা করতে গেলে আদিবাসীরা কটুক্তি করত, মারধোর করত, এমনকি তার নিকট সওদা পর্যন্ত বিক্রি করত না। তাদের ধারণা, পূর্ববঙ্গে এক কোটির মতো হিন্দু আছে এবং তারা সবাই পাকিস্তান ধ্বংসের কারসাজিতে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত।

প্রশ্ন ঃ এবার আপনার কাছে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তান সফর এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে চাইবো।

উত্তর ঃ স্বাধীনতার পর কায়েদে আযমের প্রথম পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ) সফর উপলক্ষে ১৯শে মার্চ ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করলে তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকা বিমান বন্দর হতে রেসকোর্স পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল, তিল ধারণের স্থান কোথাও ছিল না। হর্ষোৎফুল্ল জনতার এই ঢল দেখে কে বলবে, মাত্র দু'দিন পূর্বেও ঢাকা শহরে সরকার বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ঢাকার কর্তা ব্যক্তিদের মসনদকে টলটলায়মান করে তুলেছিল। দেশবাসীর কি অকৃত্রিম ভালবাসাই না ছিল রাষ্ট্রের জনকের প্রতি। অতি পরিতাপের বিষয়, কায়েদে আযম ২১শে মার্চ রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে ভাষণ দানকালে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে এবং ভাষা আন্দোলন বিদেশী চক্রান্ত বিশেষ। কায়েদে আযমের মন্তব্য ছাত্রসমাজকে মর্মাহত করল এবং যত ক্ষীণ কণ্ঠে হোক এর প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটল ২৪শে মার্চ কায়েদে আযমের সম্মানার্থে আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে। কায়েদে আজমের ভাষণে "Urdu & urdu shall be the State Language"—এই মন্তব্যের সাথে সাথে সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত ছাত্রদের একাংশ 'No' 'No' অর্থাৎ 'না' 'না' বলে প্রতিবাদ জানালো। ২০শে মার্চ কায়েদে আযম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা হল ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদেরকে সাক্ষাৎ দান করেন।

২২শে মার্চ কায়েদে আযম নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ দান করেন। অতঃপর ২৩শে মার্চ নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ (উত্তর কালে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ) প্রতিনিধি শাহ আজিজুর রহমান, মাজহারুল হক কুদ্দুস এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠাতা-আহ্বায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ ও মোঃ তোয়াহা এক যুক্ত বৈঠকে কায়েদে আযমের সহিত মিলিত হন। উভয় পক্ষের বক্তব্য

শোনার পর ২৪শে মার্চ কায়েদে আযম পুনরায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিনিধি শাহ আজিজুর রহমান ও মাজহারুল হক কুদ্দুস এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সাংগঠনিক কমিটির সদস্য আবদুর রহমান চৌধুরী ও মোঃ তোয়াহার সহিত এক বৈঠকে মিলিত হলেন। ধৈর্য সহকারে আদ্যোপান্ত শুনে তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগকে মৃত ঘোষণা করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে যোগ দিতে নির্দেশ দিলেন। ছাত্রনেতৃবৃন্দও লিখিতভাবে এক অঙ্গীকারপত্রে সই করলেন যে, তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে একযোগে কাজ করবেন। কথা ছিল কায়েদে আযম নব গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে আশীর্বাদ জানিয়ে একটি বাণী দেবেন কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। ইতিমধ্যে অদৃশ্য হস্তের কারসাজিতে কায়েদে আযম স্বীয় মত পাল্টালেন এবং ২৭শে মার্চ তিনি শাহ আজিজুর রহমান ও মাজহারুল হক কুদ্দুসের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনার পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিনিধিদ্বয় আবদুর রহমান চৌধুরী ও মোঃ তোয়াহার সঙ্গে সাক্ষাতের আর প্রয়োজনই বোধ করলেন না। কায়েদে আযমের আচরণে মর্মাহত হয়ে অংগীকার ভঙ্গ করে আবদুর রহমান চৌধুরী সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফতে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগের উপর কায়েদে আযমের "আশীর্বাদ বাণী" সাধারণ ছাত্রদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন।

কায়েদে আযমের আমন্ত্রণে ২৪শে মার্চ অপরাহ্নে সর্বজনাব শামসুল হক, নঈমুদ্দিন আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, শামসুল আলম, তাজুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল কাসেম, মোঃ তোয়াহা এবং আমি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে তার সাথে পূর্ববঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বাসভবনে (পরবর্তীকালে মিন্টু রোডস্থ গণ ভবন) এক বৈঠকে মিলিত হই। পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর কায়েদে আযমের সাথে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার প্রারম্ভেই কায়েদে আযম মন্তব্য করেন যে, একাধিক রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। এর জওয়াবে কামরুদ্দিন আহমদ বলেন যে, সুইজারল্যাণ্ড ও কানাডায় একাধিক রাষ্ট্রভাষা জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করেছে। কায়েদে আযম তার উত্তরে অসহিষ্ণু স্বরে বলেন যে, তাঁকে ইতিহাস শিখাতে হবে না, তিনি ইতিহাস জানেন। তিনি পাকিস্তান সংগ্রামের ইতিবৃত্ত চুম্বক ভাষায় বিবৃত করে আবেগের মুহূর্তে আমাদের ইংরেজীতে বললেন, "In the interest of the integrity of Pakistan, if necessary you will have to change your mother tongue" অর্থাৎ "পাকিস্তানের সংহতির খাতিরে প্রয়োজনবোধে তোমাদেরকে মাতৃভাষা পরিবর্তন করতে হবে।" কায়েদে আযমের উক্ত বিস্ময়কর

মন্তব্য সকলকেই বিস্ময় বিমূঢ় ও হতবাক করে ফেলে। এ কি যুক্তিবাদী কায়েদে আযম কথা বলছেন, না আর কেউ? এরূপ অপ্রীতিকর অবস্থা কিছুটা সামলে নিয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করার মধ্যেই আমি বললাম, "Sir Britain, U.S.A., Canada, Australia & Newzealand speak the same language, preach the same religion, come of the same stock, could they form one state? Despite the same religion Islam, same language Arabic, and semitic blood, and same land Arab, why are there so many states on Arab Land?" অর্থাৎ "জনাব, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড একই ভাষা, একই ধর্ম, একই বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তারা একই রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়েছে কি? একই ধর্ম ইসলাম; একই ভাষা আরবী, একই সেমেটিক রক্ত ও একই আরবভূমি সত্ত্বেও আরব জগতে এতগুলি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কেন?" বেশ বুঝছিলাম যে, কায়েদে আযম আমার উত্তর ভালভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। কিন্তু জবাবে তাঁর বলবার কিছু ছিল না।

বিদায় গ্রহণকালে রাষ্ট্রভাষা কমিটির তরফ থেকে ইংরেজী ভাষায় নিম্নোক্ত স্মারকলিপিটি কায়েদে আযমের নিকট হস্তান্তর করা হয়ঃ

"সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সংগঠনের মুসলমান যুবকদের দ্বারাই গঠিত। সংগ্রাম পরিষদের অভিমত, বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক।

কারণ প্রথমতঃ তা পাকিস্তানের লোক সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভাষা ও পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র বিধায় সংখ্যাগুরু অধিবাসীর দাবী গ্রহণ করা বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিককালে কোন কোন রাষ্ট্র একাধিক রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত কয়টি দেশের নাম উল্লেখ করা যায়ঃ বেলজিয়াম (ফ্লেমিং ও ফরাসী ভাষা), কানাডা (ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা), সুইজারল্যাণ্ড (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় ভাষা), সাউথ আফ্রিকা (ইংরেজী ও আফ্রিকান ভাষা), মিশর (ফরাসী ও আরবী ভাষা), থাইল্যাণ্ড (থাই ও ইংরেজী ভাষা); ইহা ছাড়াও সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৭টি রাষ্ট্রভাষা চালু রয়েছে।

তৃতীয়তঃ সম্পদের দিক থেকে বাংলা ভাষা পৃথিবীতে সপ্তম ভাষা রূপে স্বীকৃত বিধায় এ রাষ্ট্রে একমাত্র বাংলা ভাষা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত।

চতুর্থতঃ আলাওল, নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, সৈয়দ ইমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী ও আরো অনেক মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের রচনা সম্ভারে বাংলা ভাষাকে সম্পদশালী করেছেন।

পঞ্চমতঃ বাংলার সুলতান হোসেন শাহ সংস্কৃতি ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্বেও উক্ত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করছিলেন। এই ভাষার শব্দ সম্ভারের শতকরা ৫০ ভাগ আরবী ও ফারসী ভাষা হতে উদ্ভূত।

পরিশেষে আমরা পেশ করতে চাই যে, যে কোন পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের কতগুলো মৌলিক অধিকার আছে। সুতরাং আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি বাংলা ভাষার আন্দোলন চলতে থাকবে।"

উল্লেখযোগ্য যে, কায়েদে আজমের সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। ১৯৪৬ সালে নির্বাচনী সফরে আসাম যাবার পথে আখাউড়া রেলওয়ে জংশনে সুদীর্ঘ কয়েকঘন্টা কাল কায়েদে আজমের সাহচর্য ভোগ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কলিকাতা হতে ট্রেনযোগে আসার সময় পথিমধ্যে লক্ষ লক্ষ জনতার সম্বর্ধনার কারণে আখাউড়া জংশনে পৌঁছুবার পূর্বেই আসামগামী মেইল ট্রেন আখাউড়া ত্যাগ করে। তাই কায়েদে আযমের সেলুনকে আখাউড়ায় পরবর্তী ট্রেনের অপেক্ষায় কয়েকঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কায়েদে আযমের সফরসূচী পূর্বাহ্নে জ্ঞাত ছিলাম। আমরা ত্রিপুরা জেলা ইলেকশন বোর্ডের তরফ হতে তাঁকে সম্বর্ধনা দিতে আখাউড়া গিয়েছিলাম। লক্ষ লোকের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনায় আমার বিশেষ কিছু করার ছিল না। মাঝে মাঝে মাইকে ভেসে উঠছিল বিভিন্ন ধ্বনি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ', 'লড়কে লেংগে পাকিস্তান' ইত্যাদি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আবেদন। কায়েদে আযম সংক্ষিপ্ত ভাষণে ঐক্য, ঈমান, শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে ও আগামী নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে হারিকেন মার্কায় ভোট দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিতে উদাত্ত আহবান জানালেন। দুই এক ঘন্টার মধ্যে জনতার ভীড় হালকা হয়ে উঠলে কায়েদে আযম আংগুলী ইশারায় আমাকে তাঁর নিকট ডাকলেন। এর কারণ বোধ হয় আমার পরিধানে মুসলিম লীগ ব্যাজ ছিল। ভয়, দ্বিধা ও সংকোচে জড়সড় হয়ে তাঁর জানালার নিকট উপস্থিত হলে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয় শোনবার পর স্নেহের সুরে বললেন, "Young boy, remember character first. After election rejoin the classes." অর্থাৎ "তরুণ বালক, স্মরণ রেখো চরিত্রই প্রথম। নির্বাচনের পর পড়াশোনায় পুনরায় মনোনিবেশ করো।"

কায়েদে আযমের নির্দেশ ও উপদেশ আজও আমার মধ্যে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে।

যা হোক কায়েদে আযমের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতের কথা বলছিলাম। কায়েদে আযমের আজকের ভূমিকা আমার সামগ্রিক সত্বার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, আমি হতভম্ব ও দিশেহারা। মাতৃভাষার দাবী প্রতিষ্ঠাকল্পে তর্ক বিতর্ক স্থলে ও দায়িত্বের খাতিরে কায়েদে আযমের প্রতি কঠিন মন্তব্য করতে বাধ্য হলেও তাঁর নেতৃত্ব ও অবদানের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। গণতান্ত্রিক জীবনে বিভিন্ন প্রশ্নে মতভেদ অস্বাভাবিক কিছু নয়। পরিতাপের বিষয়, বংগভাষা ও বাংগালী চরিত্র সম্বন্ধে কেহ তাঁকে সঠিক ধারণা দেয় নি বরং ভুল তথ্যই তাঁকে বোধ হয় পরিবেশন করা হয়েছিল। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বংগ সাহিত্য লেখক শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন অকপট মনেই লিখেছেন, "মুসলমান কর্তৃক বংগ বিজয়ই বংগ সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধির কারণ।" আরাকান বৌদ্ধ রাজসভা ও ত্রিপুরা মহারাজ সভায় মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ বংগ ভাষাতেই কবিতা ও সাহিত্য রচনা করতেন। ষষ্ঠ হতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে সংস্কৃত ভাষার হামলার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্থানীয় বংগ ভাষায় চর্যাপদ রচনা করেন। এরপর মুসলমান নৃপতিদের বাংলায় আগমন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। মিথ্যা জালবোনার হীন স্বার্থেই এই নিরেট ঐতিহাসিক সত্যকে চাপা দেয়া হয় এবং এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় ঐক্যে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়।

কায়েদে আযমের ব্যক্তিত্বের পিছনে একচেটিয়া গণ সমর্থন ছিল। তাই তাঁর পূর্ববংগ সফরের পর ভাষা আন্দোলনে ভাটা দেখা দেয়। কায়েদে আযমের নির্দেশে সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপের কার্যতঃ ত্রিনেতা, মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে (প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী) ব্রহ্মদেশে রাষ্ট্রদূত করা হল এবং তোফাজ্জল আলী (প্রাক্তন ডেপুটী স্পীকার, বংগীয় আইন পরিষদ) ও ডাঃ আবদুল মোত্তালেব মালিক (শ্রমিক নেতা) নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। ফলে পূর্ববংগ আইন পরিষদে সোহ্‌রাওয়ার্দী সমর্থক সদস্যদের কেন্দ্র করে কালের গতিতে ঘটনার বিবর্তনে পরিষদ অভ্যন্তরে যে অর্থপূর্ণ বিরোধী দল গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা বিনষ্ট হল। এমনকি তার সংগে আইন পরিষদের বাইরে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও ১৫০ নং মোগলটুলী কর্মী শিবিরের প্রভাবে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক মত সংগঠিত হওয়ার যে সুযোগ দেখা গিয়েছিল, তাও আপাততঃ তিরোহিত হল। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর জনাব লবিব উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকীর বেগম বাজারস্থ "বলিয়াদি হাউজে" ও ২২শে ডিসেম্বর জনাব তোফাজ্জল আলীর জয়নাগ রোডস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত সোহ্‌রাওয়ার্দী সমর্থক পূর্ববংগ আইন পরিষদ সদস্যদের সভায় তরুণ নেতা শামসুল হক, শওকত আলী, তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুদ্দিন ও আমি সহ অন্যান্য কর্মীরা অংশ গ্রহণ করি। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

ডাঃ আবদুল মোত্তালেব মালিক ও সিরাজুল ইসলামকে কলিকাতায় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকার কর্মীদের মনোভাব তাঁর গোচরীভূত করে তাঁকে ঢাকা আসার আবেদন জানাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব ঢাকা আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, ডাঃ মালিক পরিচালিত গ্রুপের একটি অংশ হতোদ্যম হয়ে পড়েন। পরে তাঁরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সুযোগে ও কায়েদে আযমের আদেশে রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রী পদ গ্রহণ করে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক ভূমিকা ত্যাগ করেন। এর ফলে পার্লামেন্টারী রাজনীতি অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন ঃ '৪৮ সালের ১১ই মার্চের ভাষা চুক্তি বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার পক্ষ কতটুকু উদ্যোগ নিয়েছিলেন? পরবর্তী পর্যায়ে আপনাদের তৎপরতা কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ উজিরে আলা খাজা নাজিমুদ্দীন ১৫ই মার্চে স্বাক্ষরিত ৮ দফা চুক্তির ৩ ধারা শর্ত অবলীলাক্রমে হজম করে ৬ই এপ্রিল পূর্ববংগ আইন পরিষদে বাংলাকে পূর্ববংগের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ৮ই এপ্রিল নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় ঃ (ক) পূর্ববংগ প্রদেশে ইংরেজীর স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করা হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব অসুবিধাসমূহ অপসারণ করা যায় তত শীঘ্র তা কার্যকর করা হবে। (খ) পূর্ববংগের শিক্ষায়তন সমূহের শিক্ষার মাধ্যম যথাসম্ভব বংগভাষা হবে, কেননা বাংলা অধিকাংশ বিদ্যার্থীর মাতৃভাষা।

আমরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর সংগ্রাম পরিষদে নানা কারণে অনৈক্য দেখা দেয়। কর্মপরিষদের আহ্বায়ক শামসুল আলমের পদত্যাগের পর জনাব আজিজ আহমদ কিছুকাল আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ক্রমশঃ আন্দোলন তীব্রতা হারিয়ে ফেলে এবং এর ফলে সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এদিকে ১৫০ নং মোগলটুলী, ঢাকা কর্মী শিবিরের কতিপয় সদস্যের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক সভায় জনাব আবদুল মান্নানের উপর আহ্বায়কের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়। আর এভাবেই সংগ্রাম পরিষদ স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করার প্রাক্কালে এক কাগুজে সংস্থায় পরিণত হয়ে পড়ে।

১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিন শ্রেণীর আন্দোলনকারীর সমাবেশ লক্ষ্য করেছি" (ক) অতি বিপ্লবী বাক্যবাগীশ। এরা কথায় কথায় সরকার উৎখাত চায়; সামাজিক,অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনের বড় বড় বুলি আওড়ায়; কিন্তু জনতার সংগে পুলিশ মিলিটারীর জুলুম ভোগ করতে এরা নারাজ। কারাবরণে এদের অনীহা; আন্দোলনে বাস্তব ও সক্রিয় অংশগ্রহণেও তারা বিমুখ, (খ) চতুর

সুবিধাবাদী ভীরু ফোঁপর দালাল শ্রেণী। এরা মুখে মুখে আন্দোলনের সক্রিয় ও খাঁটি সংগঠকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও অন্তরংগতা সৃষ্টিতে তৎপর; শুধু তাই নয়, এরা এভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে যে, দেখলে মনে হয় ধরি মাছ না ছুঁই পানি এদের আদর্শ; আন্দোলনে নেই এ অপবাদও এরা নিতে রাজী না, আবার সরকারী কর্তৃপক্ষের কোপানলেও পড়তে নারাজ। এরা একদিকে আন্দোলনের সক্রিয় ত্যাগী সংগঠকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখে অন্যদিকে আন্দোলনে নিজেদের অংশীদারিত্বের প্রামাণিক দলিল ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদের নিকট হস্তান্তর করে। দেখেছি, সর্বত্রই এ ধরনের ফাঁকিবাজ অতি বুদ্ধিমানদের পোয়াবারো। কারাবরণ করতে হয় না, সময় সুযোগ মত তরুণ বয়সেই বিরোধী দলের জনপ্রিয়তার আনুকূল্যে আইন সভার সদস্য হওয়া যায়– কি মজা। (গ) একনিষ্ঠ, সক্রিয় ও সৎকর্মী। সরকার বা কর্তৃপক্ষ বিরোধী আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ পোষ্টার লেখা হতে আরম্ভ করে অর্থ যোগানো, পুলিশী জুলুম ভোগ, কারাবরণ, প্রতিকূল অবস্থাকে পরোয়া না করে সভা সমিতির আয়োজন অর্থাৎ কোন লোভ লালসার বশবর্তী না হয়ে আন্দোলনের সফলতার জন্য সর্বক্ষণ নিরলস। এই শ্রেণীর আন্দোলনকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য বটে, তবে তারাই মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার পথিকৃত; তারাই সভ্যতার পিলসুজ।

সম্মুখ রণে বাংলা ভাষা আন্দোলন বানচাল করতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভিন্ন পথ গ্রহণ করল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বংগসন্তান ফজলুর রহমান করাচীতে ১৯৪৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। শুধু তাই নয় ১৯৪৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় এই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেন।

১৯৪৯ সালের ১৪, ১৫ এবং ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশনে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক আরবী হরফ প্রবর্তনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনার খবরে বিচলিত ও শঙ্কিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ প্রতিবাদের জন্য কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। এ উদ্দেশ্যে ৭ই ডিসেম্বর (১৯৪৯) রাতে এম.এ. ওয়াদুদ ও মোঃ তোয়াহা ৪৩/১, যোগীনগরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার পর আমি তখন ১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিতব্য বি.কম. পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম।

যা হোক নেতৃদ্বয়ের অনুরোধে পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে যোগ দিই। সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে আমরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সাধারণ সভায় আরবী হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে সরকারের নিকট আহবান জানাই এবং সরকারকে সতর্ক

করে দিই যে, আরবী হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্রসমাজ দেশব্যাপী সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলবে বাধ্য হবে। সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হল। আরবী হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও সরকারী অর্থানুকূল্যে আরবী হরফে বাংলা প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের কয়েকটি নিষ্ফল প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এ কাজে মাওলানা আতাহার আলী প্রমুখ আরবী শিক্ষিত গোঁড়া রাজনীতিবিদ অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ দেশবাসীর সহজাত শুভবুদ্ধি তাঁদের ভ্রান্ত প্রচেষ্টাকে যথাসময়ে ব্যর্থ করে দেয়।

প্রশ্ন ঃ পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কখন গঠিত হয়? যুবলীগ কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রন্ট সংগঠন ছিল কি? বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে যুবলীগের অগ্রণী ভূমিকাকে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কি? যুবলীগ গঠনের সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল।

উত্তর ঃ ১৯৫১ সালের ২৭ ও ২৮শে মার্চ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর অপর তীরে ভাসমান গ্রীনবোটে অনুষ্ঠিত এক উদ্দীপ্ত ও প্রতিবাদী যুব সম্মেলনের মধ্য দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' গঠিত হয়।

যুবলীগ কমিউনিস্ট পার্টির কোন ফ্রন্ট সংগঠন ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুবলীগের কোন দিক থেকেই সংশ্লিষ্টতা ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির কোন কর্মী যুবলীগের সদস্য থাকতে পারে কিন্তু যুবলীগ গঠনে বা পরবর্তী পর্যায়ে এ যুব সংগঠনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব সৃষ্টির কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং ভাষা আন্দোলনে যুবলীগের অগ্রণী ভূমিকাকে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

যুবলীগ গঠনের প্রাক্কালে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই অগণতান্ত্রিক ও অস্বাভাবিক ছিল। বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন নুরুল আমিন সরকার যুব সম্মেলন তথা যুবলীগ গঠনের প্রস্তুতিমূলক তৎপরতাকে সুনজরে দেখেন নি তাই সরকার সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সকল প্রকার চেষ্টা চালান।

পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুবলীগ গঠন করা হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে নিখিল ভারত মুসলিম স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি নুরুল হুদা ও নিখিল বংগ মুসলিম ছাত্রলীগের প্রাক্তন সম্পাদক আনোয়ার হোসেন এক প্রতিনিধিত্বমূলক যুবকর্মী সভায় যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে যুব সম্মেলন আহ্বানের জন্য একটি অভ্যর্থনা

কমিটি গঠন করেন। যুব সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম করি। আমরা কায়েদে আযমের সহোদরা মাদারে মিল্লাত মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ ও পাঞ্জাবের প্রগতিশীল জনপ্রিয় নেতা মিয়া আরিফ ইফতেখার উদ্দিনকে ২৭ ও ২৮শে মার্চ (১৯৫১) ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান যুব সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ ও অনুরোধ পত্র পাঠাই।

এ সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো দুর্যোগপূর্ণ ও সংকটজনক রূপ লাভ করে। পাঞ্জাব আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কিছুকালের মধ্যেই মেজর জেনারেল আকবর খান এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের সরকারকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা নেয়। কিন্তু ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়ায় মেজর জেনারেল আকবর খান ও তাঁর স্ত্রী, পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পাদক সাজ্জাদ জহীর, দৈনিক পাকিস্তান টাইমস্ সম্পাদক উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, বিমান কমোডর ঝানঝুয়া, মেজর ইসহাক ও আরো অনেকে গ্রেপ্তার হন। পাকিস্তানে সরকার উৎখাতের এ প্রচেষ্টা বিখ্যাত রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিতি লাভ করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনজীবী হিসেবে ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পক্ষ সমর্থনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এমনিতেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার যেখানে সেখানে রাষ্ট্রবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আবিষ্কারে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তদুপরি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরোধী দলীয় নেতৃত্ব গ্রহণ ও ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনের দায়িত্বভার গ্রহণ অসহিষ্ণু সরকারকে আরো বিক্ষুব্ধ করে। বস্তুতঃ খোদ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান কার্যালয় রাওয়ালপিণ্ডি সেনানিবাসে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটনের পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো বিপজ্জনক পরিণতির দিকে মোড় নেয়। এমনি ভয়াবহ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জাতির জনক কায়েদে আযমের ভগ্নী মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহ ও পাঞ্জাবের আজাদ পাকিস্তান পার্টির প্রধান মিয়া ইফতেখার উদ্দিন আমাদের আহূত যুব সম্মেলনে যোগদানের অক্ষমতা তারযোগে আমাদেরকে জানিয়ে দেন। এ সত্ত্বেও আমরা মনোবল হারাইনি। নির্ধারিত তারিখে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। পাকিস্তান অবজারভারের সহকারী সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটনের কারণে সৃষ্ট উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে যুব সম্মেলনের তারিখ পিছিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। আমরা সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ও কর্মতৎপরতা বন্ধ না করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন জোর গুজব, যুব সম্মেলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে, ঢাকা বার লাইব্রেরী হল সহ সমগ্র ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হবে।

যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। পরিশেষে ঢাকা

শহরে ১৪৪ ধারা জারী এবং বার লাইব্রেরী হলে সম্মেলন অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারের এ সব স্বৈরাচারী বাধা-বিপত্তি সত্বেও তদানীন্তন পাকিস্তান অবজারভারের স্টাফ রিপোর্টার ও বিভাগপূর্ব আসাম মুসলিম স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের নেতা জনাব তাসাদ্দুক আহমদ চৌধুরীর সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতায় ও সময়োপযোগী পরামর্শে বুড়িগঙ্গা নদীর অপর তীরে ভাসমান গ্রীনবোটে যথারীতি যুব সম্মেলন অনুষ্ঠান করি। বুড়িগঙ্গা নদীর উপর ১৪৪ ধারা জারী ছিল না বলে আমরা এ কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। সন্ধ্যারাত্রি থেকে হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সম্মেলন চলে। অবিভক্ত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন সমস্যা, সরকারী নির্যাতন, ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী প্রসঙ্গ, পূর্ববংগ আইন পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে নতুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ গঠন করা হয় ঃ সভাপতি জনাব মাহমুদ আলী, সহ-সভাপতি সর্বজনাব খাজা আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, সামসুদ্দোহা (টাংগাইল), আবদুল মজিদ এবং মিসেস দৌলতুন্নেসা, সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ, যুগ্ম সম্পাদক আবদুল মতিন ও রুহুল আমিন, কোষাধ্যক্ষ তাসাদ্দুক আহমদ চৌধুরী, কার্যকরী সংসদ-সদস্যবর্গ; সর্বজনাব নুরুল হুদা, মোহাম্মদ তোয়াহা, মতিউর রহমান (রংপুর), আবদুল হালিম (ঢাকা), আবদুস সামাদ (সিলেট), মকবুল আহমদ, কে. জি. মোস্তফা, কবির আহমদ (চট্টগ্রাম), এম.এ. ওয়াদুদ, আবদুল গফ্ফার চৌধুরী, প্রাণেশ সমাদ্দার, তাজউদ্দিন আহমদ, আকমল হোসেন, মোতাহার হোসেন ও মিস রোকেয়া খাতুন।

২৮শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয় যুব সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় তেজগাঁ রেলস্টেশনের নিকটে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন জেলা হতে আগত কালচারাল ট্রুপ এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের মূর্চ্ছনায় যুব সম্মেলনের তারুণ্যদীপ্ত বেপরোয়া মনোভাবেব প্রকাশ ঘটে।

১৯৪৯ সালের শেষার্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ কারাবন্দী হবার পর হতে পূর্ব পাকিস্তানে চরম রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগকে জন্মলগ্ন হতে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। '৫১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে মোহাজেরদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ, লিয়াকত আলী সরকার কর্তৃক মাদারে মিল্লাতের সেপ্টেম্বরের (১৯৫১) বেতার ভাষণের অংশ বিশেষের মাঝখানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা, অক্টোবর মাসে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিরোধী দলীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সক্রিয় প্রতিবাদ এ

সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শুধু তাই নয় লবণের মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য ১৬ টাকা সের দরে বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৩রা নভেম্বর বিকেল ৪টায় আরমানিটোলা ময়দানে জনাব আতাউর রহমান ও কামরুদ্দীন আহমদ যে প্রতিবাদ সভা আহবান করেন তা যুবলীগের সক্রিয় সহযোগিতায়ই সফলতা লাভ করে।

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সাংগঠনিক কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন ২৭-২৮ শে মে (১৯৫১) ঢাকা জেলার নরসিংদিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিল সম্মেলনেও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ হামলা চালাতে কোন প্রকার কসুর করেনি। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব আবদুল মজিদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির দরুন আমরা যে কোনরূপ দুঃখজনক ঘটনা এড়াতে সক্ষম হই।

১৯৫১ সালের ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সরকারের গণবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সচেতন করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমাদের আহবানে বিভিন্ন জেলার যুবকর্মীরা যেভাবে সাড়া দেয়, তাতে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। এ সময়ে এডভোকেট ইমাদুল্লাহ ও আমি ১৬ই নভেম্বর সিলেট পৌঁছি এবং ১৮ই নভেম্বর ফেঞ্চুগঞ্জে আহুত সিলেট জেলা ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করি। ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধনের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। এ সম্মেলনেই পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামে এক নতুন ছাত্র সমিতি গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে এ ছাত্র সমিতিই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক সত্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনেই ছাত্র ইউনিয়নের জন্মের ইতিকথা এ প্রসঙ্গে বললাম। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ঐ একই সালের ২৬শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল ছাত্র কর্মীরা ঐ নামেই পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করে এবং '৫২ সালের নভেম্বরে এ সংগঠনের নাম রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।

সে যা হোক, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে যথাসময়ে অর্থাৎ ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫১) দু'দিন ব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিল সম্মেলনে ১৯৫২–'৫৩ সালের জন্য যাঁরা কর্মকর্তা নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন ঃ

সভাপতি ঃ জনাব মাহমুদ আলী
সহ-সভাপতি ঃ মীর্জা গোলাম হাফিজ, খাজা আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, ইয়ার মোহাম্মদ খান, সামসুজ্জোহা
সাধারণ সম্পাদক ঃ অলি আহাদ
যুগ্ম সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ সুলতান ও ইমাদুল্লাহ
কোষাধ্যক্ষ ঃ মাহবুব জামাল জাহেদী

কার্যকরী সংসদের সদস্য বর্গ ঃ আবদুল হামিদ, আবদুল মতিন, এ.বি.এম. মুসা, নুরুল হুদা, আনোয়ারুল হোসেন, এস. আবদুল বারী, সালাহ্ উদ্দিন, আবদুল ওয়াদুদ, শফি খান, আলী আশরাফ, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, মোতাহার হোসেন, নুরুর রহমান, জিয়াউল হক, মতিউর রহমান, মফিজুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, দেওয়ান মাহবুব কাদের ও প্রাণেশ সমাদ্দার।

প্রশ্ন ঃ এবার বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবহুল এবং রক্তাক্ত অধ্যায় সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাইবো।

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। তিনি আরো বলেন, পরীক্ষামূলক একুশটি কেন্দ্রে বাংলাভাষাকে আরবী হরফে লিখার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে ও জনগণ স্বীয় উদ্যোগে নতুন কেন্দ্র খুলছে।

ছাত্রজনতার তীব্র আন্দোলনের নিকট নতিস্বীকার করে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তদানীন্তন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বেমালুম ভুলে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন জনসভায় উপরোক্ত উক্তি করেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার কারণে ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কতিপয় উৎসাহী ও সংগ্রামী ছাত্র এক কর্মীসভা আহ্বান করে। এই সভায় যুবলীগের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক জনাব আবদুল মতিনকে আহবায়ক নির্বাচিত করে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" বা "Dacca University State Language Committee of Action" গঠন করা হয়। সংগ্রামে যখন ভাটা পড়ে তখন এ ভাবেই গুটিকয়েক সচেতন মন অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করে। জনাব মতিন একটি ইংরেজী স্মারকলিপি তৈরী করেন এবং উক্ত স্মারকলিপি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনসহ পাকিস্তান গণপরিষদের সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ স্মারকলিপির উত্তরেই বোধ হয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকার পল্টন ময়দানের সভায় উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। এতে বিপরীত হল। এর প্রতিবাদেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০শে জানুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। ছাত্রসভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট ছাত্র সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৩০শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরীতে জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অপর এক সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমবায়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয় ঃ

১।	মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	ঃ সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
২।	জনাব আবুল হাশিম	ঃ খেলাফতে রাব্বানী পার্টি
৩।	জনাব শামসুল হক	ঃ সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
৪।	জনাব আবদুল গফুর	ঃ সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক
৫।	অধ্যাপক আবুল কাসেম	ঃ তমদ্দুন মজলিস
৬।	জনাব আতাউর রহমান খান	ঃ আওয়ামী মুসলিম লীগ
৭।	জনাব কামরুদ্দিন আহমদ	ঃ
৮।	জনাব খয়রাত হোসেন	ঃ সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ
৯।	আনোয়ারা খাতুন	ঃ সদস্য
১০।	জনাব আলমাস আলী	ঃ নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগ
১১।	জনাব আবদুল আওয়াল	ঃ নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগ
১২।	সৈয়দ আবদুর রহিম	ঃ সভাপতি, রিকসা ইউনিয়ন
১৩।	জনাব মোঃ তোয়াহা	ঃ সহ-সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
১৪।	জনাব অলি আহাদ	ঃ সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
১৫।	জনাব শামসুল হক চৌধুরী	ঃ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
১৬।	জনাব খালেক নেওয়াজ খান	ঃ সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
১৭।	জনাব কাজী গোলাম মাহবুব	ঃ আহবায়ক, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
১৮।	জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ	ঃ সিভিল লিবার্টি কমিটি
১৯।	জনাব মজিবুল হক	ঃ সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ হল ছাত্রসংসদ
২০।	জনাব হেদায়েত হোসেন চৌধুরী	ঃ সাধারণ সম্পাদক,
২১।	জনাব শামসুল আলম	ঃ সহ-সভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্রসংসদ
২২।	জনাব আনোয়ারুল হক খান	ঃ সাধারণ সম্পাদক,
২৩।	জনাব গোলাম মাওলা	ঃ সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল

কলেজ ছাত্র সংসদ

২৪। সৈয়দ নুরুল আলম	ঃ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
২৫। জনাব নুরুল হুদা	ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
২৬। জনাব শওকত আলী	ঃ পূর্ববংগ কর্মী শিবির
২৭। জনাব আবদুল মতিন	ঃ আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
২৮। জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ	ঃ নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

একুশের কর্মসূচী

বার লাইব্রেরীর এই সভাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা নগর ছাত্র ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয় এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোস্তফা রওশন আখতারের প্রস্তাবক্রমে যুবলীগ নেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কলা বিভাগ প্রাংগণে এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যায়তন হতে ধর্মঘটী ছাত্ররা দলে দলে মিছিল সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগনে জমায়েত হয়। উক্ত সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী যথা হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিলকে সাফল্যমণ্ডিত করার অংগীকার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এবং এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল কতিপয় রাজপথ পরিক্রম করে বিভিন্ন ধ্বনিতে সংগ্রামের ডাক দেয় ও শপথ ঘোষণা করে।

৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ববঙ্গ কর্মী শিবির অফিস ১৫০ নং মোগলটুলীতে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ১১ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে পতাকা দিবস পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করে ও জনসাধারণকে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য দ্বারা আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় সহায়তা করতে আহ্বান জানায়। সরকার যদি ১৪৪ ধারা ইত্যাদি নিষেধাজ্ঞা জারী করে, তাহা হলে আইন ভঙ্গ করা হবে কি হবে না সভায় তাও আলোচিত হয়। বেশীর ভাগ উপস্থিত সদস্যই আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত জ্ঞাপন করেন। কিন্তু আমি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে দৃঢ় মত প্রকাশ করি।

মাওলানা ভাসানী সভাপতির আসন হতে আমার বক্তব্যের সমর্থনে জোরালো ভাষায় ঘোষণা করে বলেন, "যে সরকার আমাদের নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনকে ইচ্ছাকৃতভাবে বানচাল করার জন্য অন্যায়ভাবে আইনের আশ্রয়

গ্রহণ করে, সে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নিষেধাজ্ঞাকে মাথা নত করে গ্রহণ করার অর্থ স্বৈরাচারের নিকট আত্মসমর্পণ।" যাহোক, কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্যতীতই সে দিনকার মত সভা মুলতবী হয়ে যায়।

সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ববংগ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহ্বান করেছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, আহূত বাজেট অধিবেশন পূর্ব পাকিস্তানের তরফ হতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে যথাযথ চাপ সৃষ্টি করুক।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা এবং সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক

এভাবে ৩০শে জানুয়ারী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এবং ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান ও মিছিলের ফলে ঢাকার সাধারণ গণমানস সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বিভিন্ন মহল প্রতিরোধের সক্রিয় কর্মসূচীই সংগ্রাম কমিটির নিকট থেকে আশা করছিল। জনমনে ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টি করার চিরাচরিত পন্থাই সরকার গ্রহণ করল। ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে নুরুল আমিন সরকার ঢাকা শহরে এক মাস মেয়াদী ১৪৪ ধারা জারী করে সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঐ তারিখেই রাত ৭ ঘটিকায় বিভিন্ন হলের ছাত্রবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র এস.এ. বারী এ.টি. নিজস্ব উদ্যোগে আহূত এক বৈঠকে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ১৪৪ ধারাজনিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে ফজলুল হক মুসলিম হল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সভাও ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে রায় দান করে।

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে অগ্রজপ্রতিম জহুর হোসেন চৌধুরীর কয়েকটি সতর্কবাণী উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। জহুর ভাই আমার রাজনৈতিক জীবনকে বিভিন্ন দিক হতে বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন। সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মীরাও রক্ত মাংসের মানুষ। শত অভাব, অনটন, মিথ্যা, নিন্দা ও অপবাদের ঊর্ধে ওঠা তাদের পক্ষে সব সময়ে সম্ভব হয় না। হলেও হৃদয়মন থাকে বেদনার্ত ও রক্তাপ্লুত। জহুর ভাই স্নেহাবিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করে অগ্রযাত্রায় আমাকে সব সময় উৎসাহিত করতেন বটে কিন্তু তাই বলে নীতির প্রশ্নে তিনি নির্মম কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেও সামান্যতম দ্বিধা করতেন না। যেহেতু তিনি মুসলিম লীগ সরকারের বাংলা মুখপত্র দৈনিক সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন, সেহেতু সরকারী উচ্চমহলে তাঁর

আনাগোনা ও উঠাবসা ছিল অবাধ। এ সুবাদেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচীর প্রতি সরকারী মহলের কঠোর মনোভাব তিনি অবগত ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল, জহুর ভাই ততই আমাকে আইন ভঙ্গ করার চিন্তা পরিহার করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারী তাঁর বাসভবনে আলোচনাকালে তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তাঁর খবর অনুযায়ী আন্দোলন দমন করতে সরকার প্রয়োজনবোধে সৈন্যবাহিনী তলব ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে পারে। আমি তাঁকে বিনয়ের সাথে উত্তর দিয়েছিলাম 'Better dead than slave' অর্থাৎ 'দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়'। কেননা নিরস্ত্র সংঘবদ্ধ গণশক্তির বিরুদ্ধে সরকারী দমনমূলক ব্যবস্থা পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এটাই ইতিহাস। উল্লেখ্য যে, জহুর ভাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন দমনের ওছিলায় সরকারী নির্মম আঘাত হয়তো গণতান্ত্রিক শক্তিকেই নির্মূল করে ফেলবে এবং অদূর ভবিষ্যতে আর কোন সরকার বিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

উল্লিখিত সম্ভাব্য সংঘর্ষের পটভূমিকায় ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সদর দফতরে (৯৪ নওয়াবপুর রোড) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হাশিম। বৈঠকে মাওলানা ভাসানীর উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী ছিল। পূর্বাহ্নে আমি তাঁকে ২০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারীর মফস্বল সফরসূচী বাতিল করতে অনুরোধ করি এবং সম্ভাব্য জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য তাঁর ঢাকা উপস্থিতি অপরিহার্য বলে জানাই। কিন্তু মাওলানা ভাসানী তাঁর সফরসূচী বাতিল না করায় এবং জনাব আতাউর রহমান খান আইন ব্যবসার প্রয়োজনে ময়মনসিংহ কোর্টে মক্কেলের মামলা পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকায় উভয়েই ২০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুপস্থিত ছিলেন।

যাহোক, উক্ত সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, সরকার সমর্থক বিভিন্ন হল ছাত্র সংসদের প্রতিনিধি বর্গ–প্রায় সবাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন। সভায় তাঁদের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক নিম্নোক্ত যুক্তির অবতারণা করেন। যথা ঃ

প্রথমতঃ আওয়ামী মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়তঃ গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করে সরকার প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন অনিশ্চয়তার গর্ভে নিক্ষেপ করবে এবং তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

সভাপতির অনুমতিক্রমে আমি আমার বক্তব্য পেশ করতে উঠি। বক্তৃতাকালে জনাব শামসুল হকের বর্ণিত যুক্তিগুলির প্রয়োজনীয় অংশের উত্তরদানের পর বললাম, "১৯৪০ সালে টাংগাইল উপনির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববংগ আইন পরিষদে জনাব শামসুল হককে সদস্য হিসাবে কর্তব্য পালনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাঁর সদস্যপদ চক্রান্ত করে খারিজ ঘোষণা করা হয়েছে। এমন কি টাংগাইল উপনির্বাচনে পরাজিত হবার পর মুসলিম লীগ সরকার অদ্যাবধি আর কোন উপনির্বাচন দেন নি। শুধু তাই নয়, বিনা অজুহাতে আমাদের পুনঃ পুনঃ ঘোষিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বানচাল করার অসদুদ্দেশ্যেই সরকার ১৪৪ ধারা জারী করেছে। অতএব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সরকারকে সমুচিত জবাব দেব। Come what may— যাহা হয় হবে। এতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। এবার যদি সরকারের জালিম ও হঠকারী মনোভাব রুখতে না পারি, তবে ভবিষ্যতে সামান্যতম প্রতিবাদও করতে পারব না। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫১ সালের মার্চ মাসেও সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে ঢাকা জিলা বার লাইব্রেরী হলে যুব সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। এই মুহূর্তে সম্মিলিত গণশক্তি যদি সরকারের অন্যায় আদেশ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয় তা হলে আর কখনো প্রতিরোধ করতে পারবে না। সুতরাং Now or Never".

উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা স্বীয়মত জ্ঞাপনকালে আমার মতের প্রতিধ্বনি না করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। রাত প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে জনাব শামসুল হক সংগ্রাম পরিষদের এই সভায় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন ঃ

" Resolved that in view of the promulgation of the section 144cr. p.c., the programmes of the 21st February are withdrawn & if any member of the All party Committee of Action for State Language defies the decision, the Committee will ipso facto stand dissolved."

উপরোক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমি তৎক্ষণাৎ উচ্চস্বরে 'No' 'No' অর্থাৎ 'না' 'না' বলে প্রতিবাদ করলাম। প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে ভোট গ্রহণ করা হলে আমার সাথে সর্বজনাব শামসুল আলম, সহ-সভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল, আবদুন মতিন, আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ, গোলাম মাওলা, সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদ প্রস্তাবের বিপক্ষে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ভোট দান করেন।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

পূর্বাহ্নে বর্ণিত ফজলুল হক হল ছাত্রসভা, সলিমুল্লাহ হল ছাত্রসভা ও মেডিকেল কলেজ ছাত্র সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে গৃহীত সিদ্ধান্ত ফজলুল হক হলের ছাত্র আবদুল মোমিন ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র জনাব এম, এ, আজমল আমাকে সভা চলাকালেই সভা কক্ষের বাইরে ডেকে জ্ঞাত করান এবং আমি বিশ্বস্ততার সাথে তাঁদের দেয়া বার্তা সভার সদস্যবৃন্দের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করি। মেডিকেল কলেজের ছাত্র জনাব আজমল হোসেনই ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণ হতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রথম দলটির নেতৃত্ব দান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সদর দরজা সংলগ্ন পূর্বদিকস্থ রাজপথে অপেক্ষমান পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। এভাবে জনাব আজমল হোসেন ২১শে ফেব্রুয়ারীর অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সভায় মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বিদ্রোহাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্তর্নিহিত গুরুদায়িত্বের প্রতি স্বীয় সচেতনতা, পরিচ্ছন্ন আন্তরিকতা ও সততার স্বাক্ষর রাখেন। ভুল ও মিথ্যা ইতিহাস বর্ণনার ফাঁদে তিনি আজ হারিয়ে গেছেন, যদিও বাস্তবে একুশের ইতিহাস রচনাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এই রূঢ় সত্য একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ও আন্দোলনে সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর পক্ষেই লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। অপরের জবানী বা বয়ান হতে শুনে এবং অনুমানকে অবলম্বন করে ইতিহাস রচনার প্রয়াস অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়।

যাহোক, সভাশেষে সভাকক্ষ হতে বিমর্ষ মনে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েই নওয়াবপুর রোডে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র যুবলীগ কর্মী নিয়ামুল বশীরের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নিয়ামুল ও তার সংগীগণ আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তাদেরকে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী ভোরবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাবিভাগ প্রাংগণে উপস্থিত হতে বললাম। গভীর রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক যুবলীগ কর্মীবৃন্দ সদর দফতর ৪৩/১, যোগীনগরে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইতিমধ্যে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার নির্ভীক স্থির প্রতিজ্ঞ দৃঢ়চেতা তরুণ যুবলীগ কর্মীবৃন্দ আলোচনায় যোগ দেন। তাঁরা এসেছেন যুবলীগের নির্দেশ জানতে। তাঁরা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তে মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ। তাঁদের সাথে আলোচনায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহণ করি। বস্তুতঃই সাহসী, অকুতোভয়, সরলপ্রাণ যুবলীগ কর্মীরাই ২১শে ফেব্রুয়ারীর অগ্নিপরীক্ষায় স্বীয় জীবন তুচ্ছজ্ঞান করে ১৪৪ ধারাজনিত নিষেধাজ্ঞাকে ভঙ্গ করেছেন, এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য স্থাপন করে গিয়েছেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে দিনকার চরম সন্ধিক্ষণে যুবলীগ কর্মীদের এই নিঃস্বার্থ কর্মধারা ও নির্ভুল নেতৃত্বই পূর্ব পাকিস্তান

তথা পাকিস্তানের রাজনীতির আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। এটাই ছিল পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং দৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর।

শেখ মুজিবর রহমান ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। চিকিৎসার কারণে সরকার তাঁকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। প্রহরী পুলিশের ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততার সুযোগ গ্রহণ করে আমরা তাঁর সাথে হাসপাতালেই কয়েক দফা দেখা করি। তিনি ও নিরাপত্তা বন্দী মহিউদ্দীন আহমদ ১৬ই ফেব্রুয়ারী হতে মুক্তির দাবীতে অনশন ধর্মঘট করবেন সে কথা শেখ সাহেবই আমাদেরকে জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, বরিশাল জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন আহমদ পূর্ববংগ মুসলিম লীগ নেতা হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবের গ্রুপভুক্ত ছিলেন। তাছাড়াও ছিলেন ১৯৫০ সালে বরিশালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাংগায় অন্যতম প্রধান অংশগ্রহণকারী বলে পরিচিত। এ কারণে আমি তাঁর প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করতে কুণ্ঠাবোধ করছিলাম। তবে আমরা নীতিগতভাবে যে কাউকেও বিনা বিচারে আটক রাখার বিরোধী ছিলাম। তাই জনাব মহিউদ্দিনের মুক্তিদাবী জানাতে আমরা সম্মত হই। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জিলা কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে ফরিদপুর যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে নারায়ণগঞ্জ নেতৃবৃন্দের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎ ঘটে। কথোপকথনকালে তিনি যুবলীগ নেতৃদ্বয় জনাব সামসুদ্দোহা ও শফি হোসেন খানকে জানান যে, পথিমধ্যে ষ্টীমারেই ১৫ই ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ১২টার পর নিজ মুক্তির দাবীতে তিনি আমরণ অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করবেন। এ অনশন ধর্মঘট এবং আমাদের আন্দোলনের ফলেই সরকার ১৯শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানকে কারামুক্তি দেয়। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে ফরিদপুর কারাগার হতে তাঁকে গোপালগঞ্জ জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং কারামুক্তির পর তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়াতেই অবস্থান করছিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা

২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টার মধ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন প্রাংগণে যাই। আমার উপস্থিতিতে বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্রকর্মীবৃন্দ বিশেষতঃ যুবলীগ নেতা ও কর্মীরা দ্বিগুণ উদ্যমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে অনুষ্ঠিত ২০ তারিখ রাতের বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এম, আর, আখতার মুকুল সেকথা আমাকে জানান। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা কাজী গোলাম মাহবুব ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রবল ছাত্রমত তাঁদেরকে হতাশাগ্রস্ত করে ফেলে। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করব কিনা, আমার নিকট জানতে চাইলে আমি বললাম, "ওটা সাধারণ ছাত্রসভায় স্থির হবে।" এ কথা বলার পর তাকে কোন প্রকার বচসা বা বাকবিতণ্ডার সুযোগ না দিয়েই আমি দ্রুত অন্যদিকে চলে যাই। কারণ, ২০শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রির সংগ্রাম পরিষদের সভায় কাজী গোলাম মাহবুব ও আমি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রেখেছিলাম। অর্থাৎ কাজী গোলাম মাহবুব ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে দৃঢ়মত প্রকাশ করেছিলেন আর আমি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করি।

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, আর্টস ফ্যাকালটির ডীন ডঃ জুবেরী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নিউম্যানকে নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলার সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে আগমন করলে ছাত্ররা ভাইস চ্যান্সেলার সাহেবকে ছাত্র সভায় সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ জানায়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে না শর্তে তিনি সভাপতিত্ব করতে সম্মত আছেন বলে জানান। সাধারণ ছাত্রবৃন্দ বিনয়ের সাথে তাঁর শর্ত গ্রহণ করতে অসম্মতি জানায়।

যুবলীগ নেতা মোস্তফা রওশন আখতারের প্রস্তাবক্রমে ও যুবলীগ কর্মী কামরুদ্দীন শহুদের সমর্থনে যুবলীগ নেতা জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বেলা ১২টার দিকে সাধারণ ছাত্রসভা শুরু হয়। পরিতাপের বিষয়, ২১শে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের দুর্যোগময় দিনগুলোতে এম, আর, আখতার মুকুল গা ঢাকা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিনি কোলকাতায় পাড়ি জমান। যাহোক, সভা চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক সভায় উপস্থিত হন। তিনি এবং জনাব মোঃ তোয়াহা উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করতে ছাত্র সাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব ও ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নেওয়াজ খানও বক্তৃতায় অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন। এ সময়ে আমি সভা হতে কয়েক গজ দূরে অবস্থিত মধুর কেন্টিনে বসা ছিলাম। সংগ্রামী কর্মীরা বক্তৃতা করে পাল্টা শক্ত জবাব দেবার অনুরোধ জানালে আমি তাঁদেরকে বুঝিয়ে বলি যে, আমি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে চাই কিন্তু সে সঙ্গে এটাও চাই যে, সংগ্রাম পরিষদ অটুট থাকুক। এ মুহূর্তে আমি কোন বিতণ্ডা চাই না। তাছাড়া

আগামী দিনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থেই আমার পক্ষে প্রকাশ্য সভায় কমিটির প্রতি কোন প্রকার প্রকাশ্য অনাস্থা দেখানো ভুল হবে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, আমার এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল। উল্লেখ্য যে, এ সভাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন প্রত্যয়ব্যঞ্জক দৃঢ়তার সাথে তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "জালেম সরকারের নিষেধাজ্ঞা ১৪৪ ধারাকে প্রতিরোধ করা না হলে, অনাগত দিনে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও অবশিষ্ট থাকবে না।" সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে সংগ্রাম পরিষদকে লুপ্ত ঘোষণা পূর্বক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ছয় জন, আট জন ও দশ জনের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় সংকল্পে স্বেচ্ছায় রাজপথে অপেক্ষমান পুলিশবাহিনীর হস্তে গ্রেপ্তার হবার জন্য ভীতিহীন চিত্তে অগ্রসর হতে থাকে। আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জীবিত যুবসমাজের শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল আইন ভঙ্গ আন্দোলনে পুলিশ বাহিনী হতচকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক নিয়োজিত নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উস্কানীদাতাদের উপস্থিতি যে ছিল না, তা নয়। শান্তিপূর্ণ মিছিলকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবার অপপ্রয়াসে এ উস্কানীদাতা দল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণ হতে পুলিশ বাহিনীর উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে দেয়। জবাবে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে জমায়েত ছাত্রদের উপর কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অল্পক্ষণের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের শান্ত সুশৃঙ্খল আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে ছাত্রসাধারণের ধমনীতে। উত্তেজনার এ মুহূর্তেই রাওলাট এ্যাক্টের (১৯১৯) বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত সর্বভারতীয় অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের বিভিন্ন লোমহর্ষক ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী আমার মনের দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দেহমনে এক অপূর্ব নৈতিক সাহস ও আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারিত হল। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন ন্যায় ও সত্যের এ লড়াইয়ে দুর্গম ও বন্ধুর পথে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবার উৎসাহ ও উদ্যম জোগাল। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতেই অবশেষে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করে। পুলিশী হামলার মুখে ছাত্রসাধারণ ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের মধ্যবর্তী অনুচ্চ বাউণ্ডারী প্রাচীর টপকে মেডিকেল হোস্টেলের প্রধান ফটকের নিকট আবার জমায়েত হই এবং সেখান থেকেই পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভবনগামী পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমাদের দাবী পেশ করতে থাকি। এটা ছিল ১৪৪ ধারাজনিত নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের অংশ। উল্লেখ্য যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল তখনকার

পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ভবনের (জগন্নাথ হল মিলনায়তন) অতি সন্নিকটে বর্তমান শহীদ মিনার সংলগ্ন পেছনের বিস্তৃত এলাকায় অবস্থিত ছিল। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের প্রধান ফটকে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে একজন ছাত্রকর্মীর মারফত জানলাম যে, ছাত্রসভার সভাপতি জনাব গাজীউল হক কলা ভবনের দ্বিতলে হঠাৎ করে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন। তাঁকে দেখতে যাওয়া প্রয়োজন। আমি কালবিলম্ব না করে তাঁর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তাঁকে সাহস হারাতে মানা করলাম। বললাম, আপনি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাংগণে আসুন। এই বলে আমি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে চলে আসি। এই চরম সংকটাপন্ন সময়ে তাঁর উপস্থিতি সংগ্রামের মুহূর্তে এত কাম্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এলাকায় উপস্থিত হতে পারেননি। এমনকি ৭ই মার্চ আমার গ্রেপ্তার হওয়া অবধি জনাব গাজীউল হকের সাথে আমাদের আর দেখা হয় নাই। হয়ত বা গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর চোখে ধূলা দিয়ে, পর্বতপ্রমাণ দুর্লংঘনীয় বাধা অতিক্রম করে আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছুবার সকল প্রচেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হয়েছিল।

এদিকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও সংগ্রামী ছাত্র বিক্ষোভকারীদের পারস্পরিক ইট পাটকেল বর্ষণের ফলে অবস্থা ক্রমশঃ আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। এমনি ঘোলাটে পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ধৈর্য, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় না দিয়ে জেলা প্রশাসক কোরাইশী গুলি চালাবার নির্দেশ দেন। হোস্টেল গেইট সংলগ্ন ১১নং ব্যারাকের পার্শ্বে অবস্থানরত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম, এ, ক্লাসের ছাত্র আবুল বরকত বুলেটবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। গুলির আওয়াজে হতচকিত বিক্ষোভকারীরা সম্বিত ফিরে পেতে না পেতেই আমরা সাদা শার্ট ও পায়জামা পরিহিত আবুল বরকতকে রক্তাপ্লুত ও ভুলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখতে পাই। তাঁকে ধরাধরি করে হাসপাতালের উত্তর দিকস্থ প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে হোস্টেল অভিমুখে রওয়ানা দিতেই দেখতে পাই যে, সংগ্রামী বন্ধুরা আর একটি লাশ পাঁজাকোল করে আনছে। নিকটবর্তী হয়ে মাথার দিকে কাপড় তুলতেই দেখতে পেলাম ছাত্রবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ক্লাশের ছাত্র সালাহউদ্দীনের মাথার খুলি নাই। কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই এই দৃশ্য অনুভব করা সম্ভব। এর পূর্ণাংগ বিবরণ আমার দুর্বল লেখনীতে সাধ্যাতীত।

প্রতিক্রিয়া

পুলিশের গুলি শুরু হয় আনুমানিক তিনটার পর। নিহত হন আবুল বরকত, সালাহউদ্দীন, জব্বার, শফিউর রহমান ও নাম না জানা আরও কয়েকজন।

ছাত্রহত্যার খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অফিস, আদালত এবং যানবাহন ধর্মঘটে নেমে আসে। পূর্ববংগ আইন পরিষদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্য মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ মূলতবী প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং জনাব খয়রাত হোসেন ও বেগম আনোয়ারা খাতুন উক্ত প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। গুলি চালনার স্বপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন কর্তৃক সাফাই গাইবার প্রতিবাদে মাওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, দৈনিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বেগম আনোয়ারা খাতুন ও কংগ্রেসদলীয় সদস্যবৃন্দ আইন পরিষদ অধিবেশন হতে ওয়াক আউট করেন। মাওলানা তর্কবাগীশ পার্লামেন্টারী পার্টি হতে পদত্যাগ করে লীগ সদস্যদের মধ্যে প্রথম বিরোধী দল গঠন করেন, আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রথমতঃ পার্লামেন্টারী পার্টি হতে ও পরদিবস অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী পরিষদ সদস্য পদ হতে ইস্তফা দেন।

পূর্ববংগ গভর্ণর ও পূর্ববংগ আইন পরিষদ স্পীকার বরাবর লিখিত ইস্তফাপত্রটি ছিল নিম্নরূপঃ "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে তার প্রতিবাদে আমি পরিষদের সদস্য পদ হতে পদত্যাগ করছি। যে নূরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক, এ ব্যাপারে তাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকতে আমি লজ্জাবোধ করছি।"

ছাত্রহত্যার প্রেক্ষিতে মুহূর্তের মধ্যে ছাত্র আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করায় সরকার ভীত, সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা নাগাদ ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারী ও সেনাবাহিনী তলব করা হয়। গভীর রাত্রে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে মর্গ হতে নিহত ছাত্রদের লাশ অন্যত্র অপসারিত করে। তাই নিহতের মোটসংখ্যা সম্পর্কে দেশবাসীর মনে অনন্তকাল ধরে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন জেগে থাকবে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা মাত্র চার জন, প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে প্রচুর সংশয় রয়েছে। হাসপাতালে ভর্তিকৃত বিশজন আহতের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত ও আবদুল জব্বার (২৭) প্রাণত্যাগ করেন। বাকী সতের জনের অবস্থাও আশংকাজনক ছিল।

শামসুল হকের আগমন

গুলির কিছুক্ষণ পর আনুমানিক অপরাহ্ন চার ঘটিকার দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক খবর পাঠালে আমি সেই শোকাভিভূত

মুহূর্তে মেডিকেল কলেজের হোস্টেল হতে হাসপাতাল ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের গেইটের সম্মুখের ,চত্বরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। সদ্য সংঘটিত মর্মান্তিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমরা উভয়েই মর্মাহত । হৃদয়-বিদারক পরিস্থিতি আমাদের উভয়েরই বাকশক্তি যেন হরণ করে নিয়েছিল । প্রকৃতিস্থ হবার পর অত্যন্ত ধীর ও শান্ত কণ্ঠে উদ্ভূত পরিস্থিতির মূল্যায়নে নিবিষ্ট হলাম । জনাব শামসুল হকের প্রশ্নোত্তরে আমি নিবেদন করলাম যে, সর্বপ্রকার মতবিরোধ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা সঠিক হয়েছে কি না, সে অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণপূর্বক ঐক্যবদ্ধভাবে হত্যাকারী জালেম সরকারের সমুচিত জবাব দিতে হবে । আমি আরও বললাম যে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে । অবশ্য জনাব হকের বক্তব্য ছিল যে, ২০শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রির বৈঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করার ফলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বিলুপ্তি ঘটেছে । উদ্ভূত পরিস্থিতির পটভূমিকায় আমি তাঁর সাথে দ্বিমত ব্যক্ত করলাম এবং দৃঢ়ভাবে বললাম যে, ১৪৪ ধারা ভংগ করাকে অপরাধ বিবেচনা না করে আমাদের আশু কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সংগ্রাম কমিটির নামে সঠিক ও বীরোচিত নেতৃত্ব দান । তদুত্তরে জনাব শামসুল হক দোষারোপ করে মন্তব্য করলেন, "তুমি ও তোমার পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কর্মীরাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী ।" তাঁর সাথে আলোচনা বৃথা বুঝতে পেরে অযথা কালক্ষেপ না করে তাঁকে মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে আসার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি । তিনি আমার অনুরোধের কোন জবাব না দিয়ে কাজী গোলাম মাহবুব ও মোঃ তোয়াহার অবস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাহেন । তাঁকে জানাই যে, গোলাম মাহবুব ও মোঃ তোয়াহা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে তখনও আসেন নি । আমি আরও বলি যে, হয়ত সময় এবং সুযোগমত তাঁরা আসবেন । মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় সবার সাথে দেখা হবে এ আশা প্রকাশ করে আমি ছাত্রাবাস অভিমুখে প্রস্থান করি ।

পরবর্তী কর্মসূচী

ছাত্র হত্যাজনিত বিশেষ পরিস্থিতিতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলটি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের উত্তর দিকস্থ বটবৃক্ষে মাইকের হর্ণ বেঁধে ২০ নং ব্যারাক হতে আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘোষণা ও আহ্বান জনতার উদ্দেশ্যে অবিরাম প্রচার করা হচ্ছিল । মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং যুবলীগের নেতৃস্থানীয় সক্রিয় ব্যক্তিবর্গের যৌথ সভায় আমরা নিম্নলিখিত কর্মসূচী ঘোষণা করি ঃ

(ক) ২২শে ফেব্রুয়ারী ভোর সাতটায় মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস প্রাংগণে গণ-গায়েবী জানাজা এবং (খ) গায়েবী জানাজা সমাপনের পর জনসভা ও জংগী মিছিল। মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের কন্ট্রোল রুম হতে জনতার জ্ঞাতার্থে কর্মসূচী মাইকে বারবার ঘোষণা করা হল।

নেতৃবর্গের ভূমিকা

এদিকে পরিস্থিতি মোকাবিলার তাগিদে আমাকেই উদ্যোগ গ্রহণ করে ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত ন' ঘটিকায় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলস্থ ৪ নং ব্যারাকের ৩ নং রুমে সাহসী ও উৎসাহী কর্মীদের এক সভা আহ্বান করতে হয়। উক্ত বৈঠকে মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা ছাত্রসংসদের সদস্য জনাব গোলাম মাওলাকে অন্তর্বর্তীকালের জন্য অস্থায়ী আহ্বায়ক নিযুক্ত করে আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত্বদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য সদস্যের অনুপস্থিতিতে আমাকে ও জনাব গোলাম মাওলাকে উক্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সর্বজনাব শামসুল হক, মোঃ তোয়াহা, আবদুল মতিন, আবুল হাশিম, আবুল কাশেম, খয়রাত হোসেন, শামসুল আলম (ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি), মুজিবুল হক (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি), হেদায়েত হোসেন চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) ও অন্যান্য সবাই গা ঢাকা দিয়েছিলেন। ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার পর আন্দোলনের দারুণ সংকটময় ও বিপজ্জনক মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নেতৃবর্গ ও সাধারণ কর্মীদের উপর আন্দোলন পরিচালনার সমগ্র গুরুদায়িত্ব বর্তেছিল। বলাই বাহুল্য যে, এই আন্দোলনে জনতা ও নিঃস্বার্থ কর্মীরা অপূর্ব সংগ্রামী চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে এটাই ছিল প্রকৃত পরিস্থিতি। বিভিন্ন মহল বিভিন্ন সময়ে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীকে এবং তার সত্যকে বার বার বিকৃত করেছে। এ প্রবণতা এখনও অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও তাদের খয়েরখাঁগণ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে চরমভাবে বিকৃত করে সুবিধামত ব্যবহার করেছে। পূর্বাহ্নে এই ইতিহাসকে বিকৃত করেছে অতি বামপন্থী লেখকবৃন্দ।

২২শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা

২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল আট ঘটিকায় মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস প্রাংগণে শহীদদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত গায়েবী জানাজায় লক্ষাধিক লোক যোগদান করেন। শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত সমাপনের

পর পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট ইমাদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আহ্বানে আমাকে ২১শের সংগ্রামের তাৎপর্য ও শহীদের আত্মত্যাগের মহিমার উপর বক্তৃতা করতে হয়। উল্লেখ্য যে, আন্দোলনের এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেদিন একা আমাকেই বক্তৃতা করতে হয়েছিল। উক্ত বক্তৃতায় আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী জনতাকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানিয়ে এক পর্যায়ে বলেছিলাম, "শহীদের জন্য ক্রন্দন করব না, বরং ইস্পাতকঠিন শপথ গ্রহণ করব। শাদ্দাদ, নমরুদ ও ফেরাউনের পদাংক অনুসরণকারী খুনী উজিরে আলা নূরুল আমীন সরকারের হত্যার জবাব দেব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মারফত, মাতৃভাষা বাংলাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দ্বারা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দের যাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি নিবেদন, ছাত্রহত্যার পর আন্দোলনে নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে, সর্বপ্রকার মতভেদ পরিহার করে চলুন, ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করি এবং খুনীকে সমুচিত জবাব দিই। হিম্মতে মর্দান মদদে খোদা।" আমার বক্তৃতার পর সভাপতি জনাব ইমাদুল্লাহ তাঁর ভাষণে দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব ইমাদুল্লাহ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় দুরারোগ্য বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯৫৬ সালের ৬ই এপ্রিল ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার রাজনৈতিক গগনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর অকাল মৃত্যুতে এ দেশের যুব আন্দোলন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জঙ্গী মিছিল

যাহোক, পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী আমরা লক্ষাধিক জনতার জঙ্গী মিছিলসহ রাজপথে বের হয়ে পড়ি। এই বিপ্লবী জনতার বিদ্রোহী পদভারে রাজধানীর রাজপথ প্রকম্পিত হয়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অবর্ণনীয়। শুধু হৃদয়ংগম করা যায়, অভিজ্ঞতার কোটরে রাখা যায়, কিন্তু ভাষায় রূপ দেয়া যায় না।

"নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর", "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই", "উর্দু বাংলায় বিরোধ নাই", "খুনী নূরুল আমীনের বিচার চাই", "খুনের বদলা খুন চাই" ইত্যাদি গগনবিদারী ধ্বনি দিতে দিতে দৃপ্ত পদক্ষেপে মিছিল হাইকোর্ট ও কার্জন হল মধ্যস্থিত রাজপথ বেয়ে আবদুল গণি রোডের দিকে মোড় নেয়। সেক্রেটারিয়েট-ইডেন বিল্ডিং আক্রমণ হবার অহেতুক সংশয়ে ভীত পুলিশ বাহিনী মিছিলকে ছাত্রভঙ্গ করার প্রয়াসে লাঠি চার্জ শুরু করে ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। এই

অবস্থায় মিছিলের একটি অংশ কার্জন হল, ফজলুল হক হল ও ঢাকা হল প্রাংগণে প্রবেশ করে। আমরা আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তাদেরকে পুনঃসংগঠিত করি। আপোষহীন শপথের স্বাক্ষর বহনকারী ষাট সত্তুর হাজার লোকের এ জঙ্গী মিছিলটি অতঃপর ঢাকা হলের পশ্চিম দিকস্থ গেইট দিয়ে ধীর পদক্ষেপে নাজিমুদ্দীন রোড, চকবাজার, মোগলটুলী, ইসলামপুর ও পাটুয়াটুলীর উপর দিয়ে সদরঘাট অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। সশস্ত্র সামরিক বাহিনী ভর্তি অসংখ্য ট্রাক পুরনো ঢাকা শহরের রাজপথগুলো অবিরত টহল দিচ্ছিল। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম কালে রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বাড়ীর ছাদ, দ্বিতল ও ত্রিতল বারান্দা হতে আবালবৃদ্ধবণিতা, কিশোর-কিশোরী, পুরবাসিনী সজল নয়নে, কোথাও হাত নেড়ে, কোথাও পুষ্প বর্ষণ করে, কোথাও বা দেশাত্মবোধক শ্লোগান দ্বারা আমাদেরকে অভিনন্দন জানাতে ও উৎসাহ দিতে থাকে। যাহোক মিছিলটি সদরঘাট মোড় হতে ভিক্টোরিয়া পার্ক (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) অভিমুখে রওনা হয়ে জগন্নাথ কলেজের পূর্বদিকস্থ গেইটের নিকটবর্তী হতেই পুলিশ বাধা প্রদান করে। কর্ডন ভাংতে চেষ্টা করতেই পুলিশ মিছিলকারীদের বেদম প্রহার শুরু করে, বেপরোয়া কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে। অবিরাম লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপে টিকতে না পেরে আমাদের মিছিল ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। আমি প্রথমে ড্রেনের ঢাকনীর নিচে ও পরে জগন্নাথ কলেজের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করি। জগন্নাথ কলেজের দারোয়ানের নিকট অবগত হই যে, পূর্বাহ্নে সদরঘাট এলাকা হতে সংগঠিত একটি মিছিল ইংরেজী দৈনিক মর্নিং নিউজ অফিসে অগ্নি সংযোগ করে। তাই পুলিশ কোন মিছিলকে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ভারতীয় চর ও হিন্দু দ্বারা পরিচালিত, এ শিরোনামে মর্নিং নিউজ এক মিথ্যা, বানোয়াট ও অমর্যাদাকর সংবাদ পরিবেশন করায় অত্র এলাকার ছাত্র-জনতা ক্রোধান্বিত হয়ে বাংগালী বিদ্বেষী পত্রিকাটির জুবিলী প্রেস অগ্নিদগ্ধ করে। জগন্নাথ কলেজের পার্শ্ববর্তী বাড়ীর মালিকের অনুমতি গ্রহণপূর্বক সহকর্মী বন্ধুরা আমাকে কিছুক্ষণ ঐ বাড়ীতে লুকিয়ে রাখে। অবস্থা কিছুটা শান্তভাব ধারণ করলে দৃঢ়চিত্ত, সদা সচেতন ও জাগ্রত সহকর্মী বন্ধুদের কড়া পাহারাবেষ্টিত হয়ে চোরারাস্তা ও অলিগলি বেয়ে অতি সন্তর্পনে ও সাবধানতার সাথে আন্দোলন পরিচালনা কেন্দ্র মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের পথে রওয়ানা দিই। সহকর্মী বন্ধুদের সতর্কতা অবলম্বনের কারণ এই ছিল যে, পাশে গোয়েন্দা বাহিনী কিংবা মুসলিম লীগ দালালদের কবলে পড়ি। তাদের এই অকৃত্রিম ভালবাসা, দরদ ও স্নেহ আমার স্মৃতিপটে আমৃত্যু বিরাজ করবে। যাহোক এই সন্তর্পণ প্রস্থানের পথেই কায়েৎটুলীর মোড়ে রেলওয়ে ক্রসিং অর্থাৎ ঢাকা মিউজিয়ামের দক্ষিণ দিকস্থ রাজপথের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় পৌঁছলে সাইকেল গমণরত বন্ধুবর জনাব তাজুদ্দিন আহমদের

সাক্ষাৎ ঘটে। সে আমাকে অনুযোগ ও ধমকের সুরে শীঘ্র সাইকেলে উঠবার নির্দেশ দিয়ে বলে, "এভাবে চললে যে কোন মুহূর্তে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে।" আমি কোন বাক্য ব্যয় না করে তার সাইকেলের সিট ও হ্যাণ্ডেলবারের মধ্যবর্তী ডাণ্ডায় বসে পড়ি। তাজুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আমাকে নামিয়ে প্রস্থানোদ্যত হলে আমি তাকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দিতে বলি। প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে সে মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে যায়। কোন সংকটজনক পরিস্থিতিতে পড়লে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করে হেসে অন্য প্রশ্নের অবতারণা করা ছিল তার স্বভাব। সরকার ও সরকার বিরোধী তথা কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃপক্ষ বিরোধী শক্তিদ্বয়ের সংঘাতে ছাত্রজীবনের সবসময় সে গা বাঁচিয়ে চলত। তাই ছাত্রজীবনে তার গায়ে কর্তৃপক্ষের সামান্যতম আঁচড়ও লাগে নি।

নিহতদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে

ইতিপূর্বে পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসে আক্রান্ত মিছিলের অপর অংশ কার্জন হল, ফজলুল হক হল সংলগ্ন পূর্ব দিকস্থ রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। মিছিলটি অতঃপর রেলওয়ে হাসপাতালের দক্ষিণ দিকস্থ রাজপথ বেয়ে নবাবপুর রেলওয়ে ক্রসিং অতিক্রম করে এবং নবাবপুর রোড দিয়ে সদরঘাট অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। পথে বংশাল রোডে অবস্থিত মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের বাংলা দৈনিক সংবাদ অফিস আক্রমণ করে। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী প্রথমে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে এবং অবশেষে গুলি চালায়। গুলিতে অকুস্থলেই আবদুস সালাম নামক একজন রিক্সাচালক প্রাণত্যাগ করে। মেহনতী জনতার প্রতিভূ আবদুস সালাম এভাবে মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচারণকারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এবং স্বীয় পরিবার পরিজনকে অভাব-অনটনের অকূল সাগরে ভাসিয়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে গেছে যে, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম কেবলমাত্র ছাত্রদের সংগ্রাম নয়, বরং এ সংগ্রাম মেহনতী আপামর বাংলা ভাষাভাষী সকলের। তাঁর এই আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেশবাসীর স্মৃতিতে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকবে। ছত্রভঙ্গ শোভাযাত্রীরা পুনরায় সদরঘাটের পথে রওয়ানা দিলে নবাবপুর রোড়ে অবস্থিত অধুনালুপ্ত 'খোশমহল রেষ্টুরেন্টের' সন্নিকটে হাইকোর্ট কর্মচারী সফিউর রহমান পুলিশের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন। এবং পরবর্তীকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মাতৃভাষার মান রক্ষার সংগ্রামে অকাতরে প্রাণ দেয়ার মত চরম ত্যাগের আহ্বান রেখে যান। ২২শে ফেব্রুয়ারী ভিক্টোরিয়া পার্কের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং নবাবপুর রোড ও বংশাল রোডে সংগ্রামী জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে কতজন শাহাদাৎ বরণ করেছে তা

আমদের কেউই সঠিকভাবে বলতে পারে না। অবশ্য দৈনিক আজাদ ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় ২২শে ফেব্রুয়ারীর গুলিবর্ষণে চারজন নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার সংবাদ পরিবেশন করেছিল। নিহতের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই যে, জালেম সরকার শহীদের লাশ গুম করে ফেলত। তদুপরি ছিল আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা। এর কারণে সঠিক খবর আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আমি যতটুকু জানি, ততটুকুই লিপিবদ্ধ করছি। তবে হাইকোর্টের সম্মুখস্থ রাজপথে মিছিলকারীদের উপর কোন গুলি চালনা করা হয় নি। অতএব সেখানে হাইকোর্টের কর্মচারী সফিউর রহমানের নিহত হওয়ার যে দাবী তা সঠিক নয়। আমি স্বয়ং উক্ত মিছিল পরিচালনা করছিলাম। শফিউর রহমান নিহত হন নবাবপুর রোডের গুলিবর্ষণে। প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ্য যে, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক গায়েবী জানাজায় যোগ দেন নি এবং জানাজার পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ হতে বহির্গত মিছিলের কোন পর্যায়েই তিনি অংশ গ্রহণ করেন নি। যুবলীগ নেতৃবর্গ এবং সাধারণ ছাত্র কর্মীরাই সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক জঙ্গী মিছিল পরিচালনা করেছিলেন। অন্য কোন নেতারই সাক্ষাৎ সেদিন মেলে নি, বরং কোন কোন স্বনামধন্য ব্যক্তি নাগরিক কমিটি নামে আন্দোলনকে পেছন হতে ছুরিকাঘাত করে সরকারী আনুকূল্য কুড়াবার চেষ্টা করেছেন। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, কামরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ এই কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

ঐদিনই অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে আমি মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাংগণে আন্দোলনের চরম মুহূর্তের সহযোগী সর্বজনাব গোলাম মাওলা, মোঃ সুলতান (যুগ্ম সম্পাদক, যুবলীগ) ও জনাব মোঃ ইমাদুল্লাহ ও অন্যান্য নিঃস্বার্থ সক্রিয় কর্মীবৃন্দের সাথে এক সভায় মিলিত হই। সে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৩শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালনের আহ্বান জানাই। ইতিমধ্যে সংগ্রামী ছাত্রদের উদ্যোগে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক হলে আন্দোলনের স্বার্থে কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয় এবং এই কন্ট্রোল রুমগুলো হতে মাইকযোগে প্রচারকার্য অব্যাহত থাকে। আমাদের গৃহীত সাধারণ হরতাল পালনের সিদ্ধান্তও উপরে বর্ণিত হলগুলোর কন্ট্রোল রুম ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কন্ট্রোল রুম হতে প্রচারিত হতে থাকে। এ ভাবেই ছাত্রদের সীমাবদ্ধ আন্দোলন দেশব্যাপী ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

শহীদ মিনার

সে দিনই অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী সূর্যাস্তের সময় মোঃ সুলতান কয়েকজন যুবলীগ

কর্মীসহ আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং যেখানে পূর্ববর্তী দিবসে (২১শে ফেব্রুয়ারী) প্রথম গুলি চালনা করা হয়েছে সেখানে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রস্তাব রাখেন। নিহত সহযোগী ভাইদের প্রতি প্রাণচঞ্চল কর্মীদের অকৃত্রিম মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি আমাকে অভিভূত করে। ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী সম্পর্কে আজ যারা দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থে অসত্য বক্তব্য রাখছেন, তাদের কেউই সে আন্দোলনে কিংবা আবেগঘন ঐতিহাসিক লগ্নে উপস্থিত ছিলেন না। সরল ও সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত দুঃসাহসী কর্মীদের হৃদয়ের অনুভূতি তাঁরা বুঝবেন না। মিথ্যার ফুলঝুরি রচনায় তাই তাঁদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা জাগে না। মাতৃভাষা ও দেশমাতৃকার জন্য প্রথম আত্মোৎসর্গকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম। কোথা হতে ইট, সুরকী, সিমেন্ট ও অন্যান্য মালমশলা যোগাড় হল জানি না, তবে এই প্রাণচঞ্চল তরুণরাই সারারাত ধরে অমানুষিক পরিশ্রমে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করেন। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে যিনি পূর্ববংগ আইন পরিষদের সদস্যপদ হতে ইস্তফা দিয়েছিলেন দৈনিক আজাদ সম্পাদক সেই আবুল কালাম শামসুদ্দিন ২৩শে ফেব্রুয়ারী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি উদ্বোধন করে একদিকে যুব-ছাত্র-জনতার কৃতজ্ঞতাভাজন ও অন্যদিকে জালেম সরকারের চক্ষুশূলে পরিণত হন। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় প্রশ্নে তাঁর সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্বীকার করতেই হয় যে, তাঁর সাহিত্যিক মন সঠিক মুহূর্তেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং সর্বপ্রকার আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে তিনি এই সংগ্রামী চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যাশ্রয়ী ও হৃদয়বান মানুষেরা এভাবেই ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় নিজেদের অবদান রাখেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পুলিশ শহীদ স্মৃতি স্তম্ভটি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। এই প্রথম শহীদ মিনার ভেঙ্গে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স ক্লাসের ছাত্র আলাউদ্দিন আল আজাদ ইকবাল হলে বসে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

"স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার?
ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছিতো যে ভিৎ কখনো রাজন্য
পারেনি ভাঙ্গতে....."

যাহোক, ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এককভাবে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক প্রণীত ওয়াদায় ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ওয়াদা ছিল। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৫৬ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর জনাব আতাউর রহমান খান শহীদ মিনারের ব্লুপ্রিন্ট ও ডিজাইন তৈরীর জন্য প্রখ্যাত স্থপতি হামিদুর রহমানকে নিযুক্ত করেন। শহীদ মিনারের অঙ্গশোভা পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী কামরুল হাসান।

আতাউর রহমান খানের সরকার পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষতার পরিচয় দিলেও দু'বৎসরাধিক ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও স্থপতির ঐকান্তিক চেষ্টায় অঙ্কিত নক্‌শা মোতাবেক শহীদ মিনার নির্মাণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের তদানীন্তন উর্দুভাষী গভর্ণর লেঃ জেঃ আজম খান বর্তমান শহীদ মিনারটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং ১৯৬৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ বরকতের মা উক্ত মিনারটি উদ্বোধন করেন। বলা বাহুল্য যে, লেঃ জেঃ আজম খান নির্মিত শহীদ মিনারটি স্থপতি হামিদুর রহমান কর্তৃক অঙ্কিত নক্‌শার আংশিক বাস্তবায়ন মাত্র।

নূরুল আমীনের ঘোষণা ঃ দেন দরবার

২২শে ফেব্রুয়ারী ভীতসন্ত্রস্ত নূরুল আমিন সরকার কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উক্ত মর্মে সুপারিশ করে। আন্দোলনের ভয়াবহ রূপ অবলোকন করে ২৪শে ফেব্রুয়ারী সরকার পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করে। এদিকে আন্দোলনের বৈপ্লবিক রূপদৃষ্টে আরাম কেদারার রাজনীতিবিদ ও বৈঠকখানার বৈঠকী রাজীনীতিবিদদের আঁতে ঘা লাগে। তাঁরা Citizens Committee বা নাগরিক পরিষদ গঠন করেন এবং ঐ কমিটির তরফ হতে জনাব কামরুদ্দীন আহমদ সমঝোতা আনয়নের জন্য আমাদের ও মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন সরকারের মধ্যে বৈঠকের প্রস্তাব দেন। বৈঠকের এ প্রস্তাবাবলী মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আমাদের কাছে পাঠান হয়। আমরা পরিষদের নেতৃবর্গের প্রতি যথারীতি শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করি, ঢাকায় রাজপথে মিছিলের নেতৃত্ব দিন ও জনতার কাতারে শামিল হোন। এর বিকল্প যে কোন প্রচেষ্টাকে দেশবাসী বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করবে।

এ সময়ে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সদর দরজায় উপস্থিত হয়ে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা চাঁদা দিতে চান এবং আমাকে তাঁর সাথে দেখা করতে খবর পাঠান। সর্বজনমান্য শেরে বাংলা উপরোল্লিখিত নাগরিক কমিটির (Citizens Committee) অন্যতম নেতা এবং তিনি তখনও ঢাকা

হাইকোর্টে নূরুল আমীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সরকারী বেতনভুক এডভোকেট জেনারেল। তাই তাঁর সাথে আন্দোলনের এই সংকটময় মুহূর্তে দেখা না করাই শ্রেয় মনে করি।

রেলওয়ে ধর্মঘট

ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ সুলতান, কাজী আজিজুর রহমান এবং কতিপয় উৎসাহী যুবলীগ কর্মীসহ আমার নিকট রেলওয়ে ধর্মঘট তথা রেলের চাকা বন্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে আসে এবং এ ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চায়। আমি সর্বাত্মক ধর্মঘটের পক্ষে আছি এবং এছাড়া সরকারকে নতজানু করা সম্ভব হবে না বলে তাদের জানাই। তারা কৌশলে রেলের চাকা কার্যতঃ বন্ধ করতে সমর্থ হয়, কিন্তু এর ফলে নাজিরাবাজার ও ঢাকা ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

২৩শে ফেব্রুয়ারীর বৈঠক

কতিপয় সৎ, সাহসী উদ্যোগী কর্মীর প্রচেষ্টায় ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার বিকাল তিনটায় সে সময়ে কারারুদ্ধ কর্মী আজমল হোসেনের মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কামরায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হাশিম। সভাপতির আসন হতে জনাব আবুল হাশিম আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন, "অলি আহাদ, আন্দোলনকে আর কতদূর যেতে চাও এবং আর সামনে নেওয়া সম্ভব কিনা?" সভাপতির প্রশ্নের জবাবে আমি বলি যে, "স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ভাটার চিহ্ন দেখা দিয়েছে। তদুপরি অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার মত সাংগঠনিক শক্তি এ পর্যায়ে আমাদের নেই। সুতরাং honourable retreat বা সম্মানজনক পশ্চাদাপসরণই আমার দৃঢ় মত।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ এই বৈঠকের আহ্বায়করূপে কাজী গোলাম মাহবুবের স্থলে জনাব আতাউর রহমান খানের নাম উল্লেখ করেন। তা সর্বৈব ভুল। ৮ই মার্চ রাত্রে আমরা গ্রেপ্তার হওয়ায় আন্দোলন প্রশমিত হয়ে পরিস্থিতি শান্তভাব ধারণ করলে পরবর্তী সময়ে আতাউর রহমান খানকে কর্মপরিষদের আহ্বায়ক করা হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী রোববার বিধায় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আমরা ২৫শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ সোমবার ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট ও ৫ই মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী হরতাল ঘোষণা করি।

সরকারী জুলুমের আরেক পর্যায়

২৩শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রে জনাব আবুল হাশিম, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং খয়রাত হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত গুহকে নিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ও অন্যান্য ছাত্রাবাসের কন্ট্রোল রুম হতে সরকারের সশস্ত্রবাহিনী মাইক ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং নবনির্মিত স্মৃতি-স্তম্ভটি চুরমার করে দেয়। সরকার শুধু এতেই ক্ষান্ত হয়নি।

অবস্থা আয়ত্বাধীন নয় এ অজুহাতে এবং শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রাকে বলপ্রয়োগে দমিয়ে দেয়ার অশুভ চিন্তা হতেই সরকার আকস্মিকভাবে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পূর্ববংগ আইন পরিষদের বাজেট সেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করেন। জ্ঞানতাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সরকারের চণ্ড নীতির বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে আকস্মিকভাবেই ২৫শে ফেব্রুয়ারী অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং আবাসিক ছাত্রদেরকে ছাত্রাবাস ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। পুলিশ বাহিনী দু' ঘন্টাকালব্যাপী সলিমুল্লাহ হলে তল্লাশী চালায়। একই সঙ্গে হলের হাউস টিউটর অধ্যাপক ডঃ মফিজুদ্দিনকে আটক এবং তাঁর সাথে ৩৯ জন ছাত্রকেও গ্রেপ্তার করে।

কিন্তু সরকারের শত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকার কোন প্রেস নগদ পয়সাতেও ২৫শের হরতাল পালন সংক্রান্ত ইস্তেহার ছাপাতে স্বীকৃত না হওয়ায় যুবলীগ যুগ্ম সম্পাদক জনাব মোঃ সুলতান ও কাজী আজিজুর রহমান নরসিংদি বা ভৈরব হতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে আনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যদিও সে মুহূর্তে ঢাকা শহরে সামরিক বাহিনী, সশস্ত্র ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই, পি, আর), সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী এক বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল তথাপি ২৪শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহরের মধ্যে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বিলি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ কর্মীদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম,ত্যাগী চরিত্র, সুনিপুণ কর্ম-কৌশল, কঠোর শক্তি, অদম্য সাহস ও উদ্যোগ, কর্তব্যনিষ্ঠা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সর্বোপরি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়চিত্ততা ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও অন্যান্য ভীরু ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠির আন্দোলন পরিচালনায় আপোষমূলক নিন্দনীয় ভূমিকার বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য ভরসাস্থল। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ২১শে

ফেব্রুয়ারী ছাত্র রক্তক্ষরণের পর ভাষা আন্দোলনের মূল সাংগঠনিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং সাধারণ ছাত্রকর্মীরা সহায়ক শক্তিরূপে নজিরবিহীন আত্মসচেতনতার সাক্ষ্য বহন করে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর ভবিষ্যদ্বাণী "মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ গর্বের সাথে বলেন, উর্দুই বাংগালী মুসলমানের ভাষা। কিন্তু আমার প্রত্যয় যে, একদিন বাংগালীর সহজ শুভবুদ্ধি প্রমাণ করবে যে, বাংলা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা।" কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি কত নিখুঁত ছিল, ২১শে ফেব্রুয়ারীই তার রক্তস্বাক্ষর।

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কিছু বলুন না।

উত্তর ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রহত্যার পর বিদ্রোহ বহ্নি দাবানলের ন্যায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রাজপথে, জনপদে, নগরে, গঞ্জে, গ্রামে, কোটি কোটি বাঙ্গালীর শিরা-উপশিরায়, ধমনীতে, রক্তকণায় প্রজ্জ্বলিত হয় মুক্তির প্রদীপ্ত মশাল, যার চরমসীমা প্রাপ্তি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে।

যাহোক, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী মোতাবেক নারায়ণগঞ্জ রহমতুল্লাহ ইনষ্টিটিউশনে আহূত জনসভায় যোগদানের জন্য জনাব আবুল হাশিম নারায়ণগঞ্জ গমন করেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা পুলিশের গুলিতে ঢাকার ছাত্রহত্যার বিস্তৃত বিবরণ পেশ করেন। সভাশেষে বিরাট মিছিল পুলিশের গুলির প্রতিবাদে সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা নগরে জালেম সরকারের ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে খণ্ড খণ্ড মিছিলে ২৩শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ হরতাল পালনের আহ্বান জানান হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র নারায়ণগঞ্জে সামসুজ্জোহা, নারায়ণগঞ্জ যুব লীগ নেতা সফি হোসেন খান, ডাঃ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য যুবলীগ নেতা আন্দোলন বিমুখ আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা আলমাস আলী ও আবদুল আউয়ালের শত বাধাকে উপেক্ষা করে পূর্ণ হরতাল পালনের নেতৃত্ব দেন। হরতাল শেষে ইস্ট পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের সভাপতি জনাব ফয়েজ আহমদের সভাপতিত্বে তুলারাম কলেজ প্রাংগণে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। করাচীর ইংরেজী দৈনিক সম্পাদক জেড, এইচ, সুলেরী এই সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা দানের অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। উল্লেখ্য এই যে ২২শে ফেব্রুয়ারী হতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অব্যাহত আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বিচক্ষণ এস, ডি, ও, অবাংগালী জনাব ইমতিয়াজীর প্রশাসন কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা বা হস্তক্ষেপ করে নি।

নারায়ণগঞ্জ মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম ছিলেন নারায়ণগঞ্জ ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। সরকার ও সমাজের সর্বপ্রকার রক্তচক্ষুকে

অবজ্ঞার সাথে উপেক্ষা করে এই অপ্রতিরোধ্য তেজস্বিনী নেত্রী যুবলীগ নেতা সামসুজ্জোহা, শফি হোসেন খান ও ডাঃ মুজিবর রহমানের সাথে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শহীদদের রক্তশপথে নারায়ণগঞ্জবাসীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উজ্জীবিত করেন। অধুনা পথেঘাটে অগ্নিকন্যার দাবী ভূষিত বহুনেত্রীর নাম শোনা যায়, কিন্তু তাঁরা কেউ কি মিসেস মমতাজ বেগমের ন্যায় অগ্নি অতিক্রম করে জনতার চেতনায় স্বীয় ত্যাগ ও কর্মোদ্যম দ্বারা এবং জানমাল ইজ্জতের পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলনের আগুন ছড়াতে কখনও সক্ষম হয়েছেন? সরকার মমতাজ বেগমের এই সাংগঠনিক শক্তি ও সাহস লক্ষ্য করেছিল। তাই ২৯শে ফেব্রুয়ারী মর্গ্যান স্কুল হতে যুবলীগ নেতা সামসুজ্জোহার বাড়ী হীরামহল গমনকালে পথিমধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা তহবিল তসরূফের মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগে পুলিশ বাহিনী মিসেস মমতা বেগমকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে নারায়ণগঞ্জ কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় ও তাঁর পক্ষে জামিন প্রার্থনা করা হলে তা নামঞ্জুর হয়। এমন কি ভাষা আন্দোলন সমর্থক কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি নগদ দশ হাজার টাকা মহামান্য আদালতের নিকট জামিন হিসাবে তৎক্ষণাৎ জমা দিতে যাওয়া সত্ত্বেও মিসেস মমতাজ বেগমকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়নি। ইতিমধ্যে তাঁর গ্রেপ্তারে উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজিত হাজার হাজার জনতা কোর্ট ঘেরাও করে ফেলে এবং মমতাজ বেগমকে নিয়ে পুলিশ বাহিনী ঢাকার পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে ক্রুদ্ধ জনতা সরকারী কারসাজির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়ায়। বিদ্রোহী জনসমুদ্রের অটল অবিচল দৃঢ়তা উপেক্ষা করে পুলিশ ভ্যান জনতার উপর দিয়ে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়। ক্রোধান্বিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ অবশেষে পশুশক্তি প্রয়োগের আদেশ দেয়। পুলিশ জনতাকে বেদম প্রহার শুরু করলে জনতা সাময়িকভাবে ছত্রভংগ হয়ে পড়ে এবং সেই সুযোগে বন্দী মমতাজ বেগমকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়। কিন্তু চাষাড়া রেলওয়ে ক্রসিং-এ বিক্ষুব্ধ জনতা রেলওয়ে গেইট ফেলে দিয়ে পুলিশ ভ্যানের গতিরোধ করে। এস্থলে জনতা ও পুলিশে আরেক দফা সংঘর্ষ বাধে। জজকোর্টে মমতাজ বেগমের জামিনের জন্য জনাব সামসুজ্জোহা ও ডাঃ মুজিবর রহমান ঢাকায় চলে আসায় যুবলীগ নেতা শফি হোসেন খানকেই সেদিনকার সেই সংকটময় মুহূর্তে নেতৃত্ব দিতে হয়। পুলিশের আক্রমণে নিরস্ত্র বিদ্রোহী জনতা এক পর্যায়ে রেলওয়ে রাস্তার পাথর খণ্ডগুলোকে পুলিশের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার শুরু করে। পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা পুলিশ অফিসার জনাব দেলওয়ার হোসেন আহত হন। ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি হতে হাজার হাজার জনতা আন্দোলনে শরীক হয়। তারা চাষাড়া হতে পাগলা পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় মাইল রাস্তায় একশ' ষাটটি বটগাছ কেটে

ঢাকামুখী পথকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। বেগতিক অবস্থাকে আয়ত্বে আনবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ শেষমেষ পাকিস্তান রাইফেলসকে তলব করে। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য খান সাহেব ওসমান আলীর বাসস্থান 'বায়তুল আমান' খানাতল্লাসী করা হয়। তল্লাসীকালে 'বায়তুল আমানের' বহু টাকা-পয়সা ও সোনা-গহনা লুট হয়,বহু বাড়ী-ঘরেরও বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং শুধু খান সাহেব ওসমান আলীকেই নয়, পুলিশ তাঁর পুত্র মোস্তফা সারওয়ারকেও গ্রেপ্তার করে। সেই আন্দোলনের মূল কর্ণধার যুবলীগ নেতা শফি হোসেন খান, মিস্ত্রী ইলা বক্শী ও ছাত্রী বেলুও গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারকৃত অপর বন্ধু কমরুদ্দীন ও দবিরকে পুলিশ বেদম প্রহার করে। দিন কয়েকের মধ্যেই সামসুজ্জোহা, জামিল, লুৎফর রহমান এবং সাত বৎসর বয়স্ক বালক মেসবাহউদ্দীন কারারুদ্ধ হয়। ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা কোতওয়ালী থানায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর ১লা মার্চ বন্দীদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চালান দেয়া হয়। অপরিণামদর্শী নূরুল আমীন সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে পাঁচজন আইন পরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলী, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জী ও মাদার বক্সকে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার কারণে অনেককেই গুরুতর মাশুল দিতে হয়েছে। কারাগার হতে বণ্ড সই করে মুক্তি ক্রয় করতে অস্বীকার করলে মিসেস মমতাজ বেগমকে তাঁর স্বামী তালাক দেন। এভাবেই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যোগ দেবার অপরাধে মমতাজ বেগমের সংসার তছ্নছ হয়ে যায়। তাঁর এ ত্যাগ আমরা মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছি কি? এবং সেই অনুযায়ী জাতির কর্ণধারগণ তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছেন কি?

সরকারী অপপ্রচার

সরকার আন্দোলন পরিচালনাকারীদেরকে ভারতীয় অর্থে পুষ্ট ভারতীয় অনুচর বলে অপবাদ দিতে সামান্যতম কসুর করেনি। নারায়ণগঞ্জ-কালীবাজারে আততায়ীর গুলিতে নিহত প্রহরারত কনষ্টেবল সৈয়দ জোবায়েদ ও আহত আনছার খলিল আহমদের পরিবারদ্বয়কে যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা ও ২ হাজার টাকা এককালীন ক্ষতিপূরণ দান করা হয়। জনমন বিষিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই উক্ত ক্ষতিপূরণ দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণাকালে ২রা মার্চ মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বলেন যে, ভারতীয় অনুচরেরাই উক্ত নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। কিন্তু আপামর দেশবাসী নূরুল আমিন সরকারের এ অভিযোগকে অবজ্ঞার সাথে উপেক্ষা করে। শুধু তাই নয়, শহীদ মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হলে—কেবল নগদ অর্থই নয়, বহু লোকই উক্ত স্মৃতিস্তম্ভ বেদীতে সোনাদানা দিয়ে তাদের ব্যথিত হৃদয়ের অর্ঘ্য রেখে গিয়েছেন।

কোন কোন মহিলা নিজ গলায় পরিহিত সোনার হার স্বীয় হস্তে স্মৃতিস্তম্ভ বেদীতে অর্পন করেছেন। এ সমস্ত অমূল্য দান আমি মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা রাখতে বলি এবং আমরা সমবেতভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিই যে, আন্দোলনের বিভিন্ন খরচ তথা হতে নির্বাহ করা হবে।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল কেন্দ্রে সংগৃহীত অর্থ জনাব আখতার উদ্দিন আহমদের নিকট জমা ছিল। সুতরাং সরকারী অভিযোগ বা কুৎসা অনুযায়ী বিদেশী অর্থের কোন খবর অন্ততঃ আমরা যারা চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে আন্দোলন পরিচালনা করেছি জানতাম না। সরকার হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই আমাদেরকে অনর্থক হিন্দুস্থানের দালাল বলে দেশে-বিদেশে প্রচার করেছে।

আন্দোলনে ভাটা

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন স্বাভাবিক নিয়মেই গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। আন্দোলনে ভাটা দেখা দেয়। সাংগঠনিক শক্তির অভাবে এ ভাষা আন্দোলনকে বৈপ্লবিক কোন আন্দোলনে রূপান্তরিত করা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। তদুপরি সরকারী তৎপরতা ও দমননীতির দরুন আন্দোলনের অভ্যন্তরেও বিশ্বাসঘাতকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিও অর্থ প্রলোভনে পড়ে বা কারা-নির্যাতনের ভয়ে আমাদের আশেপাশে অবস্থান করেই আমাদের কর্মতৎপরতা ও অবস্থান সম্পর্কে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে নিয়মিত রিপোর্ট করতে থাকে। সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলোতে আন্দোলনের স্বার্থেই আমাকে আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলে অবস্থান করতে হয়েছিল। মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের ৭ নম্বর ব্যারাকের ৫ নম্বর রুমে আমার বাল্যবন্ধু আলী আজগর, নজরুল ইসলাম ও কাসেদুল হক থাকত। আমি তাদের সাথে রাত্রি যাপন করতাম এবং আমার সবকিছুই তারা অত্যন্ত দরদের সাথে দেখাশোনা করত। আমার নিরাপত্তার প্রতিও তারা সজাগ ছিল। এটা কেবলমাত্র বন্ধুত্বের নিদর্শন নয়, অকৃত্রিম দেশপ্রেমের অকাট্য প্রমাণও বটে।

হোম (স্পেশাল) ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র (বিশেষ) বিভাগ কর্তৃক ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত ঢাকা গেজেটে (এক্সট্রা অর্ডিনারি) গভর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী হতে ৩০ দিনের মধ্যে স্ব স্ব জিলা প্রশাসকের নিকট হাজির হবার নির্দেশ দেন ঃ

কাজী গোলাম মাহবুব, আহ্বায়ক, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, বরিশাল; খালেক নেওয়াজ খান, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ময়মনসিংহ;

শামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, ময়মনসিংহ; অলি আহাদ, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, ত্রিপুরা; আবদুল মতিন, আহ্বায়ক, বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, পাবনা; সৈয়দ এম, নূরুল আলম, পাবনা; আজিজ আহমদ, নোয়াখালী; আবদুল আওয়াল, ত্রিপুরা; মোঃ তোয়াহা, সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটি, নোয়াখালী। ২১শে ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জ মর্গান গার্লস হাই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস মিসেস মমতাজ বেগমকে গ্রেপ্তারের ফলে নারায়ণগঞ্জে যে গণ অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল এবং তা দমাতে সরকার যে কি পাশবিক শক্তি ব্যবহার করেছিল নজীরবিহীন সেই ঘটনার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। সে সময়ে নারায়ণগঞ্জ শহরে যে কারফিউ বা সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছিল, সেই সান্ধ্য আইন ৭ই মার্চ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এ সময়ের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ হতে দু'জন ছাত্রীসহ মোট একশ' পনের জনকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়। আমি আত্মগোপন অবস্থায় নারায়ণগঞ্জ অভ্যুত্থানের নায়কদের অন্যতম পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ সহ-সভাপতি সামসুজ্জোহা ও ডাঃ মুজিবর রহমানের সাথে ঢাকাস্থ মদন মোহন বসাক রোডের (বর্তমান টিপু সুলতান রোড) জনাব আবদুল জলিলের বাসভবনে সাক্ষাৎ করতাম এবং আন্দোলনের বিভিন্ন করণীয় দিক বনাম বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করতাম।

গ্রেপ্তার

৫ই মার্চ আহূত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ হরতাল, মিছিল ও সভা সরকারী কঠোর দমননীতির জন্য আশানুরূপভাবে সফল হতে পারেনি। এমতাবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণকল্পে ৭ই মার্চ শুক্রবার রাত সাতটায় ৮২ নং শান্তিনগরে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভা আহ্বান করা হয়। ৮২ নং শান্তিনগর যাওয়ার পথে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র যুবলীগ কর্মী আনিসুজ্জামান আমার পথ প্রদর্শক ছিলেন। সভায় আমি ব্যতীত কাজী গোলাম মাহবুব, জনাব আবদুল মতিন, মীর্জা গোলাম হাফিজ, জনাব মুজিবুল হক, (সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রসংসদ), হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, (সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ) এবং মোঃ তোয়াহা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মোঃ সাদেক খান ও আবদুল লতিফ, হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামানও উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সভা সমাপ্তপ্রায়, এমন সময়ে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ৮২ নং শান্তিনগর ঘেরাও করে। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পুনঃপুনঃ সতর্কবাণী সত্ত্বেও জনাব মোঃ তোয়াহার অতিরিক্ত বক্তব্য ও একই বক্তব্য বারবার বলার প্রচেষ্টায় সভার কাজে অনর্থক কালক্ষেপণ হয়েছিল। জনাব তোয়াহার অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘায়িত বক্তব্যই এই

দুর্ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। পুলিশের পদধ্বনি পাওয়ামাত্র তাকিয়ে দেখি আমরা পুলিশ পরিবেষ্টিত। তথাপি পুলিশের গ্রেপ্তারী এড়াবার চেষ্টায় কেউ চাকর সেজে, কেউ বা ঘরের কোণায় গৃহবাসী হয়ে পুলিশকে ফাঁকি দিতে চাই, কিন্তু কিছুই হয়নি। তবে কাজী গোলাম মাহবুব ঘরের বাঁশের মাঁচার উপর এমনভাবে শয়ন করেছিলেন যে, পুলিশের শ্যেন দৃষ্টিও তাঁকে আবিষ্কার করতে পারে নি, যদিও সংবাদদাতার তালিকায় কাজী গোলাম মাহবুবের নাম ছিল। কোন এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামান (পরবর্তীকালে ডক্টরেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) কে গ্রেপ্তার করে নি। বাকী সবাইকে নিয়ে কোতওয়ালী থানা হাজতে আটক রাখা হয়। খবর পাওয়ামাত্র ঢাকা সিটি সুপারিন্টেনডেন্ট জনাব মাসুদ মাহমুদ হন্তদন্ত হয়ে আমাদেরকে দেখতে আসলেন। এক নজর আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি থানা অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন "Have you linched them" অর্থাৎ "বেত্রাঘাত করেছ কি?" তার প্রশ্নে আমরা ক্ষোভে, অপমানে ও ক্রোধে গড়গড় করছিলাম।

ঢাকা ওয়াইজ ঘাটে অবস্থিত গোয়েন্দা বিভাগের সদর দফতরে আমাকে ও আবদুল মতিনকে স্থানান্তরিত করা হয়। ৮ই মার্চ সকাল ন'টায় গোয়েন্দা বিভাগের সদর দফতরে তদানীন্তন আই, জি, পি, জাকির হোসেন ডি, আই, জি, ওবায়দুল্লাহ, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ডি, আই, জি, হাফিজুদ্দিন ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সুপারিন্টেনডেন্ট তসলিম আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমার দিকে চেয়ে মজার প্রশ্ন করেন আই, জি, পি, জাকের হোসেন, "এই নাকি প্রধান মন্ত্রী?" উক্ত মন্তব্যের নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে হতচকিতভাবে তাঁর দিক তাকালাম। পরবর্তীকালে অবগত হই যে, আমরা নাকি 'সুইসাইড স্কোয়াড' করেছি এবং আমার নেতৃত্বে নাকি অস্থায়ী বিকল্প সরকার গঠিত হয়েছে। বাহবা দিতে হয় সংবাদদাতাগণকে। গোয়েন্দা বিভাগ যে কাল্পনিক তথ্য সংগ্রহে কত পারদর্শী, উপরে বর্ণিত তথ্যাবলী হতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোয়েন্দা বিভাগ সদর দফতরে পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি আমাকে অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদকালে তাদের প্রশ্নের উত্তর বড় একটা দিতাম না। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা নানা রকম ভয়ভীতি দেখাতো, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করত ও সময়ে সময়ে প্রহার করত। তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, আমরা ভারতীয় অর্থ ও কারসাজিতেই এ ভয়াবহ গণআন্দোলন সৃষ্টি করেছি। অথচ তাদের এ অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। এটা মিথ্যা বানোয়াট। এটা আমরা স্বপ্নেও চিন্তা করিনি। সুতরাং আমার জবানীতে মিথ্যা স্বীকারোক্তি কেন করতে যাব? ১২ই মার্চ সন্ধ্যা হতে এক হাবিলদার আমাকে ক্যান্টনমেন্টে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে খবর দিয়ে গেল।

উদ্দেশ্য ফৌজি ছাউনিতে দৈহিক নির্যাতন চালানো। তাহলে সকল গোপনীয় খবর প্রকাশ করে দেব। আমি মনে মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করে মানসিক প্রস্তুতি নিলাম। দৈহিক নির্যাতন যতই হোক মিথ্যা স্বীকারোক্তি করব না। যে ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও জানি না তার খবর বলব কোথা হতে? যাহোক পুলিশ রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় নি। পথ হতেই ফিরিয়ে এনেছিল। ক্যান্টনমেন্টে যাবার পথে কেবলই "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল গান" রচনাকারী জুলিয়াস ফুঁচিকের অকথ্য পাশবিক অত্যাচার সহ্য করার কাহিনী আমার মনে সাহস ও মনোবল যোগাত।

১৩ই মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠাবার পূর্বক্ষণে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ডি, আই, জি, হাফিজুদ্দিন আহমদের সাথে আমার পুনঃ পুনঃ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। কারাগারের দেওয়ানী ওয়ার্ডে খন্দকার মোশ্‌তাক আহমদ, মীর্জা হাফিজ, মোঃ তোয়াহা, দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম পূর্ব হতেই ছিলেন। এক আপত্তিকর সংবাদ লেখার কারণে সরকার ইংরেজী দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। তাঁরা সবাই ভাষা আন্দোলনের শিকার। কিছুদিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিভাগ প্রধান ও রীডার ডঃ পি, সি, চক্রবর্তী আমাদের সাথে যোগ দেন। ডঃ চক্রবর্তীকে সংগদানের প্রয়োজনে দেওয়ানী ওয়ার্ডে বেশীর ভাগ সময় তাস ব্রীজ খেলতে হত। কারণ শ্রদ্ধেয় ডঃ চক্রবর্তীকে প্রফুল্লচিত্ত রাখার নিমিত্ত সংগদান আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে মুচলেকা সই করে রাজনীতি করব না অংগীকার করে মীর্জা গোলাম হাফিজ কয়েদখানা হতে মুক্তি ক্রয় করলেন।

ইতিমধ্যে সর্বজনাব শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, সৈয়দ নূরুল আলম ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জেলা প্রশাসকের নিকট হাজিরা দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির জয়ধ্বনি করে স্বেচ্ছায় কারান্তরালে প্রবেশ করলেন। জেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে দেওয়ানী ওয়ার্ড হতে ৫নং ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করল। ৫নং ওয়ার্ডে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশিম, শামসুল হক, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান, আজিজ আহমদ, মোঃ তোয়াহা, শওকত আলী, হাশিমুদ্দিন আহমদ, আবদুল মতিন, ফজলুল করিম ও আমি একত্রে বাস করতাম। সর্বপ্রকার আশা নিরাশার আলো-ছায়া খেলায় বৃদ্ধ মাওলানা ভাসানী সকলের নিকট পিতৃসুলভ স্নেহ, মায়া, মমতা এবং সাহস, উৎসাহ ও দৃঢ়তার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়া ও ঔষধ-পথ্যে যাতে

অসুবিধা না হয় তার জন্য তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে সুকৌশলে জয় করে রাখতেন। মোদ্দা কথা, তাঁর অপত্য স্নেহ ও নির্ভীক মন সে সময়ে দুর্লভ প্রেরণার উৎস ছিল।

ভীরু নেতারা মন্ত্রী, মেম্বার ও সমাজে গণ্যমান্য হবার খায়েশ রাখেন। কিন্ত সরকারী লাঠিপেটা খেতে প্রস্তুত নহেন। জনাব হাশিমুদ্দিন আহমদ ময়মনসিংহ জেলা কারাগার হতে স্থানান্তরিত হয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আসেন। জনাব আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ হতে এক চিঠিতে হাশিমুদ্দিন সাহেবকে বণ্ড সই করে মুক্তি ক্রয় করতে উপদেশ দিয়ে পাঠান। কত সামান্যর জন্যই না আমাদের চেতনা বিক্রয় হতে প্রস্তুত। আর নেতার চরিত্রই যখন এরূপ, তখন অনুসারীদের চরিত্র উচ্চমানের হবার সুযোগ কোথায়? বোধহয় নেতৃবৃন্দের মেরুদণ্ডহীন চরিত্রের কারণেই গণতান্ত্রিক রাজনীতি একনায়কত্ববাদী দর্শনে বিশ্বাসী রাজনীতির নিকট ক্রমশঃ পরাজয় বরণ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অমান্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকে immoral বা নীতি বিগর্হিত বলে আমাদের নিন্দা করতেন। কিন্তু অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিত গুহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের যারা বিরোধী তাদের কাউকেও গ্রেপ্তার করা ন্যায়তঃ সঠিক হয়নি তবে, নির্যাতনই যে সরকারের অস্তিত্বের ভিত্তি, তাদের পক্ষে শাসনদণ্ডের বিবেকপ্রসূত ও নীতিগত ব্যবহার নয় বরং বিদ্বেষমূলক ব্যবহারই স্বাভাবিক। কেননা মূল প্রতিপাদ্য লক্ষ্যই হল সর্বপ্রকার বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়া।

ইতিমধ্যে জাষ্টিস এলিস-এর নেতৃত্বে ২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ কর্তৃক গুলি চালনার যথার্থতা বিবেচনার জন্য প্রকাশ্য তদন্ত শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ডঃ এম, ও, গণি তদন্ত কমিশন সমীপে সাক্ষ্য দানকালে বলেন যে, তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারীর দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় একমাত্র 'অছাত্র' অলি আহাদকে দেখেছেন।

ডঃ গণির এই সাক্ষ্যদানে আমার নামোল্লেখ দেখে মোশতাক ভাই বলতেন যে, উস্কানিদাতা হিসেবে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হতে পারে। কেননা জনাব শামসুল হক ও জনাব তোয়াহাও ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা যেহেতু ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন সেহেতু তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

আন্দোলন যখন সার্বজনীন রূপ ধারণ করে সংগ্রামী জনতা তখন মাঠে হোমরা-চোমরা নেতাদের মুখনিঃসৃত বাক্যের অপেক্ষায় থাকে না। আন্দোলনের আগে বহু নেতা, উপনেতা, তার্কিক, দার্শনিক ও মেকী দেশসেবক আসন জমাবার সার্বিক

প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য কিছু ফায়দা লুটা যায় কিনা, অথবা ফটকাবাজারীতে ফাঁকতালে জনতার নেতা হওয়া যায় কিনা। আন্দোলন যতই ভয়াল রূপ ধারণ করে, অগ্নিপরীক্ষা ততই নিকটবর্তী হয়, আর মোনাফেক, কাপুরুষ, স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দ জনতাকে অসহায় অবস্থায় আগ্নেয়গিরি উদ্‌গারিত উত্তপ্ত লাভার উত্তাল তরংগে ফেলে দিয়ে স্বীয় প্রাণ নিয়ে দৃশ্যপট হতে হাওয়া হয়ে যায়। আন্দোলন যখন সফলতা অর্জন করে ও আন্দোলনকাল উত্তীর্ণ হয়ে পরিস্থিতি শান্তভাব ধারণ করে, তখনই ঐ সকল বিশ্বাসঘাতক, সুযোগসন্ধানী, অতি চতুর ব্যক্তি সময়োপযোগী মুখোশ পরিধান করে সংগ্রামী জনদরদী ও দেশ দরদীর লেবাসে সর্বত্র বুক ফুলিয়ে পাঁয়তারা করতে থাকে। বর্ণিত বক্তব্য তিক্ত বটে কিন্তু নিরেট সত্য ও আমার নির্মম অভিজ্ঞতা প্রসূত। কেউ কেউ আন্দোলন সম্পর্কিত বই লিখেন, খবরের কাগজে প্রবন্ধ ছাপেন, রেডিও টেলিভিশনে আন্দোলনের কাহিনী বিবৃত করেন, অথচ আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা সন্ধিক্ষণ মুহূর্তে তাঁদের অনেকের টিকিটি দেখা যায়নি। কেউ কেউ আবার আন্দোলনে স্বীয় ন্যাক্কারজনক ভূমিকার কথা স্মরণ করে নিজ নিজ বিবেকের নিকট লজ্জাবোধ করা দূরে থাকুক, বেমালুম প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী বলে দাবী করে বিকৃত ইতিহাস বয়ান করতে থাকেন। এদের পক্ষে প্রকাশ্যে কিছু বয়ান করার পূর্বে আয়নায় স্বীয় চেহারাটা দেখা বোধ হয় দোষের হবে না। যাহোক কারাগারের কথা বলছিলাম, বিভিন্ন ওয়ার্ডের বন্দীদের মেলামেশা করার কোন নিয়ম নেই। তবুও কর্তৃপক্ষের হাজার সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন পন্থায় যোগাযোগ করা হয়, যেমন ঃ জুমার নামাজের দিন মসজিদে আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হত ও সেখানেই আমরা প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংলাপ সম্পন্ন করে নিতাম। অথবা চিকিৎসার অজুহাতে হাসপাতালে গমন করলেই পূর্ব খবরাখবর মোতাবেক নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা হত ও পূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা হত। শেখ মুজিবুর রহমান এ দুটি পন্থার কথাই অবহিত ছিলেন। তাই বোধ হয় ক্ষমতাসীন হবার পর ১৯৭২ সাল হতে কয়েদখানায় জুমার নামাজ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট মসজিদটি তুলে দিয়েছিলেন এবং কারাগারে জুমার নামাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে কারান্তরালে থাকাকালেই দুঃখের সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের এই মর্মান্তিক সিদ্ধান্তটি অবগত হই।

আন্দোলন পরবর্তী ঘটনাবলী

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরই পাকিস্তান সরকারের প্রস্তাবক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট ভিসা প্রথা প্রবর্তন করা হয়। পাসপোর্ট ভিসা প্রবর্তনের

পূর্বমুহূর্তে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে কমিউনিষ্ট রাজবন্দীদের নিকট সরকারের তরফ হতে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, যাঁরা পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারত গমনে প্রস্তুত তাঁদের কারামুক্তির প্রশ্ন সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে কমরেড অমর চক্রবর্তী, বেনু ধর, শিবানী আচার্য, সুশীল সেন, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার হতে কমরেড মনসুর হাবিব, সুবোধ রায়, কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও অন্য কয়েকজন বন্দী মাতৃভূমি ত্যাগ করে নিরাপত্তার অন্বেষণে ভারতভূমি অভিমুখে পাড়ি দিলেন।

রাজবন্দীর মুক্তি ও অন্যান্য দাবীতে মাওলানা ভাসানী লেবুর রস পানে রোজা রাখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমরাও বন্দী মুক্তি ও কতিপয় দাবীর ভিত্তিতে পূর্ণ অনশন ধর্মঘটের পরিবর্তে মাওলানা ভাসানীর পরামর্শ মত ৩৫ দিন অনুরূপ রোজা রাখি। আমরা কারারুদ্ধ থাকাকালে রাজনৈতিক আকাশে কিছু শুভ ও অশুভ ঘটনা ঘটে। মাটির সন্তানকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায়িকতা সযত্নে পরিহার করতঃ রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই দারুণভাবে অনুভব করছিলেন। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে জনাব মাহমুদ আলীর প্রচেষ্টায় 'পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল' গঠিত হয়। গণতন্ত্রী দল গঠনকালে আহুত সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তান হতে আজাদ পাকিস্তান পার্টির দুই নেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিন ও শওকত হায়াত খান যোগদান করেন। এ সম্মেলনেই হাজী মোঃ দানেশকে সভাপতি ও জনাব মাহমুদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক (সেক্রেটারী জেনারেল) নির্বাচিত করে 'পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল' গঠন করা হয়। সে সব ঘটনা রাজনীতির আরেক অধ্যায়।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

[অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে অতি পরিচিত ও বিশিষ্ট একটি নাম। জ্ঞানের গভীরতা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি প্রায় সর্বমহলে এখন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৪৮ সালে সিলেট থেকে প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র সাপ্তাহিক 'নও বেলাল' পত্রিকার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। 'নও বেলাল' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি যে বলিষ্ঠ 'কলম-সৈনিকের' ভূমিকা পালন করেন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর গুলি বর্ষণের সংবাদ যখন সিলেটে পৌঁছে তখন তিনি সুনামগঞ্জ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। সুনামগঞ্জে তাঁর বাসার সামনে থেকেই ভাষা আন্দোলনের মিছিল বের হয়। '৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য পরবর্তী সময়ে সরকারের চক্ষুশূল হয়ে তাঁকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ১৯৪৯ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনের সূচনাকারী সংগঠন 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসে'র সভাপতি নির্বাচিত হন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের জন্ম ১৯০৬ সালের ২৫শে অক্টোবর মোতাবেক বাংলা ১৩১৩ সালের ৯ই কার্তিক শুক্রবার। তাঁর জন্ম হয় সুনামগঞ্জ শহরের তেঘরিয়া মহল্লায় তাঁর নানা বিখ্যাত মরমী কবি হাসন রাজার বাড়ীতে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস সুনামগঞ্জের দুহালিয়া। পিতা দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ ছিলেন দুহালিয়ার জমিদার এবং বৃটিশ যুগের জাতীয়তাবাদী নেতা।

জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় দুহালিয়া মধ্য ইংরেজী স্কুল থেকে। সুনামগঞ্জ জুবিলী হাই স্কুল থেকে ১৯২৫ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৭ সালে মুরারী চাঁদ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০ সালে ডিস্টিংশন সহ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৩২ সালে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫০ বছর তাঁর শিক্ষকতা জীবন অব্যাহত রয়েছে। আশি বছর বয়স অতিক্রম করে এখনও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় রত। প্রকাশিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ মিলে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ২০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

দার্শনিক সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত সাক্ষাৎকার কিছু ব্যতিক্রমী তথ্য সংযোজন করবে।]

প্রশ্ন ঃ ভাষা আন্দোলনে সাপ্তাহিক 'নও বেলাল' পত্রিকার বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। আপনি 'নও বেলাল'-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন। 'নও বেলালে'র এ ভূমিকা সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে আগ্রহী।

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে মাহমুদ আলী ও আমি যৌথভাবে 'নও বেলাল' প্রতিষ্ঠা করি। তবে পত্রিকার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার মাহমুদ আলীই বহন করতেন। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক গণপষিদে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সংশোধনী প্রস্তাব উথাপিত হলে তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী যে যুক্তি পেশ করেন তা ছিল খুবই মারাত্মক। লিয়াকত আলী খানের সেই অযৌক্তিক বিরোধিতার কঠোর সমালোচনা করে আমি 'নও বেলালে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম। তার ফলে সিলেটের অধিকাংশ মুসলিম মাহমুদ আলী ও আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশের ধারণা ছিল উর্দুভাষা আরবী হরফে লেখা হয় বলে বাংলা থেকে উর্দু ভাষা ধর্মের কাছাকাছি। এ জন্য উর্দুকেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

আমরা লিয়াকত আলী খানের বাংলা ভাষা বিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদে তখনকার দিনের গোবিন্দ বরণ পার্কে (বর্তমান হাসান মার্কেট) যে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিলাম তা সিলেটের তখনকার একজন প্রবীণ জননেতার আদেশে ও নবীন জননেতার উদ্যোগে পণ্ড করার এবং আমাদের লাঞ্ছনা করতে চেষ্টা করে। আমার যতদূর মনে পড়ে মকসুদ আহমদ নামক একজন ছাত্রকে একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় উলংগ অবস্থায় পাঁচ সাত বার টানা-হেঁচড়া করে নির্যাতন চালায়। এর ফলে সে মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়। ছেলেটি প্রায় দু'তিন মাস শয্যাশায়ী ছিল। সে যাত্রা মাহমুদ আলী ও আমি রেহাই পাই। কিন্তু দু'একদিনের মধ্যে আমরা খবর পেলাম যে আমাদের দু'জনকে সিলেটের বুক থেকে সরাবার চেষ্টা চলছে। প্রায় দু'মাস আমরা খুব সাবধানে চলাফেরা করতাম। মাঝে মাঝে আমাদের বিশ্বস্ত লোকেরা সংবাদ দিতো যে কোন সময় আমাদের উপর আক্রমণ হতে পারে। তবে ধীরে ধীরে সে আশংকা দূর হয়।

তখন ভাষা আন্দোলনের পত্রিকা হিসেবে নও বেলালকে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সক্ষম হই। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ, নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় লেখার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে 'নও বেলাল' বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে। সিলেটের 'যুগভেরী' পত্রিকা ছিল 'উর্দুর' সমর্থক।

প্রশ্ন ঃ আপনি ভাষা আন্দোলনের সূচনাকারী সংগঠন 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস'-এর সঙ্গে কিভাবে এবং কোন সময় থেকে যুক্ত হন? ভাষা আন্দোলনের ভূমিকার জন্য আপনাকে কোন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল কি?

উত্তর ঃ আমি ১৯৪৯ সালে 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস'-এর সভাপতি নির্বাচিত হই। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের উদ্যোগে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রের সহযোগিতায় তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে নও বেলাল পত্রিকার সূত্র ধরে শাহেদ আলী 'নও বেলাল' অফিসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আমাকে তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তমদ্দুন মজলিসের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে অবগত না থাকায় আমি তখন মজলিসে যোগ দিতে সম্মত হইনি।

'নও বেলাল'-এ ৫/৬ মাস কাজ করার পর ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে মাহমুদ আলীর সঙ্গে আমার মতানৈক্য হয়। তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে বিশ্বাসী ছিলেন। আমি ইসলামী আদর্শের অন্তর্গত সমাজবাদে বিশ্বাসী ছিলাম। তাই নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে মাঝে মধ্যে উভয়ের দ্বন্দ্ব দেখা দিত। এর ফলে আমি পত্রিকা ছেড়ে দিয়ে দোহালিয়া দেশের বাড়ীতে চলে যাই। এ সময় সুনামগঞ্জের এস, ডি, ও-র অনুরোধক্রমে তিনটি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য সুনামগঞ্জ কলেজে যোগদান করি। সুনামগঞ্জ কলেজে আমাকে ইংরেজী, বাংলা ও তর্কশাস্ত্র পড়াতে হতো। তবে তখন পর্যন্ত 'নও বেলাল'-এর সম্পাদক হিসেবে আমার নাম ছিল। এরপর ১৯৪৯ সালে তমদ্দুন মজলিস কর্তৃপক্ষ, বিশেষভাবে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের দাওয়াত পেয়ে ঢাকায় এসে মজলিস সম্পর্কে সব কিছু জানতে পেরে তাতে যোগদান করি।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনে ঢাকায় যখন বরকত, শফিক, জব্বার সহ আরো কিছু তরুণপ্রাণ শহীদ হয়, তখন আমি সুনামগঞ্জ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। সুনামগঞ্জে সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠে। সুনামগঞ্জের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষেপে উঠে। আবদুল হক নামে আমার ছেলে-মেয়েদের একজন গৃহশিক্ষক ছিল। সে আমার বাসার সামনে

থেকে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল পরিচালনা করে শহর অভিমুখে নিয়ে যায় এবং কলেজের সামনে এসে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় ঢাকায় বর্বর হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করা হয়। মিছিলে সুনামগঞ্জের মহকুমা হাকিম থেকে শুরু করে আরো অনেক সরকারী কর্মকর্তাদের ছেলেরা যোগ দিয়েছিল। মহকুমা হাকিম এ, কে, কিউ, মুকিম উদ্দিন সহ সরকারী কর্মচারীদের অধিকাংশই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং কোন ছেলেকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে পরবর্তীকালে দুর্ভোগ আমাকেই পোহাতে হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে আমরা মনে করছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে বাস করার পক্ষে আরো স্বাচ্ছন্দ্য আসবে, বাংলা ভাষা সরকারী মহলে আরো গুরুত্ব লাভ করবে। কিন্তু ফল হল ঠিক উল্টো। পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে ৯২ (ক) ধারা জারী করা হয়। ইস্কান্দার মীর্জা ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের উপর ভীষণভাবে নির্যাতন শুরু করেন। সরকারের 'নেকদৃষ্টি' পড়লো আমার উপর। আমাকে সুনামগঞ্জ কলেজের পদ থেকে 'স্ক্রীন অফ' করা হয়। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আমি শুধু ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী নই, আমি তমদ্দুন মজলিসের প্রেসিডেন্ট এবং তমদ্দুন মজলিস একটি অর্ধ কমিউনিষ্ট দল এবং একটি চরম বিপ্লবী সংগঠন। ১৯৫৫ সালে সিলেটের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ডঃ আই, এইচ, ওসমানী আমাকে সিলেটে ডেকে পাঠান এবং আমার বিরুদ্ধে লিখিত অনেকগুলি অভিযোগপূর্ণ একটি দলিল আমার সামনে তুলে ধরে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, এগুলো কি সত্যি? এর মধ্যে ছিল ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নানাবিধ সভা সমিতিতে আমার বক্তৃতার সারাংশ। সে প্রত্যেক বক্তৃতায় না কি আমি পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতা করেছি এবং সমাজতন্ত্রকে আহ্বান করেছি। সুনামগঞ্জ থেকে কবি সুফিয়া কামাল, ডক্টর মোতাহার হোসেন, কথা সাহিত্যিক শাহেদ আলীকে লিখিত কয়েকটি পত্র সেখানে সন্নিবেশিত ছিল। তিনি আমাকে বলছিলেন এ পত্রগুলোর যে কোন একটির জন্য আপনাকে চরম শাস্তি দেওয়া যায়। তবে অধ্যাপক শাহেদ আলীর নিকট লিখিত পত্রে আমি বলেছিলাম মরণপণ করে হলেও ইসলামী শাসন কায়েম করতে হবে। এ পত্রের উছিলাই আমি বেঁচে গেলাম। তা না হলে তিনি হয়তো আমাকে হাতকড়া পরাতেন। এতে স্পষ্টই বুঝা গেলো তিনিও ইসলামী শাসন চাইতেন। কাজেই ভাষা আন্দোলনে তথা তমদ্দুন মজলিসের আন্দোলনে যোগদানের ফলে আমাকে ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৫৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাস পর্যন্ত বেশ ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

শামসুল আলম

[ভাষা আন্দোলনের স্থপতি এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম সাহেবের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে যাঁরা সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম জনাব শামসুল আলম। তিনি ছিলেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক এবং 'তমদ্দুন মজলিসের' প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের গণ বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের যে ৭ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে চুক্তিনামায় সই করেছিলেন জনাব শামসুল আলম। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চের বক্তৃতার পরে সর্বপ্রথম জিন্নাহ সাহেব যে সংগ্রামী ছাত্র প্রতিনিধি দলের মুখোমুখি হন তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে সে ঐতিহাসিক সংলাপে যোগদান করেন। জনাব শামসুল আলম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তরুণ ছাত্র নেতাদের অন্যতম এবং হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক।

জনাব শামসুল আলম ১৯২৬ সালে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলাস্থিত 'গৌরাঙ্গী' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম রেজায় করিম আহমদ।

স্বীয়গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে জনাব শামসুল আলম ১৯৪১ সালে জামালপুর গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল (বর্তমানে জামালপুর জেলা স্কুল) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসবে তাঁর পরিচিতি ছিল ব্যাপক। স্কুলে শিক্ষাকালীন অবস্থাতেই তিনি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং তৎকালীন বিশিষ্ট ভারতীয় মুসলিম ছাত্রনেতা মরহুম জনাব আবুল ওয়াসেকের সংস্পর্শে আসেন।

১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে অর্থনীতিতে বি,এ, (অনার্স) এবং ১৯৪৭ সালে এম, এ, পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে রত থেকে ১৯৮২ সালে জয়দেবপুর মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী হতে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনের পাশাপাশি তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি একজন প্রাক্তন রোটারিয়ান এবং 'টাঙ্গাইল মাহফিলের' (বর্তমান 'টাঙ্গাইল জেলা সমিতি') প্রাক্তন সভাপতি।]

প্রশ্ন ঃ কি ভাবে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। আপনি কি ভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলরকে আজ অনেকে খণ্ডিত পরিসরে রেখে আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু এ মহান আন্দোলনের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালেই এ আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্পষ্ট দাবী উচ্চারিত ঐতিহাসিক পুস্তিকা–'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?' প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকার মাধ্যমে 'তমদ্দুন মজলিস' ভাষা আন্দোলনের সূচনা করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে 'তমদ্দুন মজলিস' ছিল একটি চম্‌কে দেওয়া বিপ্লবী নাম। ভাষা আন্দোলনে 'তমদ্দুন মজলিস' এবং এর মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকার এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। আর এসব কিছুর 'প্রাণপুরুষ' ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। (বর্তমানে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম নামে সুপরিচিত)। বস্তুতঃ প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের উনিশ নম্বর আজিমপুরের বাড়িটি ছিল 'ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার।' আর প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম হলেন ভাষা আন্দোলনের স্থপতি।

এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গেলে আরো একটু পেছনে ফিরে যেতে হয়। ১৯৪৭ সালে আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। থাকতাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। এই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বা এস, এম, হলে এমন অনেক মেধাসম্পন্ন ছাত্ররা থাকতেন যাঁরা পরবর্তীকালে জাতীয় জীবনে যশ ও পদ লাভ করেছেন, কেউ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ১৪ই আগষ্ট উপমহাদেশ ভাগ হয়ে দেশ স্বাধীন হল। আমাদের তরুণমনে তখন অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা আর দেশ গড়ার স্বপ্ন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আদর্শিক এবং সৃজনশীল কিছু করার জন্য মন তখন অধীর। তখন চানখাঁর পুলের রেলওয়ে ক্রসিং-এর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পুরোনো রশিদ বিল্ডিং-এর একটি ছোট্ট রেস্তোরাঁয় নিয়মিত চায়ের আড্ডা বসতো। সে চায়ের আড্ডা সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির আলোচনা সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতো। সে আলোচনায় উপস্থিত থাকতেন শিল্পাচার্য

মরহুম জয়নুল আবেদীন, মরহুম শামসুল হক, মরহুম খালেক নেওয়াজ খান, মরহুম আজিজ আহমদ, মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখ ছাত্রনেতা। এমনি এক আড্ডায় রেস্তোরাঁয় বেঞ্চে বসেই আমরা উপলব্ধি করলাম সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য আমাদের কিছু একটা করা প্রয়োজন। আমাদের এ আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের সূত্র ধরেই জনাব আবুল কাসেম (তখন তিনি সদ্য পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হয়েছেন) তাঁর উনিশ নম্বর আজিমপুরের বাসায় আমাদের ইফ্‌তারীর দাওয়াত করলেন। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে আছে তখন ছিল রমজান মাস। ইফ্‌তার পার্টির নামে আহুত সে আলোচনা সভায় আমরা সিদ্ধান্ত করি, একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলে তার মাধ্যমে আমাদের কিছু করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে গঠিত হলো তমদ্দুন মজলিস। সে দিনের সে আলোচনা বৈঠকে আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামকরণ নিয়েও বেশ আলোচনা হয়। অবশেষে উপস্থিতদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের জনাব ফজলুর রহমান ভুঁইয়ার (বর্তমানে ঢাকায় প্রবীণ আইনজীবী) প্রস্তাবক্রমে 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' নামকরণ করা হয়। দেশের তৎকালীন পরিবেশ, আদর্শ ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সঙ্গে নামটি ছিল খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। এ বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত হয় 'সৈনিক' নামে তমদ্দুন মজলিসের একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশ করা হবে।

প্রশ্ন ঃ '৪৭-'৪৮ সালে সরকারের ভাষা সম্পর্কিত যে সব বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ আপনাদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে এবং আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছে সে সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার কথা বলুন না।

উত্তর ঃ '৪৭-'৪৮ সালে ভাষার প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক বহু মারাত্মক পদক্ষেপ জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এ ছাড়া সরকারী গণমাধ্যমে বাংলা ভাষা 'উর্দু-করণের' কিছু উদ্ভট প্রচেষ্টা চলে যা আমাদের সকলকে বিক্ষুব্ধ করে। এমনি ধরনের দু' একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলছি।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা এস, এম, হলে রেডিওর বাংলা সংবাদ শুনছি। সংবাদের কিছু অংশ এরূপ ছিল ঃ

"হুকুমতে হায়দরাবাদ এক ফরমান জারি করিয়া এলান করিয়াছেন, হুকুমতে হায়দরাবাদের মালি হাকিকত গুজেস্তা ---দিনের চেয়ে বেহেতের আছে। ...." উর্দু শব্দের যথেচ্ছা মিশ্রণে বাংলা সংবাদের এ করুণ পরিণতিতে আমরা খুবই ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হই। তৎক্ষণাৎ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বন্ধু নাজিমুদ্দীন রোডে অবস্থিত তৎকালীন রেডিও অফিসে গিয়ে রেডিওর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অধ্যাপক) সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে দেখা করে বাংলা সংবাদ পরিবেশনের এ ধরনের

উদ্ভট প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাই। জনাব সৈয়দ আলী আহসান আমাদের বলেন, করাচী থেকে বাংলার সঙ্গে উর্দু সংমিশ্রণ করে সংবাদ পরিবেশনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা অবিলম্বে এ ভাবে বাংলা সংবাদ পরিবেশন বন্ধ করতে বললাম। আমাদের প্রবল চাপের মুখে তিনি অবশেষে তখন অনন্যোপায় হয়ে তদানীন্তন পাকিস্তানের বেতার প্রধান জেড, এ, বোখারী সাহেবকে এ ব্যাপারে জানানোর জন্য পরামর্শ দেন। পরবর্তী সময়ে বোখারী সাহেব ঢাকা এলে, আমরা তাঁর কাছে প্রতিবাদ জানালাম। তিনি বলেন, এ ভাবে বাংলা সংবাদ পরিবেশন করে তারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রচুর অভিনন্দন পেয়েছেন। আমরা তাঁকে বললাম, পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের ভাষা এটা নয়। এ ভাষা এ অঞ্চলের নবাব ও উর্দুভাষীদের হতে পারে। বোখারী সাহেব উত্তরে বললেন, তাই বলে আমরা 'বঙ্কিম-শরতের' বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারি না। আমরা বললাম, ঠিক আছে আমরা 'বঙ্কিম শরতের' বাংলা ভাষা চাই না। আমরা নজরুল, গোলাম মোস্তফার বাংলা ভাষায় সংবাদ পরিবেশন চাই।

বোখারী সাহেবের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘক্ষণ বিতর্কমূলক আলোচনা হয়। এরপর অবশ্য রেডিওতে বাংলা সংবাদে 'গুজেস্তা' ও 'বেহেতের ধরনে'র শব্দ আমরা শুনিনি।

অপরদিকে আমরা আরো লক্ষ্য করলাম, সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের মুদ্রিত রেলওয়ের টিকেট, টাকার নোট, অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রে বাংলাভাষার কোন স্থান নেই। সরকারের দুরভিসন্ধি ও বৈষম্যমূলক আচরণে আমরা খুবই শংকিত ও উদ্বিগ্ন হলাম। আমরা দৃঢ় সংকল্প করলাম বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এ Slow Poisoning -এর অবসান ঘটাতে হবে। আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের বাড়ি ঘেরাও করে এর কৈফিয়ৎ চাইলাম। আমাদের দাবী ও প্রতিবাদের জবাবে তিনি জানালেন, এগুলো আগেই ছাপা হয়ে গেছে, পরে উর্দুর পাশাপাশি যাতে বাংলাও ছাপা হয় তার জন্য চেষ্টা করা হবে।

এ ছাড়া বাংলা ভাষার প্রতি সরকারের আরো অনেক বৈষম্যমূলক আচরণ ও পদক্ষেপ ছিল। '৪৮ সালের জানুয়ারীতে পাক গণপরিষদে বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু সে দাবী অগ্রাহ্য হয়। গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণের মনোভাব, একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। খাজা নাজিমুদ্দীনের এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে দৈনিক আজাদ, ইত্তেহাদ, আনন্দ বাজার, অমৃতবাজার পত্রিকায়

সম্পাদকীয় লিখে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়। সিলেটের সাপ্তাহিক 'নও বেলাল'ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় ঢাকার ছাত্র, রাজনীতিক ও শিক্ষিত মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রতিবাদ ছাত্রসভায় খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করা হয়।

প্রশ্ন ঃ এ সময়ই সম্ভবতঃ নতুন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং আপনি আহ্বায়ক মনোনীত হন, তাই না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বাংলা ভাষা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ২রা মার্চ ফজলুল হক হলের এক সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস, গণআজাদী লীগ, বিভিন্ন হল প্রতিনিধি ও 'ইনসান', 'জিন্দেগী', ও 'দেশের দাবী' পত্রিকার প্রতিনিধি নিয়ে নতুন করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আমাকেই এই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগেই ২রা মার্চে ফজলুল হক হলের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ফজলুল হক হলের এ সভাতেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১১ই মার্চের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব পকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ধর্মঘট আহ্বান করে যে ইশতেহার প্রচারিত হয় তাতে স্বাক্ষর দান করেন তফাজ্জল আলী, আনোয়ারা খাতুন, মরহুম কামরুদ্দীন আহমদ, মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় বিস্তারিত ধর্মঘটের কর্মসূচী ছাপা হয়।

ঢাকাসহ সারাদেশে, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১১ই মার্চ ধর্মঘট পুরোপুরি সফল হয়। ঐ দিন ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ধর্মঘটী পিকেটিংরত ছাত্রদের উপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে। শেরে বাংলা ফজলুল হক সহ অনেক ছাত্র নেতৃবৃন্দ আহত হন। অনেকে গ্রেপ্তার হন। ছাত্রনেতা মরহুম খালেক নেওয়াজ খান, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব, মোহাম্মদ তোয়াহা, শেখ মুজিব প্রমুখ গ্রেফতার হন। ছাত্রদের উপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে পুনরায় ১৫ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালনের তারিখ স্থির হয়।

কিন্তু এর পূর্বেই খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আপোষ আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। কারণ কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফর উপলক্ষে প্রদেশে শান্তি স্থাপন তাঁর বড়ই প্রয়োজন। আমরা সংগ্রাম

পরিষদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারী বাসভবন বর্ধমান হাউসে (বর্তমানে বাংলা একাডেমী ভবন) আমাদের দাবীসমূহ নিয়ে আলোচনায় মিলিত হই। আলোচনা বৈঠকে বহু তর্ক বিতর্ক হওয়ার পর দাবী আদায়ের প্রশ্নে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের অনমনীয় মনোভাবের কাছে খাজা নাজিমুদ্দীন শেষ পর্যন্ত আমাদের আট দফা দাবীই মেনে নিতে বাধ্য হন। অবশেষে উভয় পক্ষ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। সরকার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আমি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করি। চুক্তিপত্রের আট দফা দাবীর মধ্যে গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রদের মুক্তি, পুলিশী অত্যাচারের তদন্ত, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের সুপারিশ সম্বলিত প্রাদেশিক পরিষদের গৃহীত একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো, আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়া, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের আগমনের পর আন্দোলনের পরিস্থিতি কি রূপ নেয়?

উত্তর ঃ ১৫ই মার্চের ভাষা চুক্তি ও কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা আগমনের পর স্বাভাবিকভাবে আন্দোলনের তীব্রতা কমে আসে। আমাদের আশা ও গভীর বিশ্বাস ছিল তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন আইনজীবী, বিরল মনীষা, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী পাকিস্তানের জাতির জনক কায়েদে আযমের কাছে আমরা সুবিচার পাবো। তাই ১৯শে মার্চ তিনি এলে আমরা প্রবল বৃষ্টিপাত উপেক্ষা করে তাঁকে তেজগাঁও বিমান বন্দরে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানাই। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। রেসকোর্সের জনসভায় এবং কার্জন হলের বিশেষ কনভোকেশন সভায় তাঁর ভাষণে তিনি রাষ্ট্রভাষা উর্দুর স্বপক্ষে যেভাবে দ্ব্যর্থহীন উক্তি করেন তাতে আমরা নিদারুণভাবে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হই। প্রাদেশিক সরকার তাঁকে বাংলা ভাষা এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যে কত বিরূপ ধারণা দিয়েছেন তাঁর যুক্তিহীন কঠোর মন্তব্যে তা আমাদের কাছে প্রকটভাবে ধরা পড়ে।

প্রশ্ন ঃ কায়েদে আযমের সঙ্গে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা কিভাবে হলো? সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে নিশ্চয়ই আপনি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কি আলোচনা হলো সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন না?

উত্তর ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপ-সচিব (পলিটিক্যাল) মিঃ ডি, কে, পাওয়ার সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে আমার নামে এক ডি-ও পত্র লিখে জানালেন যে, ভাষার প্রশ্নে কায়েদে আযম জিন্নাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।

পত্র পেয়ে আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে যাই। এ সম্পর্কে পরামর্শ নেয়ার জন্য জনাব কামরুদ্দীন আহমদের কাছে ছুটে যাই। কামরুদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ করে আলোচনা বৈঠকের প্রতি সংগ্রাম পরিষদের লিখিত সম্মতি জানিয়ে দিই। মিঃ ডি, কে, পাওয়ারের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আমরা ২১জন সদস্য কায়েদে আযমের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য মিন্টু রোডে তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী জনাব আজিজ আহমদের বাসায় যাই। কায়েদে আজম সেখানে অবস্থান করছিলেন। বৈঠকে যাওয়ার সময় আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্বলিত ইংরেজীতে লিখিত একটি স্মারকলিপি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানের সংহতির প্রতি হুমকি প্রতীয়মান হতে পারে এমন কোন প্রস্তাব স্মারকলিপিতে ছিল না।

নির্ধারিত আলোচনা কক্ষে প্রবেশ করার পর আমাদের ২১ সদস্যের বসার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। তাই কিছুটা গুঞ্জরণ শুরু হয়। ডি, কে, পাওয়ারকে মনে হলো কিছুটা অশ্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি জানালেন, আমরা এতজন যাবো এটা তাঁর ধারণায় ছিল না। আমাদের গুঞ্জরণের মধ্যে কায়েদে আযম যথাসময়ে প্রবেশ করলেন, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে যখন তিনি উপর থেকে নামছিলেন তখন আমাদের সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ হলো। দেখলাম, পেছনে রয়েছেন তাঁর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমাদের সদস্য সংখ্যা বেশী দেখে সবাইকে ফ্রেণ্ডলী বসার জায়গা শেয়ার করে নিতে বললেন। তাঁর প্রশান্ত চেহারা দেখে মনে হল তিনি বেশ খোশমেজাজে রয়েছেন। কিছু কুশল বিনিময়মূলক প্রাথমিক আলাপের পর ফাতেমা জিন্নাহ চলে গেলেন। কামরুদ্দীন সাহেব কায়েদে আযমের অনুমতি নিয়ে সঙ্গে নেয়া স্মারকলিপিটি পাঠ করতে শুরু করলেন।

স্মারকলিপির ১, ২, ৩ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত পড়ার পর দেখি কায়েদে আযমের চেহারার প্রশান্ত ভাব কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেছে। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠেন, "Stop all these nonsense. Look gentlemen, I call to hear me not you." এরপর তিনি যা বললেন সংক্ষেপে তার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের এক ধর্ম, এক ধর্মগ্রন্থ, এক রাষ্ট্র। সুতরাং দেশ ও জাতির সংহতির জন্য আমাদের রাষ্ট্রভাষাও একটি হওয়া উচিত।

এক পর্যায়ে অকুতোভয় বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ নেতা শামসুল হক কিছু বিতর্কের সূচনা করলে তিনি শামসুল হককে লক্ষ্য করে বললেনঃ "You are the man, who always create trouble at Lahore Convention also alongwith Moulana Hasrat Mohani and Abul Hashim."

বিতর্কের উত্তপ্ত পর্যায়ে জিন্নাহ সাহেব তিন তিন বার আসন ছেড়ে আলোচনা কক্ষ পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। কায়েদে আযম জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবনে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি বলে পরবর্তী সময় ডি, কে, পাওয়ার আমাদের জানিয়েছেন।

বিতর্কের উত্তপ্ত ভাব কিছুটা প্রশমিত হলে শামসুল হক তাঁর অনমনীয় শানিত তারুণ্য নিয়ে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ছাত্র ও তরুণদেরও বলার রয়েছে বলে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি কায়েদে আযমকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার ডাকে দেশ স্বাধীন করার জন্য আমরা লেখাপড়া সহ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সুতরাং দেশের ব্যাপারে, দেশের রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য রয়েছে।

কায়েদে আযম বললেন, That was emergency period. এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলাই এখন তোমাদের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত কি হবে তা তোমাদের পার্লামেন্ট এবং রাজনৈতিকদের উপর ছেড়ে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত। জনাব কামরুদ্দীনের স্মারকলিপি পাঠের সূত্র ধরে শামসুল হক পৃথিবীর অন্যান্য দেশের একাধিক রাষ্ট্রভাষার উদাহরণ প্রদর্শন করে বললেন, আমরা পাকিস্তানকে ভালোবাসি, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা পরিবর্তন করবো কি করে? পৃথিবীতে কোথাও মাতৃভাষা পরিবর্তনের উদাহরণ নেই।

কায়েদে আযম শামসুল হকের এ মন্তব্যকে লক্ষ্য করে বললেন, 'No, my boy, everything may change---'

তাঁর এ মন্তব্যে আমরা কিভাবে কঠোর জবাব দেবো ভেবে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছি। এমনি মুহূর্তে কায়েদে আযম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে আমাদের নিরীক্ষণ করে সম্বোধন করলেন, "Well my boy---" তারপর শামসুল হক এবং কামরুদ্দীনের দিকে দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখন যে পোষাক পরছো, যা খাচ্ছ, যে ভাষা ব্যবহার করছো, সে জীবন যাপন পদ্ধতি কি তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে ছিল?

শামসুল হক জবাব দিলেন, না, তা ছিল না। কিন্তু ---

শামসুল হক আরো কিছু বলতে যাবেন, কিন্তু না, শামসুল হক বলার পূর্বেই কায়েদে আযম শামসুল হককে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, Well my boy, তোমরা আমার সাথে একমত হবে যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষদের খাওয়া পরা তথা জীবন যাপন তোমাদের মাঝে নেই, বিরাট পরিবর্তন হয়েছে? Now please tell, who

change it.

শামসুল হক জবাবে বললেন, Time has changed these.

কায়েদে আযম তাৎক্ষণিকভাবে বললেন, "Yes, my boy "Time." Time will change everything and if necessary your mother tongue also."

এ পর্যায়ে আলোচনায় আরো কিছু যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি চললো।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে কায়েদে আযম বললেন, "My boy, two men may differ on one point. Let us differ respectfully. You can go with your point with constitutional way. Any unconstitutional movement will crush ruthlessly."

প্রশ্ন ঃ এবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুব সম্মেলন সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু জানতে চাই। সম্ভবতঃ আপনি এ আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এ যুব সম্মেলনের উদ্যোক্তা কারা ছিলেন? শুনেছি এ সম্মেলনে আপনাদের প্রতিনিধি দলের নেতা (বিচারপতি) আবদুর রহমান চৌধুরী বাংলায় বক্তৃতা দেন। কোন আন্তর্জাতিক ফোরামে এটাই নাকি প্রথম বাংলায় বক্তৃতা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কোলকাতায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এ যুব সম্মেলনে প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে আমিও যোগদান করেছিলাম। জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। হ্যাঁ তিনি বাংলায় বক্তৃতা করেন। এটা আমাদের বাংলা ভাষার জন্য গৌরবের বিষয়। কোন আন্তর্জাতিক ফোরামে এর পূর্বে কেউ বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছেন কিনা আমার সঠিক জানা নেই।

দেশ বিভাগের প্রশ্নে এ সম্মেলনের সঙ্গে আমাদের দ্বিমত হওয়ায় আমরা 'পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি দল' সম্মেলন থেকে ওয়াক আউট করি। দেশ বিভাগ মেনে না নিয়ে এ সম্মেলন শ্লোগান তোলে 'ইয়ে আযাদী জুটা হ্যায়'। আমরা বক্তব্য এবং শ্লোগানের সঙ্গে একমত ছিলাম না।

এ যুব সম্মেলন Organise করেছিল প্রাগের 'ওয়ার্লড ফেডারেশন অব ডেমোক্রেটিক ইয়থ'। প্রাগ থেকে Organise করার জন্য এসেছিলেন সেন্ট্রাল প্রিপারেটরী কমিটির মেম্বার মিস কার্লম্যান ব্রিকম্যান, বোম্বে থেকে এসেছিলেন মিস কিটি বোমলা। প্রিপারেটরী কমিটির 'পূর্ব পাকিস্তানের' আহ্বায়ক ছিলেন নূরুল আলম। মহিলা সদস্য হিসেবে লিলি খান এবং সাংস্কৃতিক অতিথি হিসেবে লায়লা আর্জুমান্দ বানু ও মালেকা বানু সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। লায়লা আর্জুমান্দ বানু

ও মালেকা বানুর পল্লীগীতি ও ফোক সঙ্গীত সম্মেলনে খুবই প্রশংসা লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এ যুব সম্মেলনে দেশ বিভাগ প্রশ্নে আপনাদের 'ওয়াক আউট', পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন। এ দু'টি ঘটনাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর ঃ '৪৭ সালের দেশ বিভক্তি ছিল এ দেশে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আশা আকাঙক্ষার ফল। তৎকালীন ভাষা আন্দোলনে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিছু করেছেন বলে আমার মনে হয় না। গণ বিরোধী সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা বিরোধী তৎপরতার মিথ্যা অপবাদ আনা হতো মাত্র। আমাদের তখনকার সংগ্রাম, আন্দোলন পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে ছিল না। পাকিস্তানকে কেন্দ্র করেই আমাদের ন্যায্য সংগ্রাম তথা ভাষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এ সত্যটি অনুধাবন করার জন্য আমাদের সকলের ভাষা আন্দোলনের গোড়ার কথা জানা প্রয়োজন। নতুবা অনেক তথ্যই অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যাবে। ভাষা আন্দোলনের সত্যিকার ইতিহাস জানার জন্য তাই, এ সাক্ষাৎকারে সূচনা লগ্নের অনেক কথা বললাম।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৮৭

কাজী আবুল কাসেম

[শিল্পী কাজী আবুল কাসেম বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তাঁর তুলি হাতে নিয়ে সংগ্রামে নেমেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের বিপ্লবী মুখপত্র 'সৈনিকে'র পাতায় সংগ্রামের দিনগুলোতে তিনি নিয়মিত কার্টুন আঁকতেন। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত তাঁর 'হরফখেদা' শীর্ষক কার্টুনটি আজো ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী সৈনিকদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

ভাষা আন্দোলনের নীরব-সৈনিক শিল্পী কাজী কাসেম তিরিশ ও চল্লিশ দশকে শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবল প্রতিপত্তি নিয়ে পদচারণা করতেন। 'দোপেয়াজা' ছদ্ম নামে তিনি কার্টুন আঁকতেন।

কাজী আবুল কাসেম ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে যশোর জেলায় তাঁর মাতুলালয় উমেদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগ ছিল। তাঁর এই সহজাত প্রতিভা ১৯২৬ সনে ফরিদপুর শহরে এক খৃষ্টান পাদ্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর সহযোগিতায় কোলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে যান। কিন্তু বয়সের স্বল্পতার জন্য টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে পারেন নি। ১৯২৮ সনের দিকে পুনরায় চেষ্টা করেন কিন্তু অর্থের অভাবে এবার ব্যর্থ হন। তারপর জীবনের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে শিল্পী প্রতিষ্ঠিত হন তাঁর সহজাত পেশায়। ১৯৪৬ সনে বোম্বাই থেকে আগত একটি এনিমেশন কার্টুন ফিল্মস কোম্পানীর সঙ্গে প্রধান কার্টুনিষ্ট হিসেবে কাজ করেন। ছবিটির নাম ছিল 'সাবাস'।

১৯৫০ সালের শেষ ভাগে তিনি কোলকাতা থেকে ঢাকা আসেন। এখানে প্রধানতঃ পুস্তক প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হন। ঢাকায় আসার পরই তিনি 'সৈনিক' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন।]

প্রশ্ন ঃ কি ভাবে আপনি 'সৈনিক' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন?

উত্তর ঃ ১৯৫০ সালের শেষভাগে কোলকাতা থেকে এসে প্রথমে আমি কিছুদিন

খুলনায় অবস্থান করি। খুলনা অথবা ঢাকায় নিজস্ব স্টুডিও গড়ে কাজ করার ইচ্ছা নিয়ে প্রাথমিক প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় খুলনায় আমার এক পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষী মোহাম্মদ আমজাদ আমাকে ঢাকায় এসে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'ঢাকায় আপনার মিতা অধ্যাপক কাসেম (প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের নামের সাথে আমার নামের সাদৃশ্য থাকায় শুভাকাঙ্খী মিতা আখ্যায়িত করেছেন) 'সৈনিক' পত্রিকা প্রকাশ করছেন, আপনি ঢাকায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করুন, কাজের পরিবেশ পাবেন।' কিছুদিনের মধ্যে ঢাকায় এলাম। উনিশ নম্বর আজিমপুরে প্রিন্সিপাল কাসেম সাহেবের সঙ্গে (তখন তিনি অধ্যাপক) পরিচয় হলো। পরিচয়ের প্রথম আলাপেই সহজ সরল উদার মানুষটিকে ভালো লাগলো। পেশাগত অন্যান্য কাজের সঙ্গে 'সৈনিকে'ও কাজ করতে লাগলাম। কার্টুন, ইলাস্ট্রেশান যখন যা প্রয়োজন হতো তাই আঁকতাম।

প্রশ্ন ঃ কি ধরনের কার্টুন আঁকতেন? কার্টুনের থিম্ বা বিষয় কি আপনিই স্থির করতেন?

উত্তর ঃ সব ধরনের কার্টুনই আঁকতাম। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কার্টুনগুলো আমাদের মাতৃভাষার উপর হামলা ও এ ভাষাকে বিভিন্ন কৌশলে দাবিয়ে রাখার সরকারী প্রচেষ্টাকে তীব্র ব্যঙ্গ করে আঁকতাম। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনার উপরও প্রচুর কার্টুন এঁকেছি। কার্টুনের বিষয় বা থিম্ কাসেম সাহেব এবং আমি দু'জনে মিলেই ঠিক করতাম। কখনো তিনি বিষয় ঠিক করে বুঝিয়ে দিতেন। আমি নিজের 'কনসেপশন' থেকে কার্টুন আঁকতাম। তখনকার দিনে 'সৈনিকের' পাতায় ভাষার দাবী সম্বলিত কার্টুনগুলো খুবই জনপ্রিয় ছিল।

প্রশ্ন ঃ ভাষার দাবী সম্পর্কিত কার্টুনগুলো ভাষা আন্দোলনকে কতটুকু ত্বরান্বিত করেছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ নিজের আঁকা কার্টুন সম্পর্কে কোন ধরনের মন্তব্য করা খুবই বিব্রতকর। তবে এ কথা সত্যি জনগণের প্রাণের দাবী যে কার্টুনে ফুটে ওঠে সে কার্টুন যে কোন গণআন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে সফলতার দিকে নিয়ে যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে ভাষার দাবী নিয়ে আঁকা 'সৈনিকের' পাতায় আমার কার্টুনগুলো কিছুটা হলেও ভাষার দাবীকে ত্বরান্বিত করেছে। কয়েকটি তুলির আঁচড়ের সার্থক কার্টুন যে কোন গণবিরোধী সরকারের জন্য ত্রাসের কারণ হতে পারে, জনগণের হাতে প্রতিরোধের অস্ত্র হতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৮৭

রওশন আরা বাচ্চু

[রওশন আরা বাচ্চু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ দর্শনের ছাত্রী ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ঐতিহাসিক ছাত্রী মিছিলে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। পুলিশের লাঠি চার্জে আহত হয়েছিলেন তিনি। ছাত্রীদের দাবী অনুযায়ী, তাঁদের প্রথম গ্রুপটিই ১৪৪ ধারা প্রথম ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়। এই গ্রুপেই রওশন আরা বাচ্চু অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

রওশন আরা বাচ্চু ১৯৪৭ সালে পিরোজপুর গার্লস্ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বরিশাল বি, এম, কলেজে ভর্তি হন। সে কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করে ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে অনার্স পাশ করে শিক্ষকতায় কুলাউড়া গার্লস্ জুনিয়র হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকা পদে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে তিনি বি, এড, এবং ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাসে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন।]

প্রশ্ন ঃ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশে কি মানসিকতা নিয়ে আপনারা ছেলেদের পাশাপাশি আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন? এটা কি কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না পরিকল্পিত ছিল?

উত্তর ঃ '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় আমি বরিশাল বি, এম, কলেজের ছাত্রী ছিলাম। '৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের ঢেউ আমাদের মফস্বলের কলেজকেও আন্দোলিত করে। বলতে গেলে তখন থেকেই রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্পর্কে মানসিকভাবে সচেতন হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু

হয় 'নো ফি ক্যাম্পেইন' আন্দোলন। এ আন্দোলনে সীমিতভাবে হলেও আমরা ছাত্রীরা কম বেশী জড়িত হই। তখন থেকেই ক্যাম্পাসের ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের প্রতিবাদ সভায় আমরা উপস্থিত থাকতে শুরু করি। এরপর সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে আন্দোলন হয়, এ আন্দোলনে এবং সে সময় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ছাত্র কনভেনশনে আমরা ছাত্রীরা অংশ নেই। এভাবে মেয়েদের মধ্যে আন্দোলনের একটা স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা গড়ে ওঠে। তখনকার পরিবেশ অবশ্য খুবই রক্ষণশীল ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা সরাসরি কথা বলতে পারতো না। প্রোক্টরের অনুমতি নিয়ে কথা বলতে হতো।

এমনি রক্ষণশীল পরিবেশে যখন '৫২-র ২৭শে জানুয়ারী 'একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে' এ ধরনের এক তরফা ঘোষণা আসে তখন আমাদের চেতনার মর্মমূলে আঘাত আসে। এ আঘাতের ফলেই রক্ষণশীলতার সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে আমরা আন্দোলনে শরীক হই। তাই আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণকে পুরোপুরি পরিকল্পিত বলা না গেলেও একে কোন আকস্মিক ঘটনা বলা ঠিক হবে না। এর নেপথ্যে মানসিক প্রস্তুতি ছিল।

প্রশ্ন ঃ আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার জন্য মেয়েরা কি ধরনের কাজ করতেন?

উত্তর ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচী অনুযায়ী আমরা স্কুল কলেজের মেয়েদের সংগঠিত করা, পোস্টার লিখা, চাঁদা উঠানো প্রভৃতি কাজগুলো করেছি।

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আপনার স্মৃতি থেকে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী সকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়েরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মেয়েদের স্কুলে এবং কলেজে যায় সংগঠিত করে ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় নিয়ে আসার জন্য। সভা শুরু হওয়ার পূর্বে প্রবল ক্ষোভের মধ্যেও একটা অনিশ্চিত ও থম্‌থমে ভাব বিরাজ করছিল। সভা শুরু হলো কিন্তু ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় শাফিয়া আপাসহ আমরা সবাই সভা বয়কট করে মেয়েদের কমন রুমে চলে যাই। আমরা পূর্বাপর ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছিলাম। এ ব্যাপারে দ্বিধা সৃষ্টি হওয়ায় আমরা সভা বয়কট করে চলে যাই। পরে অবশ্য ছাত্রদের অনুরোধে আন্দোলনের ঐক্যের স্বার্থে ফিরে আসি। গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে মিছিলের প্রচেষ্টা শুরু হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইটের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়ানো সশস্ত্র পুলিশ। ছেলেদের গ্রুপ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাদের গেইট থেকে ট্রাকে তুলে নিচ্ছিল। ফলে ছেলেরা আর এগুতে পাচ্ছিল না। এর পরে শাফিয়া আপাসহ আমরা মেয়েরা পর পর দু'তিনটি গ্রুপে বের হই। আমাদের ধারণা ছিল

তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশে পুলিশ মেয়েদের এগিয়ে যেতে বাধা দেবে না বা লাঠিচার্জ করবে না। গেইটের বাইরে গিয়ে আমরা তেমন বাধা পেলাম না। আমরা গেইট থেকে বের হওয়ার সময় স্কুল কলেজের ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে রেখে এসেছিলাম। আমাদের এগিয়ে যাওয়া দেখে আরো মেয়েরা বের হতে শুরু করে। এভাবে কিছুটা মিছিলের আকার ধারণ করে। কিছু ছেলেও দেয়াল টপকে মিছিলের পেছনের দিকে যোগ দিচ্ছিল। আমরা মেডিকেলের বর্তমান প্রবেশ দ্বারের কাছে আসতেই শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ। লাঠির আঘাত এসে পড়ে আমার গায়ে। আকস্মিক আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই মাটিতে। রাস্তার পাশে রেষ্টুরেন্টের কাছে ছিল কয়েকটি ভাঙ্গা রিকশা, কিছু ভেবে না পেয়ে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি চার্জ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেখানে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি। এরপর ছুটে যাই সাইন্স এনেক্সের কম্পাউণ্ডে এস, এম, হলের প্রভোস্ট ডক্টর ওসমান গণির বাসভবনের দিকে। কিন্তু সেখানে আশ্রয় নিতে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়ায় আটকা পড়ে যাই। এমনি অসহায় অবস্থায় কে এসে যেন কাঁটাতারের বেড়া থেকে আটকানো শাড়ি ছাড়িয়ে দেন। কাঁটাতারের আঁচড়ের ব্যথা নিয়ে ওসমান গণির বাসভবনের দিকে গিয়ে দেখি সেখানে বাসভবনের বারান্দায় সুফিয়া, শামসুন নাহার ও সারা তৈফুর রয়েছে। ওরা আমার আগেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ওরাই আমার প্রাথমিক শুশ্রূষা করে। অনেকক্ষণ পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে অধ্যাপক মুনির চৌধুরীর সহায়তায় আমরা হোস্টেলে ফিরে আসি।

একুশে ফেব্রুয়ারী পরবর্তী দিনগুলোতেও চাঁদা তোলা এবং আহতদের সেবার কাজে ছাত্রীরা যে ভূমিকা রেখেছিল তাকে কোনক্রমে খাটো করে দেখা যায় না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

ডক্টর হালিমা খাতুন

ডক্টর হালিমা খাতুন বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে এম, এ, প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরত।]

প্রশ্ন ঃ ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার স্মৃতিচারণ থেকে কিছু জানতে চাই।

উত্তর ঃ ১৯৪৯ সাল হতে ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়ে আসছিল। তবে '৫২তে এসে সরকারী ঘোষণায় সবার মনে বিক্ষোভের দানা বেঁধে উঠে। যার ফলে, প্রতিদিনই নানা সভা ও প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছিল। আর সংখ্যায় কম হলেও আমরা ছাত্রীরা তাতে অংশ গ্রহণ করে আসছিলাম। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অপেক্ষা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যেই উৎসাহ উদ্দীপনার ভাগটা ছিল বেশী।

আমি নিজে ১৯৪২ সাল থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলাম খানিকটা। নেতাজী সুভাষ বোসের আদর্শিক চিন্তা-চেতনার প্রতি সাংঘাতিকভাবে অনুপ্রাণিত ছিলাম। নেতাজীর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর সাথে ছিল আমাদের পারিবারিক পরিচয়। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন (শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ব্যানার্জী, ক্যাপ্টেন রহমান), আমার এক সহপাঠির দাদু। বিভিন্ন সময়ে সহপাঠির কাছে লেখা দাদুর চিঠি পড়ে আমাদেরকে যেন বিপ্লবী পথ ও মত হাতছানি দিয়ে ডাকতো। তাছাড়া দাদুর লেখা বিপ্লবী জীবনের গল্প আমরা পড়তাম। আর দেখা

হলে তো দীর্ঘ সময় ধরে শুনতাম নেতাজী ও তাঁর সমস্ত দুঃসাহসিক জীবনের ইতিহাস। বাগেরহাটে ছিল আমার জন্ম। দীর্ঘকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক শক্ত ঘাঁটি ছিল এই বাগেরহাট। অতএব সেই পরিবেশে মানুষ হয়ে জন্মেই দেখেছি ক্ষুব্ধ স্বদেশের চিত্র। প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ পুরোহিত অধ্যাপকরাও আমাদের সেই স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এক কথায় তৈরী মনমানসিকতা নিয়ে যখন ঢাকায় এলাম তখন দেখলাম তৎকালীন ঔপনিবেশিক ও আমলাতান্ত্রিক শোষণ টিকিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইর‍্যা নিতে চায়'। আর তখনই নিশ্চুপ না থেকে পথে নেমে ছিলাম ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে।

একুশের প্রস্তুতি চলছিল বেশ কয়দিন ধরে। প্রতিদিনই মেয়েদের স্কুলে বিশেষ করে কামরুন্নেছা, বাংলাবাজার ও মুসলিম গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজে দায়িত্ব পালন করেছিলাম আমি নিজে। স্কুলের ছাত্রীদের বয়স কম,তাই তাদের মিছিলে, সভা-সমিতিতে নিয়ে আসতে তেমন অসুবিধা ছিল না কিন্তু মুশ্‌কিল হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে। আমি ঢাকায় নতুন এসেছি, তাই আমার কথায় বিশেষ করে পুলিশের সামনা-সামনি হতে বিশেষ রাজী হচ্ছিল না কেউই। আমি তাই ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতে হাতীরপুলে গিয়ে নাদেরা বেগমের (শহীদ মুনীর চৌধুরীর বোন) কাছ হতে একটা চিঠি নিয়ে এলাম। যে চিঠিতে তিনি পরদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে জমা হয়ে মিছিলে যাওয়ার জন্য ছাত্রী বোনদেরকে অনুরোধ করেছিলেন। নাদেরা বেগম নিজের নিরাপত্তার কারণে নিজে আসতে পারেন নি। সে যা হোক, চিঠির জন্য হোক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হোক হোস্টেল থেকে গুটিকয়েক ছাত্রী মিছিলে যাওয়ার জন্য আর কামরুন্নেসা, বাংলাবাজার ও মুসলিম গার্লস স্কুল থেকেও প্রায় ৩০/৪০ জন ছাত্রী আমতলায় এসে জড়ো হলো। সেদিন আমতলার মিটিংয়ে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে না। এ সিদ্ধান্ত আমরা অর্থাৎ ছাত্রীরা মানতে চাচ্ছিলাম না। মানতে চাইনি বলেই আইন অমান্যকারীদের প্রথম মিছিল নিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আমরা চারজন প্রথম পুরানো আর্টস বিল্ডিংয়ের দরজায় পুলিশের ব্যারিকেড ঠেলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে পথে বের হয়ে পড়ি। মেয়েদের দেখে কেন জানি পুলিশ পথ ছেড়ে দেয়। তারপর ছোট ছোট আরো দু'টি মিছিল (দল) পুলিশের বেড়া ভেঙ্গে বের হয়ে আসে। মেয়েদের ৩য় ও ৪র্থ মিছিল (দল) কে পুলিশ অ্যারেষ্ট করে, পুলিশ তাদের ভ্যানে তুলে বহুদূর নিয়ে ছেড়ে দেয়।

আজ অনেক কথা, অনেক নাম, অনেক ঘটনা ভুলে গেছি– তবুও সেদিনের কিছু কিছু স্মৃতি এখন আমাকে বিচলিত করে। সেদিন আমতলা থেকে বের হয়ে আমরা

বেশীদূর অগ্রসর হতে পারি নি। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ার গ্যাসের সেল আমাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে। চোখের জ্বালায় কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবুও এগিয়ে যাচ্ছি। স্বেচ্ছাসেবকরা বালতি করে পানি এনে সামনে ধরলেন। বালতির পানিতে রুমাল আঁচল ভিজিয়ে চোখে ঝাপটা দিতে লাগলাম। শেলের তীব্রতা ক্রমশঃ বেড়ে চলল। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে হাতড়ে হাতড়ে মেডিকেল কলেজের জরুরী বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে গেলাম। ঐদিকে তখন কিন্তু প্রচণ্ডভাবে গুলি বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। মেডিকেল হোস্টেলের বাঁশের খড়ের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে। জরুরী বিভাগে আহতদের ধরাধরি করে নিয়ে আসতে গিয়ে যে আর্তনাদ শুনেছিলাম, আজও যেন তা কানে শুনতে পাই। হাসপাতালের বাড়ী তৈরীর জন্যে প্রচুর ইট জমা করা ছিল হাসপাতালের চত্বরে। মারমুখী পুলিশের বিরুদ্ধে ছাত্ররা সেই ইট ছুঁড়তে থাকে। গুলির শব্দ, শ্লোগান, ইটের শব্দ ও আহতদের আর্তনাদে মেডিকেলের মোড় সেদিন এক রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছিল। প্রাথমিক চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হয়ে আমরা হোস্টেলের দিকে গেলাম। তখন কোন লাশ ছিল না সেখানে, শুধু তরতাজা রক্ত আর মগজ ছড়ানো ছিল পিচঢালা পথে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

পরিশিষ্ট

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ভাষণ

National Consolidation

Speech at a public meeting attended by over three lakhs of people at Dacca on March 21, 1948.

As-Salam-o-Alaikum! As-Salam-o-Alaikum! As-Salam-o-Alaikum!

I am grateful to the people of this province and, through you Mr. Chairman of the Reception Committee to the people of Dacca, for the great welcome that they have accorded to me. I need hardly say that it gives me the greatest pleasure to visit East Bengal. East Bengal is the most important component of Pakisan, inhabited as it is by the largest single bloc of Muslims in the world. I have been anxious to pay this province an early visit, but unfortunately, other matters of greater importance had so far prevented me from doing so.

About some of these important matter, you doubtless know. You know, for instance, of the cataclasm that shook the Punjab immediately after partition, and of the millions of Muslims who in consequence were uprooted from their homes in East Punjab, Delhi and neighbouring districts and had to be protected, sheltered and fed pending rehabilitation in Western Pakistan. Never througout history was a new state called upon to face such tremendous problems. Never throughout history has a new state handled them with such competence and courage. Our enemies had hoped to kill Pakistan at its inception. Pakistan has, on the contrary, arisen triumphant and stronger then ever. It has come to stay, and play its great role for which it is destined.

In your address of welcome you have stressed the importance of developing the great agricultural and industrial resources of this province of providing facili-

ties for the training of the young men and women of this province for entering the armed forces of Pakistan, of the development of the port of Chittagong and of communications between this province and other parts of Pakistan, of development of educational facilities and finally you have stressed the importance of ensuring the citizens of Eastern Pakistan get their due and legitimate share in all spheres of Government activity. Let me at once assure you that my Government attaches the greatest importance to these matters and is anxiously and constantly engaged in ensuring that Eastern Pakistan attains its full stature with the maximum of speed. Of the martial prowess of the people of this province history provides ample evidence and, as you are aware, Government have already taken energeitic steps to provede facilities for the training of the youth of this province both in the regular Armed Forces and as volunteers in the Pakistan National Gaurds. You may rest assured that the fullest provision shall be made for enabling the youth of this province to play its part in the defence of this state.

Let me now turn to some general matters concerning this province. In doing so, let me first congratulate you, the people of this province and your Government, over the manner in which you have conducted yourselves during these seven months of trials and tribulations. Your Government and loyal, hard working officials deserve to be congratulated on the speed and efficiency with which it succeeded in building up an ordered administration out of the chaos and confusion which prevailed immediately after partition. On the 15th August, the Provincial Government in Dacca was a fugitive in its own home. It was faced with the immediate problem of finding accommodation for thousands of Government personnel in what was, after all, before partition only a small mofussil town. Hardly had Gov-

ernment got to grips with administrative problems thus created when some seventy thousand Railway and other personnel and their families suddenly arrived in this province, driven out of India partly by panic owing to the disturbances immediately following the partition. There were further, owing to the whole sale departure of Hindu personnel, great gaps left in the administrative machinery and the entire transport and communication system had been disorganised. The immediate task that faced the Government, therefore, was hurriedly to re-group its forces and reorganise its administrative machine in order to avertan imminent administrative collapse.

This the Government did with extraordinary speed and efficiency. The administration continued to function unhampered and the life of the community continued undisturbed. Not only was the administration speedily reorganised but the great administrative shortages were quickly made good, so that an impending famine was averted, and what is equally important, peace was maintained throughout the province. In this latter respect, much credit is due also to the people of this province, in particular to the members of the majority community, who showed exemplary calm and determination to maintain peace despite the great provocation afforded by the massacre and oppression of the Muslims in the Indian Dominion in the months immediately after partition. Despite those horrible happenings, some forty thousand processions were taken out by the Hindu community during the last Puja in this province without a single instance of the breach of peace, and without any molestation from the Muslims of this province.

Any impartial observer will agree with me that throughout these troubles the minorities were looked after and protected in Pakistan better than anywhere else in

India. You will agree that Pakistan was able to keep peace and maintain law and order; and let me tell you that the minorities not only here in Dacca but throughout Pakistan are more secure, more safe than anywhere else. We have made it clear that the Pakistan Government will not allow peace to be desturbed; Pakistan will maintain law and order at any cost, and it will not allow any kind of mob rule it is necessary to draw attention to there facts, namely, the building up of an orderly administration, the averting of an imminent famine and the maintenance of the supply of food to some forty million people in this province at a time of overall food shortage and serious administrative difficulties, and the maintenance of peace, because there is a tendency to ignore these achievments of the Government and to take these things for granted.

It is always easy to criticise; it is always easy to go on fault finding, but people forget the things that are being done and are going, to be done for them and generally they take those for granted without even realising as to what trials, tribulations, difficulties and dangers we had to face at the birth of Pakistan. I do not think that your administration is perfect, far from it, I do not say that there is no room for improvement, I do not say that honest criticism from true Pakistanis is unwelcome. It is always welcome. But when I find in some quarters nothing but complaint, fault finding and not a word of recognition as to the work that has been done either by your Government or by those loyal officials and officers who have been working for you day and night, it naturally pains me. Therefore, at least say some good word for the good that is done, and then complain and criticise. In a large administration it is obvious that mistakes must be made; you cannot expect that it should be faultless no country in the world can be so. But our ambition, and our desire is that it should be as

little defective as possible. Our desire is to make it more efficient, more beneficial, more smooth working. For what? What has the Government got for its aim? The Government can only have for its aim one objective–how to serve the people, how to divise ways and means of their welfare, for their betterment. What other object can the Government have and, remember, now it is in your hands to put the Government in power or remove the Government from power, but you must not do it by mob methods. You have the power, you must learn the art to use it, you must try and understand the machinery. Constitutionally, it is in your hands to upset one Government and put another Government in power if you are dissatisfied to such an extent. Therefore, the whole thing is in your hands, but I advise you strongly to have patience and to support the men who are at the helm your Government, sympathise with them, try and understand their troubles and their difficulties just as they should try and understand your grievances and complaints and sufferings. It is by that co-operation and that good spirit and good will that you will be able not only to preserve Pakistan which we have achieved but also make it a great state in the world. Are you now, after having achieved Pakistan, going to destroy it by your own folly? Do you want to build it up? Well then for that purpose there is one essential condition, and it is this complete unity and solidarity amongst ourselves.

But I want to tell you that in our midst there are people financed by foreign agencies who are intent on creating disruption. Their object is to disrupt and sabotage Pakistan. I want you to be on your guard, I want you to be vigilant and not to be taken in by attractive slogans and catchword. They say that Pakistan Government and the East Bengal Government are out to destroy your language—A bigger falsehood was never uttered by a man. Quite frankly and openly I must tell you that

you have got amongst you a few communists and other agents finance by foreign help and if you are not careful, you will be disrupted. The idea that East Bengal should be brought back into the Indian Union is not give up, and it is their aim yet, and I am confident I am not afraid, but it is better to be vigilant that those people who still dream of getting back East Bengal into the Indian Union are living in a dreamland.

I am told that there has been some exodus of the Hindu Community from this province. I have seen the magnitude of this exodus put at the fantastic figure of ten lakhs in the Indian Press official estimates would not put the figure beyond two lakhs at the utmost. In any case, I am satisfied that such exodus as has taken place has been the result not of any ill-treatment of the minority communities. On the other hand, the minority communities have enjoyed, and, rightly so, greater freedom, and have been shown greater solicitude for their welfare than the minorities in any part of the Indian Dominion.

The causes of this exodus are to be found rather in the loose talk by some war mongering leaders in the Indian Dominion of the inevitability of war between Pakistan and India; in the ill-treatment of the minorities in some of the Indian provinces and the fear among the minorities of the likely repercussions of that ill treatment here, and in the open encouragement to Hindus to leave this province being sedulously given by a section of the Indian Press, producing imaginary accounts of what it calls the plight of the minorities in Pakistan, and by the Hindu Mahasabha. All this propaganda and accusations about the ill treatment of the minorities stand belied by the fact that over twelve million non-Muslims continue to live in this province in peace and have refused to migrate from here.

Let me take this opportunity of repeating what, I have

already said. We shall treat the minorities in Pakistan fairly and justly. Their lives and property in Pakistan are far more secure and protected than in India and we shall maintain peace, law and order and protect and safeguard fully every citizen of Pakistan without distinction caste, creed or community.

So far so good. Let me now turn to some of the less satisfactory features of the conditions in this province. There is a certain feeling, I am told, in some parts of this province against non-Bengali Muslims. There has also lately been a certain amount of excitement over the question whether Bengali or Urdu shall be the state language of this province and of Pakistan. In this latter conncetion, I hear that some discreditable attempts have been made by political opportunist to make a tool of the student community in Dacca to embarrass the administration.

My young friends, students who are present here, let me tell you as one who has always had love and affection for you, who has served you for ten years faithfully and loyally, let me give you this word of warning: you will be making the greatest mistake if you allow yourself to be exploited by one politcal party or other. Remember, there has been a revolutionary change. It is our own Government. We are a free, independent and sovereign state. Let us behave and regulate our affairs as free men; we are not suppressed and oppressed under the regime of a foreign domination, we have broken those chains, we have thrown off those shackles. My young friends, I look forward to you as the real makers of Pakistan, do not be exploited and do not be mislead. Great amongst yourselves complete unity and solidarity. Set an example of what youth can do. Your main occupation should be in fairness to yourself, in fairness to your parents, in fairness to the state—to devote your attention to your studies. If you fritter away your

energies now, you will always regret. After you leave the portals of your universities and colleges then you can play your part freely and help yourself and the state. Let me warn you in the clearest terms of the dangers that still face Pakistan and your province in particular as I have done already. Having failed to prevent the establishment of Pakistan, thwarted and frustrated by their failure, the enemies of Pakistan have now turned their attention to disrupt the state by creating a split amongst the Muslims of Pakistan. These attempts have taken the shape principally of encouraging provincialism.

As long as you do not throw off this poison in our body politic, you will never be able to weld yourself, mould yourself, galvanise yourself into a real true nation. What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Baluchi, Pathan and so on. They are of course units. But I ask you: have you forgotten the lesson that was taught to us thirteen hundred years ago? If I may point out, you are all outsiders here. Who were the original inhabitants of Bengal—not those who are now living. So what is the use of saying, "We are Bengali, or Sindhis, or Pathans or Punjabis". No, we are Muslims.

Islam has taught us this, and I think you will agree with me that whatever else you may be and whatever you are, you are a Muslim. You belong to a Nation now; you have now carved out a territory, vast territory, it is all yours; it does not belong to a Punjabi or a Sindhi or a Pathan or a Bengali; it is yours. You have got your Central Government where several untis are represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation, for God's sake give up this provincialism. Provincialism has been one of the curses; and so is sectionalism Shia, Sunni, etc.

It was no concern of our predecessor Government; it

was no concern of theirs to worry about it; they were here to carry on the administration, maintain law and order and to carry on their trade and exploit India as much as they could. But now we are in a different position altogether. Now I give you an example. Take America. When it threw off British rule and declared itself independent, how many nations were there? It had many races: Spaniards, French, Germans, Italians, English, Dutch and many more. Will, there they were. They had many difficulties. But mind you, their nations were actually in existence and they were great nation; where as you had nothing. You have got Pakistan only now. But there a Frenchman could say, "I am a Frenchman and belong to a great nation" and so on. But what happened? They understood and they realised their difficulties because they had sense, and within a very short time they solved their problems and destroyed all this sectionalism, and they were able to speak not as a German or a Frenchman or an Englishman or a Spaniard, but as Americans. They spoke in this spirit: 'I am an American' and 'We are Americans.' And so you should think, live and act in terms that your country is Pakistan and you are a Pakistani.

Now I speak you to get rid of this provincialism because as long as you allow this poison to remain in the body politic of Pakistan, believe me you will never be a strong nation, and you will never be able to achieve what I wish we could achieve. Please do not think that I do not appreciate the position very often it becomes a vicious circle. When you speak to a Bengali, he says: Yes you are right, but the Punjabi is so arrogant. When you speak to the Punjabi or non-Bengali, he says, 'Yes but these people do not want us here, they want to get us out'. Now this is a vicious circle and I do not think anybody can solve this Chinese puzzle. The question is, who is going to be more sensible, more practical, more

statesmen—like and will be rendering the greatest service to Pakistan? So make up your mind and from today put and end to this sectionalism.

About language, as I have already said, this is in order to create disruption amongst the Mussalman. Your prime Minister has rightly pointed this out in recent statement and I am glad that his Government have decided to put down firmly any attempt to disturb the peace of this province by political saboteurs or their agents. Whether Bengali shall be the official language of this province is a matter for the elected representatives of the people of this province to decide. I have no doubt that this question shall be decided solely in accordance with the wishes of the inhabitants of this province at the appropriate time.

Let me tell you in the clearest language that there is no truth that your normal life is going to be touched or disturbed so far as your Bengali language is concerned. But ultimately it is for you, the people of this province, to decide what shall be the language of your province. But let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Any one who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Whitout one State Language, no nation can remain tied up solidly together and function. Look at the history of other countries. Therefore, so far as the State Language is concerned, Pakistan's Language shall be Urdu. But, as I have said, it will come in time.

I tell you once again, do not fall into the trap of those who are the enemies of Pakistan. Unfortunately, you have fifth-columnists—and I am sorry to say they are Muslims who are financed by outsiders. But they are making a great mistake. We are not going to tolerate the sabotage any more; we are not going to tolerate the enemies of Pakistan; we are not going to tolerate

quislings and fifth columnists in our state, and if this is not stopped, I am confident that your Government and the Pakistan Government will take the strongest measures and deal with them ruthlessly. because they are a poison. I can quite understand differences of views. Very often it is said, "Why can not we have this party or that party?" Now let me tell you, and I hope you will agree with me, that we have a result of unceasing effort and struggle ultimately achieved Pakistan after ten years. It is the Muslim league which has done it, there were of course many Mussalmans who were indifferent; some wee afraid, because they had vested intersets and they thought they might lose; some sold themselves to the enemy and worked against us, but we struggled and we fought and by the grace of God and with His help we have established Pakistan which has stunned the world.

Now this is a sacred trust in your hands. i.e. the Muslim Laegue. Is this sacred trust to be guarded by us as the real custodians of the welfare of our country and our people, or not? Are mushroom parties led by men of doubtful past to be started to destroy what we have achieved or capture what we have secured? I ask you one question. Do you believe in Pakistan? (cries of yes, yes). Are you happy that you have achieved Pakistan? (cries of yes, yes). Do you want East Bengal or any part of Pakistan to go into the Indian Union? (no, no). Well, if you are going to serve Pakistan, if you are going to build up Pakistan, if you are going to reconstruct Pakistan, then I say that the honest course open to every Mussalman is to join the Muslim League Party and serve Pakistan to the best of his ability. Any other mushroom Parties that are started at present will be looked upon with suspicion because of their past, not that we have any feeling of malice, ill-will or revenge. Honest change is welcome is but the present emergency

requires that every Mussalman should come under the banner of the Muslim League. Which is the true custodian of Pakistan, and build it up and make it a great State before we think of parties amongst ourselves which may be formed later on sound and healthy lines.

Just one thing more. Do not feel isolated. Many people have spoken to me that East Bengal feels isolated from the rest of Pakistan. No doubt there is a great distance separating the East from the West Pakistan; no doubt there are difficulties, but I tell you that we fully know and realised the importance of Dacca and East Bengal. I have only come here for a week or ten days this time, but in order to discharge my duty as the Head of the State I may have to come here and stay for day, for weeks, and similarly the Pakistan Ministers must establish closer contact. They should come here and your leaders and members of your Government should go to Karachi which is the capital of Pakistan. But you must have patience. With your help and with your support we will make Pakistan a might State.

Finally, let me appeal to you—keep together, put up with inconveniences, sufferings and sacrifices, for the collective good of our people. No amount of trouble, no amount of hard work or sacrifice is too much or to be shirked if you individually and collectively make a contribution for the collective good of your nation and your state. It is in that way, that you will build up Pakistan as the fifty largest State in the world not only in population as it is but also in strength, as that it will command the respect of all the other nations of the world. With these words I wish you God speed.

Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad.

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ভাষণ

STUDENTS' ROLE IN NATION-BUILDING

Speech at the Dacca University Convocation on 24th March, 1948

(Recorded by Radio Pakistan Dacca).

Mr. Chancellor, Ladies and Gentlemen,

When I was approached by your Vice-Chancellor with a request to deliver the convocation Address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which this University deals, such as Arts, History, Philosophy, Science, Law and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfilment of that promise that I will address you now.

First of all, let me thank the Vice-Chancellor for the flattering terms in which he reffered to me. Mr. Vice-Chancellor, whatever I am, and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon ever Mussalman to serve his people honestly and selflessly.

In addressing You I am not here speaking to you as Head of the State, but as a friend, and as one who has always held you in affection. Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. Just as you have won the laurels in your University and qualified yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this University to enter life under a sovereign, independent state of your won. It is necessary that you and your other fellow students fully

understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. We have broken the shackles of slavery, we are now a free people. Our state is our own state. Our Government is our own Government, of the people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. Freedom, however, does not mean licence. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or of the state. A great responsibility rests on you and, on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom that to run a Government. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi holocaust. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Over fifty lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks.The care and rehabilitation of there unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. Not only has Pakistan survived the shock of that upheavel but it has emerged stronger more chastened and better equipped than ever.

There followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment and lately, the institution of an almost complete economic blockade of your province. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore there happenings and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued vigilance on our part. Of late, the attack on your province, particularly, has taken a subtler form. Our enemies, among whom I regret to say, they are still some Muslims, have set about actively encouraging provincialism in the hope of weakening Pakistan and thereby facilitating the re-absorption of this province into the Indian Dominion. Those who are playing this game are living in a Fool's Paradise, but this does not prevent them from trying. A flood of false propaganda is being daily put forth with the object of undermining the solidarity of the Mussalmans of this state and inciting the people to commit acts of lawlessness. The recent language controvers, in which I am sorry to make note, some of you allowed yourselves to get involved even after your Prime Minister had clarified the poison, is only one of the many subtle ways whereby the poison of provincialism is being sedulously injected into this province. Does it not strick you rather odd that certain sections of the Indian press to whom the very name of Pakistan is anathema, should in the matter of language controversy, set themselves up as the champion of what they call your "Just rights"? It is not significant that the very persons who in the past have betrayed the Mussalmans or fought against Pakistan, which is after all merely the embodiment of your fundamental right of self-determination, should now suddenly pose as the saviours of your just rights and

incite you to defy the Government on the question of language? I must warn you to beware of these fifth columnists. Let me restate my views on the question of a state language for Pakistan. For official use in this province, the people of the province can choose any language they wish. This question will be decided solely in accordance with the wishes of the people of this province alone, as freely expressed through their accredited representatives at the appropriate time and after full and dispassionate consideration. There can, however, be only one lingua franca, that is, the language for inter communication between the various provinces of the state, and that language should be Urdu and can not be any other. The state language, therefore, must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by a hundred million of Muslims of this sub-continent, a language understood through out the length and breadth of Pakistan and above all, a language which, more than any other provincial language embodies the best that is in Islamic culture and Muslim tradition and is nearest to the language used in other Islamic countries. It is not without significance that Urdu has been driven out of the Indian Union and that even the official use of the Urdu script has been disallowed. These facts are fully known to the people who are trying to exploit the language controversy in order to stir up trouble. There was no justification for agitation but it did not suit their purpose to admit this. Their sole object in exploiting this controversy is to create a split among the Muslims of this state, as indeed they have made no secret of their efforts to incite hatred against non-Bengali Mussalmans. Realising however, that the statement that your Prime Minister made on the language controversy, on return from Karachi, Left no room for agitation, in so far as it conceded the right of the people of this province to choose Bengali as their

official language if they so wished these persons changed their tactics. They started demanding that Bengali should be the state language of the Pakistan Centre and since they could not overlook the obvious claims of Urdu as the Official language of Muslim State, they proceeded to demand that both Bengali and Urdu should it. There can be only one State language of the component parts of this State are to march-forward in unison and that language, in my opinion, can only be Urdu. I have spoken at some length on this subject so as to warn you of the kind of tactics adoped by the enemies of Pakistan and certain opportunist politicians to try to disrupt this state or to discredit the Government.Those of you who are about to enter life, be on your guard against these people. Those of you who have still to continue your studies for sametime, do not allow yourselves to be exploited by any political party or self-seeking politician. As I said the other day, your main occupation should be in fairness to yourselves is fairness to your parents and indeed, in fairness to the State, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your State. Only thus, can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable its to reach it destined goal among the most progressive and strongest nations of the world.

My young friends, I would, therefore, like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves. Secondly, guard against and weed out self-ish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the State, who wish to serve the people with heart and soul and

support them. Fourthly, consolidate the Muslim League Party which will serve and build up a really and truely great and glorious Pakistan. Fifthly, the Muslim League has won and established Pakistan and it is the Muslim League whose duty it is now as custodian of the sacred trust, to construct Pakistan. Sixthly, there may be many who did not lift their little fingers to help us in our struggle, may even opposed us and put every obstacle in our great struggle openly and not a few worked in our enemy's camp against us who may now come forward and put their own attractive slogans, catch-words, ideals and programmes before you. But they have yet to prove their bonafides or that there has really been an honest change of heart in them, by supporting and joining the League and working and pressing their views within the League Party organisation and not by starting mushroom parties, at this juncture of very great and grave emergency when you know that we are facing external dangers and are called upon to dealt with internal complex problems of a far-reaching character affecting the future of seventy millions of people. All these demands complete solidarity, unity and discipline. I assure you, "Divided you fall, United you stand."

There is another matter that I would like to refer to. My young friends, hitherto, you have been following the rut. You get your degrees and when you are thrown out of this University in thousands, all that you think and hanker for is Government service. As your Vice-Chancellor has rightly stated the main object of the old system of education and the system of Government existing hitherto, was really to have well-trained, well-epuipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified clerks. Civil Service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. Well, the whole principle

was to create a mentality, a psychology, a state of mind, that an average man, when he passed his B.A. or M.A. was to look for some job in Government. If he had it he thought he had reached his height. I know and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an M.A. earns less than a taxi driver, and most of the so-called Government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are emloyed by well-to-do people. Now I want to get out of that rut and that mentality and specially now that we are in free Pakistan. Government cannot absorb thousands. Imopossible. But in the competition to get Gevernment Service most of you get demoralised. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labour. There is an immense scope in techincal education for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law etc; which provide so many opportunities now. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. Now there are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will thereby benefit yourselves more than by merely going in for Government Service and remaining there, in what I should say, a circle of clerkship, working there from morning till evening, in most dingy and uncomfortable conditions. You will be far more happy and far more prosperous

with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry and will thus be helping not only yourselves but also your state. I can give you one instance. I know a young man who was in Government Service. Four years ago he went into a banking corporation on two hundred rupees, because he had studied the subject of banking and today he is Manager in one of their firms and drawing fifteen hundred rupees a month in just four years. There are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms.

Finally, I thank you again Mr. Chancellor and particularly you Mr. Vice Chancellor for the warm welcome you have given me and the very flattering personal refenrnces made by you. I hope, may I am confident that the East Bengal youth will not fail us.*

---

* Quaid-i-Azam Mohammed Ali Jinnah, Speeches as Governor General of Pakistan 1947-1948, Ferozsons Ltd, Karachi গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

১৯৭৬ সন হতে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত একুশে পদকপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দের নামের তালিকা

১৯৭৬ সন

ক্রমিক নং	নাম	ক্ষেত্র
১।	কবি কাজী নজরুল ইসলাম	সাহিত্য
২।	ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা	শিক্ষা
৩।	কবি জসীম উদ্দিন	সাহিত্য
৪।	বেগম সুফিয়া কামাল	সাহিত্য
৫।	কবি আবদুল কাদির	সাহিত্য
৬।	অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন	শিক্ষা
৭।	মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)	সাংবাদিকতা
৮।	জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন	সাংবাদিকতা
৯।	জনাব আবদুস সালাম	সাংবাদিকতা

১৯৭৭ সন

ক্রমিক নং	নাম	ক্ষেত্র
১।	জনাব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	সাহিত্য
২।	ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান	সংগীত
৩।	অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ	শিক্ষা
৪।	মরহুম কবি ফররুখ আহমদ	সাহিত্য
৫।	কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকী	সাহিত্য
৬।	খন্দকার আবদুল হামিদ	সাংবাদিকতা
৭।	ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী	শিক্ষা
৮।	কবি শামসুর রাহমান	সাহিত্য
৯।	জনাব জহির রায়হান	নাট্যশিল্প
১০।	জনাব রশীদ চৌধুরী	চারুশিল্প
১১।	মরহুম আবদুল আলীম	সংগীত
১২।	শহীদ আলতাফ মাহমুদ	সংগীত
১৩।	বেগম ফেরদৌসী রহমান	সংগীত

১৯৭৮ সন

ক্রমিক নং	নাম	ক্ষেত্র
১।	জনাব খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন	সাহিত্য
২।	জনাব আহসান হাবীব	সাহিত্য
৩।	জনাব সুফী জুলফিকার হায়দার	সাহিত্য
৪।	জনাব মাহবুবুল আলম	সাহিত্য

৫।	জনাব নূরুল মোমেন	সাহিত্য
৬।	মরহুম বেগম আভা আলম	সংগীত
৭।	জনাব সফিউদ্দিন আহমদ	শিল্পী
৮।	শহীদ সিরাজ উদ্দিন হোসেন	সাংবাদিকতা
৯।	ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন	শিক্ষা

১৯৭৯ সন

১।	মরহুম কবি আজিজুর রহমান	সাহিত্য
২।	কবি বেনজির আহমদ	সাহিত্য
৩।	জনাব আবদুল লতিফ	সংগীত
৪।	জনাব শেখ লুৎফর রহমান	সংগীত
৫।	জনাব আবদুল ওয়াহাব	সাংবাদিকতা
৬।	জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের	সাংবাদিকতা
৭।	ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক	শিক্ষা

১৯৮০ সন

১।	জনাব আবুল হোসেন	সাহিত্য
২।	জনাব বেদার উদ্দিন আহমদ	সংগীত
৩।	জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	সংগীত
৪।	জনাব হামিদুর রহমান	চারু শিল্প
৫।	জনাব মুর্তজা বশীর	শিল্পী
৬।	জনাব রণেন কুশারী	নাট্যশিল্প
৭।	জনাব মুজিবুর রহমান খাঁ	সাংবাদিকতা
৮।	জনাব মোহাম্মদ ফেরদৌস খান	শিক্ষা

১৯৮১ সন

১।	জনাব আবু রুশদ মতিন উদ্দিন	সাহিত্য
২।	জনাব আমিনুল ইসলাম	চারুশিল্প
৩।	জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী	সংগীত
৪।	জনাব মমতাজ আলী খান	সংগীত
৫।	মরহুম গওহর জামিল	নৃত্য
৬।	জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া	নাট্যশিল্প
৭।	মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী	সাংবাদিকতা
৮।	জনাব ওবায়দুল হক	সাংবাদিকতা
৯।	ডঃ মুস্তফা নুরউল ইসলাম	শিক্ষা

১৯৮২ সন

১।	অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান	সাহিত্য

২।	জনাব মরহুম আবুল হাসান	সাহিত্য
৩।	কবি তালিম হোসেন	সাহিত্য
৪।	জনাব আবদুল হাকিম (খান বাহাদুর)	শিক্ষা
৫।	ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ	সংগীত
৬।	জনাব এস, এম, সুলতান	চারুশিল্প
৭।	জনাব জি, এ, মান্নান	নৃত্য
৮।	জনাব সানাউল্লাহ নূরী	সাংবাদিকতা

১৯৮৩ সন

১।	জনাব শওকত ওসমান	সাহিত্য
২।	জনাব সানাউল হক	সাহিত্য
৩।	জনাব আবদুল গফ্ফার চৌধুরী	সাহিত্য
৪।	জনাব এম, এ, কুদ্দুছ	শিক্ষা
৫।	মরহুম শহীদুল্লাহ কায়সার	সাংবাদিকতা
৬।	মরহুম সৈয়দ নুরুদ্দিন	সাংবাদিকতা
৭।	জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন	সাংবাদিকতা
৮।	জনাব মোহাম্মদ কিবরিয়া	চিত্র শিল্প
৯।	জনাব বারীণ মজুমদার	সংগীত।

১৯৮৪ সন

১।	ডঃ আনিসুজ্জামন	শিক্ষা
২।	অধ্যাপক হাবিবুর রহমান (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৩।	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৪।	জনাব হাসান হাফিজুর রহমান (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৫।	সৈয়দ শামসুল হক	সাহিত্য
৬।	জনাব রশীদ করীম	সাহিত্য
৭।	জনাব সিকান্দার আবু জাফর (মরনোত্তর)	সাংবাদিকতা
৮।	ওস্তাদ মীর কাশেম খান	সংগীত
৯।	সাবিনা ইয়াসমিন	সংগীত
১০।	জনাব এ, টি, এম, আবদুল কাউয়ুম চৌধুরী	চারুশিল্প

১৯৮৫ সন

১।	জনাব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান	সাহিত্য
২।	জনাব গাজী শামছুর রহমান	সাহিত্য
৩।	জনাব গোবিন্দ চন্দ্র দেব (মরণোত্তর)	শিক্ষা
৪।	ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন	শিক্ষা
৫।	জনাব মোঃ আবদুল জব্বার	শিক্ষা

৬।	জনাব কলিম শরাফী	সংগীত
৭।	ওস্তাদ আবেদ হোসেন খান	সংগীত
৮।	সৈয়দ জাহাংগীর	চিত্রশিল্প

১৯৮৬ সন

১।	ডঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ	সাহিত্য
২।	কবি আল মাহমুদ	সাহিত্য
৩।	জনাব সত্যেন সেন (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৪।	জনাব আশকার ইবনে শাইখ	সাহিত্য
৫।	ওস্তাদ মুন্সী রইস উদ্দিন (মরণোত্তর)	সংগীত
৬।	জনাব মোবারক হোসেন খান	সংগীত
৭।	জনাব ধীর আলী মিয়া (মরনেণত্তর)	সংগীত

১৯৮৭ সন

১।	বেগম জাহানারা আরজু	সাহিত্য
২।	জনাব আনিস সিদ্দিকী (মরণোত্তর)	সাহিত্য
৩।	ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	সাহিত্য
৪।	ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল	সাহিত্য
৫।	অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবুল কাশেম	শিক্ষা
৬।	অধ্যাপক এম, এ, নাসের	শিক্ষা
৭।	ডঃ আহমদ শামসুল ইসলাম	শিক্ষা
৮।	জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা
৯।	জনাব এস, এম, আহমেদ হুমায়ুন	সাংবাদিকতা
১০।	জনাব কানাই লাল শীল (মরণোত্তর)	শিল্পকলা(যন্ত্র সংগীত)
১১।	বেগম ফরিদা পারভীন	শিল্পকলা (সংগীত)
১২।	সৈয়দ মইনুল হোসেন	শিল্পকলা (সংগীত)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশ প্রেস ইন্‌স্টিটিউট (মাইক্রো ফিল্‌ম বিভাগ)

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী

ডাঃ সাঈদ হায়দার

ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ

জিনাত আরা (শহীদ বরকতের মামাতো বোন)

সুস্মিতা সুলতানা